বাংলার বারোভুঁইয়া

ও

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

সংগ্রহ ও সম্পাদনা

কমল চৌধুরী

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

প্রকাশক
গোপা দাশশর্মা
অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি
নবার্ক। ৫৮/৪৭ বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলকাতা ৭০০০৪৫

সম্পাদক পর্ষৎ
মুখ্য সম্পাদক : অসীম দাশশর্মা
সদস্যবৃন্দ : তুলসীদাস লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু, কাবেরী রায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলী মিত্র, গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, জয় ঘোষাল, মিতা বসু, অনন্যা ঘোষ।

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

সাতক্ষীরা (বাংলাদেশ) সরকারি কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক কাজী মুহম্মদ আলিউল্লাহ
বন্ধুবরেষু

সূচিপত্র

বাংলার বারোভুঁইয়া

বাংলা ঃ মোঘলদের আগে

রাজা তোডরমল্ল পঞ্জাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লিতে সামান্যরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। আকবরের নাবালকী সময়ে নবাব খানখানান বের্হাম খাঁ খাদ্যদ্রব্যে বিষ দিয়া আকবরকে অপহত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বের্হামের এক দাসী তোডরমল্লের উপপত্নী ছিল। তোডর সেই দাসীর যোগে সেই চক্রান্ত জানিয়া আকবরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তদন্তে চক্রান্ত ধরা পড়িল, সুতরাং সম্রাটের প্রাণরক্ষা হইল। ইহাতেই তোডরমল্লের উন্নতি হইল এবং আকবরের হিন্দু প্রীতি সঞ্চার হইল। তিনি হিন্দুদের প্রতি যতই অধিকতর বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, ততই বেশি উপকার পাইতে লাগিলেন। তাহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুম্বেরা বিদ্রোহী হইলেও আকবর হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। আকবরের হিন্দুয়ানি, মুসলমানি ও খ্রিস্টানি বহু পত্নী ও উপপত্নী ছিল, কিন্তু আকবর কখন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অন্যের ঘরে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন না। ইহাই মোঘল রাজত্বে হিন্দুদিগের উন্নতির কারণ। রাজা তোডরমল্ল আকবরের দেওয়ান হইয়া ঠিক হিন্দুরীতিক্রমে জরিপ জমাবন্দি করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোঘল দরবারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তৎকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই যে—

(১) অম্বর, যোধপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় মহারাজগণ—যাহারা মোঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন, রাজা তোডরমল্ল তাহাদিগকে বশী রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের রাজ্যের জরিপ জমাবন্দি না করিয়া কেবল তাহাদের উপর একটি নির্দিষ্ট কর ধার্য করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তাহারা সম্রাটের আবশ্যক মতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সেনা সহ সম্রাটের আদিষ্ট যুদ্ধকার্যে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। যিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার মনসবদার উপাধি পাইতেন।

(২) অপর জমিদারগণকে তোডরমল্ল করদ রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের জমিদারি জরিপ করিয়া বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক পৃথক পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেরূপ "হাত" জরিপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজি ২২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।[১] সেই হাতের ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত প্রস্থ ভূমিকে কুলা, কুড়া বা বিঘা বলা যাইত। দীর্ঘে বেশি প্রস্থে কম হইলেও যদি মোট পরিমাণে ১০,০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়া গণ্য হইত। এক কুড়ার $\frac{১}{২০}$ বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০০ বর্গ হস্তে এক বিশোয়া হইত। আবার তাহার $\frac{১}{২০}$ অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্গ হস্তে এক ধুল বা ধুর হইত। এক হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহস্ত ভূমিকে এক কৌণী ধরা হইত। থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়া নক্‌শা তৈয়ারি করা হইয়াছিল এবং তাহার চিঠাপৈঠা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক প্রজার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, পুষ্করিণী, দিঘি, ইন্দারাগুলি জলা জমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ হ্রদগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত।

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণত দুই বৎসর ভাল রূপ শস্য হয়। তৃতীয় বর্ষে শস্য

কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলত সকল বৎসরে শস্য সমান হয় না। গড়পড়তায় চারি বৎসরের লভ্য একুন করিয়া তাহার $\frac{১}{৪}$ চতুর্থাংশ রাজা তোডরমল্ল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক লভ্য ধরিয়াছিলেন। সেই লভ্যের $\frac{১}{৬}$ ষষ্ঠাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজস্ব ধার্য করিয়াছিলেন। জলকর, ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বৎসরের লভ্যের $\frac{১}{৫}$ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লভ্য ধরিয়া তাহার $\frac{১}{৬}$ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব ধার্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক, দালাল, মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেশ্যা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম ধনকর। এইরূপ রাজস্ব যাহা জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার নাম সুমার জমা (মোট সংস্থা)। হিন্দু শাস্ত্রমত করদ রাজারা মোট সংস্থার $\frac{৭}{২০}$ ভাগ পাইতেন। রাজা তোডরমল্ল সেই স্থলে সুমার জমার $\frac{১}{৩}$ তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। বাকি $\frac{২}{৩}$ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

(৪) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহারা উপরিউক্ত নিয়মে নিজ প্রজার নিকট যাহা আদায় করিবে, তাহার $\frac{১}{৩}$ তৃতীয়াংশ তাহারা পাইবে। অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ জমিদারকে দিবে। আবার জমিদার সেই টাকার $\frac{১}{৩}$ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাকি $\frac{২}{৩}$ ভাগ অর্থাৎ তালুকদারি জমির সুমার জমার $\frac{৪}{৯}$ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান তোডরমল্লের বন্দোবস্ত দেখিয়া অনুমান করেন যে, আকবরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী ছিল না। কিন্তু তাহা ভুল। আকবর ও অন্যান্য মুসলমান সম্রাটের আমলে সমস্ত দেশই জমিদার ও তালুকদারগণ কর্তৃক শাসিত হইত। সম্রাটদের খাস দখলি কোন ভূমি ছিল না। তোডরমল্ল যে প্রজা সহ রাজস্ব ধার্য করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরূপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু জমিদার ও তালুকদারগণ প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাজনা না লইতে পারে, ইহাও অন্যতর অভিপ্রায় ছিল। রাজা তোডরমল্ল যেমন জমিদার, প্রজা এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কেহই তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেজ গভর্নমেন্ট বারংবার প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদূর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। এখন বহুব্যয় করিয়া মকদ্দমা করত প্রজা ও জমিদার সর্বস্বান্ত হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ করিতে পারে না। তোডরমল্ল কৃত বন্দোবস্তে অতি সহজে বিনা ব্যয়ে সম্রাট, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষা হইত।

ইংরেজ ইতিবৃত্তবেত্তারা আরও বলেন যে, মোঘল সাম্রাজ্যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক কর্মচারী মাত্র ছিল। ইংরেজের আমলে লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেব জমিদারদিগকে মালিকী স্বত্ব দিয়াছেন, তাহাও ভুল। জমিদারেরা পূর্বেও পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। তখন শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের উপর ছিল এবং তাহাদের বিচারাধিকার ছিল। তৎকালে তাহারা সর্বাংশেই করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু জমি দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট ক্ষমতা জমিদার বা প্রজার ছিল না। কেননা জমিদারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহাতে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আবার প্রজাদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দিলে তাহারা মহাজন কিংবা বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত। এই জন্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা স্পষ্টরূপে কাহাকেও প্রদত্ত হইত না। অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে প্রজা জমি হস্তান্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজারূপে স্বীকার করিয়া লইতেন। তেমনই জমিদার নিজ জমিদারি অন্য কোন সুযোগ্য লোককে দিলে, নবাব ও সম্রাটগণ গ্রহীতাকে জমিদার বলিয়া সনন্দ দিতেন। এইরূপ নির্দোষ হস্তান্তর প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ গভর্নমেন্ট জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই

হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারি সমস্ত বা আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়া আবশ্যক হয় না। সুবে বাংলা ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্বেই রাজা তোডরমল্ল দিল্লিতে আহূত হইয়াছিলেন। নায়েব দেওয়ান রাজা কংসনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া চিঠাপৈঠা এবং নক্‌সা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সুবে বাংলার রাজস্ব ৬৭,০০,০০০ সাতষট্টি লক্ষ এবং সুবে বেহারের রাজস্ব ৪০,০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাকা সম্রাটের বার্ষিক প্রাপ্য হইয়াছিল। সম্রাট তুষ্ট হইয়া রাজা কংসনারায়ণকে খেলাত ও দেওয়ানি সনন্দ দিয়াছিলেন।

* * * *

ভগবান পরশুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা জাতিভ্রষ্ট করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তখন সমস্ত মহর্ষিগণ তাহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভৃগুরাম কহিলেন, "বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় পত্নী এখন গর্ভবতী আছে। স্ত্রীবধ-পাপাশঙ্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমস্ত পুত্রসন্তান নষ্ট করিয়া তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব-প্রসূত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।" ঋষিগণ কহিলেন, "আপনি বহুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানদিগকে তদ্রূপ শূদ্রত্বে পাতিত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করুন।" পরশুরাম সম্মত হইলেন। তখন ভৃগুরাম ঋষিগণ সহকারে বিধান করিলেন যে, "বর্তমান গর্ভবতী ক্ষত্রপত্নীদের যে সন্তান হইবে, তাহারা শূদ্র হইবে। আর বিধবা ক্ষত্রপত্নীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান হইবে, তাহারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য হইবে। তদনুসারে সেই গুর্বিণী ক্ষত্রিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহারা গর্ভে ছিল, এইজন্য তাহারা কায়স্থ (কায়+স্থা+ডা) জাতি নামে অভিহিত হইল। কায়স্থেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তাহারা যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের স্বকৃত নহে। এইজন্য তাহারা সকল শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত।

জাতিমালায় কায়স্থজাতির এই ইতিহাস পাওয়া যায়। অন্য কোন সংস্কৃত পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু "কায়স্থ" শব্দটি বহু গ্রন্থে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কায়স্থ শব্দের মূলার্থ "শরীর-স্থিত"। চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং গীতাতে সর্বত্রই এই মূলার্থে কায়স্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা—(১) কায়স্থং নিগূঢ়ব্যাধিং (শরীরস্থিত গুপ্তরোগ)। (২) কায়স্থাঃ কৃমিনিকিরাঃ—(শরীরস্থিত চর্মকৃমিসমূহ)।

গীতাতে (৩) কায়স্থোঽপি ন কায়স্থাঃ—(শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীরের অংশ নহে)।

হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপ্তচরদিগকেও কায়স্থ বলা যাইত। তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাহারা রাজ্য মধ্যে চোর, দস্যু এবং রাজবিপক্ষ লোকদের কার্য, গতিবিধি এবং গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করিত। এই অর্থে রাজতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতেও অনেক স্থলে "কায়স্থ" শব্দ দেখা যায়। তাহা কেবল চাকরির উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ বোধক নহে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতীয় লোকের বসতি ছিল না। রাজতরঙ্গিণীর কথিত কায়স্থ পদবীর লোকেরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়া তাহা পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ শ্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাতিমালা ভিন্ন অন্য কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহা হইতে

অনুমান হয় যে, হিন্দু রাজত্বকালে কায়স্থজাতি কুত্রাপি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অনুমান করেন যে, কায়স্থ জাতি অন্যান্য শূদ্রগণ সহ মিলিত হইয়া পৃথক অস্তিত্বশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। কারণ, যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কায়স্থজাতি না থাকিলে কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইত না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না তজ্জন্য প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শূদ্র শব্দ দেখা যায়। তাহারা কায়স্থ, কি অন্য জাতীয় শূদ্র তাহা প্রকাশ নাই। পাঠান রাজত্বেই বোধ হয় বর্তমান কায়স্থজাতির উৎপত্তি বা উন্নতি হইয়াছে। সেই উন্নতির কারণ যতদূর জানা যায় তাহা এই যে, মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে পারসি, আরবি প্রভৃতি যাবনিক ভাষা রাজভাষা হইল। উচ্চজাতীয় হিন্দুরা বহুদিন পর্যন্ত সেই যাবনিক ভাষা পাঠ করিত না। সেই সুযোগে কতকগুলি শূদ্র পারসি পড়িয়া পাঠানদিগের চাকরি লইয়াছিল। তাহারা অজ্ঞ পাঠানদিগকে ঠকাইয়া এবং প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর উপার্জন করিত। তাহারা আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দিত। কায়েত শব্দ বোধ হয় কায়স্থ শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু কায়েত শব্দ কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, সমস্ত শিক্ষিত শূদ্রই কায়েত উপাধিতে অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে প্রায়ই "লাল" শব্দ যুক্ত থাকিত, এইজন্য পাঠানেরা ইহাদিগকে লালা লোক বলিত। সেই কায়েত বা লালাগণ কিছু অর্থব্যয় করিয়া কোন পুরাতন কায়স্থ পরিবারসহ দুই একটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই, তাহারা কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইত।

পশ্চিম ভারতের কায়েতদিগের দেখাদেখি বাংলাদেশের উন্নত শূদ্রেরাও কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পূর্বে আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিত না। যে সকল পশ্চিমা শূদ্র শ্রোত্রিয়দের সেবক রূপে আসিয়া বাংলাদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদেব সন্তানেরা অধিকাংশই কায়েত উপাধি ধারণ করিল। তদ্ভিন্ন নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যায় বা সঙ্গতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহারাই কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই রূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কায়স্থ হওয়ায় কাজেই অন্যান্য শূদ্রগণ অপেক্ষা কায়স্থজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুন্নত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, শ্রোত্রিয়দের সেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূদ্র কানোজ হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিল, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ নাই। সমস্ত কুলশাস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে। কোন্ শ্রেণীর শূদ্র তাহা ব্যক্ত নাই। কেননা প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া লিখিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাহ্মণেরও কুত্রাপি "কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" তাহা প্রকাশ নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল শূদ্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। সেই উক্তি হইতে, তাহারা কায়স্থ ছিল কিনা, ইহা নিরূপণ করা যায় না।

কানোজীয় ব্রাহ্মণেরা বাংলাদেশের শূদ্রগণ অপেক্ষা আপনাদের অনুচর পশ্চিমা শূদ্রদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাহাদের অনুকরণে গৌড়ের বৈদ্য রাজারাও সেই পশ্চিমা শূদ্রদিগকে অপর শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বৌদ্ধরাজা ধর্মপাল, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দেবপাল পশ্চিমা শূদ্রদিগকে সমধিক সম্ভ্রান্ত দেখিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গৌড় নগর হইতে কয়েকটি পশ্চিমা শূদ্র আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের ঘরে নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় চাকরি এবং সম্পত্তি দিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গজ কায়স্থগণ তাহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙালি কায়স্থদের প্রথম উন্নতি।

সম্রাট বল্লাল সেন কতিপয় পশ্চিমা শূদ্রকে রাজকীয় পদ দিয়াছিলেন। দত্তগোষ্ঠীয়

একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্যাদা স্থাপন সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পরেই পশ্চিমা শূদ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙালি কায়স্থদের উন্নতির দ্বিতীয় সিঁড়ি।

* * * *

রাজা মানসিংহ রাজপুতনার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহারা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের সন্তান বলিয়া পরিচিত (কাছোয়া বা কুশাবহ বংশ)। এই বংশীয় রাজারা মোঘল সম্রাটদিগের নিতান্ত অনুগত এবং অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাদের সুন্দরী কন্যা প্রায় সমস্তই বাদশাহের ঘরে বিবাহ দিতেন এবং ইহারা বংশানুক্রমে বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যোধপুরের রাথোর বংশীয় রাজারা সময়ে সময়ে বাদশাহের অধীনে সুবাদারি করিতেন। সেবাই জয়সিংহ বা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্মিত হইলে, তাহাতেই রাজধানী হইয়াছে। তদবধি এই রাজ্যটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে।

হিঃ ৯৯৭ সালে মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িষ্যায় পাঠানদিগকে দমন, বেণী রায়ের দস্যুতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটি মানসিংহের বাংলা দেশে প্রধান কার্য।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই বাংলাদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। রাজা মানসিংহ বারংবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে মোঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর বাংলা দিল্লির সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাহাদের প্রেরিত এক একজন সুবাদার বাংলা শাসন করিতেন। অনেক সময়ে রাজকুমারেরা বাংলার সুবাদার হইয়া আসিতেন।

বেণী রায়ের ডাকাইতি নিবারণ মানসিংহের দ্বিতীয় কার্য। বেণীমাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেই জন্যই পরে তাহার "পণ্ডিত ডাকাইত" নাম হইয়াছিল। তাহার এক পত্নী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দার সেই সুন্দরী অপহরণ করায়, বেণী রায় সংসার ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা জোটাইয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এই স্থলে তিনি "যবনমর্দিনী" নামে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলিদান করত তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি তিনি পুঞ্জ করিয়া রাখিতেন। তাহার বাসদ্বীপকে অদ্যাপি "পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা" বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে "শয়তানের ভিটা" বলিত। পূর্বে শ্যামা রামা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, মুসলমানদের উপর বেণী রায়ের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশি ভিন্ন কম ছিল না। শ্যামা রামা প্রকৃত ডাকাইত ছিল, বেণী রায় তদ্রূপ অর্থলিপ্সু ডাকাইত ছিলেন না। হিন্দুদের প্রতি তাহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখন বেণী রায়কে দমনের জন্য চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক প্রাণ হরণ করিতেন না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না। এমনকি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে, "আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশ্যরূপে লইলে সাহায্যকারীগণ মুসলমান কর্তৃক দণ্ডিত

হইবে, এই ভয়ে আমি লুঠ করিয়া লইয়া থাকি।" বেণী রায়ের আবির্ভাব দেখিয়া বাড়ির সম্মুখে কিছু অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণী রায়ের দল আর সেই গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করিত না। তজ্জন্য হিন্দুরা বেণী রায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে, রাজীব সাহার বাড়ি বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণী রায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণী রায়ের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "বাবা ঠাকুর! আপনকার প্রণামী অগ্রেই পৃথক করিয়া রাখিয়াছি।" বেণী রায় সেই প্রণামী লইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন ; বিবাহকার্যের কোনই বিঘ্ন হইল না। বেণী রায় সাঁতোড়ের সান্যালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্য সাঁতোড়ের সান্যাল ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর সান্যাল এবং কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্বপ্রধান।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ বেণী রায়ের বিনাশার্থ সসৈন্যে সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। সাঁতোড়, ভাদুড়িয়া ও নিকটবর্তী অন্যান্য পরগণার জমিদারগণ তলপ মত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাহারা কহিলেন, "বেণী রায়কে সদ্ভাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলে বহুলোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা সফল হইবে না।" বেণী রায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভানুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাহাকে সদ্ভাবে বশ করাই সংকল্প করিলেন। ঠাকুর ভানুসিংহ দূত দ্বারা বেণী রায়কে জানাইলেন যে, "পাঠান রাজত্বসময়ে মুসলমানেরা বহু অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্যা করিতেন। হঠাৎ তাহার মনে বিষয়বাসনা উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্মগ্লানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সম্রাট আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সাম্রাজ্যে মুসলমানগণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাধান্য হইতেছে। তাহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অনুচিত। বিশেষত আপনি সুপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুসলমানের অপরাধে অন্যান্য মুসলমানদিগকে হিংসা করা ধর্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।" বেণী রায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুসিংহ বেণী রায়কে এক পরগণা জমিদারি রূপে এবং ১২০০/ বিঘা জমি তাহার কালীদেবীর দেবত্র রূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণী রায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিলেন। বেণী রায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সান্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারি দিয়াছিলেন আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দরবারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বেণী রায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাহার সন্তানেরাই জেলা বগুড়ার সেরপুরের সান্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারি ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দিনী কালীমূর্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণী রায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারি পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার রায়। ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা "কাল জোগ্‌লা" ও "কাল্ চণ্ডিয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বেণী রায়ের দলে ছিলেন, তাহারা এবং তৎসংসৃষ্ট কুলীনেরা "বেণীপঠীর

কুলীন” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি বেণীপঠীর কুলীন নামেই পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাইত ও তাহার চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা-প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজশাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার৲ সহ তুলনায় ইংরেজি “রবিন হুডের কার্যকলাপ” তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। এখন বাঙালিরা যেমন ঐক্যহীন, পূর্বে বোধ হয় তদ্রূপ ছিল না। বেণী রায়ের পত্নী অপহৃত হইলে, বহুলোক তাহার দলভুক্ত হইয়া প্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন করা নবাব এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কার্য ছিল। তখনকার জমিদারগণ কোন বিপদে পড়িলে তাহাদের প্রজাগণ প্রাণপণে সাহায্য করিত। তখন কোন ব্যক্তির বিপদ শুনিবামাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সহায়তা জন্য বিনা প্রার্থনায় অগ্রসর হইত। বিশেষত ব্রাহ্মণের বিপদে পার্শ্ববর্তী সমস্ত হিন্দুই উদ্ধারার্থ সাহায্য করিত। এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হয় বটে, কিন্তু কার্যত কিছুই হয় না।

কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন রাজা মানসিংহের তৃতীয় কার্য। ঠাকুর ভানুসিংহ সদ্ভাবে এই কার্য সাধন জন্য দুইজন বাঙালি ব্রাহ্মণকে কোচবিহারে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিছুদিন পর রাজা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন। দিনাজপুরের নবাব তাহাদের রসদ ও অপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতেছিলেন। কোচবিহারাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বিপ্রদূতদ্বয়ের পরামর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হইলেন এবং নিজ ভগিনী পদ্মেশ্বরীকে রাজা মানসিংহের সহ বিবাহ দিলেন। মানসিংহ কোচবিহার রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং বার্ষিক ৮০,০০০৲ আশি হাজার নারায়ণী টাকা (এই টাকার মূল্য ।৶০ আনা ছিল) নালবন্দি বা নর্মা দিয়া নিরুপদ্রবে কোচবিহার রাজ্য ভোগ করিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন। এইরূপে পদ্মার উত্তরে পারে দুই কার্য বিনা রক্তপাতেই সুসম্পন্ন হইল।

আকবর শাহের সময়ে যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়া আরাকান হইতে হাব্‌রীদিগকে (পর্তুগিজ) আনিয়া আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করত রূপনারায়ণ নদ হইতে নোয়াখালি পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লন।[২] সম্রাট অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হয়। অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহকে দ্বিতীয়বার বঙ্গে প্রেরণ করেন। মানসিংহ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করেন এবং তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লি লইয়া যান। পথিমধ্যে কাশীধামে বন্দিকৃত রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মৃতদেহ ঘৃতভাণ্ড ভরিয়া তাহাই লইয়া মানসিংহ জাহাঙ্গীরের নিকট গিয়া নিজ কার্যসমূহের নিকাশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহর হইতে যে শীলাদেবী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অম্বরেই আছে। দেবীর পুরোহিত চারিজন বৈদিক ব্রাহ্মণ সপরিবারে অম্বরে বাস করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় পুরোহিতরূপে বিদ্যমান আছে।

রাজা মানসিংহ দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাহার শাসিত প্রদেশের করদ রাজা স্বীকার করিয়া রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার বার্ষিক কর ৬০,০০০৲ টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। কোচবিহারের মহারাজ রাজা প্রাণনাথের সহ পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মানসিংহের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভসম্ভূত পুত্র জগৎ সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোচবিহারের রাজকুমারী পদ্মেশ্বরীর গর্ভে মানসিংহের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার সন্তানেরাই এখন জয়পুর রাজত্ব করিতেছে।

২

পাঠান রাজত্বের অবসান কালে এবং বঙ্গদেশে মোঘল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান সময়ে বাংলা দেশের পার্শ্ববর্তী বারো জন রাজা এবং অভ্যন্তরে বারো জন করদ রাজা বা বারোভুঁইয়া ছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১. মণিপুর—

এই রাজ্য অতি প্রাচীন। ইহার রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজা চিত্রসেনের পুত্র ছিল না। তাহার একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বভ্রুবাহন মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই বংশই অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই রাজারা মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিলেন এবং বল্লাল সেনের করদ বশী রাজা ছিলেন। এখন ইংরেজের অধীন হইয়াছেন। এই বংশ কখনই বিশেষ পরাক্রান্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই।

২. ত্রিপুরা রাজ্য—

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে কাশীধাম পর্যন্ত সমস্ত স্থানে ক্ষত্রিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ববর্তী দেশে ক্ষত্ররাজ্য বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার রাজা পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই রাজবংশ সময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল। এই রাজারা বারংবার পাঠান, মোঘল, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহাদের রাজত্ব আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কমলাপুরে (কমিল্লা) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। শাহজাদা সুজার নবাবী সময়ে কমলাপুর মোঘলেরা দখল করায় আগরতলায় রাজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল গোপীপ্রসাদ বর্মা নামক রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজবংশ ধ্বংস করত স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রসাদের বংশই রাজা আছেন। গোপীপ্রসাদের বংশীয়েরা কখনও প্রতিভাশালী হন নাই। ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাজা রূপে ভোগ করেন। আর কতক স্থান জমিদারি স্বত্বে দখল করেন। রাজতালিকা নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস এবং রাজতালিকা নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, ইতিহাস লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না।

৩. শ্রীহট্ট রাজ্য—

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্তী রাজাদের সাহায্যে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্যাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছে। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহারা সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আসামের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা দিগিন্দ্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। অদ্বৈত গোস্বামীর বংশজাত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজা অন্তিমকালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গোঁসাই রাজা হইয়া অনেকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে লইয়া গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে আছে, সেই অংশও পূর্বে শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, গোঁসাই রাজা হইবার পূর্বে এই রাজ্যে

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না। দ্বারকানাথের পর তৎপুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী রাজা হইয়া শাক্তদিগের উপর ঘোর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শাহ জেহান দিল্লির সম্রাট ছিলেন এবং তৎপুত্র সুজা বাংলার সুবেদার ছিলেন। কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ গিয়া সুজার নিকট শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধে নালিশ করায় সুজা শ্রীহট্ট রাজ্য জয় করিয়া সুবে বাংলার সামিল করিয়াছিলেন। সুজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা এখন জেলা কুমিল্লার অন্তর্গত—তাহাও দখল করিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বার্ষিক চোদ্দ লক্ষ টাকা সুজার আয় হইত। শ্যামসুন্দর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত উথুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা উথুলির গোঁসাই নামে পরিচিত। বোধ হয়, ধর্মবিদ্বেষজনিত অত্যাচার মোঘল অপেক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশি ছিল।

৪. জয়ন্তীরাজ্য—

এই রাজ্যে খসিয়া নামক অসভ্য অনার্য জাতির বসতি ছিল। এই রাজ্য কখন সভ্য বা পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাজ্য অনেক সময়েই ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ও করদ ছিল। ইহাতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। স্থানে স্থানে যে সকল সামন্ত বা সর্দার ছিল, তাহারাই প্রায় স্বাধীনভাবে থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন হইয়া কতক সভ্য হইতেছে।

৫. অচ রাজ্য—

এই রাজ্যে "নাগ" জাতীয় অনার্য জাতির বসতি ছিল। অদ্যাপি তাহাদিগকে "নাগা" বলে। চিরস্থির বস্তুর নাম "নগ" (ন গচ্ছতি ইতি নগ)। এই শব্দে আকাশ, পর্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। আবার সেই নগ সম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থকেই 'নাগ' বলা যায়। নাগ শব্দে স্থির-বায়ু, হস্তী, মহাসর্প এবং পার্বত্য লোক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা অনেক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ শব্দ অপ্রাপ্য নহে। সেই সকল শব্দের সাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। "পৃথিবী অনন্ত নাগের উপর আছে" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম স্থির-বায়ুর উপর আছে ; "উলপী নাগকন্যা" এই বাক্যের অর্থ এই যে "উলপী নাগ বা নাগা উপাধিধারী লোকের কন্যা"। এই সকল স্থলে নাগ শব্দে সর্প বা হস্তী বলিয়া অর্থ করা অনুচিত। অথচ রাজ্য কখন রীতিমত সুশাসিত রাজ্য ছিল না। এই নাগরাজ্যের কন্যা উলপীকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। নাগেরা সুযোগ পাইলেই পার্শ্ববর্তী স্থান লুঠ করিত। আবার পার্শ্ববর্তী রাজারাও সময়ে সময়ে এই রাজ্য লুঠ করিতেন। এই রাজ্য অনেক সময়েই আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন থাকিত। এক্ষণে এই দেশ ইংরেজের অধীন কিন্তু জঙ্গলবাসী নাগাগণ পূর্ববৎ স্বাধীন ও অসভ্য অবস্থাতেই আছে।

৬. আসাম দেশ—

ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা প্রাগ্‌দেশ। ইহার পশ্চিমাংশের নাম কামরূপ। আহম্ নামক অসভ্য জাতি এই দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের জাতীয় উপাধি অনুসারে এই দেশের নাম "আসাম" করিয়াছিল। বোধ হয় খ্রিস্টিয় একাদশতম শতাব্দীতে এই নাম হইয়াছে। কিন্তু বক্তিয়ার খিলজির আসাম আক্রমণের পূর্বাবধি এই দেশের নাম আসাম হইয়াছিল। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ রাজত্ব কালেই আসাম নামটি সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাভারতে এই দেশে কিরাত জাতির বাস বলিয়া উক্ত আছে। তখন ভগদত্ত এই দেশের রাজা ছিলেন। রাজা দুর্যোধনের মহিষী ভানুমতী সেই ভগদত্তের কন্যা। এখন এই দেশে ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, কল্‌তা কায়েত, ভুটিয়া, তার্তার, আকা, নাগা ও মগ জাতির বসতি দেখা যায়। বৌদ্ধ দমনের পর রাজবংশীরাই এই দেশের রাজা হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সেই রাজবংশী রাজারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্ব জেলা রঙপুরের পূর্ব হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত

বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগে ভামো ও প্রোম অঞ্চলে অনেক বড়ুয়া মগ দেখা যায়। তাহারা আসামদেশীয় রাজবংশীয় সন্তান। বড়ুয়া শব্দের অর্থ বড় লোক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাজার শ্বশুরগোষ্ঠী সকলেই বড়ুয়া গণ্য হইত। রাজার দৌহিত্রগোষ্ঠী ঈশ্বর। রাজার সহিত কুটুম্বিতা-বিহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপাধি কারজী বা কার্যী। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল হিন্দুই রাজবংশী মধ্যে গণ্য। স্ত্রীজাতি এই দেশে সম্পত্তিবিশেষ মধ্যে গণ্য ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে পুরুষেরা ইচ্ছামত দান বিক্রয় ও বন্ধক দিতে পারিত। সতীত্ব ধর্ম এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ধর্ম কাহারও একচেটিয়া নহে। বিধর্মীদিগকে সনাতন ধর্মে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে বিধান আছে। বৌদ্ধদিগকে সনাতন ধর্মে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই শূদ্র হইয়াছে।

হিন্দুদের নানা জাতি, নানা শ্রেণী এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা হওয়াতে এখন কোন্ বিধর্মীকে কোন্ শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে, তাহা নির্বাচন করা যায় না। এই জন্য বিধর্মীকে হিন্দু ধর্মে গ্রহণ করিবার প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর বৈষ্ণব মতে ব্রাহ্মণেরা "অধিকারী" আর সকল জাতীয় লোকই "বৈষ্ণব" ; এই দুইটি মাত্র ভাগ ছিল এবং সেইদুই ভাগের আর কোন শাখা প্রশাখা ছিল না। এজন্য তিনি কতিপয় মুসলমানকে বৈষ্ণব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও জাতিবিচার আরম্ভ হওয়ায় বিধর্মীকে বৈষ্ণব করা অসম্ভব হইয়াছে। নানকের শিখ (শিষ্য) ধর্মেও ব্রাহ্মণ ও শিষ্য এই দুইটি মাত্র শ্রেণী ছিল। তজ্জন্য নানক অনেক মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন। পরে শিখের মধ্যেও জাতিভেদ আরম্ভ হওয়ায় বিধর্মী গ্রহণ করা রহিত হইয়াছে। আসামে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশী ভিন্ন হিন্দুর অন্য বিভাগ নাই। এজন্য তথায় বিধর্মীকে হিন্দু করিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে। এখানে হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। এখানে মুসলমানকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে,—ব্রাহ্মণ কিংবা অধিকারীর উপদেশমত মুসলমান ভক্ত কয়েকবার হরিবোল হরিবোল বলিয়া গোবর-জলে স্নান করে। তাহার পর দাড়ি কামাইয়া ভক্ত শূকরের রক্ত খায় এবং মাটিতে পড়িয়া দেববিগ্রহ প্রণাম করে। তাহার পর আবার হরিবোল বলিতে বলিতে তুলসীজলে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করে, দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া নির্মাল্য মস্তকে লয় ; অবশেষে দেবতার প্রসাদ ও চরণামৃত সেবন করিলেই বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়। মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতির হিন্দু হইলে দাড়ি কামাইতে হয় না, শূকরের রক্ত খাইতে হয় না এবং গোবর-জলেও স্নান করিতে হয় না। তাদৃশ ভক্তেরা তুলসীজলে স্নান করিয়া কয়েকবার হরিবোল বলে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ করিলেই অমনি বিশুদ্ধ হিন্দু গণ্য হয়। আর সেই রাজবংশী লেখা পড়া জানিলেই কায়েত হয়, বড় চাকরি পাইলেই কারজী হয়, রাজার কুটুম্ব হইলেই বড়ুয়া হয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে রাজবংশী রমণীর গর্ভজাত সন্তান "অধিকারী" হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ হয় না, উপনয়ন ধারণ করে না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর রাজবংশীয় পৌরোহিত্য করিতে পারে। নূতন কোন লোক ব্রাহ্মণ হইবার কোন বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নাই। সুতরাং তাহা এখানে হয় না এবং কোন স্থানেই কোন কালে হয় না।

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুসলমান আছে, ইহাদের অন্যূন চোদ্দ আনা অংশই হিন্দুসন্তান। তাহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া একবার মুসলমান হইয়াছিল। পুনরায় সনাতন ধর্মে আসিতে না পারিয়া অগত্যা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দ্বারা হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। পেশোয়ারের নিকটবাসী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধর্ম রক্ষার্থ মুসলমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে। পরে মহম্মদ গোরী তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আক্রোশে পরে গোরীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু

পুনরায় হিন্দু হইতে না পারিয়া অগত্যা তাহারা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এখন "কাক্কর" বলে। কাক্কর শব্দটি গোক্ষুর শব্দেরই অপভ্রংশ। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পূর্বে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথায় এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহারা মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঠান বলে। তাহারাও হিন্দুসন্তান। চিত্রল[৩] (চৈত্ররথ), বাল্‌খ[৪] (বাহ্লীক), কাবুল (কুভা), হিরাবতী (হিরাত), খান্দার (গান্ধার), শিবি (সিবি), শান্ব (বেলুচিস্তান), গজনী (গজনীর) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাজ্য ছিল। আসামের ন্যায় ব্যবস্থা না থাকাতেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতবর্ষ মুসলমানপূর্ণ হইয়াছে এবং পরাধীনতার প্রধান কারণ হইয়াছে। আসামে পুনরায় স্বধর্ম গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুসলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুমলা[৫] আসাম জয় করিয়াছিলেন ; তাহারা বহু লোককে বলপূর্বক মুসলমানও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ফিরিবামাত্র আসাম আবার স্বাধীন হইয়াছিল এবং পতিত হিন্দুরা পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল। আসাম কিছুদিন কোচবিহারাধিপতির করদ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বরাবর প্রসন্ন ছিল। অবশেষে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম অধিকার করিলে, আসামরাজ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা মগদিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছেন এবং আসামরাজকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন। আসামের পূর্বভাগ ব্রহ্মরাজ্যেরই অধীন ছিল। তখন তাহাও ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

৭. কোচবিহার—

এখন যাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ। তাহার উত্তরে কৈলাস পর্বত, পূর্বে চীন, দক্ষিণে হিমাচল এবং পশ্চিমে গন্ধর্ববর্ষ বা চিত্রল। মানস সরোবর হইতে ইহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণমুখ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। চীন দেশের একাক্ষরী ভাষায় বিদেশিয় শব্দ লেখা দুষ্কর। ভূতবর্ষ চীনের অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম ভোট, কৈলাসের নাম কিউন্‌লন্‌ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে। তিব্বতের অধিপতি বা মহাগুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লামা অর্থাৎ মহাযোগী বলে। যেমন কাশীর রাজা বলিলে মহাদেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকেও বুঝায়, তেমনি ভূতপতি বলিতে মহাদেব এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায়। সেই ভূতপতি (মহাদেব বা দলই লামা) নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়া চিক্‌না পাহাড়ে হরিয়া ম্যাচের দুই পত্নী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দৃষ্টে নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহাতে হীরার গর্ভে বিশু সিংহ এবং জিরার গর্ভে ইশু সিংহ নামক দুই পুত্র হয়। ভূতরাজ সেই দুই পুত্রকে নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন। কোচবিহারের মহারাজ এবং জলপাইগুড়ির রায়কত সেই বিশুসিংহের বংশীয় আর বিজনি ও সিডলির রাজারা ইশুসিংহের বংশধর, তন্মধ্যে কোচবিহারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

৮. ভিতরগড়—

চিক্‌না পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধ্বজবংশীয় রাজবংশী জাতীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে ভবচন্দ্র রাজার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভবচন্দ্র নামক পাগলা রাজা ও তাহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের গল্প প্রায় সমস্ত বাংলাদেশেই শুনা যায়। জলপাইগুড়ির সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতরগড় ও বাহিরগড়ের প্রাচীর পরিখা এবং অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, ওই রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বিভবশালী ছিল। এই রাজারাও রাজবংশী ছিলেন।

৯. শিববংশী—

বিশু সিংহ ও ইশু সিংহ এবং তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ দেখিলেন, তাহাদের পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজা এবং প্রধান লোকেরাই রাজবংশী অর্থাৎ কোচ। সুতরাং তাহারা সেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাজবংশী বা কোচ বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহার বিহারে কোন অপমান জ্ঞান করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিবাহ আদান প্রদানও কোচবিহারের মহারাজাদের দেখা যায়। ইহাদের কোন কোন আচার ব্যবহার ঠিক ক্ষত্রিয়ের সদৃশ আবার আর কতকগুলি ব্যবহার অন্ত্যজ জাতির তুল্য।

১০. কমটাপুর—

এক সময়ে এই রাজ্য বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। ভুটান, আসাম, মোরঙ্গ এবং উত্তর বাংলার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবিহারের অধিকৃত হইত। পূর্বে এই সমস্ত স্থান বিহার প্রদেশের অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। এই জন্য বিহারের যে অংশ মুসলমানদের অধিকৃত, তাহার নাম সুবেবিহার বা মোঘলান বিহার। আর যে অংশ কোচ রাজার অধিকৃত তাহার নাম কোচবিহার। এই রাজ্যেও আসামের ন্যায় কেবল রাজবংশী ও ব্রাহ্মণ এই দুই জাতি ছিল। খ্যান, কৈবর্ত, হাড়ী, বেলদার প্রভৃতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অল্পই দেখা যায়। এখানেও হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। কিন্তু এখানে মুসলমানদিগকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। নবাব মীরজুমলা এই দেশ জয় করিয়া কতকগুলি রাজবংশীকে মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা নস্য উপাধিধারী মুসলমান হইয়া আছে। কিন্তু তাহারা মুসলমান ধর্মের মর্ম কিছুই জানিত না এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই রাজবংশীদের ন্যায় ছিল। রেল হওয়ার পর এখানকার মুসলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে যাবনিক ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে। কামটাপুর ও ভিতরগড় রাজ্য কোচবিহার-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই বংশীয় জলপাইগুড়ির রায়কত এবং সিডলির চৌধুরিরা এখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। কোচবিহার ও বিজনির মহারাজগণ কতক ভূমি করদ রাজা রূপে আর কতক ভূমি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন।

১১. জাজপুর—

উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। এখানকার রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহারা বল্লালসেনের বশী রাজা ছিলেন। তাহারা বাংলার নবাব ও গৌড় বাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে উড়িষ্যার রাজারা এই রাজ্যের রাজধানী সহ অধিকাংশ দখল করিয়াছিলেন। রাজা সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গৌড় বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বর্ধমানে রাজধানী করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই বর্ধমানরাজ অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বর্ধমানের বর্তমান মহারাজের পূর্বপুরুষ লালজী রায় তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যায় না। পুরাতন রাজধানী বর্ধমানও এখন জনশূন্য হইয়াছে। এখন যে বর্ধমান নগর আছে, তাহার পূর্ব নাম গোহাট। বর্ধমান রাজ্য লালজী খরিদ করা অবধি গোহাটের নামই বর্ধমান হইয়াছে।

১২. আরাকান—

আরাকানে বাংলা ভাষা প্রচলিত নাই এবং এখানকার রাজাকে বাঙালি বলা যায় না। তাহাদের দ্বারা বাঙালি সমাজের কোন হিতাহিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজ্যের সহ বাংলা দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা সময়ে সময়ে আরাকানের

অধীন হইয়াছে। এই রাজারা পর্তুগিজদিগের সহায়তায় অতিশয় প্রবল হইয়া বকদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ পুনঃ পুনঃ লুট করিতেন। তজ্জন্য অধিবাসীরা পলায়ন করাতে সেই সকল স্থান সুন্দরবন নামক নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। ইহার পর পর্তুগিজেরা আরাকানে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করায় আরাকানি মগদের সহ তাহাদের বিবাদ হয়। পর্তুগিজেরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। তাহাদের কতক হত, কতক পলায়িত হইল, অবশিষ্টেরা অধীন প্রজারূপে চট্টগ্রামে বাস করিয়াছিল। বাদশাজাদা সুজা আরাকানে আশ্রয় লইয়া নিহত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের প্রভুত্ব লইয়া ত্রিপুরার রাজার সহ আরাকানরাজের বারংবার যুদ্ধ হইয়াছে। নবাব শায়েস্তা খাঁ নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদিগকে[৬] ঢাকার ফিরিঙ্গিবাজারে অধিবিষ্ট করিয়াছিলেন। আরাকানের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু জয়কালীর পূজা করিতেন। সেই দেবীর সম্মুখে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতীয় বন্দিদিগকেই নরবলি দিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান, কুকি, রাক্ষস, সর্প, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, হস্তী, সিংহ, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই বলি দিবার রীতি ছিল। দেবীর পুরোহিতদিগকে কুঙ্গি বলিত। অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীরও পূজা হইত। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত ছিল। মগেরা সর্বপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইত। বলিদানকৃত মনুষ্য মাংসও খাইত। ব্রাহ্মণকন্যা ব্যতীত সকল জাতীয় মনুষ্যের কন্যাই মগেরা বিবাহ করিত। মগরমণীরা সকল জাতির পুরুষকেই পতি বা উপপতিরূপে গ্রহণ করিত এবং তাহাতে উৎপন্ন সন্তান বিশুদ্ধ মগ বলিয়া গণ্য হইত। জারজ সন্তানের মর্যাদা কিছুমাত্র কম হইত না। কখন কখন ব্রাহ্মণ ধরিয়া তাহার সহ রাজকুমারীদিগের কিংবা সম্ভ্রান্ত মগদিগের কন্যাগণের বিবাহ দিত। তাহাদের সন্তানেরাও মগ বলিয়া গণ্য হইত। ফলত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও জাতিবিচার ছিল না। পরিশেষে খ্রিস্টিয় ১৭৫৩ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা আরাকান রাজ্য দখল করিয়া তথাকার রাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার ৫০ বৎসর পরেই আবার ইংরেজেরা আরাকান দেশ অধিকার করিয়াছেন। তদবধি এই দেশ ইংরেজের অধিকৃত আছে।

বারোভুঁইয়া অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্গত বারটি করদ রাজার বিবরণ।

১. **ভাদুড়িয়া**—তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইয়াছে।

২. **সাঁতোড়**—ইহার বিবরণ যত দূর প্রাপ্য, তাহাও বিস্তারিত লেখা হইয়াছে।

৩. **বর্ধমান**—এখানকার বর্তমান রাজবংশ পঞ্জাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয়। ইহাদের পূর্বপুরুষ শ্যামল রায়, কতিপয় ক্ষেত্রি ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সহ নানা তীর্থ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যাগমনকালে বর্ধমান রাজ্যে বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া গোহাটের বাজারে দোকান করিয়াছিলেন। তাহাতে সঙ্গতি হইলে টাকা লগ্নি করিতে লাগিলেন। শ্যামল রায়ের বংশ ক্রমশ অত্যন্ত ধনী হইল। বর্ধমানের মহারাজাও তাহাদের নিকট ঋণী হইলেন। সেই ক্ষেত্রি মহাজন আবুরায় ও বাবুরায় তাহাদিগের বংশধর লালজী রায় ক্রমশ বর্ধমান রাজ্য ক্রয় করিয়া আপনারাই বর্ধমানের মহারাজা হইলেন। প্রাচীন রাজবংশীয়েরা নাগপুরে চলিয়া গেলেন। তদবধি প্রাচীন বর্ধমান জনশূন্য হইল এবং গোহাটের নামই বর্ধমান হইল। বর্ধমানের মহারাজার অধীন চিত্রবরদা[৭] নামক স্থানের সামন্ত শোভা সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহি হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদিগের সাহায্যে তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরামকে বিনাশ করিয়া বর্ধমান রাজ্য অধিকার করিল। রাজা কৃষ্ণরামের জগৎ রায় নামক পুত্র একাকী পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের পরিবারভুক্ত বালক বালিকা ও রমণীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। সে রাজকুমারীকে নিজ ভোগ্যা করিতে উৎসুক হইল। পিতৃহন্তা শত্রু শোভা সিংহকে বিনাশ করিতে রাজকুমারীর ইচ্ছা হইল। তিনি সে ভাব গোপন

করিয়া শোভা সিংহের দুষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। পরে সুযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। পাঠানদিগের নায়ক রহিম খাঁ[৮] বর্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। অল্পকাল পরেই পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পুনরায় বর্ধমানে রাজা হইলেন। তিনি আরও বহু জমিদারি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারা করদ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তাহাদের মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তাহাদের গড়খাই ছিল, সৈন্য ছিল এবং বিচারাধিকার ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্নওয়ালিস বর্ধমানের মহারাজের ও অন্যান্য সমস্ত রাজা মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি এখানকার মহারাজও সাধারণ জমিদার হইয়াছেন। তাহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধারণ জমিদার অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেশি নাই। এই বংশে এগার পুরুষ বরাবর দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে। তজ্জন্য সম্পত্তি ভাগ হয় নাই এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না।

৪. **তাহিরপুর**—তাহিরপুরের রাজারা নন্দনাবাসি-গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মনুসংহিতার সর্বোৎকৃষ্ট টীকাকারক কল্লুকভট্ট এই রাজবংশের পূর্বপুরুষ। এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় গৌড়বাদশাহ গণেশের শ্যালক ছিলেন। তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা জীবন রায়, সম্রাট যদুনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজা কংসনারায়ণের বৃত্তান্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। শরীকী বিভাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেক অংশ ক্ষুদ্র হইয়াছে। অনেক শরিকের অংশ বিক্রিত হইয়াছে। কোন কোন শরিকের অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্পত্তি অতি অল্পই আছে। এই রাজ্য পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

৫. **পুঁঠিয়া**—গৌড়ে বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবারো জন্য ঠাকুর কমলাকান্ত বাগচি একটি পরগণা চাকরান পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই পরগণার নাম লস্করপুর। কমল ঠাকুরের বাড়ি ওই পরগণা মধ্যে পুঁঠিয়া গ্রামে পূর্বাবধি ছিল। ইনি সাধু বাগচির সন্তান এবং অতি মান্য কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর তদ্বংশীয়দের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্মিল। সুরাপান ও লাম্পট্য হেতু অনেক কুকার্য অনুষ্ঠিত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়, তাহার বন্ধু সাঁতোড়ের ধেনুয়া-রামকৃষ্ণ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালীপূজা উপলক্ষে মহিষের পরিবর্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্য তিরস্কার করায় পুরোহিতকে এবং রাজা জননীকেও হত্যা করিয়াছিল। এই সকল মহাপাপ করা হেতু তাহারা পাঁচুড়িয়া অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী[৯] নামে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। মধু, ডাকু, অরবিন্দ সমাজচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইল, এবং মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্বহস্তে ধেনু বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাহার নাম 'ধেনুয়া' রামকৃষ্ণ হইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগী হইলেন। রাজা রামচন্দ্রঠাকুর নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। ইহাকেই লোকে "সাধুর ভরা তল" বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বহু শরিক হওয়ায় অনেক শরিকের সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রিত হইয়াছে। আবার বড় বড় শরিকের 'মহারাজ' এবং চারি আনির 'রাজা' উপাধি আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদিগকেও স্থানীয় লোকে রাজা বলে বটে, কিন্তু গভর্নমেন্টে ঠাকুর উপাধি।

৬. **সিন্দূরী**—... ভীম ওঝা, সম্রাট বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাহার বসতি ছিল। বল্লালের হড্ডিকা সংস্রব ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন।

তাহার সন্তানেরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে বাড়ি করিয়াছিলেন, তখন পূর্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তদ্বংশীয়েরা বাঙাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙাল ওঝা, রাজা লক্ষ্মণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দুর ও শাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্করর‍ূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহু সংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্‌বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাংলাদেশে আর দেখা যায় না। পাঠান রাজ্যারম্ভে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরবর্তী থাকায় আপন চত্বরে তাহাদের স্বাধীন রাজার ন্যায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে রাঢ়দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার মাতা ও ভগিনীদ্বয়সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি স্থলে "মৈত্র" উপাধি করিলেন। তাহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জন্য ঘটকগণ এবং ভট্টগণ বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বাঁধিয়াছিল।[১০]

শিবচন্দ্রের বিবাহ সময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, "কাশ্যপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুর্যে হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত।" তাহার কথায় ফটিক দত্ত নামক একটি কায়স্থ কর্মচারী কহিল, "মহারাজের এ হুকুম সাফ বোধ হয় না।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আমি সাফ করিতে পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ কর।"[১১] তিনি ফটিককে ধরিয়া ধোবার সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদ্দৃষ্টে ভয় পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না।

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি একটি মুসলমান-কন্যাকে বৈষ্ণবী করিয়া নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা আবদুলকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের নাম ভূষণা ও রূপদয়াল রাখিয়াছিলেন। তাহারা তাহার ঘরেই থাকিত। তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন। মুসলমান কাজী এই বৃত্তান্ত জানিয়া রূপদয়ালকে হরিমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন। রূপদয়াল কহিল, "মনুষ্যের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। যে আল্লা, সেই হরি।" কাজী কহিল, "তবে তুমি আল্লা না বলিয়া হরি বল কেন?" রূপদয়াল কহিল, "আমি পারসি আরবি জানি না ; সমস্ত কথাই যখন বাংলা ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের নাম বলিলেও হরি বলাই উচিৎ। যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসি আরবিতে বলে তাহার পক্ষে ঈশ্বরকেও আল্লা বলা কর্তব্য।" কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আবদুলকে হরিমন্ত্র ত্যাগে জিদ করিলেন। আবদুল সম্মত হইল না দেখিয়া, কাজী তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। ভূষণা ভ্রাতৃশোকে জলে ডুবিয়া মরিল। গঙ্গারাম উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন।

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আসিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। গঙ্গারাম. রাজীব রায়ের শরণাগত হইলেন। রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সভা করিয়া কহিলেন, "এই গঙ্গারাম মৈত্র, ভূষণা ও রূপদয়ালসহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। হরিদাস যেরূপ হরিভক্ত ছিল,

রূপদয়ালও ঠিক সেইরূপ ছিল। যখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সন্তান সুব্রাহ্মণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে গ্রহণ করাই কর্তব্য। আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয়। কর্ম দ্বারা কেবল পাপ পুণ্য হয় মাত্র। কর্মজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই খণ্ডন হয়। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করুন।" অধিকাংশ শাক্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল—

"কেন ভাই গঙ্গারাম, আগে কল্লি হেন কাম,
কেন খালি ভূষণার পানী?
ঘরে দিলি আব্দুলে ভাত, হাড়িতে না ছোয় পাত,
তোরে কিসে ফিরে কূলে আনি।"

বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছাতিয়ান গ্রামনিবাসী কবিভূষণ চৌধুরির কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার সহ সংস্রব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই "ভূষণা পঠীর" কুলীন। উপরিউক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই সিন্দূরীর রাজাদের সামাজিক প্রাধান্য স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু নবাব বা বাদশাহের দরবারে তাহাদের বিশিষ্ট সম্মান ছিল না। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহি পদবি প্রাপ্ত হন নাই।

রাজা দেবীদাস, নামান্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গৌড়বাদশাহের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্য সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বাদশাহ উমরু নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সেনা ছাতক আক্রমণ জন্য পাঠাইয়া ছিলেন এবং তৎপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, "আঠার পুত্র সহ রাজা দেবীদাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও ; কিন্তু যদি কেহ মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সসম্মানে রক্ষা করিও এবং তাহাকে আয়মা দিও।" রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্তিক রায়, তিনদিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে, উমরু ছাতক দখল করিলেন। রাজপরিবারগণ বিষপানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশব নাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাহাদের সন্তান পাবনা জেলায় আমীনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলায় এলাচিপুরের মিঞা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দি করিয়া, তিন জন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্তমান সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই তিন জনের সন্তান। এইজন্য ইহাদিগকে নাপ্তিয়া কালিয়াই বলে।

ঠাকুর কালিদাস, মোঘলদিগের বাংলাদেশ আক্রমণকালে তাহাদের সাহায্য করিয়া পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু হেতু কালিদাস সেখানে বাস না করিয়া বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে। ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল হইয়াছে। কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রায় নামেই পরিচিত।

হরুঠাকুর (হরচন্দ্র চক্রবর্তী) রাজসরকারের পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। সে কাশ্যপগোত্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিল। ঠাকুর কার্তিক রায়ের ছয় মাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীরা বিষপানের পূর্বে হরুঠাকুরকে ডাকিয়া সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রচুর টাকা এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন। হরুঠাকুর সেই শিশুকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানীপ্রসাদ রাখিয়াছিল। হরুঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই ভবানীপ্রসাদের উপনয়ন হইয়াছিল এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যার সহ তাহার বিবাহ হইয়াছিল। হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানীপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া

তাহাকে নিজের শ্রাদ্ধাদি করিতে নিষেধ করিল। ভবানী নিজ পরিচয় শুনিয়া অমনি জমিদার হইতে ব্যগ্র হইলেন। তখন টাকা দ্বারা জমিদারি খরিদের রীতি ছিল না। নবাবের চাকরি ও ডাকাতি এই দুইটি মাত্র উপায়ে তৎকালে জমিদার হওয়া যাইত। ভবানীপ্রসাদ পারসি জানিতেন না, সুতরাং প্রথম উপায় তাহার সাধ্য ছিল না। এজন্য তিনি কতকগুলি অনুচর জোটাইয়া ডাকাতি আরম্ভ করিলেন। তিনি চোদ্দ বৎসর অবিচ্ছিন্ন ডাকাতি করিয়া সমস্ত পরগণা চাঁদপ্রতাপ অধিকার করিয়া "রাজা ভবানীপ্রসাদ রায়" এই উপাধি ধারণ করিলেন।

এই রাজ্যাভিষেক সময়ে ভবানীপ্রসাদ পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তাহার পিতার নাম কি বলিতে হইবে এবং তাহার গোত্রাদি কি বলিতে হইবে?" তখন পণ্ডিতেরা পাঁতি দিলেন যে, "হরুঠাকুর যদি নিজের অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিত, তবে তাহাকেই তোমার পিতা বলা যাইত। কিন্তু সে তোমার পৈতৃক ভৃত্য ছিল এবং তোমারই পৈতৃক অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিয়াছে ও নিজের জীবিকা নির্বাহ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে চাকর ভিন্ন পিতা বলা যায় না। কিন্তু যখন তোমার উপনয়ন বিবাহাদি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কাশ্যপগোত্র বলিয়া সেই বিধানে হইয়াছে, তখন তুমি কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণরূপেই গণ্য।" সেই ব্যবস্থা মতেই অভিষেকাদি যজ্ঞ হইল। সেই রাজা ভবানীপ্রসাদের সন্তানগণ জেলা ঢাকার অন্তর্গত জমিদার—বোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের রায়। ইহারা রাজা ভবানীর বংশ বলিয়া পরিচিত। এই বংশের উপলক্ষেই লোকে "হারায়ে মারায়ে কাশ্যপগোত্র" বলে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। এখন কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বারেন্দ্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন, "রাজা দেবীদাসের পুত্র ঠাকুর কার্তিক রায়, তৎপুত্র রাজা ভবানীপ্রসাদ রায় রাঢ়ী।" আবার রাঢ়ীয় কুলজ্ঞেরা রাজা ভবানীপ্রসাদ ও তাহার বংশধরগণের কুলমর্যাদা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পিতৃকুলের বা মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত তাহাদের পুথিতে নাই। ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গান করেন যে—

"এক ঘর ভাঙ্গিয়া তার হ'লো সাত বাড়ি।
তিন ঘর বারেন্দ্র তার দুই ঘর রাঢ়ী।।
দুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অন্য জন।
বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গের ভূষণ।।"

অন্যান্য রাজবংশের বংশবৃদ্ধি অতি কম। প্রায়শ দত্তক পুত্র দ্বারা বংশরক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু কালিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারি প্রচুর আছে। কিন্তু বহু গোষ্ঠী জন্য খুব বড় জমিদার কেহই নাই।

৭. **শুশুং**—সোমেশ্বর নামে একটি বাঙালি ব্রাহ্মণ তপস্বী, শুশুং-দুর্গাপুরে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়া অর্চনা করিতেন। তাহার সেই বিগ্রহের নিকট পূজা দিয়া অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহাকে গুরু বলিয়া মানিত। তাহার পুত্র সেই সকল শিষ্যদের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গারো, কুকি, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাংলাদেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। শুশুঙের রাজার দ্বারা সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, বাংলার নবাব তাহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বর্ধিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশের করদ রাজত্ব বহুদিন পর্যন্ত চলিতেছিল।

ইংরেজ কোম্পানির অধিকার সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিস ইহাদের জঙ্গলময় রাজ্য রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ইহাদের লভ্য কিংবা ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর হইল ইংরেজ গভর্নমেন্ট ইহাদের অধিকৃত পর্বত ও জঙ্গল খাস করিয়া লইয়াছেন

এবং হাতি ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইহাদের মুনাফা অল্প হইয়াছে এবং ইহারা সাধারণ জমিদারের তুল্য হইয়াছেন। সোমেশ্বর প্রথমে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজা হওয়া অবধি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমর্যাদা সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইহারা বহু কুলকার্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত।

৮. **বাহিরবন্দ**—পূর্বে বাঙালি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বীর্যবান বলিয়া গণ্য ছিল। কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাহাদের পূর্বপুরুষ কোচবিহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর ভুবন সিংহ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, আসাম রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। রাঙামাটিয়া গৌরীপুর ভুবন সিংহের চাকরান বা করদ রাজত্ব ছিল।[১২] আসাম ও কোচবিহারের সৈন্যগণ বারংবার বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ লুঠপাট করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য গৌড় বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আসামি সেনাপতি বিষ্ণুদেব বড়ুয়া বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে আসিলে, জগৎ রায় দুই বিপ্রদূত সহ তামার টাটে পাঁচটি হরিতকি আশীর্বাদী পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আততায়ী নিবারণ উদ্দেশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?" আসামি পণ্ডিতেরা কহিলেন, "গৌড় বাদশাহ মুসলমান, এই রাজ্য তাহারই অধিকৃত। ব্রাহ্মণ জগৎ রায় তাহার চাকর মাত্র ; সুতরাং তাহা লুণ্ঠনে দোষ নাই।" বাঙালি পণ্ডিতেরা কহিলেন, "জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশানুক্রমে ভোগ দখলের স্বত্বাধিকারি রাজা। গৌড়ের মুসলমান বাদশাহ রাজার নিকট নির্দিষ্ট রাজস্ব পান মাত্র। লাভ লোকসান জন্য ফলভাগী রাজা জগৎ রায় ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই রাজ্য লুণ্ঠন করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে।" আসামি পণ্ডিতেরা বাঙালি পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুদেব সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। সেই মীমাংসা শুনিয়া কোচবিহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই।

ইংরেজ রাজ্যারম্ভের পর বাহিরবন্দ রাজ্য ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাজা ভিতরবন্দ পরগণা পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা কাশিমবাজারের রাজা পাইয়াছেন। পাতিলাদহ কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং স্বরূপপুর রাণী রাসমণির জমিদারি ভুক্ত হইয়াছে।

৯. **চন্দ্রদ্বীপ**—বল্লালের কায়স্থজাতীয়া এক উপপত্নী-জাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান কর্তৃক বৈদ্যরাজপাট নির্মূল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিল। তাহারা যবন-রাজধানী গৌড়নগর হইতে বহুদূরে ছিল। এজন্য তাহারা পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও আয়ত্ত হয় নাই। তাহারা কখন নবাবকে কিছু কিছু কর দিত, কখন বা দিত না। নিজ চত্বরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কখন নিজনামে মুদ্রা ছাপিত না। এই রাজবংশীয়েরা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও দাতা ছিলেন। তাহারা বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিতেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে এখনও বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখা যায়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশই তাহার আদি কারণ। কালুরায় ও তদ্বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, এজন্য ইহারা কায়স্থ সমাজে বিশেষ মান্য ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজদমন রায় নিঃসন্তান গতাসু হইলে তাহার ভাগিনেয় (মতান্তরে তাহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকারী হইয়া 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরমানন্দ মুখ্যিরাজ কুলীন কায়স্থ-সন্তান এবং তাহার মাতামহকুল বাংলাদেশের সম্রাট বংশজাত। এই জন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রায়ের সহ রাজা প্রতাপাদিত্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি এখন মাধবপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কোন জমিদারি নাই।

১০. **যশোহর**—বর্তমান জেলা ফরিদপুরের মহকুমা গোয়ালন্দ মধ্যে চন্দনা নামক একটি পদ্মার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দনা নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ হইয়াছে। চন্দনার গুহগোষ্ঠী সাঁতোড়ের রাজাদের প্রজা ও কর্মচারী ছিলেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র গুহকে সাঁতোড়রাজ গোপালচন্দ্র (চাঁদ গোপাল) খাস বিশ্বাস বা সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র গৌড় বাদশাহের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার। তাহার পুত্র রাজা ভীকাম রায়, রায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড়বাদশাহের সরকারে অতি সম্ভ্রান্ত রাজকীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ভীকাম রায় তিন পরগণার রাজা হইলেও তাহার বাড়ি সাঁতোড়ের জমিদারি মধ্যে চন্দনা গ্রামে ছিল। গৌড় বাদশাহ্ সলিমান চন্দনা তালুক ভীকাম রায়কে জমিদারি স্বত্বে দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ সাঁতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। প্রতাপাদিত্য এই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজপুরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাঙালি কায়স্থ মধ্যে গুহবংশ, চন্দ্রদ্বীপের ও দিনাজপুরের রাজবংশ সর্বাপেক্ষা বনিয়াদি। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য দিনাজপুরের রাজবংশই কায়স্থ জাতি মধ্যে এক্ষণে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। রায় বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রি ছিলেন এবং সম্রাট আকবরের সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যখন সমস্ত বাংলা ও বিহার মোঘল সম্রাটের হস্তগত প্রায় হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীকাম রায়[১৩] ও কনিষ্ঠ বসন্ত রায় দণ্ডিত হইবার ভয়ে, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহারা যে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "যশোহর" হইয়াছিল।[১৪] সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেলা যশোরের নাম হইয়াছে। সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত। বর্তমান যশোর নগরের পূর্বনাম কশ্‌বা। ভীকাম রায়, বসন্ত রায় এবং বিক্রমাদিত্যের শিশু পুত্র প্রতাপাদিত্য কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত যশোহরে বাস করিয়া মোঘল রাজ্যের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। যখন তাহারা দেখিলেন যে, মোঘলেরা কোন অত্যাচার করিল না অথবা বিক্রমাদিত্যের পরিবারবর্গের কোন অনুসন্ধান করিল না, তখন তাহারা সাহস পাইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। গৌড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত প্রায় হইল এবং শুবেদার মুনিম খাঁ বিনষ্ট হইলেন, ভীকাম রায় সেই গোলযোগের সময়ে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্থ দ্বারা জমিদারি ক্রয় করিবার রীতি ছিল না। গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণা দখল করিলেন। ভীকাম রায় ও বসন্ত রায় উভয়েই বিদ্বান ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিদ্যা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিলেন, অন্য সময়ে তেমনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায়ের জীবমানে তাহার দোষ ও গুণ তত বেশি প্রকাশ হয় নাই।

কমল খোজা নামক একজন প্রহরী প্রতাপের ধূমঘাটের প্রাসাদের সিংহদ্বারে থাকিতেন। প্রবাদ আছে, ধূমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটি জঙ্গলে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আলো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দেখিয়া বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সেই জঙ্গলে রাখাল বালকেরা গরু চরাইত। একদিন তাহারা সেই স্থানে

একটি ঢিপির উপর ক্রীড়াচ্ছলে কেহ কালী সাজিল, কেহ পুরোহিত হইয়া পূজা করিল, কেহ পাঁঠা সাজিল, একজন তাহার হাত পা ধরিল, অন্য বালক বলিদান ছলে একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। হোগলার আঘাতে গলা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, বালকেরা ভয়ে পলায়ন করিল। কমন খোজা এই সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট সেই আলো ও এই আশ্চর্য মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ সেই মৃতদেহ সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া রাত্রিতে কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঢিপির নিকট উপস্থিত হইয়াই উভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবাদেশ পাইলেন—"এই ঢিপি খনন করিয়া যে মূর্তি পাইবে, তাহাই তোমার ইষ্টদেবতা। আর সেই রাখাল মরে নাই, সে আপনার জননীর নিকট ঘুমাইয়া আছে।"

রাজা সজ্ঞান হইয়াই গৃহে প্রস্থান করিলেন। প্রথমেই সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে মৃতদেহ নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন, রাখাল বালক মরে নাই, তাহার জননীর নিকট ঘুমাইতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপাদিত্য জঙ্গলের ভিতরের ঢিপি খনন করিতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটি শিলাময়ী মূর্তির গলদেশ পর্যন্ত বাহির হইল। তখন দেবী আকাশবাণী দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, "আর খনন করিও না। এই খানে মন্দির নির্মাণ করিয়া আমার পূজা কর।" রাজাও আদেশানুরূপ কার্য করিলেন। এইরূপে তিনি শিলাদেবীর বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। তিনি সেই শিলাদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন।

প্রতাপাদিত্যের যখন সাতাইশ বৎসর বয়স, তখন তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভীকাম রায়ের নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদি দাবি করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "ভ্রাতা বিদ্যমানে ভ্রাতৃপুত্র দায়াদ হয় না, সুতরাং প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগদি তাহার প্রাপ্য নহে, আমার প্রাপ্য।" এই উপলক্ষে উভয়ের মনান্তর হইল। কিন্তু প্রকাশ্য কোন বিবাদ হইল না। তখনও উভয়েই একান্নে এক বাড়িতেই ছিলেন। প্রতাপ একদিবস রাত্রিতে কতিপয় দুষ্ট অনুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাঁচুরায়কে প্রতাপাদিত্যের পত্নী রক্ষা করিয়া তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্তা হইয়া দিগ্বিজয়ে ব্রতী হইলেন। তিনি পদ্মা, মেঘনা ও সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত জমিদাবগণকে নিজের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিলেন। পালে পালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহার সহ যোগ দিতে লাগিল। প্রতাপ যদি সচ্চরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার চরিত্রদোষে সমস্ত সদ্বংশজাত সৎ লোকেরা তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গুপ্তভাবে তাহার বিপক্ষ হইল। এমন কি, তাহার নিজের স্ত্রীপুত্রও তাহার মঙ্গল কামনা করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাতা ছিলেন। অর্থলোভে অতি, নীচজাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকেরা তাহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজত্ব করিতেন। তিনি "সুন্দরবনের বাঘ" নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অতীব তেজস্বী ছিলেন। তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাহার প্রতি লোকের যত কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কার্যত কেহ তাহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিত না এবং তাহার কোন কার্যে বাধা দিত না। লোক-পরিচালকের পক্ষে এইটি সর্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও তাহারা যুদ্ধে ও সামাজিক বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্যেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রতাপ "সার্বভৌম মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোঘল সেনা পরাজয় করিয়া আঠার বৎসর কাল স্বাধীন ছিলেন।

প্রতাপের পদাতিক সৈন্যগণ "ঢালী" সৈন্য নামে অভিহিত হইত। এই ঢালী সৈন্যের সহায়তার জন্য "অযুত তুরঙ্গসাতি" এবং "ষোড়শ হলকাহাতি" ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী

এবং গোলন্দাজ এই ত্রিতয় সংযোগে উত্তম বাহিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পদাতিককে রক্ষা এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষে অশ্বারোহী বিশেষ কার্যকর হইয়া থাকে। যুদ্ধের প্রাক্কালে, যুদ্ধের মধ্য সময়ে অথবা যুদ্ধের অবসান সময়ে অশ্বারোহীর সাহায্যে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পরাজয়ের পর প্রত্যাগমনকালে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ হইতে সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার পক্ষে অশ্বারোহী সৈন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য বঙ্গীয় সৈন্যকে অজেয় করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের তোপখানা হস্তীর দ্বারা বাহিত হইত। কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্র বলেন, প্রতাপের "ষোড়শ হলকাহাতি" ছিল। ১৫টা হাতিতে একটি হলকা হয়। ২৪০টা হাতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তোপখানা এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সেকালে বঙ্গদেশে অতি সুন্দর সুন্দর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত। প্রতাপ পর্তুগিজদিগের সাহায্যে জাহাজ সকল অধিকতর সুন্দররূপে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল রণতরী বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে উভয়দিকে অনায়াসে পালভরে গমনাগমন করিত। এই নদ-নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রতাপ এই সকল রণতরী ও সৈন্য লইয়া যখন মোঘলদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতেন, তখন তাহার গতিরোধ করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত হইত।

প্রতাপের সৈন্যগণ তীর, ধনুক, শড়্‌কি, বন্দুক ব্যতীত আরও দুটি জিনিস ব্যবহার করিত। কুঠার ও কোদাল প্রত্যেক পদাতিকের সঙ্গে লইতে হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে এই কুঠার কুঠীর নির্মাণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি পক্ষে সহায়তা করিত। কোদাল সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য পরিখা ও গর্তাদি খননে বিশেষ উপযোগী হইত। যুদ্ধের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পরাজিত সৈন্য রাত্রির সুযোগে শিবিরের চতুর্দিকে গড়খাই করিয়া আত্মরক্ষাপূর্বক সুযোগক্রমে বিজয়ী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাহার সেনানীগণ যথায় জয় ধ্রুব সিদ্ধান্ত করিতেন তথায় তাহারা বিপুল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দলিত ও মথিত করিতেন। যখন তাহারা দেখিতেন শত্রুসৈন্যের সাহায্যের জন্য নূতন সেনাদল আগমন করিতেছে তখন তাহারা শত্রুসৈন্যের মিলন হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। শত্রুসেনানীগণ পরস্পর মতভেদ জনিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাহার সেনানীগণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন অথবা শত্রুসেনানী মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইলে তাহাদিগকে ভ্রমশোধনের অবকাশ প্রদান না করিয়া তাহারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতেন। তাহারা হঠকারিতার সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রতাপ প্রথম প্রথম নিজের সৈন্যের অল্পতা জনিত অভাব ক্ষিপ্রগতি দ্বারা দূর করিতেন। ব্যূহরচনা দ্বারা গোলন্দাজের এবং স্থান নির্বাচন করিয়া অশ্বারোহীর অভাব মোচন করিতেন। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে শত্রুদের দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। গুপ্তচর নিয়োগ জয়লাভের একটি প্রধান কারণ। মোঘলদিগের সময় গুপ্তচর সকল রাজ্যের দূরতর প্রদেশের ক্ষুদ্রগ্রামে অবস্থান করিয়া সমস্ত সংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিত। প্রতাপেরও গুপ্তচর সকল ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সমস্ত কথা তাহার নিকট প্রেরণ করিত। এই সকল কার্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইত।

প্রতাপ যখন "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, "আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দাস নহি। আমার যজ্ঞ-সংকল্পকালে 'প্রতাপাদিত্য দেবস্য' বলিয়া সংকল্প করাইতে হইবে।" কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্জিত করিয়া দুই দিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাহার মাতা, পত্নী, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করায় তিনি তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তৃতীয়

দিন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেবস্য বা দাসস্য না বলিয়া "রায়স্য" বলিয়া প্রতাপের সংকল্প দিতে চাহিল। প্রতাপ তাহাতেই সম্মত হইয়া রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কোন বৃত্তি বা ব্রহ্মত্র দিতেন না।

প্রতাপাদিত্য সদ্‌ভিপ্রায়ে চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়ের সহ কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইবেন। প্রতাপের পত্নী স্বামীর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া জামাতাকে রমণীবেশে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতকগণ সহ বাসর ঘরে গিয়া জামাতাকে না দেখিয়া, কন্যার চক্রান্তে জামাতা পলাইয়াছে মনে করিয়া, সেই কন্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ নিজে সহোদরা ভগিনীর সপত্নী দয়াময়ী দাসীকে পরম সুন্দরী নবযুবতী বিধবা দেখিয়া তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করায়, প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমরা সংকল্প দিতে বল কায়স্থেরা শূদ্র, কিন্তু বিবাহ দিতে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবা বিবাহ এবং ভগিনীর সতীনকে বিবাহ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহ তোমায় অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা তোমাকে কুকুরের কান চাটাইব।" প্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন। তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। এদিকে দয়াময়ী লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। কাজেই পুরোহিত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু দয়াময়ীকে যাহারা নিন্দা করিয়াছিল, প্রতাপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য দ্বারা প্রতাপাদিত্য সমস্ত সৎ লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ অত্যাচার ও কদাচার দ্বারা সমস্ত সজ্জনের অপ্রিয়, সুতরাং দেবতারও অপ্রিয় হইয়াছিল। কতকগুলি বাগ্‌দি, চণ্ডাল ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান তাহার একান্ত অনুগত ছিল. প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে সকলকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন।

এদিকে কাঁচু রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। সম্রাট প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইলেন। মানসিংহ দূত দ্বারা প্রস্তাব করিলেন যে, "প্রতাপ অর্ধরাজত্ব কাঁচুরায়কে ছাড়িয়া দেন এবং সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া জমিদার রূপে অর্ধরাজ্য ভোগ করেন।" প্রতাপ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ হইল। প্রবাদ আছে, মানসিংহের সহ যুদ্ধের সময়ে প্রতাপ সঙ্কটে পড়িয়া শিলাদেবীর নিকট স্তব করিয়াছিলেন ; কিন্তু দেবী তাহা শুনিলেন না, রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইলেন।[১৫] প্রতাপাদিত্য অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। অমনি সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা কাঁচুরায়ের সহ যোগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ সুন্দরবন মধ্যে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ সিংহের ন্যায়, বঙ্গের প্রতাপও দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিতেন ; কিন্তু রাণাদিগের অনুচরেরা যেরূপ একান্ত রাজভক্ত ছিল, প্রতাপের দুশ্চরিত্রতা হেতু তদীয় অনুচরেরা তাহার তেমন ভক্ত ছিল না। বরং তাহার জ্ঞাতি শত্রুরা তাহাকে বন্দি করিয়া দিল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লি লইয়া যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্য বীরলীলা সংবরণ করিলেন।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সমগ্র রাজত্ব কাঁচু রায়কে দেন নাই। ভীকাম রায়ের মৃত্যুকালে

তাহাদের যে জমিদারি ও যে মালগুজারি ছিল, তাহাই কাঁচু রায়কে দিয়াছিলেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান আছে। দেবীর সেবারো জন্য মানসিংহ দশঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাহাদের বংশধরেরা শিলাদেবীর পূজা করিতেছেন। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কাঁচু রায় আর একটি প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধূমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই প্রতিমা বর্তমান আছে।

যশোহরের যুদ্ধ সময়ে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রাজা মানসিংহের রসদ যোগাইয়া বাগোয়ান পরগণার জমিদারি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ তাহারই সন্তান। বাংলাদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি সাধনে এই রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ।

১১. দিনাজপুর—রঙপুর জেলায় বর্ধনকুঠির রাজারা অতি পুরাতন জমিদার। ইহারা বারেন্দ্র কায়স্থ। কিন্তু ইহাদের রাজোপাধি মুসলমান বা ইংরেজ গভর্নমেন্ট জানিত নহে। ইহাদের প্রচুর সম্পত্তি বা বিক্রম ছিল না। ইহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীর্তি নাই, এজন্য ইহাদিগকে বারোভুঁইয়া মধ্যে গণ্য করা হয় না। দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থ, এই বর্ধনকুঠির রাজার চাকরি করিতেন। তাহার পুত্র হরিরাম, নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ কল্যাণী নামে একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গৌড়বাদশাহ গণেশনারায়ণ খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) কল্যাণী এক সন্ন্যাসীর পালিতা কন্যা। তাহার পূর্বপুরুষের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। সন্ন্যাসীর অনুরোধে সম্রাট গণেশ, দিনরাজকে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনরাজ স্বীয় গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ হইয়াছিলেন।

(২) কল্যাণী, সম্রাট গণেশ খাঁর দাসী গর্ভজাতা কন্যা। গণেশ তাহাকে হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩) কল্যাণী বর্ধনকুঠির রাজা আজাবলের কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিয়া হরিরাম বর্ধনকুঠির জমিদারির সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। তাহার পর গৌড়বাদশাহের চাকরি করিয়া উন্নত হন।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দিনরাজের উন্নতি সোপান হইয়াছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্রাট যদুনারায়ণ খাঁর পেস্কার হইয়াছিলেন। যদু মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিলে দিনরাজ কর্ম এস্তাফা দিলেন। যদু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ যতদিন ব্রাহ্মণ গুরু ছিলেন, ততদিন আমি হুজুরকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়াছি। এখন আপনি স্পর্শ করিলে আমার অন্নজল নষ্ট হইবে। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। সুতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত।" যদু সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "তোমার মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি দূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে উত্তর বাংলার নবাব নিযুক্ত করিলাম। তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া পার্বত্য জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক রক্ষা কর।" এই নবাবী প্রাপ্তি অবধি দিনরাজের ঘোষ উপাধি লুপ্ত হইয়া রায় উপাধি হইল। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারই নাম "দিনরাজপুর" হইয়াছিল। উত্তর বাংলার লোক শব্দের আদ্য "র" কার উচ্চারণ করে না। এজন্য তাহারা ওই স্থানকে দিন-আজ-পুর বলিত। তাহা হইতেই দিনাজপুর জেলার নাম হইয়াছে। সেই স্থান বর্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

দিনরাজের পর তৎপুত্র শুকদেব রায় নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা বিপদ্‌গ্রস্ত

ছিলেন, তজ্জন্য সুখী হইতে পারেন নাই। কোচবিহারের মহারাজ অতি প্রবল হইয়া বারংবার দিনাজপুর রাজ্য লুঠ করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর লুঠ করিয়া অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে শুকদেব জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধ বয়সে মোঘলেরা বাংলাদেশ অধিকার করিলে, মোঘল ও উজ্‌বক সর্দারেরা দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদুর পর্যন্ত আপনাদের জাগিরভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফলত শুকদেবের অধিকৃত স্থান অল্প ছিল, শত্রু অনেক ছিল, সুতরাং অবস্থা মন্দ ছিল।

তদভাবে তৎপুত্র প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ না লইয়া স্বকৃত নবাব হইলেন। তিনি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া কোচদিগকে পরাজয় করিয়া নিজ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোঘল ও উজ্‌বক সর্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগির হইতে বিচ্যুত হইলে, প্রাণনাথ, কতক পরগণা শুকদেবের সনন্দ ক্রমে, কতক বা বলপূর্বক নিজ এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন। জেলা দিনাজপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচ জেলার কতক অংশ তাহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নবলক্ষের রাজা বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ তাহার বার্ষিক মুনাফা নয় লক্ষ টাকা ছিল। যখন সমস্ত জিনিস সস্তা ছিল, সে সময়ে কোচবিহারের মহারাজের মোট রাজস্ব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রায়ের নয় লক্ষ টাকা লভ্য থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন।

নবাব প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম তিনি "বিজয়নগর" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্য ওই স্থানের নামই দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্তমান দিনাজপুর সহর। পুরাতন দিনাজপুর কান্তনগরের নিকটে ছিল।

কোচদিগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্বদা চলিতেছিল। তজ্জন্য বোধ হয় সৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পড়িত। রাজা মানসিংহ সহ কোচবিহারাধিপতির যুদ্ধোদ্যম হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভানুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে যখন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সহ মানসিংহের সন্ধি ও কুটুম্বিতা হইল, তখন রাজা মানসিংহ প্রাণনাথকে তাহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং কোচবিহারাধিপতির সহ রাজা প্রাণনাথের পাগড়ি বদল করাইয়া উভয়ের বন্ধুতা করাইয়া দিলেন। তদবধি দিনাজপুর ও কোঁচবিহারের রাজবংশে বরাবর বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে। এই সন্ধি হওয়ার পর রাজা প্রাণনাথের আর কোন প্রবল শত্রু থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বহু সৎকর্মে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ই সর্বপ্রথমে ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসনকর্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তাহাকে ও তৎপুত্র শুকদেব রায়কে রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন হিন্দু বড় লোক উজির, দেওয়ান, নবাব বা ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাহাকে রাজা বলিবার রীতি ছিল। আর বৃহৎ জমিদার—যাহার গভর্নমেন্টে রাজা উপাধি নাই, তাহাকেও রাজা বলিবার রীতি ছিল।[১৭] বোধ হয় সেই রীতি ক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ববর্তী নবাবদিগকেও রাজা বলিয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বাদশাহি সনন্দ প্রাপ্ত রাজা ছিলেন না। মানসিংহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন জন্য

দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের রাজা নির্বাচন করা হইয়াছে। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুজারী একলক্ষ টাকা মাত্র ছিল।

প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামনাথ রায় অতি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর টাকা পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। ঔরঙ্গজেব সম্রাট হইয়া রাজা রামনাথকে দিল্লিতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, "দিনাজপুর প্রদেশের অবস্থা অতিমন্দ। তাহা হইতে লক্ষ টাকা মালগুজারী কদাচ সুবাদারের নিকট ইর্শাল হইত না। সুবাদার আমাকে স্থায়ী স্বত্ব দিয়া মালগুজারী অতিশয় বেশি করিয়াছেন, তাহা দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে।" যে সকল কারণে রামনাথের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কম হইয়াছিল, সম্রাট তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি আমদানি বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের পূর্বে দিনাজপুর প্রদেশ হইতে কখন ত্রিশ হাজার টাকার বেশি ইর্শাল হয় নাই। সুতরাং এই বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়া সম্রাট তাহাই স্থির রাখিলেন এবং সনন্দ ও খেলাত দিয়া রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লি যাওয়াকালে পথিমধ্যে বৃন্দাবনে মানস করিয়াছিলেন যে, নিজের রাজত্ব স্থায়ী থাকিলে তিনি বৃন্দাবনের মন্দির অপেক্ষা উত্তম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা মত রাজা রামনাথ রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাঙালি মন্দির এই রাজবংশের একটি মহাকীর্তি এবং বাঙালি শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সন ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙিয়া গিয়াছে।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা রামনাথের মালগুজারি বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। মালগুজারি বাকির জন্য রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে ধরিয়া মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকি রাজস্ব মাফ হইল এবং তিনি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সূর্যপুর পরগণা জমিদারি রূপে পাইলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের বংশধর।

রাজা রামনাথের পুত্র বৈদ্যনাথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন সহ রাজা বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়াছিল। রাজা বৈদ্যনাথের সহ পুনরায় কোচবিহারের মহারাজার বন্ধুতা হইয়াছিল। বৈদ্যনাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশিম, রাজার মালগুজারি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিশেষে লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদবধি দিনাজপুরের রাজা সাধারণ জমিদার-শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন।

রাজা বৈদ্যনাথের পুত্র রাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নির্বোধ ছিলেন, তজ্জন্য লোকে তাহাকে "গাধাকান্ত" বলিত। তাহারই সময়ে একটি পরগণা ভিন্ন সমস্ত জমিদারি নিলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্বজন কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সংসার ত্যাগ করত গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোবিন্দনাথ নাবালক থাকায় সুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাই এ পর্যন্ত আছে। তিনঘর বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের ও চন্দনার (যশোহরের) রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দিনাজপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য কায়স্থ সমাজে এই রাজবংশের সম্মান সর্বাপেক্ষা অধিক।

১২. রাজশাহী—কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তাহার পুত্র লালা রামগোবিন্দ, গৌড় বাদশাহের খাসমুন্সী হইয়া রাঢ়দেশে রাজশাহীদিগের নামে চারি পরগণা একত্র করিয়া একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাহার রাজা

কলতা-কায়েত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ এখন গৌরীপুরের রাজা। এই বৃত্তান্ত পূর্বে গৌরীপুর হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে তথাকার রাজবংশের অন্যরূপ ইতিহাস রাজবাড়িতে পাওয়া যায়। তাহা এই যে, সনাতন লালা নামক একজন মিথিলা দেশীয় দরিদ্র কায়স্থ চাকরির চেষ্টায় আসিয়া রাঙামাটিয়াতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান আসাম রাজ্য ও মোঘল রাজ্যের সীমান্ত স্থান। এই স্থান আসামি ও কোচদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষার জন্য সনাতনের বংশীয়েরা দিল্লির বাদশাহের নিকট বহু জমি 'আলতাম গাঃ' রূপ প্রাপ্ত হন এবং আট পরগণা জমিদারি পাইয়াছিলেন। তাহারা বড়ুয়া উপাধি ধারণ করিয়াছেন বটে কিন্তু আসামি কায়েত সহ বিবাহ আদান প্রদান করেন নাই। তাহারা বরাবর পশ্চিমা কায়েত সহ বিবাহাদি করেন।

১৩ হিন্দি ভাষায় ভীষ্ম শব্দের অপভ্রংশে ভীখম বলে। বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীষ্ম শব্দেরই অপভ্রংশ।

১৪. লোকে ইহাদিগকে সাগর দ্বীপের রাজা বলিত।

১৫. শিলাদেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র আছে। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি।"

১৬. প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ জঘন্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক করা অতীব দূষ্য।

১৭. রাজারা ভূমিতে স্বত্ববান মালিক আর নবাবেরা বেতনভোগী অস্থায়ী চাকর মাত্র। এজন্য 'নবাব' উপাধি হইতে 'রাজা' উপাধি বরাবর সমধিক সম্মানিত ছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে নবাবেরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাহাদের উপাধি নবাবই থাকিল। তখন অনেক রাজা সেই নবাবদের অধীন থাকায় নবাব উপাধি রাজা উপাধি অপেক্ষা উচ্চতর হইল।

বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস

সূচনা ঃ

প্রাচীনকালে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণ "ভৌমিক" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন।[১] "ভূএগ্র" ইহার অপভ্রংশ। এক সময়ে বাংলা দ্বাদশ ভৌমিকের রাজ্য (বারভূঞকা মুল্লুক) বলিয়া খ্যাত ছিল।[২] কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, গঙ্গা-বক্ষস্থিত বদ্বীপ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমিদারগণই "দ্বাদশ ভৌমিক" বা "বারভূএগ্র" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।[৩] ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনার মধ্যবর্তী "ভাটি" প্রদেশই যে দ্বাদশ ভৌমিকের "মুল্লুক" ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পাঠানদিগকে দূরীকৃত করিয়া সমগ্র বাংলা পদদলন করিতে মোঘলদিগের সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন এই সপ্তদশ বর্ষই দ্বাদশ ভৌমিকের পরমায়ু। এই উক্তি কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না ; ভৌমিকশ্রেণীতে যে সকল মহাত্মার নাম গ্রথিত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই আকবরের সমসাময়িক নহেন। বিশেষত আকবরের জন্মের পূর্বেও বাংলা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] প্রকৃতপক্ষে পাঠানদিগের শাসন কালেই বাংলা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভাগের জমিদারগণ সংস্কৃতে "ভৌমিক"—অপভ্রংশে "ভূএগ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের "রাজা" কিংবা "রায়" উপাধি ছিল। "মহারাজাধিরাজ", "মহাবাজেন্দ্র বাহাদুর" ও "মহারাজা বাহাদুর" প্রভৃতি অনেক অনুচিত উপাধি সেকালে প্রচলিত ছিল না কিন্তু ভারতীয় বর্তমান স্বাধীন নৃপতিগণ হইতে বঙ্গীয় ভৌমিকগণ ভাল অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, রণতরী ছিল। ইচ্ছানুসারে জলে-স্থলে সমভাবে আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। আমরা এই সকল ভৌমিকদিগের বিবরণ ক্রমে পাঠকদিগকে উপহার দিব।

দ্বাদশ ভৌমিকের নাম এইরূপ উল্লেখ হইয়া থাকে—

১। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, চন্দ্রদ্বীপ। (কায়স্থ, বসু)
২। রাজা প্রতাপাদিত্য, যশোহর। (কায়স্থ গুহ)
৩। চাঁদরায়, কেদার রায়, শ্রীপুর, বিক্রমপুর। (কায়স্থ, দেব)
৪। মুকুন্দরাম রায়, ভূষণা। (কায়স্থ?)
৫। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, ভুলুয়া। (কায়স্থ, সুর)
৬। ঈশা খা মসনদ আলি, খিজিরপুর, সুবর্ণগ্রাম।[৫]
৭। ফাজেল গাজি, ভাওয়াল।
৮। চাঁদ গাজি, চাঁদ প্রতাপ।
৯। রাজা কংসনারায়ণ লস্কর রায়, তাহারপুর (বা তাহিরপুর। ব্রাহ্মণ)
১০। রাজা রামকৃষ্ণ, সাতৈল, পাবনা[৬]। (ব্রাহ্মণ)
১১। পুটিয়ার ঠাকুর বা রাজা। (ব্রাহ্মণ)
১২। রাজা গণেশ রায়, দিনাজপুর। (কায়স্থ[৭])

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ ঃ

চন্দ্রদ্বীপ জেলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতী একটি পরগণা। এই পরগণার নামানুসারে সমুদ্র তীরবর্তী বাকরগঞ্জ প্রদেশ "চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক লেখকগণ চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্তে "বাকলা" বা "বাগোলা" রাজ্য লিখিয়াছেন।[৮] বাকলা একটি স্বতন্ত্র পরগণা। আমাদের বিবেচনায় "বাকলা" বা "বাগোলা" কেশবসেনদেবের তাম্রশাসনাঙ্কিত "বাগুলী"র অপভ্রংশ মাত্র।[৯]

চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বেব্রিজ সাহেব পশ্চাদুক্ত দেশপ্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। বিবাহান্তে তিনি তাহার পত্নীর নাম "ভগবতী" শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ইষ্টদেবীর সংজ্ঞাবিশিষ্টা রমণীর সহিত সহবাস করিতে অসম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নির্বেদ পরতন্ত্র চন্দ্রশেখর এক ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিয়া জলে জীবন বিসর্জন করিতে চলিলেন। সে সময় বাকরগঞ্জ প্রদেশের নামগন্ধও ছিল না। নদরাজ লৌহিত্য এতদূর না আসিয়াই বঙ্গোপসাগরের দর্শন পাইয়াছিলেন। বঙ্গ বা সমতট রাজ্যের অর্ধাংশ সে সময় লবণাক্ত জলরাশিতে আবৃত ছিল।[১০] চন্দ্রশেখর ক্ষেপণী সঞ্চালনে দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিলেন। অহোরাত্র গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন—দ্বিতীয় মৎস্যগন্ধারূপিণী এক ধীবর-কন্যা ক্ষুদ্র নৌকারোহণে একাকিনী সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালে? অসীম অর্ণবে একাকিনী বিচরণ করিতেছ, তোমার কি ভয় নাই?" বালিকা উত্তর করিল—"দেব! আমি জালজীবীর কন্যা, অর্ণবে বিচরণ আমার জাতীয় ব্যবসায়, ইহাতে আমার ভয় কি। কিন্তু আপনি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, আপনি গোস্বামী, কি কারণে এখানে আসিলেন।" তদুত্তরে চন্দ্রশেখর তৎসমক্ষে স্বীয় মর্মপীড়া বিবৃত করিলেন। তখন বালিকা ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! জান না জগজ্জননী ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। রমণী মাত্রই প্রকৃতির অংশভূতা।" ব্রাহ্মণ ধীবর বালিকার মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বালিকার ক্ষুদ্র জলযানে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং বালিকার পদধারণ করিয়া বলিলেন—"মাতঃ! আপনি কে?" বালিকা পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধীবরকন্যা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে বালিকা বলিল, "বৎস আমি তোমার ইষ্টদেবী।" তদনন্তর বরদা তাহাকে বরদান করিলেন, "এই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপে পরিণত হইবে। তোমার নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" নামে খ্যাত হইবে এবং তুমি ইহার অধিপতি হইবে।" বর দিয়া বরদা অন্তর্হিত হইলেন।

মতান্তরে ঃ

চন্দ্রশেখর নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাহার দনুজমর্দন দেব নামে কায়স্থ জাতীয় জনৈক শিষ্য ছিল। চন্দ্রশেখর সতত ক্ষুদ্র জলযানে ভ্রমণ করিতেন। নৌকারোহী সন্ন্যাসী একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, কালী বলিতেছেন—"বৎস! এই স্থানে জলতলে কয়েকটি দেবমূর্তি পতিত রহিয়াছে। তুমি ইহাদের উদ্ধার কর।" পরদিবস সন্ন্যাসী তাহার শিষ্যকে তিনবার ডুব দিয়া তিনটি দেবমূর্তি উদ্ধার করিতে বলিলেন। দনুজমর্দন দুইবার ডুব দিয়া কাত্যায়নী ও মদনগোপাল নামে ২টি বিগ্রহ উঠাইয়াছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহা অদ্যাপি মাধবপাসা রাজবাটিতে স্থাপিত রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত সন্ন্যাসী শিষ্য তৃতীয়বার ডুবিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু করিলে তিনি রাজলক্ষ্মীর মূর্তি উঠাইতে পারিতেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে এই বাণী উচ্চারিত হইল "এই স্থানটি শুষ্ক হইয়া একটি দ্বীপের উৎপত্তি হইবে এবং দনুজমর্দন ইহার অধিপতি

হইবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর নামানুসারে এই দ্বীপ "চন্দ্রদ্বীপ" আখ্যাপ্রাপ্ত হইবে।[১১] আকাশবাণী সফল হইল। রাজা দনুজমর্দন দেব—অপভ্রংশে দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের প্রথম ভূপতি।

চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজ বংশাবলী।

১

রাজা দনুজমর্দন দেব রায়।

২

রাজা রমাবল্লভ রায়।

৩

রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।

৪

রাজা হরিবল্লভ রায়।

৫

রাজা জয়দেব রায়।

চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যস্থাপয়িতা রাজা দনুজমর্দনদেব কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিলে তিনি শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। বিখ্যাত যবন ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ স্বীয় "তবকতই নসরি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"মহাম্মদ বখ্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলে রায় লাক্ষ্মণেয় বঙ্গের রাজধানী সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" 'তবকতই নসরি' সঙ্কলন কালে (৬৪০—৪২ হিজিরি শক মধ্যে) তদ্বংশধরগণ বঙ্গ শাসন করিতেছিলেন।[১২] তওয়ারিখে বারনি বলেন ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌড়ের বিদ্রোহী শাসনকর্তা "সুলতান মোঘিসুদ্দিন তুগ্রল" সম্রাট বলবন কর্তৃক তাড়িত হইয়া স্বীয় বন্ধু রত্নমাণিক্যদেবের আশ্রয়ে যাইতেছিলেন। সম্রাট সেন বংশজ সুবর্ণগ্রাম (বা সমতটাধিপতি দনুজরায়ের সাহায্যে জাহাজ নগর ত্রিপুরার) প্রান্তে তুগ্রলের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার ওয়াইজ অনুমান করেন—এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠান কর্তৃক সুবর্ণগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের অনুমান সত্য হইলে সচিবপ্রবর আবেলফাজেল ও জোসেফ টিফেফনতল্লারের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুশাসন পত্রে সেনরাজগণের নামের অন্তে "দেব" উপাধি পরিলক্ষিত হয়, রাজা দনুজমর্দনও কায়স্থ "দেব" বংশ সম্ভূত।[১৩]

রাজা দনুজ রায়ের জীবনী সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজ বন্ধন। বল্লাল কায়স্থদিগের যেরূপ সামাজিক শ্রেণীতে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই নিয়ম অনুসারে ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর কুলীন ; দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আট ঘর মৌলিক। এতদ্ভিন্ন কায়স্থগণ "বায়াত্তরে" নামে খ্যাত। দনুজ রায় এই নিয়ম সংশোধন করেন। কুলজি গ্রন্থানুসারে তিনি প্রথম "বঙ্গজকায়স্থ সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সামাজিক আধিপত্য-সীমা ততদূর প্রসারিত ছিল না ; পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিমে যশোহর, উত্তর সীমা ঢাকা জেলাস্থ ইছামতী নদী।

দনুজ রায়ের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চারি ঘর কুলীন যথা—ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র। তৎপর আট ঘর। সেই আটঘরে আবার দুই শ্রেণী, মধ্যল্য ও মহাপাত্র। দত্ত (মধুকুল্য গোত্র)। নাগ, নাথ ও দাস মধ্যল্য ; মধ্যল্য কুলীনদিগের বিশ্রামস্থল। সেন, সিংহ, দেব ও রাহা—মহাপাত্র। মহাপাত্রের[১৪] সহিত আদান প্রদান করিলে কুলীনদিগের কিঞ্চিৎ মানহানি হয়; কিন্তু

কুল নষ্ট হইতে পারে না। মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সর্বথা কুলকার্য হওয়া উচিত। এই উৎকৃষ্ট কায়স্থ দ্বাদশ গৃহের নিম্নে পশ্চাল্লিখিত পনের ঘরের গণনা হইয়া থাকে ; ইহারা মধ্যবিধ, যথা—কর, দাম, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুরু, বিষ্ণু, আদ্য ও নন্দন। এতদ্ভিন্ন চৌষট্টি ঘর কায়স্থ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য ; যথা—কেতু, সাই, সিল্ল, সর্ম, খর্ম, সুর, শাম, পাহি, বিদি, হোর, আদিত্য, ভুয়, বর্ধন, লধ, লোধ, বিধি, বিদ, গুণ, বল, বর, ধীর, ব্রহ্ম, আইচ, ভুঞ্জ, ভৃতক, নাহা, কুন্দ, এন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ঈর্ষা, নন্দ, চম্পক, অম, শুক, অনো, হন, হরি, শুশ্চ, কুশ, ক্রুঞ্চ, মাঝি, রাহুত, রাজক, আখণ্ড, মুটেক, সাধু, গর, পাণি, হদেশ, সুত, শুক্ত, অন্য, রধ, রাধ, মালি, হাতি, বধ, শ্যাম, অঞ্জ, ভঞ্জ, সির্ষ্ঠা, বিছা, রুদ্র। বঙ্গজ কায়স্থ কুলজি গ্রন্থে এতাধিক কোন কায়স্থের উল্লেখ নাই।

রাজা দনুজ রায় কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রতি দুইটি ভার অর্পণ করেন। সেই কার্য অনুসারে তাহারা স্বর্ণামাত্য ও কুলাচার্য (ঘটক) নামে খ্যাত। কায়স্থদিগের বংশাবলী তাহাদের বিবাহ সংখ্যা ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট পুস্তকে লিখিয়া রাখা কুলাচার্যের কর্ম। কায়স্থদিগের কুলকার্যাদির বিবরণ রাজসমক্ষে বিবৃত করা স্বর্ণামাত্যের কার্য। তদতিরিক্ত তাহারা রাজসভায় ও ভোজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থগণের উপবেশন স্থান নির্দেশ করিতেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজভবনে কায়স্থদিগের জন্য "চিলছত্র" নামে একটি ভোজনালয় নির্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজা, তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কুলীন, তৎপর কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ; তাহাদের চতুঃপার্শ্বে অন্যান্য কায়স্থগণ বসিতেন।

চন্দ্রদ্বীপপতিদিগের রাজধানী কচুয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজা কৃষ্ণবল্লভের কন্যা তথায় একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। রাজা জয়দেব রায় অপুত্রাবস্থায় কাল-কবলিত হইলে তাহার দৌহিত্র "দেহুড়গাতি" নিবাসী বসু-বংশজ পরমানন্দ মাতামহ-রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন প্রাপ্ত হন।[১৫] বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন পরমানন্দ, কান্যকুব্জ হইতে আগত পূষণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে অবতীর্ণ। আমাদের বিবেচনায় এই উক্তি সঙ্গত নহে।

চন্দ্রদ্বীপের দ্বিতীয় রাজবংশের বংশাবলী।

১
রাজা পরমানন্দ রায়।
২
রাজা জগদানন্দ রায়।
৩
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়।
৪
রাজা রামচন্দ্র রায়।
৫
রাজা কীর্তিনারায়ণ রায়।
৬
রাজা বসুদেবনারায়ণ রায়।
৭
রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়।
৮
রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

পরমানন্দ মাতামহের আসন প্রাপ্ত হইয়াই সামাজিক বন্ধনে হস্তক্ষেপ করিলেন। পূর্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র যথাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ লিখা হইত। পরমানন্দের সময় হইতে কুলজি গ্রন্থে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র লিখা যাইতেছে।

আকবরের সেনানী মনিয়ম খাঁ গৌড়াধিকার করিয়া মুরাদ খাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ জয় করিতে প্রেরণ করেন। মুরাদ ১৪৯৬ শকাব্দে (১৫৭৪ খ্রিঃ অঃ) বাকলা ও ফতেয়াবাদ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় জগদানন্দের শাসনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র লিখিয়াছেন—"জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। উক্ত রাজা শক্তি উপাসনায় একজন "সিদ্ধ পুরুষ" ছিলেন। তিনি গঙ্গার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। একদা গঙ্গার (পদ্মা) জল উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজবাটির দ্বার পর্যন্ত ধাবিত হইল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া স্মরণ করিলেন, বুঝি গঙ্গা তাহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া তৎপ্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন। রাজা জগদানন্দ দেবীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, গঙ্গার জলও যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল।" ডাক্তার ওয়াইজ এই ঘটনাটি অন্যরূপ লিখিয়াছেন।[১৬] প্রকৃতপক্ষে ১৫০৫ শকাব্দে একটি ভয়ঙ্কর ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়াছিল। আইন আকবরি গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[১৭] ইহাতে বাকলা রাজ্যবাসী দুই লক্ষ লোক ও জাহাজাদি নষ্ট হয়। মঠ ও নহবৎখানা ব্যতীত অন্যান্য গৃহ সমুদয়ের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ হইয়াছিল। ক্রমে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত ২৫।৩০ হস্ত উচ্চ বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গকলাপ বাগুলীবক্ষে ক্রীড়া করিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায়, এই ঘটনাটিই রাজা জগদানন্দের মৃত্যুর সমসাময়িক। এই বিপদকালে রাজপুত্র কন্দর্পনারায়ণ একটি উচ্চশীর্ষ দেবমন্দির আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কন্দর্পনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ভৌমিক। ১৫০৮ শকাব্দে (১৫৮৬ খ্রিঃ অঃ) ইংলন্ড দেশীয় বিখ্যাত পর্যটক রল্‌ফ ফিচ বাকলায় উপনীত হন। তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্গান্তর্গত চট্টগ্রাম হইতে আমি বাকলায় গমন করি। তত্রত্য অধিপতি (King) অতি ভদ্র। তিনি বন্দুক ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। তাহার রাজ্য বিস্তৃত ও উর্বরা। তথায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। রেশমি ও কার্পাস বস্ত্র নির্মিত হয়। তথাকার গৃহগুলি উচ্চ ও সুন্দর। পথ প্রশস্ত। অধিবাসীগণের দেহ প্রায় অনাবৃত, কেবল অল্পপরিসর বস্ত্র দ্বারা কটি ও তাহার নিম্নদেশ আবৃত করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠ ও বাহু রৌপ্যালঙ্কারের ভাণ্ডারসদৃশ; তাহাদের পদে রৌপ্য, তাম্র, কিংবা দ্বিরদ-রদ নির্মিত মল।"[১৮]

রাজা কন্দর্পনারায়ণের বাকলা শাসনকালে রাজা তোডরমল্ল বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তন্মধ্যে বাকলা বাংলার ঊনবিংশ সরকারের অন্যতম। সরকার বাকলা ৪টি মহালে বিভক্ত, যথা—বাকলা, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও আদিলপুর (বর্তমান ইদিলপুর)। মোট বার্ষিক রাজস্ব ১৭৮৭৫৬ টাকা[১৯]। আবোল ফাজেল বলেন—বাকলার রাজা সম্রাটের সাহায্যার্থে ৩২০টি গজ ও পঞ্চদশ সহস্র পদাতি যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু ফিচের লিখা পাঠে বোধ হয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণ নামত মোঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

রাজমালায় লিখিত আছে শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ভাগে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যদেব বাকলা আক্রমণ করেন। তিনি সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া বহুতর ধন ও বহু সংখ্যক

লোক দাসরূপে লইয়া যান। আরাকানরাজও বাকলার প্রতি খর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কন্দর্পনারায়ণ, ত্রিপুরেশ্বর, আরাকানরাজ ও পর্তুগিজদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রথমত বসুরকাঠি—তৎপর মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মাধবপাশায় জনৈক "গাজি" উপাধিধারী যবন বাস করিত, কন্দর্পনারায়ণ তাহাকে বধ করিয়া সেই স্থানটি অধিকার করেন। অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যশূন্য রাজগণ তথায় বাস করিতেছেন। মাধবপাশা রাজবাটিতে একটি বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ইহার দৈর্ঘ্য $\frac{১৩}{৪}$ ফিট। ইহাতে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম "৩১৮" অঙ্ক ও কামান-নির্মাতা শ্রীপুর নিবাসী "রুপিয়াখার" নাম খোদিত রহিয়াছে। "৩১৮" অঙ্কটি বোধ হয় কামানের সংখ্যা হইতে পারে।

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, শিশু রামচন্দ্র পৈতৃক আসনে আরোহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই উদ্বাহ-কার্য কন্দর্পনারায়ণের জীবিতাবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—"বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সমৃদ্ধি সহকারে সমারোহপূর্বক প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বিবাহ-কার্য সমাপনানন্তর বরকন্যা গৃহপ্রবিষ্ট হইলে, বর (রামচন্দ্র) শুনিতে পাইলেন যে, রাত্রিতে তাহাকে হত্যা করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজপতিত্ব অধিকার করিবেন, তাহার সমুদয় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রামচন্দ্র তাহার নববিবাহিত পত্নীর নিকট এই কথা শুনিতে পান ; কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায় তাহাকে এই সম্বাদ জ্ঞাপন করেন)। রামচন্দ্র ইহাও অবগত হইলেন, যে যে খাল দিয়া গমন করিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। কিন্তু সে সময়, তাহার আত্মীয় ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ বহির্বাটিতে আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। পরিশেষে রাজা রামচন্দ্র তাহার নবোঢ়া মহিষীর (কেহ বলেন বসন্ত রায়ের) সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষকদিগের নায়ক ভীমপরাক্রম রামমোহন মাল স্বীয় প্রভুর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ রাজা রামচন্দ্রকে ৬৪ ক্ষেপণীযুক্ত এক কোষ নৌকায় আরোহণপূর্বক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদি পূর্ণ খালে নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল। বিঘ্নসঙ্কুল খাল অতিক্রম করিয়া তোপধ্বনিতে রাজা রামচন্দ্র স্বীয় শ্বশুরকে তাহার গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখিত বিবরণ ইহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। তিনি বলেন, "বিবাহ-রজনীতে রাজা রামচন্দ্রের অনুচর রামাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপমহিষীর সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া নূতন জামাতার প্রাণবধে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রতাপ দুহিতা পিতৃপ্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া রাজা রামচন্দ্রকে নির্বিঘ্নে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি রামমোহনের বাহুবলে নির্বিঘ্নে স্বীয় রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।"

"প্রতাপাদিত্য চরিত্র" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য (বিবাহের বহুকাল পরে) লোভাক্রান্ত হইয়া জামাতৃরাজ্য করতলস্থ করিতে মনস্থ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রকে নিজ ভবনে আনাইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরের কৌশলজালে রুদ্ধ হইয়া কিছুকাল যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে একদা প্রতাপাদিত্য জনৈক দৌবারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন "কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা একজন যে হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।" প্রতাপাদিত্যের এই অনুজ্ঞা তাঁহার কন্যার কর্ণগত হইলে তিনি দুঃখে মৃতকল্প হইলেন। পরে নিশাযোগে সঙ্গোপনে স্বীয় স্বামীকে সকল

বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় শ্যালক যুবরাজ উদয়াদিত্যকে আহ্বান করিলেন এবং তিনি তথায় উপনীত হইলে সবিনয়ে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। অনুজার রোদন[২০] ও ভগিনীপতির বিনয় বাক্যে যুবরাজের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হইল। তিনি কৌশলে রাজা রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে নির্বিঘ্নে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি শ্যালকের কৃপায় প্রাণ রক্ষা করিলেন। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ও ওয়াইজ সাহেবের লিখা হইতে মহাত্মা রামরাম বসুর লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ রাজা রামচন্দ্রের উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে খ্রিস্টধর্ম-যাজক ফোনসেকা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাক্‌লায় উপনীত হন। ফোনসেকা বলেন "রাজার বয়ঃক্রম অনধিক আট বৎসর। রাজা তাহাকে সম্মান ও আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং বাকলা রাজ্যে গির্জা প্রভৃতি সংস্থাপন জন্য সনন্দ দান করিয়াছিলেন।" ফোনসেকা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, যে, তিনি অষ্টমবর্ষীয় বালকের পরিণামদর্শিতা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফোনসেকা বলেন সাদর সম্ভাষণের পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোথায় যাইব ; আমি বলিলাম, আমি মহারাজের শ্বশুর চাঁদ খাঁর অধীশ্বর সমক্ষে যাইতেছি।"[২১] এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং উদ্বাহকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন, অতএবই বোধ হইতেছে, যে কন্দর্পনারায়ণ রায়ের জীবদ্দশায় এই বিবাহ কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। ফোনসেকার বাংলা ভ্রমণকালে যে যশোহর ও বাকলা রাজপরিবার মধ্যে কোন প্রকার অসূয়া বর্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন, "রাজা রামচন্দ্র যশোহরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জীবনরক্ষিত্রী পত্নীকে হৃদয় হইতে বিসর্জন করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর অন্তে প্রতাপদুহিতা কাশী যাত্রাচ্ছলে চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। তিনি মাধবপাসার নিকটবর্তী স্থানে পঁহুছিয়া নৌকাতেই রহিলেন, কেহ তাহাকে সমাদরপূর্বক নিতে আসিল না। তাহার নৌকার নিকট সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত, অদ্যাপি সেই স্থানটি "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে। পরে তিনি সারসী গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই সকল সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বধূকে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, রাজা পত্নী সন্দর্শন করিবেন না বলিয়া তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। হতভাগিনী প্রতাপ-দুহিতা অবশেষে কাশীযাত্রা করিলেন।" আমাদের বিবেচনায় ব্রজসুন্দর বাবুর লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য নহে। রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় একজন সুবোধ নৃপতি তাহার জীবনরক্ষিত্রী পত্নীর প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

ডু. জারিক বলেন "১৬০২ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ বাকলা জয় করিয়াছিলেন।"

প্রবাদ অনুসারে রামচন্দ্রের জীবনী সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনা লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাণদণ্ড। এই ঘটনাটা ভুলায়ার ভৌমিক বংশের বিবরণে বিবৃত হইবে। বলা বাহুল্য যে রামচন্দ্র আকবরের মৃত্যুর পূর্বে সিংহাসনারোহণ করেন, জাহাঙ্গীর বাদশাহের শাসনকালে তাহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্তিনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তিনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাহার অধিকার কালে মোঘল-শাসিত বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা[২২] নগরীতে স্থাপিত হয় (১৬০৮ খ্রিঃ অঃ)। ঢাকার শাসনকর্তার সহিত কীর্তিনারায়ণের সদ্ভাব জন্মিল। নবাব যুদ্ধযাত্রাকালে প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন। এক যুদ্ধযাত্রাকালে, নবাবের রন্ধনালয়ের নিকট দাঁড়াইয়া রাজা কীর্তিনারায়ণ নবাবের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ রন্ধনের ঘ্রাণ আসিয়া রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। রাজা বস্ত্র দ্বারা নাশা আবৃত করিলে, নবাব বলিলেন "রাজন্, 'ঘ্রাণেনার্দ্ধভোজনং' অতএব আপনার জাতি নষ্ট হইয়াছে।"[২৩] রাজা

নবাব বাক্য শ্রবণ মাত্র স্বীয় অনুজ বাসুদেবনারায়ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থধর্মাবলম্বন করিলেন।

১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হরবার্ট সাহেব (Sir J. Herbert) বাকল, গঙ্গাতীরস্থ সমৃদ্ধিসম্পন্ন একটি প্রধান নগরী লিখিয়াছেন। ব্লেভ ও ব্রোকের মানচিত্রেও "বাকলা" ("Beacola" Blaev's map ; "Baecala" Van den Broueke's map.) প্রধান নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। এতাবত অনুমিত হইতেছে খ্রিস্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাকলার সৌভাগ্য-দীপিকা নির্বাণ হয় নাই।

রাজা বাসুদেবনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ দীর্ঘকাল পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। উলাইল[২৪] নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদার সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজকুমারীর গর্ভে গৌরীচরণের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ, কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। রাজা প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাহার একমাত্র পুত্র প্রেমনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। মাতুলের মৃত্যুর পর উদয়নারায়ণ মিত্র—পশ্চাৎ রাজা উদয়নারায়ণ রায়—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজপতির আসন অধিকার করেন। রাজনারায়ণ মিত্র "সরকার বাকলার" অধীনস্থ কয়েকটি তাল্লুক লইয়া রাজধানী মাধবপাসার নিকটবর্তী প্রতাপপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। তাহাদের তাল্লুকগুলি নিলাম হইয়া গিয়াছে।
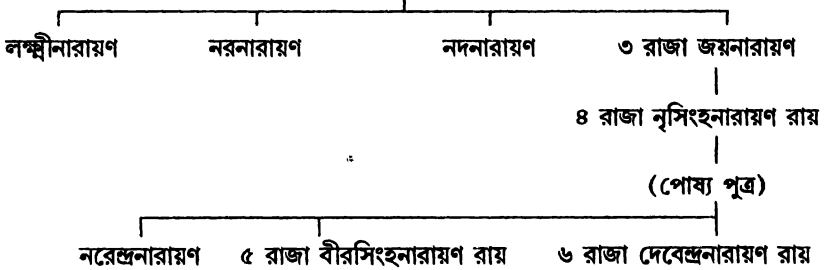
রাজা উদয়নারায়ণ কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা ডাক্তার ওয়াইজ কিংবা ব্রজসুন্দর বাবু লেখেন নাই। সৌভাগ্যবশত আমরা মোঘল-শাসিত বঙ্গের রাজস্বের তৃতীয় হিসাবে (জমাকামেল তোমারি) তাহার নাম পাইয়াছি, সুতরাং তিনি মুরশিদকুলি খাঁ ও সুজাউদ্দিনের সমসাময়িক। এই সময়ে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) সরকার বাকলার রাজস্ব ১৯২৪৪৮ টাকা লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপপতি উদয়নারায়ণ রায় খালসা ভূমির জন্য ১১৭০ টাকা, জায়গির মহালাভের জন্য ৫৮৬৮১ টাকা মোট ৫৯৭৫১ টাকা কর দান করিতেন। সুতরাং প্রাচীন বাকলা রাজ্যের অধিকাংশ ইহার পূর্বেই তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।[২৫]

বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—"উদয়নারায়ণের রাজত্ব লাভ করিবার পরেই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাহাকে অধিকারচ্যুত করেন। তাহাতে

তিনি নবাবের সমীপে গমন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। নবাব বলিলেন—যদি তুমি একটি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর, তাহা হইলে রাজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দ্বিতীয় ফরিদের ন্যায় মল্লযুদ্ধে এক "সের" নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নবাবের বেগম তাহার ন্যায্য পুরস্কার লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তদন্তে রাজা কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার নিজ হস্তগত করিয়াছিলেন।"

উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর শিবনারায়ণ পৈতৃক আসন অধিকার করেন। তাহার রাজ্যাধিকার কালে ভারত ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই নরপতি ভোগাবিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর শিশু জয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তাহাকে ও তাহার মাতা দুর্গারাণীকে একটি নির্ধারিত বৃত্তি দিয়া রাজকর্মচারী শঙ্কর বকসী প্রকৃত রাজা হইয়া ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। অবশেষে দুর্গারাণী ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের[১৯] সাহায্যে শঙ্কর বকসীকে পদচ্যুত করিয়া পুত্রের রক্ষয়িত্রী স্বরূপ রাজাসন অধিকার করেন। উক্ত রাণী একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "দুর্গাসাগর" নামে খ্যাত রহিয়াছে। ইহার আয়তন ৩৶ তিন দ্রোণ তেরকানি (২৪৪ বিঘা)।

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে প্রসিদ্ধ "দশশালা বা চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত হয়। পূর্বেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কলেবর খর্ব হইয়াছিল। এইক্ষণে আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের "নিলামের আইনের" কৃপায় প্রাচীন জমিদারদিগের সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। অবধারিত দিবসে রাজস্ব প্রদান করা তাহাদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত কর্ম ছিল। বিশেষত চন্দ্রদ্বীপের রাজ কর্মচারীগণ সময় সময় কোম্পানি বাহাদুরের ধনাগারের পরিবর্তে চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব নিজ ধনাগারে অর্পণ পূর্বক চরিতার্থ হইতেন। এই সকল কারণে বাকী-পড়া রাজস্বের জন্য চন্দ্রদ্বীপ জমিদারি নিলাম হইতে লাগিল। ১২০০ বঙ্গাব্দে ওই জমিদারির /১৭৷৷০ ক্রান্ত হিস্যা ঢাকার কালেক্টরিতে নিলাম হয়। ঢাকা নিবাসী দলসিংহ তাহা ক্রয় করেন। ১২০২ বঙ্গাব্দে ৵/১২৷৷০ হিস্যা ও ১২০৪ বঙ্গাব্দে ৵/১৭৷৷০ হিস্যা নিলাম হয়। তাহা ঢাকাবাসী জন পোনয়টি (বোধ হয় আরমেনিয়ান) সাহেব ক্রয় করিলেন। ১২০৬ বঙ্গাব্দের অবশিষ্ট৷৷১২৷৷/ হিস্যা নিলাম হইলে রাজার মুদি /০ এক আনা হিস্যা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ৶/১২৷৷/ হিস্যা রাজকে দিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু অভিমানী ভূপতি মুদির সহিত সরিকিতে জমিদারি ভোগ করিতে অসম্মত হইলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজ বংশধরগণ অধুনা একটি বিস্তৃত নিষ্কর "খানেবাড়ি" ও কয়েকখানা খারিজা তাল্লুকের উপস্বত্ব দ্বারা কথঞ্চিৎ উদর পরিতোষ করিয়া থাকেন। "অভাগা চন্দ্রদ্বীপের মানিক মুদী রাজা।"

ভারতী ১২৮৭ পৌষ

শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদার রায়

যে ব্যক্তি পিতৃব্যের প্রাণ বধ করিয়া দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন—যাহার ভুজবলে দক্ষিণাপথে সর্বপ্রথমে মুসলমান পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল সেই খ্যাতনামা দুর্ধর্ষ প্রকৃতি আলাউদ্দিন বাদশাহের সময়ে কায়স্থ জাতীয় নিমচাঁদ রায় ও রাজারাম রায় নামে দুই ভাই দিল্লির রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বংশীয় পদবী "দেব"। কোনও লেখক ইহাদিগকে কর্ণাটি কায়স্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থ।

আলাউদ্দিন বাদশাহের রাজ্যশাসনের চরমাবস্থায় পূর্ববঙ্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। বাহাদুর খাঁ সুবর্ণগ্রাম প্রদেশের সর্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্তা। সম্ভবত তাহার নিয়োগ কালেই দিল্লিশ্বরের অনুমতি ক্রমে নিমচাঁদ ও রাজারাম পূর্ববঙ্গে উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় পারস্য ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাহারা উভয়েই শাসনকর্তার মুন্সিখানার কার্য নির্বাহ করিতেন, 'পত্রনবিস' তাহাদের কার্যের খেতাব ছিল।

আড়াফুলবাড়িয়া গ্রামে নিমাই রায় প্রথমেই বাসস্থান নির্মাণ করেন। যে কয়েকখানা পল্লি গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, আড়াফুলবাড়িয়া তাহার মধ্যে একখানি।

নিমাই ও রাজারামের বংশধরগণ সকলেই যত্নসহকারে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া 'পত্রনবিস' দপ্তরের কার্য নির্বাহ করিতেছিলেন।

নিমাই রায়ের পৌত্র মুকুট রায়ের দুই পুত্র জন্মে যথা চাঁদরায় ও সূর্যরায়। চাঁদরায় শৈশবকালে মৌলবি আমিরবক্‌সের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। আরব্য পারস্য ভাষায় তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি নবাব সরকারে নিযুক্ত হন। ঘটনাক্রমে তাহার বিদ্যার খ্যাতি দিল্লির রাজসভায়ও ঘোষিত হইতে লাগিল। গুণগ্রাহী মোঘল সম্রাট হুমায়ুন চাঁদরায়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনমাস দিল্লিতে অবস্থানের পর হুমায়ুন তাহাকে কর্ণাট প্রদেশের দেওয়ানি আহেলকারের (জজ) পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর হুমায়ুনের চরমাবস্থায় কিম্বা সের সুরের সময়ে চাঁদরায় বিক্রমপুরের প্রথম 'ভৌমিক' উপাধি লাভ করেন।

আধুনিক জমিদারদিগের ন্যায় কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করা ভৌমিকদিগের কার্য ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহে হস্তি, অশ্ব, পদাতি ও রণতরী দ্বারা রাজার সহায়তা করিতে তাহারা বাধ্য ছিলেন। রাজচিহ্নোচিত আসাসোটা, নিশান ডঙ্কা প্রভৃতি তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইত। আধুনিক "রাজা বাবু" বা "মহারাজাধিরাজ"দিগের ন্যায় ভৌমিকগণ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের "বিদ্যাভূষণ" উপাধির ন্যায়, অকর্মণ্য রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন না। তাহাদিগের সহিত প্রাচীন কালের সামন্ত রাজগণের কোন প্রভেদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদরায়ের সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"—চাঁদ রায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যু বৃত্তি কাম।।
তিন লক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়।।
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়।।
শক্তি মন্ত্রে উপাসক দুর্গোৎসব করি।

প্রজা দণ্ড করি লয় পূজা ছল করি।।
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে।।"

চাঁদরায় গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, সুতরাং ভক্তমালপ্রণেতা তাহার কার্যকলাপ সদাশয়তার সহিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। চাঁদরায়ের ইষ্টদেবতা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সম্বন্ধে আমরা শৈশবাবধি নানা প্রকার প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি। প্রবাদ আছে তিনি একদা মৃণ্ময়ী কালীর জানু বিদারণ করিয়া প্রচুর পরিমাণ রুধির বাহির করিয়াছিলেন। একদিবস অমাবস্যা রাত্রে ভ্রম বশত পূর্ণিমা বলিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। আর একদিন অর্থাভাবে শৌণ্ডিকালয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সার্দ্ধদ্বিপ্রহর সূর্যদেবকে ঠিক গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ইত্যাদি। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে রামভদ্রপুর নিবাসী গোস্বামীগণ পূর্ব হইতে এই বংশের কুলগুরু ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি কিছুকালের জন্য তাহার একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ভক্তমাল-প্রণেতা বলেন ইহারা পূর্বে শাক্ত ছিলেন পরে ঘটনাচক্রে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন।

চাঁদরায় বসু পরিবারে বিবাহ করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তাহার প্রথম পুত্র কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৭] পুত্রের নামানুসারে চাঁদ এক নূতন বাটি নির্মাণ করত তাহাকে কেদার-বাটি নাম দিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজারাম রায়ের বংশধরগণ রাজাবাড়িতে বাস করিতেছিলেন। রাজারামের নাম অনুসারেই উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেদার বাটির চতুর্দিকে গড় কাটা হইয়াছিল।[২৮]

চাঁদরায় তারামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্তি স্থাপন জন্য চাঁদরায় এক সুদৃশ্য ও বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। চাঁদরায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন, সুতরাং তাহার বাটিতেও এক বৃহৎ "চিলছত্র" নির্মিত হইয়াছিল।

সোনামণি নাম্নী কন্যা চাঁদ রায়ের শেষ সন্তান। নয় বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহের ৮ মাস পরে সোনামণি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। শিশু কন্যাকে দর্শন করিয়া চাঁদরায় একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

হায়! হায়! এইরূপ শত শত বঙ্গগৃহে শিশু বিধবাদিগকে দর্শন করিয়াও বঙ্গবাসীদিগের চৈতন্য হইতেছে না। এইরূপ চিরশান্তিময়-গৃহ বঙ্গদেশে অতি বিরল যেখানে বালবিধবার শোকাশ্রু পতিত হয় নাই। এইরূপ শিশুকন্যার বৈধব্য দর্শনে কত পিতামাতার হৃদয় অবিরাম দগ্ধ হইতেছে। কৈ তাহারা তো অগ্রসর হইয়া জঘন্য দেশাচারকে কর্মনাশার জলে বিসর্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন না। ধন্য প্রমথভূষণ! প্রমথভূষণের ন্যায় ভূস্বামী কি বঙ্গদেশে নাই? তাহারা নিজ গৃহে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গের গৃহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাহাদের হৃদয় কি এমনই পাষাণ নির্মিত, যে বালবিধবাদিগের উত্তপ্ত শোকাশ্রুতেও তাহা গলিত হইবে না। শিশু হতভাগিনীদিগের প্রতি দয়া করিবার জন্য মানব যদি এদেশে না থাকে তবে এই দেশ রসাতলগামী হউক, বাংলার নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হউক, বাংলা বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শে প্রবিষ্ট হউক।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে সুবর্ণগ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ একবার শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সেই বালবিধবা সোনামণিকে অপহরণপূর্বক লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৯] বঙ্গবাসি! অদ্যাপি কি বঙ্গদেশে এরূপ কাণ্ড হইতেছে না! বালবিধবাগণ যে কত স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক কুল পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ককালিমা দ্বারা আত্মীয়বর্গের মুখ ম্লান করিতেছেন। কত প্রকার পাপ কার্য দ্বারা বঙ্গদেশ কলুষিত করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমরা কলির ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি পরাশরের মতানুসরণ করিবে না? ধীশক্তিসম্পন্ন দূরদর্শী মহাত্মা পরাশর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।

চতুর্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

বালবিধবা কন্যার বৈধব্য-শোকে অধীর হইয়া চাঁদরায় বৈষয়িক কার্য হইতে হস্তোত্তোলন করিলেন। তাহার উপযুক্ত পুত্র কেদার রায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ৮৩ বৎসর বয়সে শিশু কন্যার বৈধব্যশোক হৃদয়ে লইয়া চাঁদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার শ্রাদ্ধ কার্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বীরচূড়ামণি কেদার রায় মোঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। যে কয়েকজন ভৌমিকের বাহুবলে দীর্ঘকাল সম্রাট আকবরের বিজয় বৈজয়ন্তী বাংলায় সংরোপিত হয় নাই, কেদার তাহার মধ্যে একজন। তাহার শাসনকালে সুবিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিচ বাকলা হইতে শ্রীপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

From Bacola I went to Seereepore, which standeth upon the river Ganges, the king is called Choudery. They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber :"[৩০] for here are so many rivers and islands, that they flee from one to another, where by his horsemen cannot privail against them. Great store of cotton cloth is made here.

পর্তুগিজ লেখক ডু'জারিক "দ্বাদশ ভৌমিক রাজ্যের" বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "পাঠান রাজ এই সকল ভৌমিকের সাহায্যে মোঘলদিগকে বাংলা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।"

ডি আবিটি, জারিকের বাক্য পোষণ করিয়া বলেন, এই দ্বাদশজন নরপতির মধ্যে শ্রীপুর পতি—(কেদার রায়), চাঁদখাঁর ঈশ্বর (প্রতাপাদিত্য) ও (খিজিরপুরের ঈশাখাঁ) মছন্দেআলিই প্রধান। পোরচাস লিখিয়াছেন "১৬০২ খ্রিস্টাব্দে সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া মগ, মোঘল, পর্তুগিজ ও হিন্দু এই চারি জাতির মধ্যে একটি তুমুলকাণ্ড হইয়াছিল। এই দ্বীপ তৎকালীন কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। আকবরের সেনাপতিগণ ইহা অধিকার করেন। তৎপর পর্তুগিজগণ মোঘলদিগকে জয় করিয়া সন্দ্বীপের আধিপত্য গ্রহণ করিল। আরাকানরাজ পর্তুগিজদিগের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একবহর রণতরী প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে আরাকানপতি কেদার রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি পর্তুগিজদিগের প্রতিকূলে ১০০ এক শত রণতরী (কোষা) প্রেরণ করেন। পর্তুগিজ লেখক লিখিয়াছেন, যদিও এই যুদ্ধে পর্তুগিজেরাই জয়লাভ করিয়াছিলেন তথাপি তাহারা কেদাররায়ের সহিত সন্ধি করিয়া সন্দ্বীপ উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যে জাতি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া লঙ্কা বিজয় করিতে ধাবিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্বে যে জাতির জলরণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি উজ্জয়িনী নগরনিবাসী কবিকুল তিলক কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ১২।১৩ শত বৎসর পূর্বে চীন পরিব্রাজকগণ যে জাতির অর্ণব পোত সকল মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান দর্শন করিয়াছিলেন, ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে সেই বাঙালি জাতির—সেই গৌরব সূর্য বঙ্গোপসাগরে সন্দ্বীপ সমক্ষে অস্তমিত হইল। আর কি তাহার উদয় হইবে না? আর কি বাঙালি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করিবে না? আর কি বাঙালি জাতির অর্ণব-পোত সমূহের উন্নত পতাকার প্রতিবিম্ব সৌরমণ্ডল উপকূলে,[৩১] সিংহল, যব, বালী দ্বীপে পতিত হইবে না। আর কি বঙ্গীয় নাবিকদিগের সুমধুর ভাটিয়াল-গীত সামুদ্রিক হিল্লোলে নৃত্য করিয়া মহাসমুদ্রগামী ভিন্ন দেশিয় মানবদিগের কর্ণকুহরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে না?

কেদার রায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন। বিক্রমপুরের কুলীন কায়স্থগণ "সাড়ে তিন মেলে" বিভক্ত, যথা মালখাঁ নগরের বসু, পঐলদিয়ার ঘোষ ও শ্রীনগরের গুহ (মস্তুফী)। এই তিনমেল ও কাঠালিয়ার দত্তগণ অর্ধ কুলীন। রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন, প্রাচীনকালে বঙ্গজ কায়স্থগণ তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সমাজ, বাক্‌লার (চন্দ্রদ্বীপের) সমাজ ও যশোর বা প্রতাপাদিত্যের সমাজ।

রল্‌ফ ফিচ বলেন শ্রীপুর, সুবর্ণগ্রাম হইতে ছয় লিগ দূরবর্তী। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সুবর্ণগ্রাম হইতে শ্রীপুরের দূরত্ব গণনায় ফিচের ভ্রম হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীপুর গঙ্গা ও মেঘনাদ নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ব্রোকের মানচিত্রে শ্রীপুর Zerepoer প্রধান নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। ব্রোক Zerepoer এর নিকট Ceerpoer Fringe নামে একটি নগর অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রফেসার ব্লকমান ভ্রমক্রমে ইহাকেই শ্রীপুর নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত Ceerpoer Fringe আধুনিক রিকাবী বাজারের নিকটবর্তী ফেরিঙ্গি বাজার। বৃদ্ধ মার্সমানও এই ফেরিঙ্গি বাজারের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে শ্রীপুরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। এস্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র য়ুনানী মণ্ডলে ও চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত। পরিব্রাজক ফিচ আমাদের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বৃহৎ তোপ প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীপুরে উপযুক্ত কর্মকার ছিল।

কেদার রায় কার্তিকপুরের নিকটবর্তী স্থানে একটি বাটি নির্মাণ করেন। অদ্যাপি সেই স্থানটি কেদারবাটি নামে পরিচিত রহিয়াছে। তিনি কেদারপুর নামে আর একটি নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য দ্বারা কেদারপুরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ব্রোকের মানচিত্রে Chedderpoer বৃহৎ নগরী রূপে চিত্রিত আছে। অদ্যাপি বিক্রমপুরের মধ্যে একটি স্থান কেদারপুর নামে পরিচিত, কিন্তু তাহার প্রাচীন উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্তিসমূহ গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছে। সেই করালকালরূপিণী কীর্তিনাশার তীরভূমিতে প্রাচীন কীর্তির চিহ্নসমূহ দর্শনের আশা দুরাশা। বঙ্গ প্রান্তবর্তী প্রদেশ সমূহে (উড়িষ্যা, চুটিয়ানাগপুর, আসাম ও ত্রিপুরায়) প্রাচীন উন্নতির কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ রাশি রাশি উচ্চ-চূড় মন্দির ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গে তাহার কোন চিহ্ন নাই, এক মাত্র গঙ্গাই ইহার কারণ।

কীর্তিনাশার উত্তর তীরে একটি মঠ ও দীর্ঘিকা অদ্যাপি কেদার রায়ের কীর্তি সমূহের চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। এই মঠ সাধারণত "রাজবাড়ির মঠ" ও দীঘি "কেশার মার দিঘি" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

মোঘল সম্রাটের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া কেদার রায় কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়েন। তথাপি তাহার অবশিষ্ট যে সম্পত্তি ছিল তাহা তাহার বৈদ্য বংশীয় দাস রঘুনন্দন দাস, তাহার মৃত্যুর পর অপহরণ করেন। এই রঘুনন্দন দাস নওপাড়ার চৌধুরিদিগের আদি পুরুষ। ইহারা একসময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজপতি ছিলেন। ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে দুই সময়ে পূর্ববঙ্গে দুই জন বৈদ্য অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই কায়স্থ জাতির পদসেবা করিয়া আপনাদের উন্নতির সূত্রপাত করেন। একজন কেদার রায়ের ভৃত্য রঘুনন্দন দাস, অন্য ব্যক্তি মালখানগরের বসুদিগের ভৃত্য খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন।

শ্রীহট্ট নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে চাঁদ কেদারের একখানা ঘরানা বংশাবলী ও পরিবার মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদাদি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধে তাহার লিখিত বংশাবলী ও প্রবাদ সমূহ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তাহার লিখিত বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম কিন্তু

ইহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে, যদি কোন পাঠক এই বংশের এক খণ্ড সম্পূর্ণ বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আপনাকে কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তিনি আরও বলেন যে ইহারা "ঘৃতকৌষিক" গোত্রীয় "দে" বংশজ।
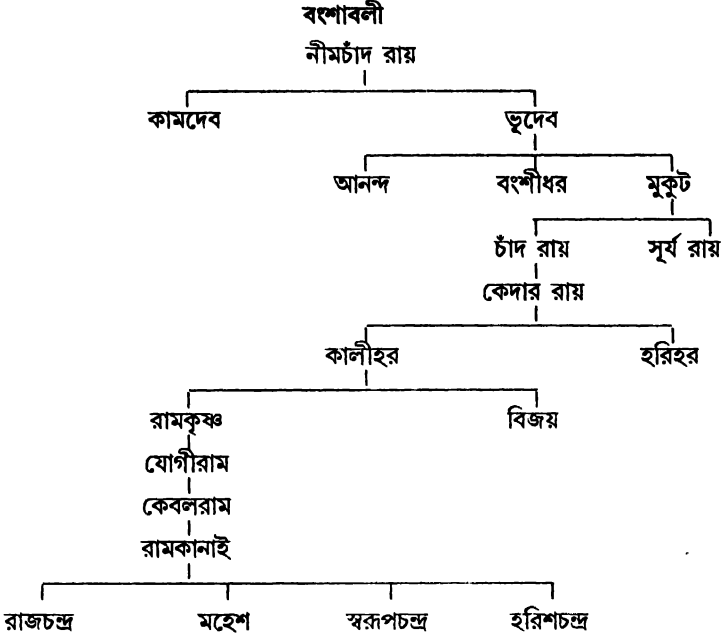
ভারতী ১২৯১ চৈত্র

---

১. রাজস্থানেও ভৌমিক আখ্যা পরিলক্ষিত হয়।
Tod's Rajasthan. (Mokerjees Ed) Vol I page-123.

২. আসামেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় দ্বাদশ ভৌমিক ছিল। কিন্তু তাহারা জমিদার নহেন। (বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত আসাম বুরঞ্জী, ৪৮ পৃষ্ঠা)।

৩. কর্নেল উইলফোর্ড বলেন—ভাটি প্রদেশের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের নিয়ত জলযুদ্ধ চলিত এবং তাহারা উভয়ই "বারোভূঁইয়ার অধিপতি" উপাধি ধারণ করিতেন।
Aseaatic Resrches Vol XIV page-451.

৪. ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ; ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

৫. ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ও মাতা যবন কন্যা।

৬. চাটমহল স্টেশনের অধীন।

৭. ডাক্তার ওয়াইজ এতন্মধ্যে পাঁচজন ভৌমিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। See Journal As. So. Bengal Vol XLIII. part I page 197—214. উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় ডাক্তার সাহেব বলেন The following notes regarding five of these governors, imperfect though they are, will it is to be hoped excite others, who have the opportunity, to add further particulars and complete what is still wanting of the history of Bengal previous to the final conquest by the Muhammadans.

আমরা ভৌমিকদিগের বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের লিখাই যে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব।

৮. রাজমালা, ব্রহ্মার ইতিহাস ও আইন আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে "বাকলা" বা "বাগোলা'ই লিখিত। ছায়রল মতাক্ষরিণ প্রণেতা ইহাকে "ভুগলা" লিখিয়াছেন।

৯. See Kasava Sen's Inscriptions of Bakerganj.
Journal As, So, Bengal Vol VII page 56.

১০. দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে বঙ্গের রাজধানী সমতটের পাদমূলে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ খেলা করিত। ত্রিপুরা ও বঙ্গের মধ্যস্থলে সাগরশাখা বিস্তৃত ছিল। "ঝাপটার" বিস্তৃত মোহনা অদ্যাবধি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে, অধিকন্তু রামপাল ও দাউদকাঁদীর মধ্যবর্তী চরস্থিত গ্রামগুলির বয়ঃক্রম ৩।৪ শতাব্দীর অধিক হইবে না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বেও সমতটের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বঙ্গের কলেবর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ছিল। শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান বাক্‌লা (প্রাচীন বাগুলী) প্রদেশে চট্টভট্টজাতি বাস করিত। গৌড়েশ্বর কেশবসেনদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ওই স্থান শ্রীঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করা হইয়াছিল।

১১. ৪।৫ বৎসর অতীত হইল, একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে (বোধ হয় Bengalee) চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে (যদি স্মৃতিভ্রম না হয়) লিখিত ছিল—প্রতাপাদিত্যের দুহিতার (রামচন্দ্রের পত্নী) নামানুসারে এই দ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

১২. Maior H. G. Raverty's Sapakat I Nasiri page 558.—and Calliots Inpia Vol II page 309.

১৩. শ্রদ্ধাস্পদ পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। (I. A. S. XXXIV. 1280) কতিপয় নবীন লেখক আবার মিত্র মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া, রাজবল্লভের মতানুসরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্বে সেনরাজগণ জনসমাজে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবল্লভই তাহাদিগকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া, আপনাকে সেই বংশজ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবীন লেখকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ উপযুক্ত স্থান নহে। সেনরাজগণের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে।

১৪. শাণ্ডিল্য, অগ্নিবাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ ও আলম্বন গোত্রীয় দত্তগণ সর্বদা সৎসম্বন্ধ করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন। "সপ্তদত্তা মহাপাত্রঃ সম্বন্ধরূপতঃ সুধীঃ।"

১৫. ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব ভ্রমক্রমে পরমানন্দকে জয়দেবের পিতৃদৌহিত্র লিখিয়াছেন।

১৬. "—an astrologer warned Jugadananda Rai the son of Paramananda Rai, that on a certain day and hour he would be drowned in the river. The Raja shut himself up in a tower of his palace at Kachua. The river gradually rose as the hour approached, and just at the time fixed, a mighty wave rolled up on which the goddess Ganga, Like another Lurline, rode proudly. She held out her hands to the Raja who clasped them. In a moment he was swept away and disappeared." (J. A. S. B. XLIII. I. 207.)

১৭. "The Sarkar, or district, of Bagla, extends along the sea coast. The fort of the Sarkar is surrounded by a forest. From new moon to full moon, the waves of the sea rise higher and higher ; from the fifteenth to the last day of the moon, they gradually decrease. In the 29th year of the present era (A. D. 1583) one afternoon, an immense wave set the whole district under water. The chief of the place was at a feast ; he managed to get hold of a boat, whilst his son Pramanand (কন্দর্পনারায়ণ হইবে). with a few others, climbed up a Hindu temple. Some merchants got on a Talar. For nearly five hours the waves remain agitated ; the lightening and the wind were terrible ; only the Hindu temple and the Talar (নহবতখানা) escaped. About two hundred thousand souls perished in this hurricane (Blochmaun's translation.)

ভিনিস নগরের বণিক সিজার ফ্রেডেরিক এই সময় পিগু হইতে চট্টগ্রামে আসিতেছিলেন। তিনি এই ঝড়ে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন।

১৮. Hackluyts Voyages, Vol II. page 257, (Hackluyts Voyage's নামক বিস্তৃত উপাদেয় গ্রন্থের কয়েক খণ্ড "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে" আছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে কোন মহাত্মা তন্মধ্য হইতে ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত পত্রগুলি অপহরণ করিয়াছেন।)

১৯. গ্রান্ট সাহেব সরকার বাকলার রাজস্ব ১৭৮২৬৬ টাকা লিখিয়াছেন। (Mr. J. Grant's Analysis of the Finances of Bengal.)

২০. খ্রিস্টধর্ম-যাজকদিগের লিখিত পত্র ও প্রবন্ধাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যুবরাজ উদয়াদিত্য রাজা রামচন্দ্রের চারি বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বোধ হয় রামচন্দ্রের মহিষী, উদয়াদিত্যের ৫।৬ বৎসরের কনিষ্ঠা ছিলেন।

২১. "After compliment the king asked me where I bound for and I replied that I was going to the king of Ciandcan, who is to be the Father-in-law of your Highness." প্রতাপাদিত্যের রাজধানী "চাঁদ খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ নামকরণের ইতিহাস যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

২২. ইহাই ঢাকা নগরীর জন্মকাল। ফেয়ার সাহেবের লিখা দ্বারা (History of Pegu.) ১৪১২ খ্রিস্টাব্দেরও পূর্বে ঢাকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে! কিন্তু ফেয়ার সাহেবের লিখিত—বাংলার ইতিহাস ও ভূগোল সংসৃষ্ট অংশগুলি যে প্রায়ই ভ্রমাত্মক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৩. যশোহর ইসবপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদার এইরূপ সামান্য অপরাধে সমাজচ্যুত হন। সুবিখ্যাত ঠাকুরদিগের পিতৃপুরুষ জগন্নাথ ঠাকুর সেই বংশীয় ভূম্যধিকারী সুধারামের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি তদ্বংশধরগণ অন্যায়রূপে সমাজ কর্তৃক পীড়িত হইতেছেন।

২৪. উলাইলগ্রাম জেলা ঢাকার অন্তর্গত বংশ নদীর পশ্চিম তটে ছিল। ঐ গ্রামে মিত্র মজুমদার বংশীয়দিগের অনেক ইস্টকালয় ছিল। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে সুবিখ্যাত রেনল সাহেব যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতেও ইহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ১২২৬-২৭ বঙ্গাব্দে ধলেশ্বরী নদীর গাজিখালি নামক শাখানদী সাভার নামক স্থানের অভিমুখে নির্গত হইয়া বংশ নদীর সহিত মিলিয়া যায়। তাহাতে ঐ নদীর বেগ বর্ধিত হইয়া উলাইল গ্রামটিকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ নদীর তীরবর্তী ফুলবেড়িয়া নামক যে স্থানে ওয়াইজ সাহেবের নীল কুঠি আছে, তাহারই অপর পারে এক চর আছে, তাহাকেই লোকে "চর উলাইল" বলে। এস্থানেই সেই সমৃদ্ধ-সম্পন্ন উলাইল গ্রাম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। যাহারা নৌকাযোগে গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারা ফুলবেড়িয়া ও চর উলাইল দর্শন করিয়াছেন।

২৫. আদিলপুর প্রভৃতি তিনটি পরগণা রমাবল্লভ রায় ও বুজরগ উমেদপুর মহম্মদ সাদক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশগুলি অন্যান্য জমিদারদিগের দখলকারিতে নিযুক্ত ছিল। (See E. I. Co's Fifth Report, p. 367. (1812 Ed.)) বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র অন্যায় রূপে লিখিয়াছেন "রাজা জয়নারায়ণের সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগণে কোটালিপাড়, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, বুজরগ উমেদপুর এবং আরো কয়েক স্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথককৃত হয়।"

২৬. ইনি পাইকপাড়া রাজবংশের তিলক স্বরূপ। পাইকপাড়ার রাজগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কান্দি নিবাসী হরকৃষ্ণ সিংহ এই রাজবংশের স্থাপন কর্তা। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে এই বংশধরগণ বাংলার রাজস্ব বিভাগের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন ;

Mr. Hastings afterwards abolished the provincial Councils and appointed Gangagovinda Sinha as Divan of the Committee of the revenue. He was also appointed Nayeb kanungo ; and his son, Prankrishna Sinha, Nayeb Divan of the Committee. Thus we see the members of the Kandi family holding the highest offices in the State, and exercising immense influence by virtue of their position. All Zaminders, talukdars, and in fact all those who held lands in any part of the country used to pay their respects to Gangagovinda. The Kandy Family. (T. A. B.) Calcutta Review. Vol. LVIII. page 98.

২৭. ডাক্তার ওয়াইজ কেদাররায়কে চাঁদরায়ের ভ্রাতা লিখিয়াছেন। যাহারা কেবল ওয়াইজ সাহেবের লেখা অবলম্বন করিয়া ভৌমিকদিগের ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তাহারাও ওয়াইজের ন্যায় ভ্রমমার্গে

পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। ঘরানা বংশাবলীতে কেদারকে চাঁদের পুত্র লেখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাসেও বারংবার কেদারকে চাঁদের পুত্র বলা হইয়াছে।

২৮. বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক বলেন যে, গড়খাইর মধ্যস্থিত কেদারবাটিতে এক্ষণ ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কোন একটি পল্লিতে কত পরিমাণ ভূমির রাজস্ব ৪৫০ টাকা হইতে পারে তাহা মফঃস্বলবাসী পাঠকগণ অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন।

২৯. J. A. S. Bengal Vol. XLIII part I, page-202.

৩০. জালালদ্দিন আকবর।

৩১. "সৌরমণ্ডল" অধুনা করমণ্ডল নামে পরিচিত। সৌরমণ্ডল কিরূপে করমণ্ডল হইল তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে "স" এর উচ্চাহরণ "ছ"। তদনুসারে ইউরোপিয়গণ ইহাকে ছৌরমণ্ডল শ্রবণ করিয়া "C" অক্ষর নামের অগ্রে সন্নিবেশিত করেন। তৎপরেই আমাদের ও অজ্ঞ বিলাতী মানবদিগের কৃপায় "C" "ক" এ পরিণত হইয়াছে।

বাংলার বিদ্রোহিগণ

পাঠান ও মোঘল রাজত্ব ঃ

... বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাংলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেহবা নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বশ্যতা জানাইলে—তাহারা স্বাধীন থাকিতেন। তাহারা নিজের নিজের রাজ্যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হত্যাকাণ্ড ও কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। অবশ্য এক এক সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় দেশে বইয়া যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং যাহারা ঝড়ের মুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্তু মোঘল সম্রাট সমস্ত দেশটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন, তোডরমল্লকে পাঠাইয়া সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া রাজস্বের হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও অনেক হিন্দুর জায়গির বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জায়গির দখল করিয়া মোঘলদিগকে দিলেন, তাহাদিগকে তাহা নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে দিলেন না—তাহাদিগকে রীতিমত রাজস্ব দিতে হইত এবং অন্যান্য কঠোর নিয়মের বশবর্তী হইয়া সেই জায়গির ভোগ করিতে হইত। কোথায় জঙ্গলবাড়িতে ক্ষুদ্র ভৌমিক ঈশা খাঁ, শ্রীপুরে কেদার রায়, যশোহরে প্রতাপাদিত্য—কে কি করিতেছে, আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষগুলি ভাঙিয়া চলিত, কিন্তু মোঘল সম্রাটের চক্ষুতে যেরূপ পাহাড়-পর্বত পড়িত, দুর্বাঘাস ও তৃণগুল্মও সেইরূপ তাহার শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইত না। পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্ষুদ্র বাংলার মসনদের উপর, দিল্লিশ্বরগণের অনেকেই দুর্বল ছিলেন, সুতরাং বাংলার বাদশাহের ক্ষমতা তাহার প্রায়ই লোপ করিতেন না। কিন্তু এবার বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতার সমর আরম্ভ হইল। বৃহত্তর বাংলার সঙ্গে দিল্লির লড়াই নূতন কথা নহে। চিরকাল বাংলাদেশ দিল্লির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। সেই ইতিহাস-পূর্বযুগে জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, ভগদত্ত, বাণ, মুর, নরক প্রভৃতির সময় হইতে বাংলাদেশ দিল্লির সম্রাটের সার্বভৌমত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাংলা জয়ী হইল—ইন্দ্রপ্রস্থ আড়ালে পড়িল। যুগ যুগ ধরিয়া মগধ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিল। তারপর গুপ্তগণ পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধি নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন. গুপ্তদের শেষকালে রাজলক্ষ্মী মগধ ছাড়িয়া খাস গৌড়ে আসিলেন। পালেরা খাস বাংলার রাজা। তখন ইন্দ্রপ্রস্থ নিবিয়া গিয়াছে, তথাপি পশ্চিম-ভারতের সহিত বাংলার বিরোধ থামে নাই, বঙ্গরাজকে প্রতারণা করিয়া কাশ্মীরাধিপতি নিধন করিলেন, বঙ্গসৈন্য পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙিবারো জন্য যে অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়াছিল তাহা কল্‌হণ কবি নানা উপমাখচিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলার রাজা শশাঙ্ক কনোজাধিপ রাজ্যবর্ধনকে প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—এই দুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন নহে। বাংলাদেশ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে যাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। বৃহত্তর বাংলায় জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়া সমুদ্রের তীরে রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙালির রাজকীয় রক্তে দিল্লির বিদ্বেষ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে

যে স্বাধীনতা তাহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোঘলদের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আওতায় তাহা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করিব—ঈশা খাঁ মসনদ আলির।

১৫৮২ খ্রিঃ, ১৫৮৫ খ্রিঃ জঙ্গলবাড়ি ঃ

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগণায় ভগীরথ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি দিল্লিশ্বরের সামন্ত রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভগীরথ বঙ্গদেশে তীর্থদর্শনে আসিয়া সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি অতি পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি একটি ছোট সোনার হাতি নির্মাণ করিয়া তাহা ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। এজন্য তিনি "কালিদাস গজদানী" নামে খ্যাত হন। কাহারও কাহারও মতে সুলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কন্যা মমিনা খাতুন,—কাহারও মতে হুসেন সাহের এক কন্যা-কালিদাসের গঙ্গাস্নাত সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন মুখচোখ দেখিয়া যাচিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু কালিদাস সুলতানের কন্যার কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সদুপদেশ ছিল—এবং তাহার শেষ কথা ছিল—কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কৌশলক্রমে তাহাকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্যোপায় হইয়া কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। ইহার মুসলমানী নাম হইল—সোলেমান খাঁ। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই আকবরীর মতে সোলেমানের দুই পুত্র ইসমাইল ও ঈশা খাঁ,—সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম খাঁ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর—দাসবৎ পারস্যদেশে প্রেরিত হন। তাহারা তাহাদের এক খুল্লতাত কর্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটি অঞ্চলের অধিপতি হন। ঈশা খাঁ তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাভুক্ত হইয়া শ্রীহট্টের (তরপের) রাজা ফতে খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজ্যধরের সঙ্গে অভিযান করেন। ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়তা করিয়া ইনি মোঘল সেনাপতি সাহবাজ খাঁকে পরাস্ত করেন। তখন ত্রিপুরায় সরাইল পরগণার মালিক হইয়া ইনি অমর মাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ করেন। যখন অমর মাণিক্য চৌদ্দগ্রামে বিখ্যাত অমরসাগর দিঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৮৫২ খ্রীঃ) ঈশা খাঁ তাহাকে সরাইল হইতে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার রাজ্যধরের সরাইল পরগণায় শিকারযোগ্য পশুপক্ষিবহুল অরণ্য দেখিয়া ঐ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে শাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হন—তখন সরাইল পরগণায় থাকিতে না পারিয়া শাহবাজের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহাদি ও যুদ্ধোদ্যোগ করিবার জন্য ঈশা খাঁ কোন নিভৃত অরণ্য-সংরক্ষিত স্থান খুঁজিতে থাকেন। অমরমাণিক্য তাহার রাজ্ঞীর অনুরোধে ঈশা খাঁকে 'মসনদ আলি' উপাধি এবং ৫০,০০০ সৈন্য দিয়াছিলেন। উপাধিটি দিল্লিশ্বর-প্রদত্ত নহে—আবুলফজল ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ঈশা খাঁ সহসা একরাত্রে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী জঙ্গলবাড়িতে হানা দেন (১৫৮৫ খ্রিঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষ্মণ হাজরা ও রাম হাজরা ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ি ঈশা খাঁর অধিকৃত হয়। ঈশা খাঁ জঙ্গলবাড়ি দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগণা (সেরপুর, জোয়ানসাহী,

আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উ-জিরাল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হাজরাদি, দরজিরাবু, গোয়ের ও হুসেনপুর প্রভৃতি) অধিকার করেন ও নানাস্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দিল্লিশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের দুর্গ ইহার অজেয় নিরাপদ নিবাস ছিল। আবুলফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৫৮৩ খ্রিঃ অব্দে সাহবাজ খাঁ ঈশা খাঁর বক্তিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া কতকগুলি কামান প্রস্তুত করেন, তম্মধ্যে ৩টি পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে "সরকার শ্রীযুত ঈশা খাঁ, মসনদালি ১০০২" উৎকীর্ণ আছে। ১০০২ বাং সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে মানসিংহ আসিয়া ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। যদিও ঈশা খাঁ অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন, তথাপি সম্রাট-বাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রথমত বুকাই নগরে পরাস্ত হইয়া সেরপুর গড়জরিপা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ—তথা হইতে মুড়াপাড়া এইরূপে এক দুর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হইয়া দুর্গান্তরে উপস্থিত হন। এখানে পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বন্দি করেন। দিল্লিশ্বর তাহার বিক্রম ও সাহসে, তদধিক আত্মসমর্পণে প্রীত হইয়া সমুচিত আতিথ্য করেন, এবং সম্মানিত করিয়া তাহাকে রাজধানী জঙ্গলবাড়িতে প্রেরণ করেন। এই আখ্যায়িকা বহু প্রাচীন পল্লীগীতিকায় স্থান পাইয়াছে। ঈশা খাঁর বংশধরেরা দেওয়ান ভগীরথ—তৎপরে দেওয়ান কালিদাস গজদানীর উপাধি-অনুসারে জঙ্গলবাড়ির 'দেওয়ান পরিবার' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীপুরের ভুঁইয়া কেদার রায়ের ভগিনী সোনামণি (অপর নাম সুভদ্রা) স্বেচ্ছায় ঈশা খাঁকে আত্মদান করিয়া শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ঈশা খাঁর অঙ্কশায়িনী হন। বঙ্গবিশ্রুত এই ঘটনাসম্বন্ধে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ঈশা খাঁ, তাহার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রণয়কাহিনী, সোনামণির দুই পুত্র আরাম-বিরামের কথা—ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঈশা খাঁর বংশধর বলিয়া যাহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাহাদের সংখ্যা অগণ্য। কথিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানেরা সোনামণির সন্তানের কুলোদ্ভব। এই দেওয়ান পরিবারেরা সোলেমানকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাহাদের রক্তসম্বন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য ঃ

দ্বিতীয় বিদ্রোহী যশোরের প্রতাপাদিত্য। ইহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত ও রাজস্বের হিসাবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ তোডরমল্ল ইহাদিগকে অনুসন্ধান করেন। ইহারা মোঘলদিগের বশ্যতা স্বীকার করায় তোডরমল্ল ইহাদিগকে বিস্তৃত ভূমির অধিকার প্রদান করিয়া বিক্রমাদিত্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণের পর রাজজ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'ইনি পিতৃহন্তা হইবেন।' বিক্রমাদিত্য এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তাহার 'গঙ্গাজল' নামক এক সুবৃহৎ খড়্গ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিত্যের রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য দুই বৎসর কাল আগ্রায় অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোঘল সম্রাটের সভা, রাজনীতি, সৈন্যব্যূহ—এ সকল দেখিয়া অভিজ্ঞতা

লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুমারী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্বে তাহার রাজ্যের দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্ত রায়কে ও তাহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া যান। প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা-লিপ্সা ও দুর্দান্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া বসন্ত রায় এই অসম রাজ্যবিভাগে বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু খাঁর পক্ষ হইয়া মোঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ বঙ্গাধিপ হইয়া আসিলে তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ক্রমাগত সৈন্যবৃদ্ধি ও দুর্গাদি রচনা করিয়া উত্তরকালে মোঘলশক্তি নির্মূল করিয়া সমস্ত বাংলাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী কোথায় ছিল—ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাগরদ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যাণ্ডিকানে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ধুমঘাটেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। পর্তুগিজগণ যাহাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদ্বীপের সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম—চণ্ডিকানগর—হইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু দুর্গের মধ্যে ১৪টি প্রধান দুর্গ ছিল—(১) যশোর দুর্গ, (২) ধুমঘাট দুর্গ, (৩) রায়গড় দুর্গ, (৪) কমলপুর দুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবশাহ দুর্গ, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা দুর্গ, (৯) মাতলা দুর্গ, (১০) হায়দারগড়, (১১) আড়াইকাকী দুর্গ, (১২) মণি দুর্গ, (১৩) রায়মঙ্গল দুর্গ, (১৪) চকশ্রী বা চাকশ্রী দুর্গ। কথিত আছে বর্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ ছিল—যথা, মাতলা, রায়গড়, টালা, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, মুলাজোড়। প্রতাপাদিত্য জাহাজ নির্মাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাহার নৌবহরের জন্য সুন্দরী কাঠের অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। তাহার নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। যশোরে প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে 'পিয়ারা', 'মহলগিরি', 'ঘুরাব', 'পাল'. 'মাচোয়া', 'পশত', 'ডিঙ্গি', 'গছাড়ি', 'বালাম', 'পলওয়ার', 'কোচা' প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর তরী ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরের কারিগরেরা জাহাজ-নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সায়েস্তা খাঁ অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ১০,০০০-এর উপরে ছিল এবং অন্যান্য পোতের সংখ্যাও দ্বিসহস্র কিংবা তদধিক ছিল। জাহাজঘাটা এখনও নামে মাত্র বর্তমান। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—"প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।' এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙালি কর্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পর্তুগিজ ফ্রেডারিক ডুডলীই এই কার্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্য (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, (৪) গোলন্দাজ, (৫) নৌসৈন্য, (৬) গুপ্তসৈন্য, (৭) রক্ষিসৈন্য, (৮) হস্তিসৈন্য—এই আট বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায়, মদন মল্ল (যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী"—ভারতচন্দ্র) অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন ও নুরউল্লা। তীরন্দাজের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টাস পেড্রো। বিপক্ষদের গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ লইবারো জন্য যে গুপ্তসৈন্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ ছিল 'সুখা' নামক এক অসমসাহসী বীর ("গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রম ঃ'—ঘটককারিকা)। কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু। "ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতী, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী"—প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসংখ্যার এই নির্দেশ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন। পূর্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দত্ত। প্রতাপাদিত্যের বহু কামান ও গোলার

নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ এবং সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্ট ও পরাজিত পাঠান সৈন্য, পর্তুগিজ ও পার্বত্য ত্রিপুরার কুকী সৈন্য বিস্তর ছিল; বাঙালি রায়বেঁশে ও ঢালী সৈন্যগণ অতীব দুর্ধর্ষ ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য কিছুকাল পোষ মানিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম খাঁর শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। মূল কথা তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী এবং মহাবলশালী সূর্যকান্ত গুহ (সূর্যকান্তো মহাশুরো গুহকুলস্য ভূষণম্) এই দুইজনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে দেশে হিন্দুরাজত্ব ফিরাইয়া আনিতে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার সৈন্যবল এবং প্রতাপ ছিল—এবং তিনি নিজে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা করা অসম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবত কামাল) নামক এক বিশ্বস্ত অতি দুর্দান্ত রণদক্ষ খোজা তাহার এই আশার এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং তৎসঙ্গে বাঙালি চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া গেলেন তাহা বুঝা যাইবে।

বসন্ত রায়ের হত্যা ঃ

তিনি তান্ত্রিকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন্য মদ্যপায়ী ছিলেন। তাহার ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাহার খুব দোষ দেওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমত তাহার প্রতি তীর বর্ষণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্যে উপবিষ্ট বসন্ত রায় ভৃত্যকে "গঙ্গাজল" আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত রায় তাহার প্রসিদ্ধ 'গঙ্গাজল' নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই পিতা হইতে অধিক স্নেহে যিনি তাহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে নির্মমভাবে বধ করিলেন (১৫৯৫ খ্রিঃ)। ক্রোধের সময়ে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। তাহার সদ্যবিবাহিত জামাতা বাকলার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্দ্রকে তিনি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে 'রামাই ঢঙ্গী' নামক এক ভাঁড় আসিয়াছিল। বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাঁড়ামী দেখাইয়া খুব 'বাহবা' পাইয়াছিল। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীমহলে ভাঁড়ামী করিতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে তাহার রমণীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী শরৎকুমারী একথা প্রতাপাদিত্যকে জানান। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই ঢঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি নির্দোষ জানিয়া লজ্জিত হইতেন, কিন্তু ভীত হইয়া বাড়ির সকলের পরামর্শে সেই রাত্রেই রামচন্দ্র ৬৪ দাঁড়যুক্ত এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত নৌকাযোগে পলায়ন করেন। রাজকুমারী পরমা সাধ্বী বিমলা অবশ্য শেষে বাকলার অন্তঃপুরে তাহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর-জামাই যেন 'ভুজঙ্গ-নকুল' হইয়া চিরকাল শত্রু হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও তাহাব পুত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক, সুতরাং ক্ষমার্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যেভাবে সন্দ্বীপের অধিপতি কার্ভালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাহার চিরশত্রু কার্ভালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হইবে এবং মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার আনুকূল্য পাইবেন, এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। আরাকানাধিপের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরঙ্গভাবে

তাহার বাহ্য সরল ব্যবহারে ও মৈত্রীর প্রস্তাবে পর্তুগিজ বীরকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিয়া তাহাকে হত্যা করেন। ডুজারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। আত্মীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ আতিথ্য বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক একবার কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্ধনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান ও ক্ষমতাশালী "হ'রে শুঁড়ি" নামক আর এক বণিককে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন, তাহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে এত ভীত হইয়াছিল যে তাহার রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। যমুনা হইতে ঢলুন্দিয়া মোহনার কাছে এখনও লোকে "হ'রে শুঁড়ির দহ" দেখাইয়া থাকে। এই 'হ'রে শুঁড়ি' গোবরডাঙার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও 'হ'রে শুঁড়ির রাস্তা"র অনেকটা বিদ্যমান আছে।

কথিত আছে, একদা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর স্তন কাটিয়া ফেলেন। এদিকে তাহার সদ্‌গুণরাশিরও শেষ ছিল না। তাহার উদারতার খ্যাতি সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা যায়। তিনি আশার অতীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। এমন কি, কথিত আছে, ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পতরু হইয়াছিলেন— তখন একজন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ইহা শুধু পরীক্ষার জন্য। কল্পতরু হওয়ার প্রথা রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কালিদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ হর্ষবর্ধনের এই কল্পতরু হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কান্যকুব্জরাজ সর্বস্ব দান করিয়া তাহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে লজ্জা নিবারণার্থে একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। দিলীপ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কালিদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "অদ্য ভক্ষ্য মহারাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজা জলপান করে।" কিন্তু হিন্দুরাজত্বকালে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহস্থল। বাল্মীকির রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ ইহার অনুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন পর্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র অনুষ্ঠিত হইত। রাজা কল্পতরু হওয়ার পর মহারাণী সর্বপ্রথম তাহার রাজত্ব ও সর্বস্ব চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কল্পতরু ব্রত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরৎকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাজার ধর্মকার্যে বাধা দিলেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসীর বৃত্তি করিবেন—এই পর্যন্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাজার দানবল পরীক্ষা করিবার জন্য এইভাবে রাণীমাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে বিধিমত প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বিনিময়ে রাজ্ঞীর ওজনমত স্বর্ণ পাইলেন। প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজ্যের এরূপ সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাজ্যে বাস করিত। তাহার অপূর্ব দানশক্তি ও উদারতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে,—রামরাম বসু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দুর্দান্ত পর্তুগিজ জলদস্যুগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার রাজ্যের লোকেরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। তাহার পিতা বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ— কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ববিষয়ে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল— প্রাচীন কীর্তির অনেক ভগ্নাবশেষ তথায় দুর্লভ নহে। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী

মূর্তি পাইয়া তাহা অতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্দ্র তাহাকে "বরপুত্র ভবানীর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন বসন্ত রায়ের আত্মীয় কূটবুদ্ধি রূপরাম বসু কাঁচুরায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে তাহার হত্যার কথা জানাইল, সেই স্মরণীয় দিনে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী অধীনত্বের চিহ্ন—এবং তরবারি যুদ্ধের। কেশবভট্ট নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"এই বেড়ী যেন মানসিংহ তাহার প্রভু জাহাঙ্গীরের পায়ে পরাইয়া দেন' —"বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়ে" (ভারতচন্দ্র)। সাদরে তিনি তরবারিটি গ্রহণ করিয়া বেড়ি ফিরাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা মানসিংহ মোঘলের আত্মীয়তা করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না।

মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে বঙ্গের যে সকল জমিদার ও রাজা প্রতাপাদিত্যের ("ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ") দরবারে গরুড় পক্ষীর ন্যায় থাকিতেন, তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতাপের নিজ সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাঙালিসমাজ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মতই ছিল। কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষান্বিত ছিলেন; কেহবা মোঘলের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, কেহবা প্রতাপাদিত্য-কৃত পিতৃব্য ও তৎপুত্রের হত্যা, কার্ভালোর হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি দুর্নীতি ও পাপ খুব বাড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দুরাজা তাহা বুঝিলেন না, তাহার দানশীলতা ও উদারতার কথা কেহ বলিলেন না, তাহাকে খর্ব করিতে পারিলেই তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন। সুতরাং রূপরাম ও কাঁচু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লস্কর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ করিলেন—সেদিন বাংলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অনুভব করিলেন; যদিও কিছু ঐক্যের গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল তাহা মানসিংহের ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের ভেদনীতিতে সম্যক্ বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

১) কৃষ্ণনগরের রাজাদের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেন। ঝড়বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপে যখন মানসিংহের সৈন্যদল মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল—তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাহার গৃহদেবতা গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর মহাসমারোহে বিবাহ দিবারো জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোঘল সেনাদের মহা-বিপদ্ ঘুচিল। ভবানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন যশোরে প্রতাপাদিত্যের অনুগৃহীত হইয়াছিলেন।

২) চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের বংশধর মহাতাব রায় বা মুকুট রায় যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তের প্রধান কিল্লাদার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

৩) নলডাঙার রাজবংশের পূর্বপুরুষ রণবীর খাঁ এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ উভয়ে মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

৪) কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপের বিশেষ অনুগৃহীতদের অন্যতম। কেহ

কেহ বলেন, রূপরাম বসুর কৌশলে গুপ্তভাবে কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরিত হয় এবং মানসিংহ যশোহরের সমীপবর্তী হইলে লক্ষ্মীকান্ত গোপনে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নহে যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রতাপ কিভাবে আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়াছেন—তদ্দ্বারা মোঘল সৈন্যের জীবনরক্ষা হয়।

প্রতাপ সম্বন্ধে ঘটককারিকা ঃ

ভবানন্দ মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার[১] এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষ জয়ানন্দ মজুমদার—এই তিন মজুমদার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন—এরূপ প্রবাদ আছে। ইহারা সকলেই মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগেও পরমহংসদেব, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কীর্তিমান্ পুরুষদের অভাব নাই। কিন্তু বাংলার সে ঐক্য আর নাই, যাহা মহীপালকে ভীম কৈবর্তের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়াছিল, যাহার বলে বল্লাল সেন সমস্ত বঙ্গদেশে কৌলিন্য চালাইয়াছিলেন, যাহা আদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত রাজশক্তি তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনস্বী ব্যক্তি প্রতিভাদ্বারা কিছু কালের জন্য ঊর্ধ্বলোকে শির উত্তোলন করিতে পারেন,—কিন্তু লক্ষ্যভেদ করিতে অর্জুন উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিল ("এত বলি ধরাধরি করি বসাইল"—কাশীদাস)—বঙ্গদেশের লোক সেইরূপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা দেখিলে তাহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক—তেমনই নিরস্ত করে। পরস্পরের গার্হস্থ্য বিবাদ ভুলিয়া সর্বজনহিতকামীর হস্তে বলসঞ্চার করার যোগ্য ঐক্য-বন্ধন আর এদেশে নাই। সেই শকুনির সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, যাহাতে পৃথ্বীরাজ ভারতসাম্রাজ্য হারাইলেন—তাহা কবে নির্বাপিত হইবে?

প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খোজা কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, সুর্যকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তাহার চিরবিশ্বস্ততার জন্য দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের এই যুদ্ধ তিনদিন যাবৎ চলিয়াছিল; ইহাতে শৌর্যবীর্যের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য শুধু খোজা কমল ও আশৈশব বন্ধু সুর্যকান্তকে হারান নাই—এই যুদ্ধে তাহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শঙ্কর চক্রবর্তী বন্দি হইলেন, তৎপক্ষীয় ফিরিঙ্গি সেনানায়ক রডা নিহত হইলেন এবং তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মদনমল্ল প্রাণ হারাইলেন; মোঘলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেষে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষায় বাংলাদেশের অবস্থা মানসিংহের ভালরূপই বিদিত ছিল, পূর্ববৎসর বর্ষায় তাহার বিপুল সৈন্যের কোনরূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ্ তিনি জানিতেন। সুতরাং যখন প্রতাপ সন্ধি-প্রার্থী হইলেন, তখন তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। সন্ধিদ্বারা প্রতাপ নামে মাত্র মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্র কাঁচু রায়কে তাহার প্রাপ্য 'ছয় আনি' প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৬০৩ হইতে ১৬০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্য নিরুদ্বেগে রাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খ্রিঃ অব্দে ইসলাম খাঁ নবাব হইয়া বঙ্গের মস্নদ অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাহার সঙ্গে প্রতাপের দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়ীভূত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এ ছুতো ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম ভাঙিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মীর্জা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দি হইলেন। তাহার বন্দি হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্বক

মোঘলসৈন্যসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হন, এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এদিকে বন্দি প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গিয়া ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথে কাশীধামে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচন্দ্র এবং অপর দুই একজন লেখক লিখিয়াছেন—মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ভুল। মানসিংহ নহে, ইসলাম খাঁর হাতেই তাহার পতন।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি নাতিক্ষুদ্র ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পার্শীতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসাদ খাঁর অনুচর আবদুল লতিফ খাঁ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীর্জা সহন আলাউদ্দিন ইস্পাহিনী (অপর নাম ঘাইবী) "বাহিরিস্তান ঘাইবী" নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটিনাটি তত্ত্বে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রন্থসমূহেও প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিভারেজ-লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাস, পর্তুগিজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেযত ডুজারিকের ইতিহাস—প্রভৃতি বহু গ্রন্থে যশোররাজসম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যশোর ব্যাপিয়া প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল—তিনি তাহার পদে ইহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যেব কথা উপসংহার করিব। মোঘলদের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল, অন্যতম ভুঁইয়া সত্রাজিৎ ও আরও অনেকে মোঘলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে পাঠানেরা মোঘলের চিরশত্রু, বঙ্গদেশে তখনও তাহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই। সুতরাং মোঘল সমস্ত দেশের শত্রু-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা কেন মিলিত হইলেন না—প্রতাপের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ ঈশা খাঁ, যিনি নানা উৎসবে ধুমধাটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের শুভকার্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি করিয়া প্রতিপক্ষ রাজা ও মুসলমান নায়ক পতঙ্গের মত মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন—সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাপের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারীরা পর্যন্ত মোঘলদিগকে তাহার সর্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল। তাহার নিজ জামাতা বাকলারাজ কি ক্ষণকালের জন্য পারিবারিক কলহ ভুলিয়া তাহার সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিতেন না? অনৈক্যে দেশ নষ্ট হইল, ঐক্য লক্ষ্মী এদেশে থাকিলে রাজলক্ষ্মী এস্থান হইতে বিদায় লইতেন না। তাহার সিংহাসন পাতা ছিল—আমাদের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিড়ম্বনাকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই আমরা সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।)

কেদার রায় ও চাঁদ রায় ঃ

তথাকথিত "বারোভুঁইয়া"র অন্যতম বীর কেদার রায়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সহোদর ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখা কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। ইহাদের পূর্বপুরুষ নিম রায় সম্ভবত সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুর আরা ফুল-বেড়িয়াতে বাস স্থাপন করেন, নিম রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট 'ভুঁইয়া' উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে

আকবরের সময়ে নিম রায় কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন। (বারোভুঁইয়া সম্বন্ধে জেমস্ ওয়াইজ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এশিয়াটিক সোসাইটির জারনাল, ১৮৭৪) চাঁদ রায় ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগণা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সন্দ্বীপ মোঘলদের দখলে ছিল—কিন্তু জনৈক পর্তুগিজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নামে ঐ স্থান অধিকার করেন। কেদার রায় তাহার সেনাপতি কার্ভালোর দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ঐস্থান সেই পর্তুগিজ যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার রায়ের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। দুইবার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু শেষে সন্দ্বীপের অধিকার শেষোক্তের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল (১৬০২ খ্রিঃ)। কাম্পোস লিখিত "Portuguese in Bengal" পুস্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ মানরাজগিরি কর্তৃক সন্দ্বীপ অধিকৃত হওয়ার পর কার্ভালো তাহার নৌবহর লইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অন্যতম অধিনায়ক হইয়াছিলেন। মোঘলেরা বুঝিল তাহাদের অধিকৃত দ্বীপটি কেদার রায়ের সাহায্যে কার্ভালো কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়ও কেদার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্যাম সলিল উভয় পক্ষের শোণিতে লোহিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কেদার রায় জয়ী হইলেন এবং মোঘল-পক্ষীয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মন্দারায় নিহত হইলেন (Parch's Pilgrims, Pt. IV, Bk. V, p. 513)। কথিত আছে এই যুদ্ধে কার্ভালো অতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন (১৬০৬ খ্রিঃ) মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের সর্বনাশ সাধন করিয়া তিনি কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ তরবারি ও শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্পিতভাবে কেদার রায় শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানসিংহকে বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠাইলেন, তাহা তদবধি সংস্কৃত-সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। "ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং। বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্। করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।।" মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপন্ন, রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুল্য। এই বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়া মানসিংহ শ্রীপুর অবরোধ করেন। কেদার রায় এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কথিত আছে মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি এই—"যদি রাজা মানসিংহজীউকি বেট মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেনী করী। আর মিলাপ হুবো। যদি নীজর করি।" (অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী।) কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কথিত আছে নয় দিন পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাস্ত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের কথা Elliot's History of India, Vol. vi, এবং আকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। (যোগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কথিত আছে কেদার রায় তাহার ৫০০ রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মোঘল সেনাপতি কিল্মককে বন্দি করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোঘলেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ অন্যরূপ। ঈশা খাঁ যে কেদার রায়ের ভগিনী সোনামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেন্দ্রবাবুকৃত) এবং অপরাপর ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জানা যায় ঈশা খাঁ ও চাঁদ-কেদার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্য

ছিল। ঈশা খাঁ এক সময়ে শ্রীপুর রাজধানীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া স্নানার্থিনী সোনামণির অপূর্ব রূপ দেখিয়া যেরূপে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন্য কৃতসংকল্প হন। রায় রাজাদের এক অসন্তুষ্ট কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে তিনি কতকদিন পরে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চাঁদ রায় যে দুঃসহ পরিতাপ পাইলেন—তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ পদ্মার অপর পারে থাকিয়া ঈশা খাঁর অন্যতম রাজধানী খিজিরপুর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন, তাহা ছাড়া কৈলাগাছা দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু "ঈশা খাঁ" শীর্ষক যে পল্লীগাথা বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান কবিকর্তৃক রচিত হইয়া মুসলমান গায়েন কর্তৃক গীত হইয়া আসিতেছে— তাহাতে এই বিষয়টি ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, একদা ঈশা খাঁ তাহার অপূর্ব শিল্পখচিত সুবৃহৎ কোষা লইয়া যখন শ্রীপুরের নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন চাঁদ রায়ের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পান (সোনামণি হয়ত তাহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম সুভদ্রাটাই হয়ত তিনি মুসলমান অন্দর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন)। উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন। সুভদ্রা সোলার মাঝে চিঠি লিখিয়া ঈশা খাঁকে কোন নির্দিষ্ট যোগের দিনে কোষা লইয়া শ্রীপুরে আসিতে অনুরোধ করেন—সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরায় স্নান করিতে আসিবেন, তখন ঈশা খাঁ তাহাকে অনায়াসে তাহার ক্ষিপ্রগতি কোষাতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এই ইঙ্গিত পাইয়া ঈশা খাঁ সেই যোগ উপলক্ষে সদ্যঃস্নাতা সুভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া যান। কেদার রায় তাহার কোষা লইয়া বহুদূর পর্যন্ত পলাতক তস্করকে অনুসরণ করিয়াছিলেন—শেষে ঈশা ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ঈশা খাঁর সহিত চিরশত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়িতে উপস্থিত হইয়া তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম "নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল) দুই পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে আদর করিয়া বলেন—তাহার দুই কন্যার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসলমানী মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তাহার বৃদ্ধা মাতা বালক দুটিকে দেখিতে চান, সুতরাং মাতুলের সহিত কয়েকদিনের জন্য তাহারা যাইয়া শ্রীপুরে বেড়াইয়া আসুক। নিয়ামৎ জান এই স্নেহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় ভ্রাতার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়া জঙ্গলবাড়ির গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার কোষা নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে ব্যয়িত হইল এবং কেদার রায় তাহার ভাগিনেয়দিগকে এরূপ মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে "আজ বাকী রাতটুকু এখানে থাক," এই অনুরোধ করিলে তাহারা আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। রাজপুত্রদ্বয় নিদ্রিত হইলে বহুহস্তসঞ্চালিত কোষা অবশিষ্ট রাত্রি বাহিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীপুরে আসিল। "কালনেমী মামা" কেদার রায়ের মূর্তি পরিবর্তিত হইল। ভাগিনেয়দ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে কেদার রায়ের দুই কন্যা শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতুতো ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইবে। তাহাদের পিতা স্বয়ং এই কথা দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণা বুঝিল না, "যখন পিতার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা তাহাদেরই হইয়া গিয়াছি" এই

মনে করিয়া তাহারা বন্দিদ্বয়ের নিকট কারাগারে যাইয়া মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। আরাম-বিরাম বলিলেন, "আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ করিলে প্রকাশ্যভাবেই করিব।" যখন কালীর কাছে তাহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন এই দুই রাজকুমারী খড়্গ হস্তে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দাঁড়াইল, ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, অসাধারণ বল সম্পন্ন, ঈশা খাঁর দক্ষিণহস্ত করিমুল্লা—বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিয়া অধীর হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহায্য লইয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে রাজকুমারীদ্বয়ের আনুকূল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তখন অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেদার রায় নিকটবর্তী বনে পালাইয়া গিয়া তাহার ভূনিম্নস্থ প্রাসাদ নিরাপদ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজকুমারীরা দেখিল, কেদার রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম-বিরামের জীবন সর্বদাই সঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে। তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। রাজধানীর নিকটবর্তী 'আসুয়া' নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্যে কেদার রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাঁচ রসী দূরে—সেই আসুয়ার রাজপ্রাসাদে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌছান যায়। করিমুল্লা সেই স্থানে যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন—তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন।

আরাম-বিরাম যে ঈশা খাঁর দুই পুত্র ও সোনামণির গর্ভজাত তাহার উল্লেখ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই সময়ে কেদার রায় মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্তু করিমুল্লার ন্যায় মল্লবীরের বীরত্বের যশ লুপ্ত করিয়া মোঘলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আগ্রার দরবারে বাড়াইবারো জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর ব্রহ্মরাজ হাজিগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ করিলে সোনামণি উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোনামণির স্বামীর মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচার্য অবলম্বনপূর্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ঃ

যে দ্বাদশ জন ভৌমিক মোঘল-আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশ একরূপ শাসন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ (আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোঘলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্য মোঘল রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে কোচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু মূলতঃ ইনি মোঘলদের চিরশত্রু ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জন্য তিনি পাণ্ডুয়া ও গৌহাটির সুবেদার হইয়া মোঘলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বাধীন প্রকৃতি এই কার্য একেবারেই পছন্দ করে নাই, তাহার পুত্র সত্রাজিৎকে ঐ সুবেদারী দিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মোঘলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোঘলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন। তিনি মোঘল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ—আকবরনামা, ৩য় খণ্ড ৪৬৯ পৃঃ)। কথিত আছে মুকুন্দরাম রায় মোঘলরাজ প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুত্র সত্রাজিৎও তাহার পৈতৃক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে সময়ে মুখে

বশ্যতা স্বীকার করিলেও মোঘলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কোচদের সঙ্গে যখন মোঘলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোঘলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "Satrajit gave Jahangir's governors, of Bengal no end of trouble and refused to send in the customary *peskosh* or do homage at the court of Dacca.'' (Blockman, p. 332.) সত্রাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাংলার শাসনকর্তাদের যৎপরোনাস্তি অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বন্দি হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাহাকে হত্যা করা হয়।

ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ঃ

বারোভূঁইয়ার অন্যতম ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য অতি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, তাহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তিরও অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি "বিখ্যাত-বিজয়" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ইহার সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন।

বঙ্গদেশ মোঘলদের বিরুদ্ধে কেন হইল?

মোঘলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা যজ্ঞস্থলে আনীত পশুরা তাহাদের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহা দ্বারা কসাইয়ের কাছে বিক্রিত গাভী বা বৃষ তাহার আসন্ন বিপদ বুঝিয়া ছট্‌ফট্ করে—সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা বুঝিয়াছিলেন, মোঘলদের অধীনত্ব স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যূপকাষ্ঠে নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাহাদের নিকট সামান্য কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের মত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং শুধু যুদ্ধবিগ্রহকালে তাহাদের সহায়তা চাহিতেন—কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বহুকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোঘলদের খপ্পরে পা দিলে আর রক্ষা নাই। তোডরমল্লের জরিপে কোথায় কাহার কতটুকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল,—দেশের শাসনকর্তারা মোঘলানুগ্রহে খাইতে পরিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের চলাফেরা, কার্যকলাপ সমস্তই মোঘল বাদশাহের সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণাধীন হইত। মোঘলব্যাঘ্রের নখের দাগ, সাম্রাজ্য-গঠনের কঠোর নিয়মাবলী ও তীব্রদৃষ্টি রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না;* আকবরের প্রেরণায় তোডরমল্ল ও মানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। রাজস্ব ক্রমশ বর্ধিত হইবে—লুব্ধ মোঘলগণ ভারতের সর্বত্র অর্থসংগ্রহ করিয়া তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, দেওয়ানী খাস প্রস্তুত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসব সম্পাদন করিবেন, মোঘল অন্তঃপুরের বিলাসিনীদের জন্য অমূল্য হীরামাণিক্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবেন—এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রক্ষা নাই; সুতরাং রাজারা শৌর্যবীর্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হইলেন, সে জমিজমার যতই কেন উন্নতি হউক না, রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আর নিরুদ্বেগে ভোগ করা তাহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য উত্তরকালে "নরককুণ্ডে"র সৃষ্টি হইয়াছিল, ময়মনসিংহের সুকুমার রাজপুত্রদের দেহ বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল,—যাহার এই পরিণাম—সেই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীয় হইয়া দুঃখলাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ করিতে হইবে, তাহা সম্ভবত পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজগণ আভাসে টের পাইয়া মরিয়া হইয়া মোঘলের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর বাহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর

প্রীতি ও সৌহার্দ্যের গিল্‌টি করিয়া যে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল গড়িয়াছিলেন, তাহা যাহারা স্বর্ণশৃঙ্খল কিংবা স্বর্ণহার বলিয়া গলায় পরিয়াছিলেন তাহারাই চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারোভুঁইয়ার পতনের পর বীর বাঙালিজাতির প্রকৃত শৌর্যবীর্য লুপ্ত হইল। আকবরের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যশক্তি-নিষ্পেষণে সেই বিক্রমবহ্নি একেবারে নির্বাপিত হইল। প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর যেমন মাঝে মাঝে ভস্মস্তূপের মধ্যে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে দুই একটা খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ আমরা দেখিতে পাই। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা অতি কৌতূহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি নির্বাপিততেজ অনলকুণ্ডের দুই একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। মোঘল-রাজ প্রতিনিধি বঙ্গের নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। এই সকল আসন্ন দুঃখ-বিপদ বোধ হয় বারোভুঁইয়াগণ আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এজন্য তাহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুল্য সাম্রাজ্য-নীতির বন্ধন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া জীবনপণ করিয়াছিলেন। এই 'ভুঁইয়া রাজাদের' পর একমাত্র সীতারাম রায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোঘলের সর্বগ্রাসী বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে ভূষণার বীরবরের জীবনপণ-বীরত্ব তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

ভুঁইয়াদের মনে মোঘলবশ্যতা যে কিরূপ দুঃসহ ছিল, তাহা ঈশা খাঁর বংশধর (সম্ভবত প্রপৌত্র) ফিরোজ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি মনোভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ঈশা খাঁ ছিলেন রাজপুত কালিদাসের পুত্র। ক্ষত্রিয় রক্ত তাহার ধমনীতে বহিত। তিনি যদিও মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোঘলদের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্যন্ত মোঘলদের বশ্যতা একান্ত ক্ষোভের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা 'ফিরোজ খাঁ' শীর্ষক পল্লীগাথায় এইভাব দেখিতে পাই।

ফিরোজ খাঁর প্রতিজ্ঞা ঃ

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ির গদীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা তাহার সুহৃদ্ ও সামন্তদিগকে তাহার সুবৃহৎ 'বারদুয়ারী' গৃহে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি দিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্ব-পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি—তাহারা তো দিল্লিশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ঈশা খাঁ এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে, স্বয়ং দিল্লিশ্বর তাহাকে ভয় করিতেন। আমি তাহারই বংশধর একথা একমুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সঙ্কল্পের কথা শুনুন— ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই জঙ্গলবাড়িতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাজ্যের আয়ের অর্ধাংশ দিল্লিতে পাঠাইয়া এই অপমানসূচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, শুনুন—আমি হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্য আমায় যাহা ইচ্ছা করুক। আমার যদি মৃত্যু হয়—ঈশ্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প, আমি মৃত্যুকে আমার গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।"

যখন ফিরোজ খাঁ এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মুহূর্তে অন্তঃপুর হইতে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে তাহাকে রাজমাতা আহ্বান করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁ সেদিনের জন্য দরবার শেষ করিয়া অন্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি তাহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। দাসীরা তাহাকে সুস্নিগ্ধ সরবৎ আনিয়া দিল। তিনি তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কৌচের উপর

অর্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম তাহার উদীয়মান চন্দ্রিকার ন্যায় তরুণ কান্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অনুভব করিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না?" আমার বারংবারের অনুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্য করিবে? আমার বয়স হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা যে কবরে যাওয়ার পূর্বেই আমি একটি সুন্দরী বউ দেখিয়া মরি।"

দেওয়ান তাহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমার মনের কষ্ট মা তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্বপুরুষ ঈশা খাঁকে দিল্লিশ্বর স্বয়ং ভয় করিতেন; তাহার শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তিনি যাচিয়া তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লিশ্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামন্তগণও তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার সঙ্কল্প শুনুন—আমি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার রাজ্যের চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে। আমি দিল্লিতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব না। আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাজিরা দিতে যাইব না।"

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গনিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ)। পূর্ববঙ্গের পয়ারের ভাষা কঠিন বলিয়া আমরা গদ্যানুবাদ করিয়া দিলাম। অনুবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ফিরোজ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিব। কেল্লা তাজপুরের দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা সখিনার সহিত ফিরোজ খাঁর প্রেম হয়। ফিরোজ খাঁ তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—ওমর খাঁ, জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানেরা হিন্দুবংশসম্ভূত, আপত্তি করিয়া এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং ফিরোজ খাঁর বংশের নানারূপ নিন্দা করেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুর আক্রমণপূর্বক রাজধানী ধ্বংস করিয়া সখিনাকে লইয়া আসেন। সখিনা স্বেচ্ছায় তাহার অনুগামিনী হন;—বিবাহ হইয়া যায়। ওমর খাঁ দিল্লিশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপূর্বক সহায়তা যাচ্ঞা করেন। ওমর খাঁ ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দিল্লির এক সুবৃহৎ মোঘলবাহিনী লইয়া আসিয়া ওমর ফিরোজ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কেল্লা তাজপুরের সুবৃহৎ ময়দানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বার্তা যথাসময়ে জঙ্গলবাড়িতে পৌঁছে। তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্মুখী হইয়া ছিলেন। এমন সময়ে দাসী দরিয়া দুঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সখিনা স্বয়ং বলিলেন, "গত পরশু আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি অবশ্য আজ অপরাহ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন। দরিয়া বাগানের বড় বড় গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজয়ী স্বামীকে আমি ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধনা করিব। যুদ্ধক্লান্ত হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ ভৃঙ্গারে সুবাসিত সুস্নিগ্ধ জল ভরিয়া রাখ, তিনি আসিয়া 'অজু' করিবেন। যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্য সেবার দরকার হইবে, আভের পাখা কাছে রাখ। আমরা তাহাকে ব্যজন করিব।

"সুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাজাইয়া রাখ, সোনার পানের বাটা ভর্তি করিয়া পান রাখ, পাঁচ পীরের দরগার পবিত্র মাটি আনিয়া রাখ; দরিয়া, তিনি আসিয়া সেই মাটি যে মাথায় ছোঁয়াইবেন। পীরদের পত্নীরা আমায় আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন, দরিয়া, তাহার জয় সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" এই কথা বলিতে আনন্দে তাহার দুই রক্তিম গণ্ড উজ্জ্বল হইল।

তিনি থামিয়া আবার বলিলেন—'দরিয়া, একি! আজ তোমার মুখের হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখ ম্লান দেখাইতেছে কেন? কিন্তু জানিও আমার স্বামী আজ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন, তখন তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে।"

দরিয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "আমাদের কপাল ভাঙিয়াছে, রাজকুমারী, শোণিতার্দ্র পতাকাসহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আপনার পালঙ্কে শয্যার দিন ফুরাইয়াছে,—এখন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে বিধবার মলিন সাজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া ফেলুন—হীরার হার আর কণ্ঠে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজ-কুমারী। আপনার যৌবনের আশা এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যার ঝরিয়া পড়ে, তেমনই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্লা তেজপুরের দুর্গে বন্দি।"

ক্ষণকাল সখিনার মুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আঁধার কেহ ঢালিয়া দিল! তখন রাজমাতা ফিরোজা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্দন শব্দে জঙ্গলবাড়ির রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিতেছিলেন। কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, "যোদ্ধার সাজ লইয়া আইস। তাহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব। আমার সৈন্যদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে ভ্রাতা।"

এই তরুণ বীরবেশধারী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাড়ির অবশিষ্ট সৈন্য চলিল। দেওয়ানের প্রিয় ঘোড়া 'দুলালে'র পিঠে চড়িয়া সখিনা সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে চলিলেন, এক দিনের পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ তিনি সমস্ত মনের আগ্রহ সহ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেল্লা তেজপুরের মাঠে মোঘল সৈন্যের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই তিন দিন তিনি লৌহবর্ম পরিধান করিয়া অভুক্ত, অস্নাত, দিন রাত "দুলালে"র পিঠে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "পিতাই আমার শত্রু" ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেল্লা তাজপুরের রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা সশব্দে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই অমোঘ বীরত্বের নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে মোঘল সৈন্য পরাজিত হইল। তখনও তিনি অদম্য উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গদ্যানুবাদ দিতেছি—

"সেই মুহূর্তে তাজপুরের দুর্গ হইতে একটি সৈন্য উপস্থিত হইল। সে তরুণ বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় যোদ্ধা। আমি জঙ্গলবাড়ির সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। মোঘলেরা জঙ্গলবাড়ির প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই দুর্ভাগ্য রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। ফিরোজ খাঁ এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মোঘলদের সঙ্গে যে সর্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন—তিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন—তাহারই জন্য সোনার জঙ্গলবাড়ি আজ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্তে আরও আরও যে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই সপ্তাহেই সম্মত হইবেন। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।" এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষর-যুক্ত তালাকনামা সখিনার হাতে দিল।

এক মুহূর্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সর্পদষ্ট মানুষ যেরূপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাহার মাথার সোনার মুকুট ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি ভুতলে পড়িয়া গেলেন। তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া 'দুলাল' ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সৈন্যেরা আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একমুহূর্ত পূর্বে যিনি সদর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, এখন তিনি ভূলুণ্ঠিতা। জঙ্গলবাড়ির সহর আজ প্রকৃতই তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তাহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাজি এলাইয়া পড়িল। তাহার দেহ হইতে

পুরুষের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। তাজপুর কেল্লায় এই সংবাদ তড়িদ্‌বেগে রাষ্ট্র হইল; সেনাপতি ও সৈন্যেরা রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ ফিরোজ খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন—পূর্ণচন্দ্র মাটিতে পড়িয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

তারপর ওমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁর অনুতাপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে শবের শেষকার্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে।

যে রমণী স্বামীর ভালবাসার জন্য মোঘলের শত শত গুলি সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মহিলা একটা সাংঘাতিক গুলি সহ্য করিতে পারেন নাই,—তাহা অবিশ্বাসী নির্মম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকনামা। আজও কেল্লা তাজপুরের মাঠে পড়িয়া আছে, সেখানে সাধ্বীর মাথার সিন্দুরের ন্যায় উজ্জ্বল— সখিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা বিশ্বাস করায় বাধা নাই।

সব দিক্ দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবশ্য বলা যায় না। তবে বহু বাঙালি নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আছে। "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি মুসলমান রমণীর অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত আছে। "মাণিকতারা"-নামক গীতিকায়ও সেইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠান-রাজত্বকালে যে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়— সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে মোঘলশক্তি বন্যার মত আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল। মোঘল রাজনৈতিকগণ ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 'ভুঁইয়া রাজারা' যদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানসিংহ কিংবা ইসলাম খাঁ এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। যে একটি জিনিষের অভাবে তাহাদের শৌর্যবীর্য বিফল হইয়া গেল, তাহা—ঐক্য।

মোঘলেরা এদেশে আসিয়া যে শুধু পাঠান ও ভুঁইয়া রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁ পাঠান ওমরাদের জমিদারি কাড়িয়া লইয়া তাহা মোঘলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেরা তো অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইলই, পরন্তু মোঘল ওমরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ তাহারা যে জায়গির পাইলেন, তাহা নির্বিবাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না। মোঘলসম্রাট কর্তা করিয়াও কাহাকেও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। বড় বড় রাজা হইতে ছোট ছোট ভূস্বামী পর্যন্ত সকলের টিকি তিনি এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন এবং তাহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহা সর্বক্ষণ তাহারা বুঝিতেন। জায়গিরদারগণ রাজকীয় সৈন্যরক্ষার জন্য যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ দিল্লিতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই চূড়ান্ত নহে—পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গির ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় মোঘলদরবারে কোন জায়গিরদার বেশি দিন তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জায়গিরগুলি হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে মোঘল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গির পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। শাসনকর্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল ("He was ordered frequently to change the Jaigirs to prevent the troops establishing themselves in any one place."–Stewart) মোঘল আমীরেরাও এই সকল কারণে একত্র হইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী মোঘলদের নেতা ছিলেন—খলেদী খাঁ (জলেশ্বরবাসী) এবং বাবা খাঁ (ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা), ইহারা শীঘ্রই গৌড় দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ

পাইয়া বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁকে মোঘল আমীরদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ করেন। আমীরেরা ঐ আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের কর্তা ফিজবী খাঁ ও সেই বিভাগের প্রধান কর্মচারী পুত্রদাস আসিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ ভাল করিয়া জানিয়া যাউন, তৎপরে মিটমাট হইবে। তদনুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্মচারী তাহাদের শিবিরে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাহাদের আস্পর্দ্ধা ও দাবী আরও বাড়িয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাজধানী তাণ্ড্রা অবরোধ করিয়া মজঃফর খাঁকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁর হত্যার পর এই দল ক্রমশ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন—এত রক্তক্ষয়, এত কৃচ্ছ্রসাধন এবং চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার—তাহারই স্বশ্রেণীস্থ লোক—তাহারই পূর্বতন ওমরাহগণ তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে।

এই সময়ে আকবর রাজা তোডরমল্লকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া মোঘল-বিদ্রোহ-দমনের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করেন; আকবর তাহাকে ৫,০০,০০০ টাকা ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎকোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্য। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে রাজা তোডরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং কখনও কখনও উৎকোচে বশীভূত করিয়া এতটা হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ-সংগ্রহে অসমর্থ হইলেন। দুর্ভিক্ষজনিত নানারূপ বিপদে শত্রুশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে ককেশিলানদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অন্যতম মাসুম কাবুলি বিহারের দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীভূত করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল ওমরা এককালে তাহার সভায় অবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি তাহাদের কার্যদক্ষতা ও নানাগুণ স্মরণ করিয়া স্বয়ং বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিয়া তাহাদিগকে বড় বড় কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খাঁ ও সেরিফ খাঁকে তিনি বশীভূত করিয়া সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে আজিম খাঁ মৃজাকে বঙ্গেশ্বরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নূতন নেতা জরবর্দিকে বশীভূত করেন, এবং অপরাপর বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষ না হইতে হইতেই বঙ্গেশ্বর তাণ্ড্রা রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। তাহারা জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন—কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ তাহাদিগকে সেখানেও নিষ্কৃতি দেন নাই। তিনি তাহাদের বড় বড় গোলা সকল দখল করিয়া লইলেন এবং তাহাদের অবশিষ্ট ৫৪টি হস্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। মোঘলদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নির্মূল হয়।

'বৃহৎবঙ্গ' থেকে সংকলিত

---

১. লক্ষ্মীকান্ত বরিষা গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ।

বঙ্গে বারোভুঁইয়া

১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সেই সময়ে পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় নাই ; এমনকি পূর্ববঙ্গ শাসনাধীন করিতে প্রায় দেড়শত বর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন বঙ্গের রাজত্ব দিল্লির অধীন ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শাসনকর্তা দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করিয়া, প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪০)। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নহে। পাঠানেরা বিজিত হওয়ার পর দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল ; প্রজ্বলিত বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইল ; উহা নির্বাপিত না হইয়া, বরং ভিতরে ভিতরে সন্ধুক্ষিত হইতে হইতে, অশান্তি সর্বব্যাপী করিয়া তুলিল। যে যেখানে নেতার মত দাঁড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব পাইল ; শত শত পলায়িত হিন্দু, পাঠান তাহার পতাকার নিম্নে আশ্রয় পাইল। যাহারা পূর্বে সামন্ত রাজা বা ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই আকস্মিক নেতা হইবার সুযোগ পাইল ; ক্রমে আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়া প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। কেহ বা পূর্বে কিছুই ছিল না ; এখন দৈবযোগে দেহের বলে ভূম্যধিকারী সাজিল।

আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সকলকেই সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। যখন তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহারা অধিকার বিস্তারে মনোযোগ দিত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় নিজের গণ্ডীর ভিতর দাঁড়াইত এবং কূটমন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্রের বলে উহারা আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইত। এই ভূম্যধিকারীদিগকে ভুঁইয়া বা ভৌমিক বলিত। পাঠান ও মোঘলের সন্ধিযুগে এমন কত ভুঁইয়া যে দেশ মধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অনুসারে ইহাদের ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য বুঝা যাইত।

উহাদের কাহারও বা শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ বা এক খণ্ড-রাজ্যের অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বারো জন ভুঁইয়া একজনকে প্রধান বলিয়া মানিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিত। কখনও বা একজন প্রতাপান্বিত ভুঁইয়া অন্য ভুঁইয়ার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। তখন রণ-রঙ্গ রাজায় রাজায় না হইয়া ভুঁইয়ায় ভুঁইয়ায় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে যোগ দিয়া ফলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতার যুগে কেহ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে হইত, নতুবা আত্ম-পরিবারের প্রাণ রক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক অশান্তির একটা অশুভ ফল আছে বটে, কিন্তু উহাতে যে মানুষকে অনলস ও কর্মঠ করিয়া জাতীয় প্রাণের সাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঐ যুগে দেশের মধ্যে শত অশান্তির ভিতর একটা প্রাণের পরিচয় ছিল। জীবদেহে স্নায়ু-সন্ধির মত দেশের মধ্যে এই ভুঁইয়াগণ জাতীয় প্রাণের স্পন্দন-কেন্দ্র ছিলেন। আদ্যোপান্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি পশ্চিমদ্বার ভেদ করিয়া রাজ্যলিপ্সু বৈদেশিক জাতি, ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন আচার-ব্যবহার লইয়া, একের পর এক

ভারতে প্রবেশ করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতেছে ; দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশ মধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, অশান্তি, বিদ্রোহ বা বিপ্লব চলিতেছে ; অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মাত্র কোন কোন সবল সুশাসকের রাজত্বে দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপসৃত হইয়াছে, এবং শান্তির সুফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে। প্রজাদের সাধারণ অবস্থা আমরা বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার কোন সংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দুরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, দপ্তরে হিসাব রাখিত, রাজস্ব সংগ্রহ করিত, কিন্তু অসংখ্য ইতিহাসে তাহার প্রসঙ্গ নাই।[১]

যে দুই চারিজন সুশাসক রাজতক্ত সুশোভিত করিতেন, তাহাদের রাজত্বকালে দেশের লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত ; অনেক মনের ক্ষত আরোগ্যলাভ করিত। তাহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত ; তাহাদের জাঁকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তোলন করিত। বাস্তবিকই বঙ্গদেশে পাঠান শাসনকালের যে সকল প্রাচীন মসজিদ বা অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান আছে, শিল্প হিসাবে উহা খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না হইলেও, সে সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।[২] হুসেন শাহ সেইরূপ একজন সুশাসক, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে যে বিপ্লব আরব্ধ হইয়াছিল, শের শাহের অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহা নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ শের শাহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যাচারী যোদ্ধা এবং তিনি দিল্লি গেলে, তাহার সুশাসনের নিদর্শন বঙ্গে পৌঁছিবার পূর্বে তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবরের রাজ্যারম্ভ হইতে ১৫৫৬ অব্দে আকবরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবর্তিত হয় নাই। সুলেমানের কঠোর শাসনের মধ্যে যে শান্তিটুকু ছিল, তাহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। তৎপুত্র দায়ুদ মোঘলের নিকট পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত সন্ধিসূত্রে উড়িষ্যার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িষ্যাবাসীর হৃদয়ের উপর কোন অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই তাহাকে অচিরে সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট অবস্থায় মৃত্যুর অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। মোট কথা, হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বঙ্গদেশে কোন সুশাসন ছিল না।

এই সময়ে গৌড়, তাণ্ডা বা রাজমহল যেখানেই রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্বোক্ত ভুঁইয়াদিগের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সন্ধিযুগেই কবিকঙ্কণ নিজে মোঘল কর্মচারী কর্তৃক অত্যাচারপীড়িত হন। তিনি তাহার চণ্ডী কাব্যের প্রারম্ভে মোঘল ডিহিদার বা তহশীলদারগণের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তাহারা কিরূপে প্রজার খিল (পতিত) ভূমি লাল (উর্বর) লিখিয়া বিনা উপকারে খতি (ঘুষ) খাইয়া প্রজাকুল ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে।[৩] ভুঁইয়াগণ অনেক স্থলে ঐ সকল ডিহিদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিদ্রোহী প্রজাকে আশ্রয় দিয়া, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি যাহাই থাকুক, তাহারা দেশভক্ত সাজিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উক্ত ভুঞা বা ভুঁইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাবে উহাদিগকে জমিদার বলা যায়। এখন যেমন অস্ত্রশস্ত্রসৈন্যবিহীন রাজা মহারাজা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন সেরূপ হইত না ; তখন আত্মরক্ষা বা রাজস্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিতে হইত ; দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত ; শত্রুর অপেক্ষায় তাহাদিগকে বীরবেশে বহু রাত্রি বিনিদ্র হইয়া থাকিতে হইত। বীর বলিয়া ভুঁইয়াগণের খ্যাতি হইত, বীর বলিয়া প্রজারা তাহাদিগকে ভয় ভক্তি করিত।

অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে যিনি ধর্মপ্রাণ বা প্রজারঞ্জক হইতেন, সকলে মিলিয়া তাহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দিত। উহার ফলে তিনিও নিজকে গৌড়েশ্বর বা দিল্লিশ্বর হইতে কম মনে করিতেন না।

এইরূপে কত ভুঁইয়া যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার খোঁজ রাখিত না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা বীরত্বে অগ্রগণ্য, যাহাদের রাজত্ব বিস্তীর্ণ এবং যাহারা বিপুল সৈন্যবলে শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তাহাদেরই খ্যাতি স্থায়ী হইত। প্রবাদ এই, মোঘলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে এইরূপ বারো জন ভুঁইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার তাহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে[৪] নিজেরা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; এই জন্য বাংলাকে তখন 'বারোভুঁইয়ার মুলুক' বা 'বারোভাটি বাংলা' বলিত। কিন্তু তাহারা যে সংখ্যায় ঠিক বারো জনই ছিলেন এবং সেই বারো জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয়ত এক জনের রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভুঁইয়ার মৃত্যুর পর, তাহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালন করিতেন, কিন্তু হিসাবের বেলায় তিনিও বারোভুঁইয়ার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন।

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব। অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানা সম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে।[৫] প্রাচীন বাংলা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, তাহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণত বারোভুঁইয়া বেষ্টিত হইয়া বসিতেন।[৬] বাংলার মত আসামেও বারো জন রাজা বা বারো জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন হইত না এবং 'পাঁচ পীরের' নাম করিতে গিয়া যেমন নানা জনে নানা পীরের নাম করিয়াছেন, আসামে বারো জন রাজার তালিকা পুরাইতেও বিভিন্ন নাম কথিত হয়।[৭] আরাকান শ্যাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক কালে বারো জন সামন্ত রাজা বা ভুঁইয়ার আবশ্যক হইত এবং উহাদের অভিষেকও এক সময়ে সম্পন্ন হইত।[৮] এখনও আমাদের দেশে বারো জনে ভিন্ন কোন কাজ হয় না; বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বারো-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্য বলে। উহাতে ঠিক বারো জনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাংলার বারোভুঁইয়ার কাণ্ডটিও প্রায় ঐ একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভুঁইয়া বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদিগকে 'বারোভুঁইয়া' বলিত; প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বারো জন ছিলেন, এমন বোধ হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে, বহুজনে 'বারোভুঁইয়ার' কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই ঠিক ভাবে বারোজনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বারোজনের নাম দিতে পারেন নাই; প্রত্যেকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। বাস্তবিক এই বারো জন ভুঁইয়া কে কে ছিলেন, তাহাই দেখিবারো জন্য আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশি ও স্বদেশী লেখকদিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রহণ করিব।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারিগণ ভারতবর্ষে আসেন। মোঘল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের বিবরণী বিশেষ প্রামাণিক।[৯] উহাদের মধ্যে নিকলাস্ পাইমেন্টা প্রধান, তিনি গোয়াতে ছিলেন। ঐ সময়ে ফার্নাণ্ডেজ, সোসা, ফন্সেকা ও বাউয়েস্ এই চারিজন জেসুইট মিশনারি বঙ্গে আসিয়াছিলেন, এই চারিজনের মধ্যে ফার্নাণ্ডেজ প্রধান।[১০] ফার্নাণ্ডেজ ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ হইতে পাইমেন্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই সময় পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবৎসর জেসুইট সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিবার (Aqua Viva) নিকট এক বিবরণ পাঠাইয়া দেন (১৬০০)। ডু-

জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেসুইট পাইমেন্টার পত্রাবলী ও অন্যান্য স্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বাংলার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।[১১] এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে বারোভুঁইয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বারোজনে পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মোঘলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা পৃথক পৃথক রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। এই বারোজনের মধ্যে ঈশা খাঁ মসনদ-আলি সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু ভুঁইয়াত্রয় শ্রীপুর, বাক্‌লা ও চ্যাণ্ডিকান বা চাঁদ খানের অধিপতি।[১২]

উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্লকম্যান বারোভুঁইয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা উহাদের নাম দেন নাই।[১৩] ডক্টর ওয়াইজ বিশেষভাবে বারোভুঁইয়ার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন ; তৎপরে মহামতি বিভারিজও কিছু কিছু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।[১৪] ওয়াইজ মহোদয় বারোজনের মধ্যে সাতজনের নাম দিয়া তাহার পাঁচ জনের বিবরণ লিখিয়াছেন। সেই সাত জন যথা ঃ

১। ভাওয়ালের ফজল গাজি,
২। বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়,
৩। ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য,
৪। চন্দ্রদ্বীপ বা বাক্‌লার কন্দর্পনারায়ণ,
৫। খিজিরপুরের ঈশা খাঁ,
৬। যশোহর বা চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য এবং
৭। ভূষণার মুকুন্দরাম রায়।

ইহার মধ্যে তিনি প্রথম পাঁচ জনের বিবরণ দিয়াছেন।

ইহা হইতে দেখা গেল যে, ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু এবং দুই জন মুসলমান। সুতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন সকলেই মুসলমান হইলে, বারোভুঁইয়ার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সাত জনের অধিক হয় না। ডু-জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনের নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াইজ সাহেবের তালিকায় তাহারা ব্যতীত আরও তিন জনের নাম অতিরিক্ত পাওয়া গেল।

মানরিক্ নামক একজন স্পেনদেশীয় ধর্মযাজক ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পর্যটন করিয়া এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।[১৫] উহাতেও বারোভুঁইয়ার উল্লেখ আছে। তাহার মতে ১২টি ভুঁইয়া রাজ্যের নাম :

১। বাংলা, ২। হিজলি, ৩। উড়িষ্যা, ৪। যশোর, ৫। চ্যাণ্ডিকান, ৬। মেদিনীপুর, ৭। কর্তাভু, ৮। বাক্‌লা, ৯। সলিমাবাদ, ১০। ভুলুয়া, ১১। ঢাকা ও ১২। রাজমহল।

ইহার মধ্যে আমরা পূর্বকথিত সাতটি রাজ্যের মধ্যে চ্যাণ্ডিকান, কর্তাভু, বাক্‌লা, ভুলুয়া ও ঢাকা বা শ্রীপুর এই পাঁচটি রাজ্য পাইতেছি। সে সাতটির অবশিষ্ট ভাওয়াল ও ভূষণার উল্লেখ ম্যানরিকের তালিকায় নাই ; সম্ভবতঃ ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্কালে সে দুইটি ভুঁইয়া রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে মানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতটি রাজ্যের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে 'বাংলা' যে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও-এর নামান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর মহাশয় তাহার 'বাংলা নগরী' নামক পুস্তিকায় সর্ববিধ মতের সুন্দর সমালোচনা করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি।[১৬] সোনারগাঁও এবং কর্তাভু পরস্পর নিকটবর্তী স্থান ; ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণের দুই শাখা এই দুই স্থানে

রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খাঁ যে 'বাংলার' অধিপতি ছিলেন, তাহা বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে।[১৭] মোঘল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ে হিজলিতে আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার শাসনকর্তা কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উকিল এবং জ্ঞাতিভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহানীর পুত্র ওসমান উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন।[১৮] উক্ত ঈশা খাঁ স্বয়ং হিজলিতে এক দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলি এখনও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর। মেদিনীপুরের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জ্বালামুটা ও মাজনামুটা নামক দুইটি জমিদারি হিজলি হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথকভাবে শাসিত হইতে থাকে।[১৯] সম্ভবতঃ মানরিক্ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চাণ্ডিকান বা যশোর যে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। যশোরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পূর্বে ভবেশ্বর রায় মোঘলদিগকে সাহায্য করিবার পুরস্কারস্বরূপ 'যশোহরের রাজা'[২০] উপাধি পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্তমান যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে চাঁচড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চাঁচড়া রাজ্যই সম্ভবত মানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিঙ্কর সেন নামক এক ব্যক্তি দ্বিগঙ্গা হইতে[২১] আসিয়া বর্তমান বরিশালের অন্তর্গত সেলিমাবাদে ১৪টি ভূখণ্ড দখল করিয়া লন; মহারাজ প্রতাপাদিত্য উহার ১৩টি হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর কিঙ্করের পুত্র মদনমোহন মালিকশূন্য পরগণাগুলি পুনরায় স্বাধিকৃত করিয়া মোঘল-সরকার হইতে উহার সনদ লাভ করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজ্য। মদনমোহন বা তৎপুত্র শ্রীনাথ রায়ের সময়ে মানরিক্ এ দেশে আসেন। কিঙ্কর সেন 'ভুঁইয়া কিঙ্কর' বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাহার বংশধরগণ 'রায়েরকাটি' নামক স্থানে বাস করিতেন। এইজন্য সেলিমাবাদের রাজগণ এক্ষণে রায়েরকাটির জমিদার বলিয়া খ্যাত।[২২] মোঘলপক্ষীয় শাসনকর্তা মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়কালে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আকমহল নামক স্থানকে আকবরনগর বা রাজমহল নাম দিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।[২৩] তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তখনকার মোঘল রাজধানী, এবং ম্যানরিকের সময়ে অন্য ভুঁইয়া রাজ্যগুলি এক প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভৌমিকেরা সকলে এক সময়ে এক সঙ্গে ছিলেন না। এখন দেখা গেল, মোঘল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন, তাহাদের অনেকেই মানরিকের ভ্রমণকালে বর্তমান ছিলেন না। এমন কি, তাহাদের বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত বা অন্যভাবে তিরোহিত হইয়াছিলেন। মোঘল-বিজয়ের সমকালে যাহারা বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াসী ছিলেন, তাহাদের প্রসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য উহাদের অন্যতম এবং তাহারই সহিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এই প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রায় অন্যান্য সকল ভুঁইয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই আমাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইতেছে। প্রতাপাদিত্য সংস্রবেই যশোহর-খুলনার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, বিশাল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজনৈতিক ব্যাপারের একটি সজীব আভাষ দিবারো জন্য আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইতেছে।

যাহারা কোন না কোন প্রসঙ্গে এই মোঘল-পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাহাদের সংখ্যাপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা জনে নানা ভাবে এই সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের উল্লেখ না করিলে, সেই বৎসরের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভৌমিকগণের নামোল্লেখ করা যায় না। বৎসরানুসারে সেরূপ হিসাব ইতিহাসের কোথাও নাই। পাইলেও সে সংখ্যা সব

বৎসব বারো জন হইত কি না সন্দেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবর্তিত হইতেছিল যে, কোন বৎসর বারো জন ভৌমিক থাকিলেও দুই এক বর্ষের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্তন হইত। এইরূপ ভুঁইয়াদিগের প্রাদুর্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিতর্ক আছে এবং থাকিতেও পারে ; তবে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই ; আবার উহারাই ভুঁইয়া শ্রেণীতে প্রধান এবং তাহাদিগেরই সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহর খুল্‌নার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়।...

ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের সংখ্যা বেশি ছিল।

১. ঈশা খাঁ মসনদ্-আলি ঃ খিজিরপুর বা কর্ত্তাভু।
২. প্রতাপাদিত্য ঃ যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান।
৩. চাঁদরায়, কেদার রায় ঃ শ্রীপুর বা বিক্রমপুর।
৪. কন্দর্পরায় ও রামচন্দ্র রায় ঃ বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপ।
৫. লক্ষ্মণমাণিক্য ঃ ভুলুয়া।
৬. মুকুন্দরাম রায় ঃ ভূষণা বা ফতেহাবাদ।
৭. ফজল গাজি, চাঁদ গাজি ঃ ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ।
৮. হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর ঃ বিষ্ণুপুর।
৯. কংসনারায়ণ ঃ তাহিরপুর।
১০. রামকৃষ্ণ ঃ সাঁতৈর বা সান্তোল।
১১. পীতাম্বর ও নীলাম্বর : পুঁটিয়া।
১২. ঈশা খাঁ লোহানী ও ওসমান খাঁ ঃ উড়িষ্যা ও হিজলি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় জনই বিশেষ বিখ্যাত। তাহারাই তদানীন্তন রাজনৈতিক গগনে সমুজ্জ্বল এবং তাহারাই মোঘলদিগের দিগ্বিজয়ের পথে কণ্টক হইয়াছিলেন। আমরা তাহাদের কথা পরে বলিব। অপর ছয় জনের মধ্যে কেবলমাত্র উড়িষ্যা ও হিজলির পাঠান ভুঁইয়াদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহারাই পাঠান বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। মোঘল কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর উড়িষ্যাই পাঠানদিগের আশ্রয়স্থল হয় ; সেই স্থান হইতে পাঠানেরা বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ-বহ্নি ছড়াইয়াছিল। বিজয়ী মোঘলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভুঁইয়াদিগের প্রধান কৃতিত্ব বা প্রধান অপরাধ। এ বিষয়ে যিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোঘলদিগের নিকট তিনি সেই পরিমাণে অপরাধী। প্রথম অপরাধী ওসমান—কতলুর প্রধানমন্ত্রী ঈশা খাঁর পুত্র ওসমান খাঁ উড়িষ্যা হইতে পাঠানের রাজতক্তের উত্তরাধিকারের দাবি করিতেন। সেই দাবির পক্ষপাতের জন্যই বঙ্গ ভরিয়া বিদ্রোহ জাগিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সেই দাবির প্রধান পক্ষপাতী। হিজলির ঈশা খাঁ ও উড়িষ্যার কতলু খাঁ একই লোহানী বংশসম্ভূত। এজন্য ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র ওসমানকে আমরা এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছি। কেহ কেহ উহাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্তই করেন না।[৪] কিন্তু দায়ুদের মৃত্যুর পর যখন ওসমানের অধীনে পাঠানগণ বহুকাল পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে উড়িষ্যায় ভূম্যধিকারী ছিলেন, হিজলির শাসনকর্তা অবশেষে মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করিলেও যখন স্বীয় প্রদেশে প্রতাপান্বিত ছিলেন, তখন তাহারা নিজেরা ভুঁইয়া নাম ধারণ করুন বা না করুন, তাহাদিগকে ভুঁইয়া পর্যায়ভুক্ত না করিয়া উপায়ান্তর কি আছে? আকবরের বহু পরে যে মানরিক এ দেশে ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও উড়িষ্যা ও হিজলিতে ভুঁইয়া রাজ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। অথচ পাঁচ জন ভুঁইয়ার মধ্যে পূর্ববঙ্গের গাজিগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়ান নাই। বিষ্ণুপুরের হাম্বীর মল্ল বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেও যশোহরের সহিত তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতার

পরিচয় পাই না। পূর্ববঙ্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য মোঘল বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র ছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, সাঁতোড় ও পুঁটিয়ার ভুঁইয়াগণ উত্তরবঙ্গে প্রধান্য লাভ করিয়াছিলেন সত্য, এবং ঘোড়াঘাটের পলায়িত পাঠানের সহিত তাহাদের গুপ্ত সন্ধি থাকাও অসম্ভব নহে, কিন্তু মোঘলেরা সেদিকে তেমনি মনোযোগী হয় নাই ; কারণ নিম্নবঙ্গের বিদ্রোহ তরঙ্গ যখন মোঘলের নূতন রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজ্য করায়ত্ত রাখিতে নিম্ন-বঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশেষত উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ ভুঁইয়াত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির না করিয়া সামাজিক প্রতিপত্তির দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই তাহিরপুরের কংসনারায়ণ সর্বত্র পূজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত ছয়জন ভুঁইয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

গাজিগণ ঃ ভাওয়াল

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস করিয়া পালোয়ান শাহ নামক একজন ধর্মপ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র কারফরমা সাহেব সাধু ছিলেন এবং তাহার অনেক অদ্ভুত কর্মের গল্প আছে। তাহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাব্ গাজির পুত্র ফজল গাজি আকবরের সময়ে ভুঁইয়া ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খাঁ প্রভৃতি ভুঁইয়াগণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে আসেন, তখন গাজীগণ সহজে অধীনতা স্বীকার করেন।[২৫] চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি এই একই বংশের অন্য শাখা। সুতরাং তাহাকে পৃথক ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে।[২৬]

হাম্বীর মল্ল ঃ বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের প্রাচীন নাম মল্লভূমি এবং এখানকার রাজারা মল্ল বলিয়া খ্যাত। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে রঘুনাথ সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল। তৎপরে ৪৭ জন রাজার পর বীর হাম্বীর রাজত্ব পান (১৫৯৬)। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভুঁইয়া নৃপতি। সে সময় তিনি মোঘলের নিকট নামে মাত্র অধীনতা স্বীকার করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদারি বন্দোবস্ত হয়।[২৭]

কংসনারায়ণ ঃ তাহিরপুর

ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলভূষণ বিজয় লস্কর তাহিরপুরের জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তিনি দিল্লিশ্বর বা বঙ্গের কোন স্বাধীন সুলতান কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমিদার হইয়া ২২ পরগণা এবং 'সিংহ' উপাধি লাভ করেন। বারাহী নদীর তীরে রামবামা নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র উদয়নারায়ণের সময় তাহিরপুর ব্যতীত অন্য পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌত্রই প্রসিদ্ধ কংসনারায়ণ। তিনি বারেন্দ্রকুলের প্রধান সংস্কারক এবং তদানীন্তন বাঙালি হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সুলেমান কররাণীর অধীন ফৌজদার ছিলেন এবং তোডরমল্ল তাহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের দেওয়ান করিয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম খাঁ মৃত্যু হইলে, তিনি অস্থায়ীভাবে কিছুকাল সুবেদারী করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে তিনি কেবলমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বঙ্গে দুর্গোৎসব নামক মহাযজ্ঞের প্রথম প্রবর্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভুঁইয়া নৃপতিগণ অবনত মস্তকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।[২৮]

রামকৃষ্ণ ঃ সাতৈর

সামস্‌উদ্দীন্ ইলিয়াস্ যখন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান (১০৩৯-৫৮), তখন তিনি বিশিষ্টভাবে দুইজনের সাহায্য পান,—উভয়ই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শিখাই সান্যাল ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ী। উভয়েরই খাঁ উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারি হইয়াছিল। সুবুদ্ধির বংশধরেরা ভাদুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদারি পান ; এই বংশীয় রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন সুলতান হইয়াছিলেন। শিখাই বা শিখিবাহন সান্যালের পুত্র বলাই সাঁতোড়ের রাজা হন।[২৯] তোডরমল্ল এই বংশীয় রাজা রামকৃষ্ণকে সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি ভাতুড়িয়ার জমিদারি হ্রাস করিয়া সাঁতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন। এইরূপে ভাতুড়িয়ার জমিদারি হ্রাস করা হইয়াছিল বলিয়া তথাকার ভূস্বামী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হন না। নতুবা আকবরের পূর্বে ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক ছিলেন।[৩০] রামকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্তির জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। রামকৃষ্ণের পত্নী শর্বাণী দেবীর মৃত্যুর পর এই রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়।

পীতাম্বর ঃ পুঁটিয়া

বৎসাচার্য নামক এক সন্ন্যাসী পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাগ্‌চি উপাধিধারী এবং বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বংশীয় কুলীন। সম্ভবত তোডরমল্লই লস্করপুর পরগণা বৎসাচার্যের পুত্র পীতাম্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম 'রাজা' উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলাম্বরের ধারাই চলিতেছে। পীতাম্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অন্যান্য প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। নীলাম্বরের প্রপৌত্র দর্পনারায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্য কার্যে পুঁটিয়া সরকারে প্রবেশ করেন এবং পুঁটিয়ার উকিলরূপেই মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।[৩১]

লোহানীগণ ঃ উড়িষ্যা ও হিজলি

সুলেমান কররাণী কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের সময় হইতে আফগান জাতীয় কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকর্তা ছিলেন।[৩২] তাহারই এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহানী তাহার উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাকিতেন। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, কতলু উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রধান হন। আকমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, কতলু খাঁ উড়িষ্যার সর্বেসর্বা হন এবং ঈশা খাঁ তখন হইতে তাহার প্রধানমন্ত্রী হন। কতলুর মৃত্যুর পরে (১৫৮৯) তাহার নাবালক পুত্রগণের [৩৩] পক্ষ হইতে ঈশা খাঁ বঙ্গের সুবাদার রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্ব হইতে তিনি হিজলিতে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় কিছুকাল মোঘলের সহিত সন্ধিসূত্র অবিকৃত রাখেন।[৩৪] কতলু খাঁ জীবদ্দশায় ঈশার পুত্র ওসমান খাঁ উড়িষ্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।[৩৫] পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি উড়িষ্যা অঞ্চলে মোঘলের বিপক্ষে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, ইসলাম খাঁ যখন বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত হন (১৬১২)।[৩৬] ভুঁইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য মোঘলদিগকে বহুবৎসর ধরিয়া যেভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমঙ্কিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার ঈশা ও তাহার বীর পুত্রের প্রাণান্ত চেষ্টা, কূটনীতি ও দোর্দণ্ড প্রতাপ মোঘলকে বিংশাধিক বর্ষকাল যথেষ্ট বিড়ম্বিত করিয়াছে। খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মত হিজলি অঞ্চলের এই ঈশা খাঁ লোহানীও যে ভুঁইয়াদিগের অন্যতম ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ওসমানের পতন সর্বশেষে হইয়াছিল

বলিয়া আমরা তাহাকে ভুঁইয়ার তালিকায় সর্বশেষ স্থান দিয়াছি। নতুবা রাজনৈতিক কৌশল এবং বীর্যগৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন।

প্রথম ও প্রধান ছয় জন ভুঁইয়ার মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। কারণ দায়ুদের পতনের পর তিনি বহুসংখ্যক পাঠান সেনার অধিনায়ক হইয়া সুদূর পূর্ববঙ্গে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রথম ভাগে প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং অন্যান্য ভুঁইয়াদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।[৩৭] পাইমেন্টার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীয় ভুঁইয়াদিগের মধ্যে কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ প্রধান। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে ঈশা খাঁ সর্বাগ্রে (১৫৯৫) বশ্যতা স্বীকার করেন। অপর দুইজন উহার বহু পরেও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়া তাহাদের অবসান হইয়াছিল। সুতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাপ্য। আমরা তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভুঁইয়ার মধ্যে ভূষণার মুকুন্দরামই বহুদিন পর্যন্ত মোঘলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি মোঘলের স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি কখনও মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, সামান্য পেশ্‌কস্‌ দিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্য ভুঁইয়ার সহিত গুপ্ত সন্ধি করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। বাক্‌লার কন্দর্প রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য মোঘলের শত্রু হওয়া অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেই অধিক বিব্রত ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে হত্যা করেন, পরে নিজেই মোঘল চরণে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই কয়েকজন ভুঁইয়া সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিবার পূর্বে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্যক।

ঈশা খাঁ ঃ

সুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে ঈশা খাঁ[৩৮] প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্য প্রতিভাবলে অচিরে আড়াই হাজারী সেনানায়ক হন। দায়ুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী ছিলেন, এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাহার সৈন্যদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের সাহায্যে সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে একদিন চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে দর্শন করিয়া রূপোন্মত্ত হন ও পরে চাঁদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া সোনামণিকে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করেন।[৩৯] এই অপমানে চাঁদ রায় অচিরে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবারো জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ প্রথমতঃ বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাজুহা ও সোনারগাঁ এই দুই সরকারের শাসনভার পান এবং কতকগুলি নূতন দুর্গ নির্মাণ ও পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিয়া লন। তৎপরে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খাঁ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই করিতে পারেন না।[৪০] ঈশা খাঁ সোনারগাঁয়ে ও পরে কোচরাজাকে পরাজিত করিয়া জঙ্গলবাড়িতে পৃথক রাজধানী স্থাপন করেন। অবশেষে রাজা মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রথমত একডালা ও পরে এগারসিন্ধু দুর্গে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশা খাঁর সাহসিকতায় প্রীত হইয়া তাহার সহিত সন্ধি করেন। ঈশা খাঁ তাহার সহিত আগ্রায় গিয়া ২২ পরগণার জমিদারি ও মসনদ-ই আলি উপাধি লাভ করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।[৪১]

কেদার রায় ঃ

চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা। তন্মধ্যে চাঁদ রায় জ্যেষ্ঠ। প্রবাদ এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়া ফুলবাড়িয়া নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম রায় আগমন করেন। সে যুগে দেব বংশের কয়েক শাখা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন।[৪২] চাঁদ রায় ও কেদার রায় নিম রায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পাঠান রাজত্বের পতনের পর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই দুই ভ্রাতা সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটস্থ শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, সবিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহারা প্রতাপশালী হইয়া যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্দ্বীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। দায়ুদের প্রথম পরাজয়ের পর (১৫৭৫) মোঘল পক্ষীয় ইতিমদ্ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজনে সোনারগাঁও দখল করিতে আসেন।[৪৩] তখন সন্দ্বীপ চাঁদ রায়ের হস্তচ্যুত হইয়া ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঈশা খাঁর সহিত বিবাদের জন্য কেদার রায় বহুদিন মধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে কার্ভালো প্রভৃতি পর্তুগিজগণ ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়া কিছুকাল শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা আরাকান রাজ্যের অধিকৃত হয় (১৬০২)। তখন কার্ভালো কতকগুলি জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্য শ্রীপুর অভিমুখে যান। এই সময় মানসিংহ মুণ্ডা রায় নামক এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পথে নৌযুদ্ধকালে কার্ভালো কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব করেন। সে যুদ্ধে মুণ্ডা রায় পরাজিত ও নিহত হন।[৪৪] তখন মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করেন। মানসিংহ তখন তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেদার সন্ধিমত কর না দিয়া পূর্ববৎ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তখন মানসিংহের আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমক্ আসিয়া বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া ফতেজঙ্পুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া লন।[৪৫] ধর্মনিষ্ঠ মানসিংহ শ্রীপুর পরিত্যাগ করিবার সময় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করেন।[৪৬]

মুকুন্দরাম রায় ঃ ভূষণা

সেনাপতি মুনেম খাঁ যখন (১৫৭৪) সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খাঁ নামক একজন সেনানী তাহার সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদ[৪৭] সরকারে বিদ্রোহ দমন করেন।[৪৮] ভূষণাই এই সরকারে প্রধান জমিদারি ছিল। ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' দেখিতে পাই, তখন অর্জুন নামক এক রাজা ফতেহাবাদের জমিদার ছিলেন।

> 'উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম
> মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম।'
>
> —দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১৬৭ পৃ.

এই অর্জুন রাজার সহিত পরবর্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্তসম্বন্ধ ছিল কিনা, জানা যায় না। দায়ুদের সহিত মুনেম খাঁর সন্ধি হইলে, মোরাদ জলেশ্বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দায়ুদ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া ভদ্রকের শাসনকর্তা নজর বাহাদুরকে হত্যা করেন, তখন মোরাদ পুনরায় ফতেহাবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়।[৪৯] মৃত্যুর পর তৎপ্রদেশীয় জমিদার ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম মোরাদের পুত্রগণকে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়া সমগ্র ফতেহাবাদের রাজা হন।[৫০] তোডরমল্ল তাহাকেই ভূষণার জমিদার বলিয়া

স্বীকার করেন (১৫৮২)। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে নামে মাত্র সামান্য পেশ্কস্ পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাণ করিতেন। কিন্তু কার্যত তিনি স্বাধীনই ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্যান্য ভুঁইয়াগণের সহিত নানাসূত্রে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দরাম দমিত হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খাঁ (১৬০৮) বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া আসিলে, তিনি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া কোচহাজো (কামরূপ) অধিকার করিয়া লন। তখন মুকুন্দরাম পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিৎকে রাখিয়া স্বয়ং ভূষণায় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পেশ্কস্ বন্ধ করেন। কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।[৫১] জাহাঙ্গীরের শাসনকালে যখন ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখন সত্রাজিৎ ঢাকায় আসিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফার্সি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কয়েকটি হাতি উপহার দিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন (প্রবাসী, ১৩২৬, ১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃ)। নবাব পুনরায় কোচহাজো অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রাজিৎ ছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ সত্রাজিৎ কোচহাজোর রাজাভ্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মোঘলের গতিবিধি সমস্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন সত্রাজিৎ বন্দি হইয়া ঢাকায় আনীত হইয়া নিহত হন (১৬৩৬)।

কন্দর্পনারায়ণ ঃ চন্দ্রদ্বীপ

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ দনুজমর্দনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়দেব অল্পকাল রাজত্বের পর অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৫২] তাহার একমাত্র কন্যা কমলার সহিত বলভদ্র বসুর বিবাহ হয়। কমলার পুত্র পরমানন্দ বসু রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগদানন্দ বাক্‌লার জলোচ্ছ্বাসে প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৪)।[৫৩] জগদানন্দের পুত্রের নাম রাজা কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারোভুঁইয়ার অন্যতম। কন্দর্পনারায়ণ বরিশালের নিকটবর্তী কচুয়া হইতে স্বীয় রাজধানী মাধবপাশা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া ১৪/১৫ বৎসরকাল সদর্পে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে ভুঁইয়াদিগের মধ্যে আত্মকলহে এবং মগ ও ফিরিঙ্গির (পর্তুগিজ) অত্যাচারে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। কন্দর্পনারায়ণ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন।[৫৪] ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ঈর্ষান্বিত হইয়া কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং মগাদি দস্যুর হস্ত হইতে দেশরক্ষাকল্পে কন্দর্প ও প্রতাপাদিত্য এই উভয় মহাবীরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে পরে এই সব ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা।...

লক্ষ্মণমাণিক্য ঃ ভুলুয়া

কথিত আছে পাঠানদিগের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশীয় রাজা বিশ্বম্ভর রায় চন্দ্রনাথ তীর্থে যাওয়ার পথে মেঘনা নদের এক নবোত্থিত চরে ভুলুয়া নামে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করেন।[৫৫] বিশ্বম্ভরের পর একাদশ পুরুষে লক্ষ্মণমাণিক্য প্রাদুর্ভূত হন। বীরত্বের খ্যাতিতে তিনি বারোভুঁইয়ার অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্রের বিবাদ ছিল। তাহারই ফলে রামচন্দ্র বহু রণতরী লইয়া গিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দি করিয়া আনেন। পরে রামচন্দ্রের আদেশে

মাধবপাশা রাজবাটিতে লক্ষ্মণ নিহত হন।[৫৬] লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু বীর ছিলেন না, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন।[৫৭]

প্রতাপাদিত্য ঃ

আমরা এ পর্যন্ত একাদশজন ভুঁইয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, এখন অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ; ইনি ভুঁইয়াগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং বীরত্বে ও রাজশক্তি পরিচালনায় সর্বাগ্রগণ্য। ইহারই জন্য এক সময় যশোহর প্রাচীন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া 'যশোহর' হইয়াছিল ; মোঘল আমলের যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান ব্যক্তি।... ২৫ বৎসর মাত্র প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল বা বীরত্বের যুগ হইলেও, পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া তাহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের কীর্তিকাহিনী এমন করিয়া যশোহর-খুলনার অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি এমনভাবে এদেশের সমাজকে অনুপ্রাণিত বা স্মৃতিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, যশোহর-খুলনা যেন 'প্রতাপময়' হইয়া গিয়াছে।...

মোঘলের বিপক্ষতাচরণ করাই ভুঁইয়ারাজগণের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এইজন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাহাদের মধ্যে পরস্পরের কোন প্রকার মিলন বা সহানুভূতি ছিল না। তাহাদের সকলেই কোনও না কোন ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অনুগৃহীত ছিলেন ; মোঘলের আক্রমণে যখন পাঠানেরা ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হইতেছিলেন, তখন তাহারা এই দেশিয় রাজন্য বা ভৌমিকগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। ভুঁইয়াগণ লবণের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সকলের এক উদ্দেশ্য, তাই তাহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা সম্পর্ক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের আত্মগরিমা বা জাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা যে ছিল না, তাহা নহে ; তবে আত্মরক্ষা এবং পাঠানদিগকে সাহায্য করাই প্রধান সাধনা হইয়াছিল। শুধু পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোঘল নহে, ভুঁইয়াদিগের আরও শত্রু ছিল ; দক্ষিণ ও পূর্বদিক হইতে আগত আরাকানী মগ, এবং ফিরিঙ্গি বা পর্তুগিজ দস্যুগণের পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন ও মনুষ্যশূন্য হইয়া যাইতেছিল ; সকলের না হউক, অন্তত যাহাদের রাজ্য সমুদ্রকূলবর্তী, তাহারা প্রজার জীবন রক্ষার জন্য এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া পারিতেন না। তাই সময়ে সময়ে কয়েজন মিলিয়া এই সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন। সে শত্রুগণও সহজ দস্যু নহে, তাহারাও রাজনৈতিক কূটকৌশলে অতুলনীয় ; নানাভাবে ভুঁইয়াদিগের দরবারে প্রবেশলাভ করিয়া কখনও উৎকোচ উপহার দিয়া, কখনও স্বার্থের মোহে অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিদ্বারা ভুঁইয়াসম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসানল জ্বালাইয়া দিত। তখন ভুঁইয়াগণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরঙ্গ বা নদীবক্ষ নররক্তে রঞ্জিত করিয়া নিজেরাই দুর্বল হইয়া পড়িতেন। মোঘলের বিপুল বাহিনী যাহাদের দ্বারে দ্বারে হানা দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে এইরূপভাবে বলক্ষয় বা ধনক্ষয় দ্বারা দুর্বল হইয়া পড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয়ই ছিল, এবং তাহাতে উহাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচার মোঘলেরই কার্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভুঁইয়াদিগের পতন হইয়া গেল, তখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোঘলদিগকে অসংখ্য রণতরী পাঠাইয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সকল শত্রু নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের বারোভুঁইয়া পরাক্রান্ত আকবর বাদশাহের রাজশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল ; যদি সে পরীক্ষায় আকবর জয়ী না হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজদণ্ড কাহার হস্তে শোভা পাইত তাহা বলা যায় না! সময় অল্প বা সুযোগ স্বল্প হইলেও, ভুঁইয়াগণ আপন আপন ক্ষেত্রে যে রণদক্ষতা ও রাজনৈতিক মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর পক্ষে মানসিংহ বা তোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা না থাকিলে, তাহারা বঙ্গের ভাগ্য নূতন করিয়া গড়িতে পারিতেন। অবশেষে ভুঁইয়াদিগের অভ্যুত্থান বিফল হইলেও তাহাদের

শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফল বহুদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইব। তাহার সাধনার ফলে এমনভাবে যশোহর-খুলনার ভাগ্যসূত্র সমগ্র বঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের ইতিহাসকে বঙ্গেতিহাস হইতে পৃথক করা যায় না।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' থেকে সংকলিত

---

১. Bourdillon, J. A.—*Bengal under the Mahomedans,* p. 23.

২. Smith, V.A.—*Akbar,* p. 147.

৩. ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যেন ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরীপ।।
উজীর হইল রায়জাদা, পেবারির দেয় খেদা, ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ারে চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়লি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।।
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ৫ পৃ

৪. 'Bhati is a low country and received this name because Bengal is higher'—*Akbarnama,* (Beveridge), Vol III, pp. 645-6 'The low marshy lands of Hegellee anciently called Batty as being in a great part subject to the overflowing of the tide.'—*Fifth Report,* p. 257 ; *cf. also,* Jarrett, Vol. II, p. 116 ; Blochman, p. 342 , J. A. S. B. for 1873 p. 226, for 1913 p. 446 ; Elliot, Vol VI, p. 72.

৫. মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৫৫-৬ শ্লোক।

৬. 'বার ভুঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।'—মাণিক গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল, সা,প,সং ১৫১ পৃ
'বারভুঞে বেষ্টিত ভূপতি করা ভূষা'—ঐ, ১৫০ পৃ
'ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ,
রায়রেঞা বার ভুঞা বৈসে সারি সারি,
কোলে করি কাগজ যতেক কর্মচারী।'—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং ১৫১ পৃ
'হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভুঞা,
রায় রাঞা মোঘল পাঠান মীর মিঞা।'—ঐ,- ১৭৬ পৃ
'গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজা,
আর কত ভুঞা রাজা সবে করে পূজা।'—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

৭. 'It is not clear why the number *twelve* should always be associated with them. Both in Bengal and Assam, whenever they are enumerated, twelve persons are always mentioned but the actual names vary.'—Gait, Edward, *History of Assam,* p. 37.

৮. ভ্রমণকারী Manrique ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ্যের রাজ্যাভিষেককালে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং উহার বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—'... that the new dignitary had himself proclaimed, not only Lord of the twelve Boines (Bhuiyas) of Bengala, but of the twelve kings on the crown of whose heads the soles of his feet always rested'—Hosten's *Twelve Bhuiyas of Bengal,* J. A. S. B. Vol. IX, p. 447 ; Manrique, S.—*Itinerario,* p. 206 , *Historical Accounts of Discoveries and Travels in Asia,* Vol. I, pp. 110-11.

৯. 'The reports of the Jesuit missionaries for the Mogul period possess special value, having been written by men highly educated, specially trained and endowed with powers of keen observation.'—Smith, V. A.—*Oxford History of India,* p XXI.

১০. Nicholas Pimenta, Francis Fernandez, Dominic da Sousa, and Andrewes Bowes.

১১. Du Jaric, Pierre—*Histoire des Indes orientales*. Bordeaux, 1608. ইহার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদের জন্য নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' ৪৩৯-৫৯ পৃ দ্রষ্টব্য।

১২. 'All the Patans and native Bengalis obey these Boyons ; three of them are Gentiles namely those of Chandican, of Sripur and of Bacala. The others are Saracens.'—J. & Pro. A. S. B. (H. Hosten.) 1913, p. 437-8 ; Purchas—*Pilgrimes*, Part IV, Book V, p. 511. আরও পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের পুস্তকে এই ভুঁইয়া (Boyons of Bujoes of Bengala) দিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে Philip De Brito এবং Bishop Dom Pedro, এই দুই জন প্রধান।—*Ibid.* শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামান্তর ; বরিশাল বা চন্দ্রদ্বীপের নাম বাক্‌লা ; প্রাচীন যশোর বা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্য নাম চ্যাণ্ডিকান। ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

১৩. *Asiatic Researches*, Vol. XIV, (Wilford), p. 451 ; Blochmann—*Contributions to the History Geography of Bengal*, 1873, p. 18.

১৪. J. A. S. B. 1874, (Dr. J. Wise), pp. 214 ; 1875, pp. 181-3 ; Beveridge—*Bakarganj*, p. 29 ; J. A. S. B. 1904, pp, 57-63.

১৫. Sebastian Manrique নামক স্পেনদেশীয় ভ্রমণকারী ১৬২৮ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি স্বদেশে গিয়া *Itinerario de las Missiones* নামক এক গ্রন্থ রোম হইতে প্রকাশিত করেন। উহা সাধারণতঃ Manrique's Itinarary বলিয়া পরিচিত।

১৬. বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর—'বাংলা নগরী', শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা। এই পুস্তকে বিভারিজ বাক্‌লাকে এবং হোষ্টেন টাড়াকে বাংলা বলিতে চান, এইরূপ আরও অনেক মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। *Beveridge—Bakarganj*, p.445 ; J. A. S. B. 1913, (Hosten), pp. 444-5.

১৭. 'Minimican, son of Massacan, who had been Emperor of Bengal before the Moors conquered it'—An unpublished letter of Fr. John Cabral, 1633. Monomohan Chakravarti identifies Massacan with Muchha Khan, son of Isa Khan of Katrabuh,—J. A. S. B. 1913, p. 445 ; 'বাংলা নগরী', ৫০ পৃ।

১৮. *Ain* (Blochmann), p. 373 *note* ; Dorn—*History of the Afghans*, Vol. I p. 183. হিজলিতে ঈশার দুর্গের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯. A letter written on the 13th of October, 1812, by Mr. Crommelin, Collector of Hidgellee, quoted by Mr. Price, Settlement Officer of Midnapur, in his report on Majnamutha, 1874-5, as well as by Mr. Bayley's Settlement Report of Jalamutha Estate, 1844, both preserved in the Midnapur Collectorate. উহা হইতে জানিতে পারি যে, হিজলি রাজ্যের কর্মচারী কৃষ্ণ পাণ্ডে এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক যথাক্রমে জ্বালামুটা ও মাজনামুটা জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্দরী ও মসনদ-আলি একই কথা ; সে যুগে যে কোন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়া কীর্তিত করিতেন।

২০. ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব্ রায় (১৫৮৮-১৬১৯) প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করেন। তৎপুত্র কন্দর্প রায়ের সময়ে মানরিক্ আসিয়াছিলেন। তিনি এই কন্দর্পকেই যশোহরের ভুঁইয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—Westland, *Report of Jessore*, p. 45 ; Hunter—*Statistical Accounts*, Vol. II, p. 203 ; আনন্দনাথ রায়—'বারোভুঁইয়া', ১৯৪ পৃ।

২১. যশোহর-খুলনার ইতিহাস।

২২. রোহিণীকুমার সেন—'বাক্‌লা' ; Beveridge—*Bakarganj*, p. 121

২৩. *Ain-i-Akbari* (Blochmann), 340 ; Smith—*Akbar*, p. 242.

২৪. পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে নানা জনে নানা ভাবে ভুঁইয়াদিগের গণনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় জেসুইট মিশনারীদিগের প্রমাণানুসারে আমাদের তালিকাভুক্ত প্রথম চারিজনকেই ভুঁইয়া বলিয়া স্বীকার করেন ('প্রতাপাদিত্য' ৪৭-৫০ পৃ)। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী ('প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত', ২ পৃ) প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সাঁতোড়ের নামোল্লেখ না করিয়া 'পাবনা' লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিতে চান,

কিন্তু আমরা যে সময়ের আলোচনা করিতেছি, তখনও দিনাজপুরের রাজ্যের উৎপত্তি হয় নাই (কালীপ্রসন্ন—'নবাবী আমল')। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহোদয় ('কেদার রায়', ১০ পৃ) চাঁদ গাজি ও ফজল গাজিকে পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া মাত্র ১০ জনের নাম দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রমাণাভাবে পুঁটিয়া, তাহিরপুর ও দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আনন্দনাথ রায় মহাশয় 'বারোভুঁইয়া' নামক পুস্তকে কত ভুঁইয়ারই উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে ১২ জন বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। মোট কথা, সে পুস্তকে ঐতিহাসিকের মত কোন বিচার বা শৃঙ্খলা কিছুই নাই। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় 'নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাসে' বারোভুঁইয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে নাম দেন নাই। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহোদয় 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' নামক বিরাট গ্রন্থে বারোভুঁইয়ার তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে আমাদের তালিকার প্রথম ৯ জনের নাম আছে। ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়া আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পূর্ণিয়ার অজানিত রাজাকে অবশিষ্ট ভুঁইয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

২৫. Elliot—Vol. VI, p. 105 ; J. A. S. B. Vol. XLIII, 1874, pp. 199-201.

২৬. 'According to tradition, the principality ruled over by this family consisted of the Pergannahs, now called Chand-Pratap, then Chandgazi, Telibabad or Tala Gazi and Bhawal of Bara Gazi'—Dr. Wise,—*Bara Bhuia,* in J. A, S. B. 1874, p. 201.

২৭. *Annals of Rural Bengal,* Vol. I, App. I ; *Statistical Accounts,* Vol. IV, p. 230 ; 'বাংলার ইতিহাস' (কালীপ্রসন্ন)।

২৮. 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস', ১২৩ পৃ ; 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ১১৭-৮ পৃ ; 'নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাস'।

২৯. এই রাজ্যের অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহাকে সান্তালি বলা হইত। সান্তালি বৈদিক ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ। বাংলা ভাষায় ইহাকে সাতৈর, সাতৈল বা সাঁতোড় প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া আছে। এক্ষণে সাতৈরের সে নাম বা রাজপ্রতিপত্তি নাই। জেলার বিবরণীতে সাতৈরের শীতলপাটি বিখ্যাত, এই মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।—Hunter, *Statistical Accounts,* Vol. V, p. 292.

৩০. 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস', ১১৯ পৃ, বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যায় না, এইজন্য এই গ্রন্থ আলোচ্য ; 'বাংলার ইতিহাস' (রাখালদাস), ২য় খণ্ড, ১৮৬-৭ পৃ ; 'নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাস'।

৩১. Mitra, Kishori Chand, *The Rajas of Rajshahi,* —Calcutta Review, 1873, p.3.

৩২. Badaoni, II, p. 174 ; *Ain.* (Blochmann), p. 366.

৩৩. কতলু খাঁ তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—নসিব শাহ, লোদী খাঁ, এবং জামাল খাঁ ; ঈশা খাঁ লোহানীর পুত্র ছিল—সুলেমান, ওয়ালী, মুলহী এবং ইব্রাহিম (*Makhzan-i-Afghani*) See, Dorn—*History of the Afghans,* Vol. II, p. 115. ব্লকম্যান ঈশার এক পুত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। কতলুর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তৎপুত্র নসিবের নামে উড়িষ্যার সনন্দ গৃহীত হয়, তজ্জন্য নসিবের নামে 'শাহ' সংযোগ দৃষ্ট হয়। তৎপুত্র জামাল খাঁ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন।

৩৪. ইনি মিঞা বা খ্বাজে ঈশা খাঁ লোহানী নামে কথিত হন। সে যুগে মুসলমানদিগের মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শাসকরূপে গদিতে বসিতেন, তিনিই 'মসনদ-আলি' উপাধিভূষিত হইতেন। উহারই অপভ্রংশে 'মছন্দরী' হয়। নাটকে নভেলে গল্পকথায় এই ঈশা খাঁ মছন্দরীর সহিত যশোরের রাজা বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা শুনিতে পাই। 'মগজানী আফগানী' নামক ইতিহাস হইতে জানিতে পারি : 'After him (Kotloo), Isa Khan Lohani Miankhail, his Prime Minister, seized the reins of the state and held up the banner of sovereignty for the space of *five* years ; during which he gallantly fought Akbar's legions until he also took leave of life.'—Dorn *History,* Vol. I, p. 183. ষ্টুয়ার্ট সাহেব তদীয় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। (*See,* Stewart, *History of Bengal,* sect. VI.) তিনি বলেন '... as long a as Khuaje Issa, the Prime Minister of the Afghans, lived the peace was preserved inviolate on both sides.' কিন্তু যখন মগজানী আফগানী ষ্টুয়ার্টের উক্তির মূল গ্রন্থ, তখন তাহার

অনুবাদের 'পাঁচ বৎসর' অবিশ্বাসযোগ্য নহে। Dorn কৃত অনুবাদের ১ম খণ্ডে Dr. Lee কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে '৫ বৎসর' ভুলের তালিকায় পড়ে নাই। সম্ভবত ঈশা খাঁ অবশিষ্ট ৫ বৎসর জীবনের মধ্যে প্রথম দুই বৎসর উভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোঘল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেই মানসিংহ আকবরের অনুমতি লইয়া (১৫৯২) পুনরায় উড়িষ্যায় গিয়া যুদ্ধ জয় করেন এবং কটক ও পুরী দখল করিয়া উড়িষ্যা মোঘল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। —*Stewart, History*, p. 208 (Bangabasi edition) *Ain.* (Blochmann), p. 340. মানসিংহ এবার আফগানদিগকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দেন। সম্ভবত এই সময় হইতে হিজলিতে ঈশা খাঁ ও তৎপুত্রগণের প্রধান কেন্দ্র হয়।

৩৫. মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যখন উড়িষ্যা অভিযানের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তাহার পুত্র জগৎসিংহ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রবর্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে কারারুদ্ধ হন। পরে কতলুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়া উভয় পক্ষের সন্ধির সাহায্য করেন। এই মূল ঘটনার উপর ভিত্তি রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। ষ্টুয়ার্ট ওসমানকে কতলুর পুত্র বলিয়াছেন, ডর্ণের পুস্তকেও এক স্থলে (Vol. I, 183) তিনি দায়ুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। Dr. Lee এই ভুল সংশোধন করিয়াছেন। (Dorn, Vol. II, *Annotations*, p. 115) বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ধরিয়া লইয়াছেন। উহাই ঠিক, কারণ ঈশা কতলু খাঁর সহোদর ভ্রাতা না হইলেও জ্ঞাতি ভ্রাতা যে ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

৩৬. ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর "Sulaiman 'reigned' for a short time. He killed, in a fight with the Imperialists, Himmatsingh, son of Raja Mansingh."—*Ain.* (Blochmann), 2nd ed., p. 586 ; Dorn, Vol, I p. 183. 'Usman succeeded him and received form Mansingh lands in Orissa and Satgaon and later in Eastern Bengal, with a revenue of 5 or 6 *lacs* per annum.' — *Ain. (Ibid).* ওসমানের শেষ পরাজয় উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয়, সে সময়ে ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থান যে ঢাকা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে ছিল, তাহা ব্লকম্যানও বলিয়াছেন, ডর্ণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধস্থানকে ঢাকা কোহিস্তান (Kohistan of Dakka) বলিতে চান। —Dorn, Vol. II, p. 116. Firishta, Part IV, p. 358, ও Stewart, p. 275—এই দুই স্থানে ইহার বর্ণনা আছে। ষ্টুয়ার্ট যুদ্ধের স্থান সুবর্ণরেখা তীরেই নির্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি হয়ত ঢাকার নিকটবর্তী অন্য কোন যুদ্ধের বর্ণনা ইহার সহিত ভুলক্রমে যোগ করিয়া দিয়াছেন। *(See*, Hunter—*Orissa* Vol. II, p. 23)। ব্লকম্যানের (Ibid) নিজের মূল 'মগজানী' পুঁথিতে যুদ্ধস্থানের নামে 'Nek Ujyal' আছে। আমরা এই Ujyal-কে হিজলি মনে করি এবং হিজলিই ওসমানের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ওসমানের পরাজয় সম্বন্ধে *Tuzuk-i-Jahangiri* (Rogers and Beveridge), Vol. I, pp. 208-14, এবং *Riaz-us-Salatin* (Salam), pp. 174-9 দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি 'বহারিস্থান' নামক নবাবিষ্কৃত ফার্সী গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে, এই যুদ্ধস্থান শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল। এখনও এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই।

৩৭. 'The King of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogol slew their last King. After which twelve of them (*i. e.* the Bhuyas) joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Mogolls and still, notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur and of Ciandecan, and above all Moasudalim.'—Purchas, *Pilgrimes*, part IV, Book V, p. 511. আকবরনামায় আছে ; 'Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness and made the twelve Zemindars of Bengal subject to himself.'—*Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 648.

৩৮. ঈশা খাঁর জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য রাজপুত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুসেন শাহের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশা ও ইসমাইল নামে তাহার দুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে শের খাঁর পুত্র সেলিম খাঁ যখন গৌড় আক্রমণ করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাহার পুত্র ঈশা ও ইসমাইল তুর্কী হস্তে বন্দি হন। পরে তাহার খুল্লতাত কুতবউদ্দীন উহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের দুই কন্যার সহিত উহাদের বিবাহ দেন। [Ain. (Blochman), p. 342 ; J. A. S. B. 1874, p. 210.] ইহার সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রথমত তাহার খুল্লতাত

কুতবউদ্দীন কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ তাহাকে 'মাতুল' বলেন, কিন্তু উহারও প্রমাণ নাই। ('গৌড়ের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃ)। দ্বিতীয়ত, মুসলমানেরা কখনও মুসলমান বন্দিকে দাসরূপে বিক্রয় করেন না ; তাহা হইলে সুলেমানের পুত্রগণ কিরূপে বিক্রীত হইলেন, বুঝা যায় না।—*Akbarnama* (Beveridge), III, p. ৮48, *Note.* কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ফতেমা ঈশার মাতা ছিলেন।—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কেদার রায়' ; ৩০ পৃ।

৩৯. স্বরূপচন্দ্র রায়—'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' ১০৩-০৪ পৃ ; Bradley-Birt—*Romance of an Eastern Capital*, pp. 78-80 ; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'কেদার রায়', ৩২-৩৩ পৃ।

৪০. *Ain.* (Blochmann), p. 400 ; *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, pp. 657-60.

৪১. 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', ৫৬ পৃ।

৪২. কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়। সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, চাঁদ ও কেদার রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র।—'কেদার রায়', ১৯-২১ পৃ। কি জন্য ইহাদের পূর্বপুরুষ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহারা অকুলীন বলিয়া দেশিয় ঘটককারিকাদি ইহাদের সম্বন্ধে নীরব। এই জন্য এই প্রসিদ্ধ ভুঁইয়াবংশ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা যায়।

৪৩. *Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 119.

৪৪. Campos—*Portuguese in Bengal*, p. 71 ; Purchas—*Pilgrimes*, Part IV, p. 513. কার্ভালোই মুণ্ডা রায়কে হত্যা করেন, ইহাই পর্তুগিজ ইতিহাসের মত।

৪৫. Elliot, Vol. VI, p. III ; আনন্দনাথ রায়—'বারোভুঁইয়া', ১০৭ পৃ ; 'কেদাররায়', ৬১ পৃ।

৪৬. মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে অম্বরে লইয়া যান নাই; তিনি কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবী মূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মূর্তি এখনও 'সল্লাদেবী' নামে অম্বরের রাজধানীতে পূজিত হইতেছেন। নিখিলনাথ রায়,—'প্রতাপাদিত্য', ৪৯৮-৫১৩ পৃ দ্রষ্টব্য।

৪৭. ফতেহাবাদকে সাধারণতঃ এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবত বঙ্গেশ্বর ফতে শাহের রাজত্বকালে (১৪৮২-৮৭) ফতেহাবাদ নামের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ হইতে আরম্ভ করিয়া হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি বহু নৃপতির ফতেহাবাদ নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়।—*Catalogue of Coins in Indian Museum*, Vol. II, part II, Nos. 153-54, 163, 169-70 and 202.

৪৮. *Ain-i-Akbari* (Blochmann), p. 374.

৪৯. মোরাদ সম্ভবত খানখানান্‌পুরে অবস্থিতি করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন নিকটবর্তী রাজবাড়িতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজধানী ছিল (*Riaz-us-Salatin*, p. 42) ; কিন্তু তদ্ব্যতীত ভূষণা যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে। দিগ্বিজয়প্রকাশে দেখিতে পাই, ধেনুকর্ণ রাজার পুত্র কণ্ঠহার 'বঙ্গভূষণ' উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং তিনি যশোরের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া ভূষণ বা ভূষণা নাম রাখেন। মুকুন্দরাম ও সীতারামের সময়ে ভূষণা বহু বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী ছিল, সে পরিচয় পরে দিব। পাদশানামা এই মুকুন্দকেই 'Mukindra of Bosnah' বলিয়াছেন।

৫০. 'Murad Khan died a natural death. Mukund, the landholder of that part of the country, invited his sons as his guests and put, them to death and laid hold of his estate.'—*Akbarnama* (Beveridge), Vol. III, p. 469.

কেহ কেহ বলেন মুকুন্দ মোরাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাহার পুত্রগণকে ভূ-বৃত্তি প্রদান করেন ('বারোভুঁইয়া', ১৩৮ পৃ) ; ব্লকম্যান সাহেব সুন্দরবনে মোরাদখানা নামে এক আবাদি মহল ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। উহা মুকুন্দ প্রদত্ত ভূভাগ হইতে পারে।—J. A. S. B., 1873, p. 229.

৫১. 'বারোভুঁইয়া', ১৩৮ পৃ। ষ্টুয়ার্ট, ওয়াইজ বা অন্য কেহ মুকুন্দরামের পতনের কথা উল্লেখ করেন না। মানসিংহের অনুপস্থিতিকালে (১৫৯৩-৪) যখন সৈয়দ খাঁ বঙ্গের সুবেদার হন, তখন হয়ত মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ হয়। ইসলাম খাঁর সময়ে মুকুন্দ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সত্রাজিৎই মোঘল শাসকদিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন। ব্লকম্যান বলেন, 'Satrajit gave Jahangir's Governors of Bengal no end of troubles, and refused to send in the customary peskash or do homage at the Court of Dacca.' For Said Khan, *See, Ain*, (Blochmann), pp. 331-2.

৫২. এ প্রসঙ্গে—রোহিণীকুমার সেন, 'বাকলা' দ্রষ্টব্য।

৫৩. আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছ্বাসের বর্ণনা আছে [See, (Jarrett) Vol. II, p. 123] ; এই জলপ্লাবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বাকলা বিনষ্ট হয়। ঘটকগণের কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজপুত্র জগদানন্দ এই প্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবুল ফজল সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে জগদানন্দের স্থলে তাহার পিতা পরমানন্দের নাম করিয়াছেন।—'বাকলা'। ব্লকম্যান এই ঘটনার তারিখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন।—J. A. S. B., 1868, Dec. ; *See also*, Beveridge—*Bakarganj*, p. 28.

৫৪. র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক এক ভ্রমণকারী ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাকলা পরিদর্শন করিয়া কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। *See*, Hackluyt's *Voyages*, Vol. II, p. 257 ; 'বিশ্বকোষ', ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃ। কন্দর্পের সময়ের একটি পিত্তলের কামান এখনও বর্তমান আছে।—'বাকলা' ; J. A. S. B., 1875, p. 207.

৫৫. ভুলুয়ার পত্তন সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। Dr. Wise উহার আলোচনা করিয়াছেন। (J. A. S. B., 1874, p. 203)। ভুলুয়ার পত্তনের সময় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ বিজয় ধরিলে, তদপেক্ষা অন্ততঃ ৩৭৫ বৎসর পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের আবির্ভাব ধরিতে হয়। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থে (৩৯৪ পৃ) ভুলুয়া রাজবংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে লক্ষ্মণ বিশ্বম্ভরের ৭ম পুরুষ। সে হিসাব ঠিক হইলে আনুমানিক ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে বা বঙ্গের স্বাধীন পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে ভুলুয়ার পত্তন ধরিতে হয় ; অথবা লক্ষ্মণকে সপ্তম পুরুষ না বলিয়া ১১শ পুরুষ ধরিতে হয়—'বিশ্বকোষ' ১৭শ খণ্ড, ১২২ পৃ।

৫৬. কেহ কেহ বলেন বীর লক্ষ্মণমাণিক্য অসজ্জিতভাবে রামচন্দ্রের রণতরীতে গেলে, রামচন্দ্র অন্যায়রূপে তাহাকে বন্দি করেন। ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ঘটককারিকায় আছে, রামচন্দ্র 'জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং। স্বরাজ্যে হ্যানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দুলং।।' সুতরাং যুদ্ধে জয় করিয়া বন্দি করাই সম্ভবপর।—'রাজমালা' ৩৯৮ পৃ ; নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য', ৭৩ পৃ। আনন্দনাথ রায় মহাশয় রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণের প্রাণদণ্ডের কথা বিশ্বাস করেন না ; তিনি বলেন, ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে সন্দীপে মগদিগের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, লক্ষ্মণমাণিক্য তথায় বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। —'বারোভুঁইয়া', ১৫৭ পৃ।

৫৭. কথিত আছে, লক্ষ্মণমাণিক্য শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র মত 'বিখ্যাত বিজয়' নামক এক বীররস-প্রধান সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে 'শ্রীমল্লক্ষ্মণভূপতেরভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ' বলিয়া ভণিতা আছে।—'রাজমালা', ৩৯৬-৭ পৃ।

বারোভুঁইয়া

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে, বঙ্গভূমির অধিকার লইয়া মোঘল, পাঠান, মগ, পর্তুগিজ ও বাঙালির মধ্যে যে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহারই একটি সামান্য চিত্রপ্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করা যাইতেছে। এই বারোভুঁইয়া প্রবন্ধটি তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

বাংলাদেশ বহুদিন হইতে বারোভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মোঘলবিজয়ের সময় যে সমস্ত পরাক্রান্ত ভুঁইয়া আপনাদিগের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে কেবল তাহাদেরই বিবরণ প্রকটিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে আমরা বারোভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বাংলাদেশ বহুদিন হইতে বারোভুঁইয়ার মুলুক নামে কথিত হইয়া থাকে ; এবং আসাম প্রদেশেও এই বারোভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকানের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বারোভুঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন।[১] যে বারোভুঁইয়ার সহিত বাংলা, আসাম ও আরাকান প্রভৃতির সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যে অবশ্যকর্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা প্রথমে বারোভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ স্থির হয় যে, পালরাজগণের রাজত্বকালে এই বারোভুঁইয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বারোভুঁইয়াগণ প্রাচীন রাজনীতিসম্মত রাজমণ্ডলান্তর্গত দ্বাদশ নৃপতির[২] স্থানে পরবর্তীকালে দ্বাদশ সামন্তরাজ-রূপে গণ্য হইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। সে যাহা হউক, বাংলার বারোভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—কোনও এক সময়ে বারো জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইবার পূর্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বারো বৎসর পর্যন্ত তাহার পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির নির্মাণ ও পুষ্করিণীখননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বারোভুঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।[৩] এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর থাকায়, সম্ভবত ভুঁইয়াগণ তাহাদের অধীনস্থ সামন্তরাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বারোভুঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের রাজত্ব ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারোভুঁইয়াগণ অনেকদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্পুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাহাদের অনেক কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার তিন জন প্রাচীন ভুঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।[৪]

পাল-বংশের পর সেন-বংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহাদের সময়ে উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারোভুঁইয়াগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু সে সময়ে মূল বারোভুঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহাদের স্থানে নূতন নূতন ভুঁইয়া

নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাহারা বারোভুঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন। পাঠান-রাজত্বকালে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। ইহারা রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের ভূমি জায়গির প্রাপ্ত হন ; এবং কয়েকজন হিন্দু ভুঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাহারাও বারোভুঁইয়া নামে কথিত হইতেন। মোঘল-বিজয়ের সময় উক্ত বারো জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু ছিলেন, জানা যায়। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ব্যাপিয়া তাহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনও ভুঁইয়ার অধিকার ছিল কি না, জানা যায় না।[৫] হিন্দু তিন ভুঁইয়া শ্রীপুর, বাকলা ও যশোরের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলি সর্বপ্রধান ; তিনি অপর একাদশ জন ভুঁইয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতেন। বৌটন রোজ ও জেম্‌স ওয়াইজ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে বারোভুঁইয়ার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, উক্ত বারো জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ছিলেন।[৬] এই বারো জন ভুঁইয়া অনেক সময়ে মিলিত হইয়া মোঘলগণকে বাধা প্রদান করিতেন, এবং তাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবারো জন্য মোঘলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তাহারা পরস্পরের সহিতও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গিদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণও বঙ্গভূমিতে অধিকারবিস্তারের জন্য অল্প চেষ্টা করেন নাই। এইরূপে মোঘল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গি ও বাঙালির মধ্যে সেই সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোঘলেরাই বিজয়লাভ করে। বারোভুঁইয়ার মধ্যে যে তিন জন হিন্দু ছিলেন, তাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই বঙ্গজকায়স্থ। লক্ষ্মণমাণিক্য ও মুকুন্দরাম রায়—যাহারা কাহারও কাহারও মতে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন—তাহারা বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত দুই জন্য যে বারোভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন না, আমরা পূর্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভুলুয়ার রাজগণ চিরদিন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। এবং আকবরনামায় মুকুন্দরাম রায়কে একজন জমিদারমাত্র বলিয়া দেখা যায়। বিশেষত জেসুইট প্রচারকগণ যখন সে সময়ে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নয় জন মুসলমান ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহাদের বিবরণ কোনও মতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত বারো জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান হওয়ায় তাহারা সুচারুরূপে ধর্মপ্রচার করিতে পারেন নাই।[৭] এই নয় জন মুসলমানের মধ্যে ঈশা খাঁ সর্বপ্রধান ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ ফিচ্‌ ও জেসুইট প্রচারকগণ তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপর আট জনের বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ ভাওয়ালের গাজি বংশকে অন্যতম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৌটন রোজের গ্রন্থে চাঁদপ্রতাপের জোনা গাজি ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জোনা গাজি সম্ভবত সোনা গাজি হইবেন। কিন্তু ওয়াইজ ভাওয়ালের ফজল গাজিকে ভুঁইয়া বলিয়াছেন। ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ গাজি-বংশের অধীন ছিল। সম্ভবত উক্ত বংশের দুইজন দুই ভুঁইয়া হইতে পারেন। হিজলির মসনদআলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলি তৎকালে ভাটি বা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলির মসনদআলিগণ অন্যতম ভুঁইয়া হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু জেসুইট প্রচারকগণের আগমনের পূর্বে ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে তাহাদের অন্তর্ধান ঘটিয়াছিল। তবে মোঘলবিজয়ের সময় তাহারা বর্তমান ছিলেন বলিয়া, তাহারা জেসুইট প্রচারকগণের উল্লিখিত নয় জনের অন্যতম হইতেও পারেন। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে

বিশেষ কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। উক্ত নয় জনের মধ্যে অনেকে ঘোড়াঘাট বা রঙপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। কারণ, তৎকালে ঘোড়াঘাট প্রদেশ পাঠানদিগের অন্যতর প্রধান বাসস্থান ছিল এবং মোঘলদিগকে ঘোড়াঘাট জয় করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ফলত, আমরা বিশিষ্ট প্রমাণে কেবল চারি জন ভুঁইয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। সুখের বিষয়, তন্মধ্যে তিন জন হিন্দুরই বিবরণ জানা গিয়াছে। সেই তিনজন বাঙালি ভুঁইয়া কিরূপে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিবারো জন্য বাঙালিমাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাহাদের যথাযথ বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমত আমরা ভুঁইয়াগণের সর্বপ্রধান ঈশা খাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশ মোঘলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। ঈশা খাঁর বিবরণের পর আমরা তিন জন হিন্দু ভুঁইয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

সাহিত্য ১৩১১ আষাঢ়

---

১. "The kings of Aracan and Commillah were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the twelve bhouiyas, bhatties, or principalities of Bengal."—*Wilford ; Ancient Geography of India, vol XIV., of Asiatic Researches. P. 451.*

২. মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীযোশ্চ চেষ্টিতং। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।। অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ।।
—মনুসংহিতা ; ৭ম অধ্যায়।

৩. "The Kocchis then gave a line of princes to Kamrup ; at this time a part of Upper Assam was under a mysterious dynasty called the Bhara Bhuya, of which no one has ever been able to make anything but it is in all probability connected with the following tradition which Buchanon gives in his Account of Dinajpur :—'On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Karotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup), but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhugyas to which the Rajahs of Kasi (Benares) and Bhettiah also belong."—*Dalton's Ethnology of Bengal.*

বুকানন হামিল্টনের মতে, ইহারা বর্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্টন তাহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিতে চাহেন। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, বলিতে পারি না ; কারণ, উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্যবংশীয় কি না সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বারোভুঁইয়ার অধিকাংশ পালবংশীয় ছিলেন। পালবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; সুতরাং তাহাদের স্বজাতীয়গণ আর্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানন যে কাশী ও বেতিয়ার রাজাদিগকে বারোভুঁইয়াগণের একজাতি বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্তমান ভূমিহারগণকে অনেকে মূর্ধাবষিক্ত বলিয়া থাকেন। মূর্ধাবষিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হন। কোন কোন স্মৃতির মতে তাহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাহাদিগকে সাধারণত 'বাভণ'ও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলালিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাভণ শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ। তাহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কিঞ্চিৎ হেয়। ফলত বারোভুঁইয়ারা সেন বংশীয় হইলে যে আর্যবংশীয় জাতি, সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমরা এ স্থলে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভুঁইয়া শব্দ,

সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ বা পালি ভূমিন্দো, ভূমিপালো, ভূমিপো বা ভূম্মো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদগণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণ ভুঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।

৪. "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of the Boorigonaga and Dulluserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Just Pal resided at Moodabpore in the pargunnah of Toollipahed. Harischonder at Cotebarry near Sabar, and Sinopal at Copassia in Bhowal.

"The Rungpore branch of Booneahs, it is well known, ruled at one time the ancient kingdom of Kamroopa."—*Taylor's Topography of Dacca.*

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga, and Dhaleswari, where the sites of their capitals are still to be seen."—*Hunter's statistical Account of Dacca.*

৫. প্রতাপাদিত্যচরিত্র-রচয়িতা রামরাম বসুর মতে, উক্ত বারোভুঁইয়াগণের অধিকার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম পর্যন্ত বিস্তৃতির কথায় বোধ হয়, আসামের প্রাচীন বারোভুঁইয়াগণের কথা তখনও বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বাংলার শেষ বারোভুঁইয়াগণের অধিকার যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না।

৬. "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogoll slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocraccy and vanquished the Mogolls (it seems this was in the time of Emmadan paxda) and still not withstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur, and of Ciandecan, and above all Moasudalim Nine of them Mahametans."—*Purcha's Pilgrims, The fourth Part. Book V. P. 511.*

ফার্নান্ডেজের বিবরণে শ্রীপুর ও চণ্ডিকান বা যশোহরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য নয় জনকে মুসলমান বলা হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট হিন্দু ভুঁইয়া কে ছিলেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। ডুজারিক সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তাহার মতে, অপর হিন্দু ভুঁইয়া বাকলার অধীশ্বর।

"According to Dee Janie, the three Hindu princes were those of Sripur, Chandican and Bacala."—*Beneridge's District of Bakargunj. P. 29, Note.*

ফার্নান্ডেজ কেবল ক্ষমতাশালী ভুঁইয়াদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময় বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাহার দলভুক্ত প্রচারক ফলসেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র ও তাহার রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। পরে তাহা লিখিত হইতেছে।

৭. "Pimenta commences by giving a short sketch of the history of Bengal, and states that the government of it was at that time in the hands of twelve princes who had formed a secret league among themselves, and had got the better of the Moghals. He adds that the most powerful of the twelve were the lords of Sripur and chandecan, but above all the Moasadali, or Masauddin(?) perhaps this is Isukhan Masudd-i-Ali of Khizrpur, described by Dr. wise as the most celebrated of the twelve bhuyas. Nine of the twelve, says Pimenta, are Mahomedans, and this circumstance very much retards the work of conversion."—*Beveridge's Bakargunj. P. 29.*

পাইমেন্টা গোয়ার পাদরী ছিলেন। তাহার নিকট ফার্নান্ডেজ প্রভৃতি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত পত্র পরে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাইমেন্টার বিবরণ ফার্নান্ডেজ প্রভৃতির পত্র হইতেই সংগৃহীত।

ঈশা খাঁ

বাংলার শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদের অবসানের পর যদিও মোঘলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও অন্যান্য ভুঁইয়ারা প্রথমে তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পাঠান-বংশীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতাসঙ্কোচের কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান-বংশীয়গণের মধ্যে উড়িষ্যার কোতল খাঁ ও বঙ্গে ঈশা খাঁই প্রধান। ঈশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাহার নাম কালীদাস গজদানী। ইহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী।[১] হোসেন খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া সালিমান খাঁ নামধারণ ও এক পাঠানরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের[২] অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজখাঁ কর্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাহার পুত্রদ্বয় ঈশা ও ইসমাইল দাসরূপে বিক্রিত ও দূরদেশে নীত হন।[৩] সাউন্নেসা নামে তাহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ঈশা ও ইসমাইল খাঁ পরে তাহাদের মাতুল কুতুবউদ্দিন কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। ক্রমে ঈশা আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতার বলে পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়া হইয়া উঠেন, এবং খিজিরপুর পরগণার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি হোসেনশাহ-বংশীয়া ফতেমা খানম-নাম্নী কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপর একাদশ জনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন।[৪] ঈশা খাঁ প্রথমত মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি করিমদাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি আফগানগণের সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোঘল সুবেদার খাঁজেহান আর কতকগুলি আফগানের সাহায্যে ৯৮৬ হিজরি (১৫৭৮ খ্রিঃ অব্দে) ভাটি প্রদেশ অধিকার করেন।[৫] তাহার পর হইতে ঈশা মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ভাটি প্রদেশে উপস্থিত হন, এবং ঈশার সাহায্য গ্রহণ করেন। আজিম খাঁর সুবেদারির সময়ে তার্সন খাঁ মাশুম খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হন ; কিন্তু তিনি তাজপুরের দুর্গে বিপক্ষগণ কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, সাহাবাজ খাঁ কুম্বুর প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি তার্সন খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৫৮৫ খ্রিঃ অব্দে মাশুম খাঁর অনুসরণ করিয়া ঈশার অধিকারে উপস্থিত হন এবং মাশুমকে ধৃত করিয়া পাঠাইবারো জন্য তাহাকে বলিয়া পাঠান। ঈশা সেই সময়ে কোচবিহার অধিকারে গমন করিয়াছিলেন।[৬] সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের নিকট নদীতীরস্থ দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁ প্রভৃতি হস্তগত করিলে, মাশুম একটি দ্বীপে আশ্রয় লয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি মাশুমকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা ঈশা কোচবিহার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া উপস্থিত হইয়া মাশুমের সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহি সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা জলপথ ও স্থলপথ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হয়। তার্সন খাঁ মাশুম খাঁ কর্তৃক বন্দি হইয়া হত হইলে, সাহাবাজ খাঁ বিপক্ষগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। ঈশা খাঁ প্রথমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয়

পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাত মাস ব্যাপী যুদ্ধের পর বাদশাহি সৈন্যেরা জয়লাভ করিলে বিদ্রোহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে ওমরাদিগের সহিত সাহাবাজ খাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষগণ ১৫ স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায়, বাদশাহি সৈন্যশিবির জলে প্লাবিত হইয়া যায়। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণের নেতা বন্দুকের গুলিতে হত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দি করিয়া লইয়া যায়।

ঈশা সুযোগ বুঝিয়া বন্দি হোসেনের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সাহাবাজ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, ঈশা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিবেন, সোনার গাঁয়ে একজন দারোগা নিযুক্ত হইবেন এবং মাশুম মক্কায় গমন করিবেন ; বাদশাহের নিকট রীতিমত কর প্রেরিত হইবে। ইহার পর বাদশাহী সৈন্য প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করিলে ঈশা খাঁ পুনর্বার নতুন প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুতরাং আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁর সহিত ওমরাগণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে বাদশাহ তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ খাঁকে তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। অবশেষে তাহারা পুনর্বার ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঈশা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন ; তিনি নিজে স্বরাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মাশুমকে সেরপুরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, মাশুম তথা হইতে ভাটি, পরে উড়িষ্যার অভিমুখে পলায়ন করে। বাদশাহী সৈন্যেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ত্রিবেণীতে তাহাকে পরাস্ত করে। এই সময়ে ঈশা কিছুদিনের জন্য শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে ওয়াজির খাঁর হস্তে বাংলার শাসনের ভার প্রদান করিয়া সাহাবাজ বিহারের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ওয়াজির একাকী বাংলার বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইলে, বাদশাহ সাহাবাজ খাঁকে পুনর্বার বাংলায় যাইতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঈশাও পুনর্বার স্বাধীনতা-অবলম্বনের প্রয়াস পান। একদল বাদশাহি সৈন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদশাহ-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাশুমও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য বাংলায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর মানসিংহের সুবেদারির সময়েও ঈশা আপনার প্রভুত্ববিস্তারের ত্রুটি করেন নাই। তাহার সহিত নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ পরাস্ত ও হত হইয়াছিলেন। ১০০৮ হিজরি বা ১৫৯৯—১৬০০ খ্রিস্টাব্দে[৭] তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।[৮] আমরা ইতিহাস হইতে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানিতে পারি। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। তাহার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তিনি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা সোনাই বা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণময়ী পরে সোনা বিবি নামে অভিহিত হন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাহার রাজ্যরক্ষার জন্য শ্রীপুর, ত্রিপুরা ও আরাকানের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; পরে মগদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্বক আত্মবিসর্জন করেন। তাহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ তাহার অধিকারস্থ এগারসিন্দুর দুর্গ অধিকার করিলে, ঈশা খাঁ তাহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন, এবং তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহ নিজে যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া স্বীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতা যুদ্ধে হত হইলে ঈশা খাঁ তাহা জানিতে পারেন। পরে তিনি মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় শিবিরে চলিয়া যান। মানসিংহ পুনর্বার যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া যায় ; ঈশা তাহাকে স্বীয়

তরবারিপ্রদানের ইচ্ছা করিলে মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, ঈশাঁও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হন। মানসিংহ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ঈশাকে বন্দি না করায় মানসিংহের অনুচরেরা ও তাহার রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অনন্তর ঈশা মানসিংহের অনুরোধে তাহার সহিত আগরায় গমন করেন। বাদশাহ প্রথমত তাহাকে বন্দি করিয়াছিলেন, পরে এগারসিন্দুর যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন ; এবং দেওয়ান ও মসনদ আলি উপাধি ও অনেক পরগণার জমিদারি প্রদান করেন। মানসিংহের জামাতৃবধের প্রবাদ সম্ভবত তৎপুত্র দুর্জন সিংহের নিধন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায় সবংশে নিহত হইলে, তাহার একমাত্র জীবিত পুত্র রাঘব রায় বা কাঁচুরায় পলায়ন করিয়া ঈশা খাঁর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঈশা খাঁকে রামরাম বসু হিজলির মসনদ আলি বলিয়াছেন। কিন্তু হিজলিতে ঈশা খাঁ নামে কোনও মসনদআলি ছিলেন না। উক্ত ঈশা খাঁ যে সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশা খাঁ সমস্ত ভাটি বা সুন্দরবনের একাধিশ্বর হওয়ায় ও অন্যান্য ভুঁইয়ারাও তাহার বশ্যতা স্বীকার করায়, তাহারই নিকট রাঘব রায়ের সাহায্যার্থ উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। আমরা প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। ঈশা খাঁ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ মহানুভবও ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি ঈশা খাঁর মহত্বের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন। তাহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সোনারগাঁ প্রদেশের অবস্থার বিষয়ও অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।[৯] আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খিজিরপুর পরগণা ঈশা খাঁর জামিদারি ছিল। খিজিরপুর সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থানে আপনার অধিকার বিস্তৃত কায়য়াছিলেন। কত্রাভূ নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, তিনি বক্তারপুরে বাস করিতেন।[১০] এই কত্রাভূ বা বক্তারপুর কোথায়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বেভারিজ সাহেব সাবারের নিকটস্থ ক্ষেতবাড়িকে কত্রাভূ বলিতে চাহেন। খিজিরপুর হইতে ১৫ ক্রোস উত্তরে বক্তারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও অট্টালিকাদির চিহ্ন নাই। ঈশার পুত্র দায়ুদও কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া মানসিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ঈশা খাঁ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে তিন জন হিন্দু ভুঁইয়া সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

সাহিত্য ১৩১১ শ্রাবণ

১. Elliot's History of India, also Blochman's Ain-i-Akbari.
২. ভাটি সম্বন্ধে আকবরনামায় যাহা লিখিত আছে, ইলিয়টের ইতিহাসে তাহার এইরূপ মর্ম প্রদত্ত হইয়াছে।—
"Bhati is the low-lying country and is called by that Hindi name, because it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from east to west, and nearly 300 from south to north. On the east lies the sea and the country of Jessore ; on the west lies the hillcountry south of Tanda ; on the north the Salt sea, and the extremities of the hills of Tibet."—*Elliot's History of India, Vol. VI.* ভাটির চতুঃসীমা পাঠে নানারূপ গোলযোগ বোধ হয়, সেই জন্য বেভারিজ Tanda-র স্থলে Landa ও Jessore-এর স্থলে Jesa বলিতে চাহেন। লাণ্ডা রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে উড়িষ্যার সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেসা আইন-আকবরীতে জয়ন্তীয়ার স্থলে লিখিত আছে। —*Journal of the A. S. of Bengal Vol. LXXIII. Pt I. No I.*—

1904—P. 62. Grant সাহেব সুন্দরবন ও তন্নিকটস্থ নিম্নভূমি সকলকে ভাটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হিজলিও উক্ত ভাটির অন্তর্গত ছিল।

৩. বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ঈশার পিতা হিন্দুই ছিলেন ; কারণ মুসলমান পুত্র দাসরূপে মুসলমান কর্তৃক বিক্রিত হইত না।

৪. "Isa by his intelligence and prudence, acquired a name, and he made twelve zemindars of Bengal to become his dependants."—*Elliot's History of India. Vol VI. Akbornama.* আকবরনামার বিবরণে বোধ হয়, যেন ঈশা খাঁ বারোভুঁইয়া হইতে পৃথক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বারোভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন।

৫. Blochman's Ain-i-Akbari.

৬. Gait সাহেব ১৮৯৩ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Koc Kings of Kamrup নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও আকবর মিলিত হইয়া 'গৌড়পাশা'কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিলারায় পূর্ব ও মানসিংহ পশ্চিম হইতে তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গেট সাহেব উক্ত গৌড়পাশাকে দায়ুদ শাহা বলিতে চাহেন। বেভারিজ তাহাকে ঈশা খাঁ স্থির করেন। দায়ুদের সময়ে মানসিংহ আসেন নাই। অধিকন্তু ঈশা কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরোধী পাটকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। ঈশার সহিত কোচবিহার-রাজের যে বিবাদ ঘটিত, শাহাবাদ খাঁর সময়ে ঈশার কোচবিহার হইতে প্রত্যাগমন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭. Elliot's History. vol. VI. Inayatulla's Takmilla-i-Akbarnama র মতে ১০০৭ হিজরিতে তাহার মৃত্যু হয়। আকবরনামার মতে ১০০৮ হিজরি।

৮. Blochmann's Ain-i-Akbari.

৯. "Sonargao is a town six legaues from Serripore where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all the other kings, and is a great friend to all christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and have a fewe mats round about the walls. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, where with they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places."—*Harton Ryley's Ralph Fitch P. 118.*

১০. ইলিয়ট Katrapur বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়

সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে পদ্মাতীরে শ্রীপুর নামে নগর অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। নিম রায় নামে একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি কর্ণাট হইতে পূর্ববঙ্গে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। তিনি শ্রীপুরের প্রথম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সম্ভবত সেন-রাজগণের সময়ে তাহার আগমন হইয়াছিল। কারণ, সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যবাসী হওয়ায়, তাহাদের অনুগ্রহলাভার্থ নিম রায় দাক্ষিণাত্য হইতে পূর্ববঙ্গে আগমন করিতে পারেন। নিম রায়ের পর শ্রীপুরে আর কোনও ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না ; কিন্তু মোঘলবিজয়ের সময় শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা[১] প্রবলপরাক্রমশালী ভুঁইয়া ছিলেন। তাহারা দে—উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ। ইহারা পাঠানরাজত্বকালে ভুঁইয়া-শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। মোঘলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদ রায় কদাচ আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মোঘলেরা তাহাদের বহুনদীবিশিষ্ট ও দ্বীপসঙ্কুল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন ; মোঘল অশ্বারোহীরা সেই জন্য সহজে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়।[২] ঈশা খাঁর সহিত তাহাদের মিত্রতা ছিল, এবং তাহারা ঈশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। কিন্তু ঈশা খাঁ বলপূর্বক চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া যাওয়ায় তাহাদের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় ; ঈশা খাঁ মৃত্যুর পর পর্যন্ত সেই বিবাদ গুরুতররূপেই চলিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, ঈশা খাঁ কর্তৃক স্বর্ণময়ী অপহৃত হইলে, চাঁদ রায় লজ্জায় ও অপমানে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামে তাহাদের কোনও ব্রাহ্মণ কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর হস্তে অর্পণ করে। চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে, কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেদার রায় একেবারে মোঘলের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি নৌযুদ্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তাহার রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক রণতরী, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সন্দ্বীপ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু মোঘলেরা পূর্ববঙ্গজয়ের সহিত সন্দ্বীপ মোঘলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয় এবং তাহা সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হন। সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙালি, মগ, ফিরিঙ্গি ও মোঘলের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার জন্য সন্দ্বীপের ইতিবৃত্ত বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে লিখিত থাকিবে। এই সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য কেদার রায় কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কেদার রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন ; তিনি নৌযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গি বা পর্তুগিজকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে কার্ভালিয়স বা কার্ভালো প্রধান। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কার্ভোলোর সাহায্যে সন্দ্বীপ

মোঘলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। মাটিস নামে আর একজন ফিরিঙ্গিও কার্ভালোর সহিত যোগদান করিয়াছিল। কেদার রায় তাহাদের হস্তে সন্দ্বীপের শাসনভার প্রদান করেন। সেই সময়ে আরাকান-রাজ মেং রাজাগি বা সেলিম শা[৩] পর্তুগিজদের প্রাধান্যবিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হন। ফিলিপ ডি ব্রিট্টো বা নিকোটি নামে একজন পর্তুগিজ আরাকান-রাজের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য করিত। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আরাকান-রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ব্রিটো ক্রমে আরাকান-রাজের অধীনতা-ত্যাগের প্রয়াসী হয়। আরাকান-রাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রিট্টোর দমনে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে কার্ভালো কর্তৃক সন্দ্বীপ অধিকৃত হইলে, বঙ্গোপসাগরে পর্তুগিজ প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে মনে করিয়া, তিনি প্রথমে সন্দ্বীপ-অধিকারের সঙ্কল্প করেন। আরাকান-রাজ সন্দ্বীপকে নিজের অধিকারভুক্ত প্রচার করিয়া, তাহার বিনানুমতিতে কার্ভালো তাহা অধিকার করিয়াছে বলিয়া, সন্দ্বীপ-অধিকারের উদ্যোগ করেন। তিনি ১৫০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামানসজ্জিত বৃহৎ রণতরী প্রেরণ করেন। কেদার রায় তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপুর হইতে এক শতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে পর্তুগিজরা জয়ী হইয়া বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করে।[৪] এই সময়ে ব্রিট্টোও সাইরাম অধিকার করিয়া গোয়ার পর্তুগিজ প্রতিনিধিকে তাহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠায়। আরাকানাধিপতি পর্তুগিজগণের জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্বার সহস্রাখানি রণতরী প্রেরণ করেন। সেবারেও কার্ভালো জয়লাভ করে। বিপক্ষগণের প্রায় দুই সহস্র সৈন্য হত হয়, এবং তাহাদের ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্তুগিজদিগের ছয় জন মাত্র নিহত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আরাকাণ-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সেনাপতিগণের কাপুরুষতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পর্তুগিজগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাহারা শ্রীপুর, বাকলা ও চণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপে আশ্রয় লয়। কার্ভালো ৩০ খানি রণতরীর সহিত শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট গমন করে। অগত্যা সন্দ্বীপ আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে মানসিংহ পূর্ববঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য এক শতখানি কোষ নৌকার সহিত মন্দা রায়কে প্রেরণ করেন। কেদার রায়ের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মন্দা রায় হত হয়, এবং কার্ভালো জয়লাভ করে। তাহার পর কার্ভালো তথা হইতে গলিন বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার মোঘলদুর্গ অধিকার করে। কার্ভালোর নামে লোকে এরূপ শঙ্কিত হইত যে, কথিত আছে, একজন আরাকাণী সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার অনুচরদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে নদীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আরাকান-রাজ তৎশ্রবণে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন।[৫] ইহার পর কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাহাকে কৌশলপূর্বক হত্যা করেন। প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে। দেখা যায়, তাহার পর কেদার রায় আরাকান-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ যে সময়ে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান মোঘলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সোনারগাঁ প্রদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেদার রায় তাহার পক্ষভুক্ত ছিলেন।[৬] মানসিং ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে আরাকান-রাজকে দমন করিয়া, তৎপর বৎসর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কেদার রায়ের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। মোঘল সেনাপতি কিল্‌মক্ কেদার রায় কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে মানসিং তাহার সাহায্যের জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোঘলহস্তে বন্দি হন এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাহার

প্রাণবায়ুর অবসান হয়।[৭] এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কেদার রায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙালি যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, কেদার রায় প্রভৃতির বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রামরাম বসু বলেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে-উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তাহারা কুলীন না হইলেও, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় সামাজিক বিষয়েও তাহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। বিক্রমপুরে তাহাদিগের অনেক কীর্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়! কেদারপুর নামক গ্রামে কোনও কোনও চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।[৮] তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর অনেক দিন কীর্তিনাশার কীর্তিনাশক সলিলে বিধৌত হইয়া গিয়াছে।[৯] চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনার স্থান নাই। যাহারা বাঙালি নামের দুর্নাম মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।[১০]

সাহিত্য ১৩১১ আশ্বিন

১. শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র। কিন্তু তাহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া চিরদিনই কথিত হইয়া থাকেন। ওয়াইজও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

২. "From Bacala I went to Serrepore which standeth upon the river Ganges. The king is called Chandry. They be all hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and ilands that they flee from on to another, where by his horsemen cannot prevaile against them. Great store of cotten cloth is made here."
—Harton Ryley's Ralph Fitch pp 118-119 অনেকে Chandryকে Choudry পড়িয়াছেন ; কিন্তু হর্টন রাইলির গ্রন্থে স্পষ্টত Chandry লিখিত আছে। হর্টন রাইলি আবার শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। রাল্‌ফ ফিচের সময় যে চাঁদ রায় বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩. সেলিম সাকে পর্তুগিজগণ Xilimxa বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরাকানরাজ মেং রাজাগি 'সেলিম সা' এই মুসলমান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

৪. The Mogals with the conquest of Bengala had possessed Sundiva. Cada-raji still continuing his Title. Under colour where of Carvalius and Matees, two Portugals conquered it an 1602, Heereat the king of Arachan was angry, that without his leave they had made themselves Lords of that which is challenged to belong to his protection. Fearing that by his meanes, and the fortification of Siriam he should finde the Portugals un-neighbourly Neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie Frigates or little Galleys, with fifteene Oares on a side and other greater furnished with ordanance and Cadry (which they say was true Lord of it) sent a hundred cosse from Siripur to help him. The Protugals prevailed and became Masters of hundred and nine and fortie of enemies Vessels.—Purcha's Pilgrimes, Fourth part, book V. P 515. 1625.

৫. "The king of Arracan foreseeing such a storme, provided a Navie of a thousand sails, the most Frigates some greater catures and cosses, and assailed the Portugal Fleet at Sundiva under Carvalius, who had but sixteene of divers forts or shipping which staid by him, and yet got the victorie, neere two thousand of the Enemies being slaine, a hundred and thirtie of their vessels burnt with the loss but six Portugals which vexed the king of Arracan, that he put many of the captaines in woman's habit, upbraiding their effiminate courges, which had not brought one Portugall with them alive or

dead, yet were the Portugall ships so torne, that they were forced for feare of another tempest to forsake the land, and to transport that which there they had to Siripur, Bacola, and Chandican in the continent, and thus Sundiva became subject to Arracan, Carvalius staid at Siripur (where he had thirtie fusts or frigates) with Candury lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Manasinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth this Navie against Cadury. Mandary a man famous in those parts being Admiral : where after a bloudie fight Mandary was slain, De carvalius carried away the honor. From thence recovering of a wound in the late fight, he went to Galin or Gullum, a Portugall colony up the streame from Porto Pequino, where he own a castle of the Mogors kept by foure hundred men one of that company only escaping. These exploits made Carvalius his name terrible to the Bengalans in so much that one of the Arracans Commander of fiftie Arracan ships dreaming in the night that he was assaulted by Carvalius, terrified his fellows, and made them flie into the river which when the king heard cost him his head!! (Parchas Piligrims Pt IV. BK. V P 513)

৬. "He (the Mogh Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the zemindar of Bikrampur, who had been forcibly reduced by Man singh." (Elleots History of India Vol VI.)

৭. "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." (Elliots History of, India Vol vi Inayatullas Takmilla-i-Akbarnama)

৮. "At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to a Rajah of the name of Chande Roy, of the vace of the Booneahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country west and south of the Boori Ganga, during the decline of the kingdom of Bangoz" (Taylors Topography of Dacca. P, 101.)

টেলার চাঁদ রায়কে প্রাচীন ভূঁইয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উল্লিখিত চাঁদ রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদারপুর নগরের নাম হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেদার রায়ের নামানুসারে উহা অভিহিত হইয়াছিল।

৯. "The city on the opposite side of the Megna was not Sunergong, but Seripore which stood in Bickrompore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca p. 108)

১০. তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই যে, মানসিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্বে কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকানী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি।।

কেদার রায় তদুত্তরে মানসিংহকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ঃ—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।।

কেদার রায়

তিনশত বৎসর অতীত হইল, বাংলার শ্যামল প্রান্তরে একদিন স্বাধীনতা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার তর্পণের জন্য বাঙালি সেদিন আপনার হৃদয় হইতে শোণিত ধারা মোক্ষণ করিয়া দেয়। দেবীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাহার বাহু দুর্জয় শক্তি লাভ করে, তাই সে বাহুর অসি চালনায় মোঘল পাঠান, মগফিরিঙ্গি সন্ত্রাসিত হইয়া দূরে পলাইয়া যায়। যেদিন বাঙালির গৌরব-সূর্য সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে আলোকিত করিয়াছিল সেদিনের কথা স্মরণ করিতে কাহার হৃদয় না পুলকে অধীর হইয়া উঠে? সেদিনের কথা মনে হইলে কঙ্কালসার আমাদেরও দেহে রোমহর্ষ উপস্থিত হয়। যদি কেহ কল্পনার চক্ষেও সেদিনের চিত্র দেখিতে পান, তিনিও যে জীবনে ধন্য হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙালির সেই গৌরবময় দিনের পুণ্য-কাহিনী চিরদিন যে বাংলা জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, এরূপ আশা অনায়াসে করা যাইতে পারে। যে প্রকৃত বাঙালি হইবে, সে কখনও সেদিনের কথা জীবনে ভুলিতে পারিবে না। বাঙালির কাব্য, বাঙালির ইতিহাস চিরদিনই সেকথা জাগাইয়া রাখিবে।

বাস্তবিক খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনের মহাগৌরবময় দিন। পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমি সে সময়ে বাঙালির গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়, সেই রামচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মণমাণিক্য, সেই মুকুন্দ রায় ও বীর হাম্বীর আপনাদিগের রণক্রীড়া দেখাইয়া যেরূপে মোঘল পাঠান, মগফিরিঙ্গিকে চমকিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা বাংলার ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চারি ভীষণ শত্রুর সহিত অবিরাম সংগ্রামে বাঙালি বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা যে জগতের ইতিহাসে বিরল, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে! সে সময়ে বাঙালি যে জাতীয়তার স্পর্ধা করিতে পারিত, সে কথাই বা কে অস্বীকার করিবে? তাই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সে সময়ের বাঙালির গুণ গাহিয়াছেন, ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙালিই যে সে সময়ে বাংলার প্রকৃত অধিপতি ছিল, সে কথাও বলিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে বঙ্গভূমি বাঙালিরই শাসনাধীন ছিল। তাই তাহাকে চারিশত্রুর সহিত রণক্রীড়ার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। যাহাদের জন্য বাঙালির এরূপ গৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাদের কীর্তিকাহিনীর আলোচনায় যে হৃদয় পবিত্র হয়, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সমস্ত মহাপুরুষের অন্যতম কেদার রায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাহার সম্বন্ধে নানাস্থানে নানাভাবে আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। তথাপি তাহাদের বিষয় যতই আলোচিত হইবে, ততই আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে।

যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙালি মাত্রেই অবগত আছে, কিন্তু কেদার রায়ের নাম সকলের নিকট পরিচিত কিনা সন্দেহ। মহাকবি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে যেরূপ অমর করিয়া গিয়াছেন, কেদার রায়ের কীর্তি-কাহিনী সেরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। অথচ কেদার রায় প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাহারা উভয়েই সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া ইউরোপিয় পরিব্রাজকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] প্রতাপাদিত্যের কথা কোন মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে

অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু কেদার রায়ের অদ্ভুত বীরত্বের কথা তাহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ প্রতাপাদিত্য যেরূপ বাহুবলের পরিচয় দিয়া বাঙালি জাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, কেদার রায়ও সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনিও পাঠান, মোঘল, মগ ফিরিঙ্গির নিকট আপনার রণকৌশল দেখাইয়া ছিলেন ও বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশেষে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া আপনাকে বাঙালির প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে তিনি রণাভিনয় করিয়াছিলেন, আমরা ক্রমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

কেদার রায় বিক্রমপুর জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। কালীগঙ্গাতীরস্থ শ্রীপুর তাহার রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহারা বঙ্গজ কায়স্থ, দেববংশীয়। কথিত আছে, এই বংশের আদি পুরুষ নিমরায় কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরের আড়ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামের আসিয়া বাস করেন।[২] কোন্ সময়ে নিমরায় বাংলার উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি সেন রাজগণের সময় এদেশে আসিয়া থাকিবেন। কারণ সেনরাজগণও কর্ণাট হইতে বাংলায় আগমন করেন ও তাহারা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। এই নিমরায়ের বংশেই চাঁদরায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা তদানীন্তন বারোভুঁইয়ার অন্যতম ছিলেন এবং ইহাদের বংশ বহু প্রাচীনকাল হইতে ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে উক্ত বংশের ভুঁইয়া বলিয়া জানিতে পারি।

দায়ুদ খাঁর পতন হইতে গৌড়ে পাঠান রাজত্বের অবসান হয়। মোঘল সেনাপতিগণ বাংলা জয় করিবার জন পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গি ও বাঙালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। জলে স্থলে তাহারা সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। এদিকে পাঠানেরা আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যও সকলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মগেরাও সে সুযোগ পরিত্যাগ করিল না। নবাগত ফিরিঙ্গিগণই বানী রবে কাল যাপন করিবে কেন? কাজেই বঙ্গভূমি রুধির ধারায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চাঁদ রায় কেদার রায় সহজে মোঘলের অধীনতা স্বীকার করিতে চাইলেন না। তাহারা গৌড়ের পাঠান রাজগণের অধীন ভুঁইয়া ছিলেন। কিন্তু বিজয়ী মোঘলের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে তাহারা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মোঘল অশ্বারোহিগণ বহুনদনদীসঙ্কুল তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য হইতে পারিল না।

যে সময়ে মোঘল কেশরী আকবরশাহ দায়ুদের নিকট হইতে বাংলা জয় করিয়া লইলেন, সেই সময়ে বঙ্গভূমি বারো ভুঁইয়ার অধীন ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পাঠান। এই পাঠানদিগের মধ্যে ঈশা খাঁ মসনদ আলি প্রধান ছিলেন। তাহার রাজ্য চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। ঈশা খাঁর সহিত প্রথমত তাহাদের ঐক্য থাকিলেও ক্রমে যখন উভয়পক্ষের ক্ষমতা বাড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ঈশা খাঁ যেমন কখনও রায়দিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন, রায় ভ্রাতৃদ্বয়ও সেইরূপ সবেগে ঈশা খাঁর রাজ্যে পতিত হইয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ অবিরাম সংঘর্ষে উভয়ে উভয়ের পরাক্রমের পরিচয় পাইতেন। তাহার পর ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে হরণ করিয়া তাহাকে বলপূর্বক বিবাহ করায় ঈশা খাঁর প্রতি তাহাদের ক্রোধ দাবানলসম প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বর্ণময়ী হরণের পর রোষে ক্ষোভে চাঁদরায় ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কেদার রায় তাহার প্রতিশোধ লইবারো জন্য বদ্ধপকির হইলেন।

এই সময়ে বঙ্গোপসাগরে অনেকগুলি পর্তুগিজ বা ফিরিঙ্গি জলদস্যু বাস করিত।

পর্তুগিজগণ প্রথমত বাণিজ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশে সমাগত হয়। পরে তাহারা দেশিয় রাজগণের অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে। ক্রমে তাহা হইতে তাহারা দস্যুতা অবলম্বন করিয়া বঙ্গোপসাগরকে আন্দোলিত করিয়া তুলে। ফিরিঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ দস্যুতা অবলম্বন করিলে তখনও পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে দুই একজন প্রকৃত সেনানী দেশিয় রাজগণের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। কেদার রায় স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ উভয়েরই দ্বারা আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন। বিশেষত পূর্ববঙ্গ বহু নদনদী সঙ্কুল ও সমুদ্র প্রক্ষালিত হওয়ায় জলযুদ্ধেরই বিশেষ রূপ প্রয়োজন হইত। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি রণতরী নির্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া পর্তুগিজদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদিগকে দমন করার তাহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত তাহাদের ক্ষমতা সঙ্কোচ করা, দ্বিতীয়ত তাহাদিগকে তাহার পক্ষ ভুক্ত করা। কারণ তিনি জানিতেন যে, ফিরিঙ্গিরা জলযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী এবং কামান ও বন্দুক পরিচালনায় অদ্বিতীয় ছিল। কেদার রায়ের অবিরাম আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া অবশেষে তাহাকেই তাহারা আপনাদের প্রভু স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কেদার রায় সেই সমস্ত ফিরিঙ্গিদিগকে আপনার রণতরী ও কামান বন্দুক পরিচালনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কার্ভেলিয়াস বা কার্ভালো নামে একজন সুচতুর সাহসী পর্তুগিজ বীরপুরুষ তাহার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলেন। এই কার্ভালোর অদ্ভুত বীরত্ব বাংলার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই সময়ে মোঘল সেনাপতিগণ পূর্ববঙ্গ অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কেদার রায় প্রথমত ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পরে মোঘলদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। মোঘলেরা তাহাদের উভয়েরই প্রবল শত্রু এবং তাহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাজেই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত করিয়া সেই সাধারণ শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। মোঘলেরা তাহাদের বিক্রমপুর রাজ্যকে আপনাদের সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল ও তাহার কোন কোন অংশে আপনাদের শাসন প্রচলনেরও চেষ্টা করে। তন্মধ্যে সন্দ্বীপই প্রধান। বঙ্গোপসাগরের হৃদয় হইতে উত্থিত কৃষি, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্দ্বীপ বাংলার ইতিহাসে চির বিখ্যাত। এই সন্দ্বীপের জন্য বঙ্গোপসাগরের নীল সলিল যে কতবার রুধির ধারায় রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মোঘল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গি ও বাঙালির কত মুণ্ডু যে গড়াগড়ি গিয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করিবে? কত গোলাগুলি যে ইহার কোমল বক্ষকে বিদীর্ণ করিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সন্দ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু মোঘলেরা তাহা অধিকার করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করে। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি এই গুরুতর কার্যের জন্য কার্ভালোকে নিযুক্ত করিলেন। ১৬০২ খ্রিঃ অব্দে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মোঘলদিগের হস্ত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া লন। তিনি সন্দ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোঘলেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সন্দ্বীপে কার্ভালোকে অবরোধ করিয়া ফেলে। কার্ভালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্বে চট্টগ্রামে পর্তুগিজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মাটুস চারিশত সেনা লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হন। মোঘলগণও তাহাকে বাধা প্রদানের জন্য ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করে। ফিরিঙ্গি ও মোঘলের জলযুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোঘলেরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গির গোলার নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মোঘলেরা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জল হইতে মাটুসের ও স্থল হইতে কার্ভালোর আক্রমণে তাহারা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সন্দ্বীপ কার্ভালো ও

মাটুসের হস্তে পতিত হইল। কেদার রায় তাহাদের হস্তেই সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে সন্দ্বীপ আবার কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইল। কার্ভালো তাহার অধীন শাসনকর্তা রহিলেন।

এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের সম্রাট ছিলেন, তিনি সেলিম সা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাহার অধিকারে ছিল। তাহারও অধীনে অনেকগুলি পর্তুগিজ অবস্থিতি করিত। কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্তুগিজদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া আরাকানরাজ তাহাদের দমনের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাংলা আক্রমণের ইচ্ছা ছিল। তিনি কার্ভালোর হস্তে সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে দমন ও সন্দ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তিনি দেড়শত খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান সজ্জিত বৃহৎ রণতরী পর্তুগিজদিগের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। কার্ভালো সেই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে তিনি আপনার একশতখানি কামান ও বন্দুক সজ্জিত কোষা নৌকা তাহার সাহায্যের জন্য শ্রীপুর হইতে সন্দ্বীপে প্রেরণ করেন। বাঙালির পরিচালিত সেই নৌকা সমূহ পদ্মা ও সাগর কম্পিত করিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্য পাইয়া কার্ভালো বিপুল বিক্রমে সেলিম সার রণতরী সমূহ আক্রমণ করিলেন। বাঙালি ও ফিরিঙ্গির সহিত মগদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের ধূমে গগনমণ্ডল আবৃত হইয়া উঠিল। তাহাদের গর্জনে নীল সমুদ্র মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙালি ও ফিরিঙ্গি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া গেল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে পতিত হইল। সন্দ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত থাকিল।

যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সার সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল, ব্রিটো সেই সময়ে কৌশলপূর্বক আরাকান রাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্তুগিজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্বার সহস্রখানি রণতরী পাঠাইয়া দিলেন। রণতরী সমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। কার্ভালোও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আপনার অধীন পর্তুগিজ সৈন্য ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙালি সৈন্যদিগকে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উদ্যমে সেই বিরাট নৌ শ্রেণীর সহিত অগ্নি ক্রীড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের রণকৌশল ও অমানুষিক সাহসে মগদিগের রণতরী সমূহ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি কামান ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল। অবশিষ্টগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা ফিরিঙ্গি ও বাঙালির অদ্ভুত বীরত্বে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধেও কার্ভালো জয়লাভ করেন এবং তাহার নাম সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সেলিম সা কাপুরুষতার জন্য আপন সেনাপতিদিগকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছিলেন।

কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার রণতরী সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। তিনি আবার আপনার নৌশ্রেণী গঠনের জন্য সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীপুর, বাকলা ও সাগরদ্বীপে তাহার রণতরী সমূহের সংস্কার ও নূতন রণতরী সমূহের নির্মাণ হইতে লাগিল। শ্রীপুরে কার্ভালোর নিকট ৩০ খানি রণতরী অবস্থিত ছিল। কার্ভালো সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে আরাকানরাজ তাহা অধিকার করিয়া বসেন। কেদার

রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর এক ভীষণ শত্রু বিজয়ভেরী বাজাইয়া তাহার রাজ্যে উপস্থিত হয়। যে সময়ে সন্দ্বীপ লইয়া ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া চলিতেছিল, সেই সময়ে, মানসিংহ বাংলার সুবেদার ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য অধিকারের জন্য একশতখানি কোষ নৌকা সহ মন্দারায়কে পাঠাইয়া দেন। মোঘলের কামানসজ্জিত কোষ নৌকা পদ্মার উত্তলে তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করিয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হইল ও তোপধ্বনিতে আপনাদের আগমন ঘোষণা করিল। কেদার রায় পূর্ব হইতে সতর্ক না থাকিলেও মোঘল সেনাপতির আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

কার্ভালোর প্রতি প্রধানত আতিথ্যের ভার প্রদত্ত হইল। কার্ভালো আপনার সেই ৩০ খানি রণতরী ও আর কয়েকখানি কোষ নৌকা লইয়া আপনার ফিরিঙ্গি ও শিক্ষিত বাঙালি গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মন্দারায়কে আক্রমণ করিলেন। মোঘলের দুর্জয় কামান ঘনধ্বনির ন্যায় গর্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ফিরিঙ্গি বীর কার্ভালোকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তাহারও কামানরাশি মোঘল কামানের অণু হুঙ্কার করিয়া অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে আরম্ভ করিল সেই অদ্ভুত যুদ্ধে পদ্মার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল, রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। মোঘলেরা যেমন অত্যদ্ভুত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, ফিরিঙ্গি ও বাঙালি তদনুরূপই রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ছিল। মন্দা রায় আপনার অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কার্ভালোর বিক্রমে তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে তাহার জীবনকে আহুতি দিতে হইল, এবং ফিরিঙ্গি ও বাঙালির কামানের গোলায় তাহার রণপোতগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। কতকগুলি বা সলিলগর্ভে আশ্রয় লইল, কতকগুলি বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মানসিংহের আর কেদার রায়ের রাজ্য অধিকার করা ঘটিয়া উঠিল না। মোঘল সেনাগণ ফেরুপালের ন্যায় বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। এই যুদ্ধে কার্ভালোর বীরত্ব আরও স্ফুটতর হয়। তিনি শ্রীপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য রণতরী সংগ্রহ করেন। পরে মোঘলদিগের অধীন গলিন বা হুগলি বন্দরস্থ দুর্গ অধিকার করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাহার নামে লোকে এইরূপ ভীত হইয়া উঠিত যে, একজন মগ সেনানী স্বপ্নে কার্ভালো কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার অনুচরদিগকে চকিত করিয়া তুলে, এবং তাহারা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আরাকানরাজ তৎসংবাদে উক্ত সেনাপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিঁয়াছিলেন। গলিন বন্দর অধিকার করিয়া কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয়ে গমন করেন। প্রতাপাদিত্য কিন্তু আরাকানরাজের মনতুষ্টির জন্য কৌশলে সেই বীরপুরুষের হত্যাসম্পাদন করিয়াছিলেন।

পাঠানরাজলক্ষ্মী গৌড় হইতে চির নির্বাসিতা হইলেও বাংলার শ্যামল প্রান্তর হইতে পাঠানের দুর্দমনীয় শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দায়ুদের পর কতলু খাঁ, ঈশা খাঁ ও তৎপরে ওসমান খাঁ সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওসমানের বিজয়-ভেরী প্রথমে উড়িষ্যায় নিনাদিত হইয়া পরে পূর্ববঙ্গে মহান্দোলন উপস্থাপিত করে। সেই ব্যোম বিদায়ী বিজয় ভেরীর গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া পূর্ববঙ্গে অবস্থিত মোঘল সেনাপতি বাজবাহাদুর তাহার নীরবতা সম্পাদনের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওসমানের ভেরী নিনাদ কিছুতেই নিবৃত্ত না হওয়ায় মানসিংহ বাজবাহাদুরের সাহায্যের জন্য পূর্ববঙ্গে গমন করেন। মিলিত মোঘল সৈন্যের হুঙ্কারে কিছুকালের জন্য ওসমানের ভেরী নীরবভাবে অবস্থান করে। ইহার পর বাজবাহাদুর ঈশা খাঁর ও কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ওসমান, ঈশা ও কেদার রায়ের প্রভুত্বে মোঘল সেনাপতিগণ

পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাজবাহাদুরকে সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী দেখিয়া পুনর্বার ওসমানের স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দেন। মানসিংহ আবার তাহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। ওসমান পরাস্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলে মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকারের জন্য মনোনিবেশ করেন। কেদার রায়ও তাহাকে বাধা প্রদানের জন্য উদ্যোগী হন। মোঘল রাজপুতে ও বাঙালি ফিরিঙ্গিতে আবার রণাভিনয় আরব্ধ হইল। আবার উভয় পক্ষের অগ্নিক্রীড়া চলিতে লাগিল। কেদার রায় অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মানসিংহকে চমকিত করিলেন। কিন্তু এবার তাহাকে পরাস্ত হইতে হইল। কথিত আছে যে, মানসিংহ তাহাকে আবার তাহার রাজ্য পুনঃপ্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে কেদার রায়ের কুলদেবতা শিলামাতাকে মানসিংহ লইয়া যান। শিলামাতা অদ্যাপি জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।[৩]

কেদার রায় পরাস্ত হইয়া মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মানসিংহ তাহাকে তাহার রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ক্রমে কেদার রায় আবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে আরাকানরাজ সেলিম সাও আপনার গোলন্দাজ সেনা ও রণতরী লইয়া বাংলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি কেদার রায়ের পরাক্রম বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কেদার রায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি যে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না, সেইজন্য তিনি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অধিকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেদার রায় তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া অনেকস্থান মোঘলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ইহার পূর্বে ঈশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায় সোনারগাঁও মগরাজ ও কেদার রায়ের হস্তে পতিত হয়। কথিত আছে সোনারগাঁ আক্রমণকালে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোনাবিবি কেদার রায় ও মগদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। কেদার লজ্জায় ও ক্ষোভে সোনারগাঁ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। মোঘল সৈন্যেরা তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের অনেকস্থান কেদার রায় ও মগরাজের অধীনে আইসে।

আবার পূর্ববঙ্গে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে মানসিংহ তাহার নির্বাণের জন্য বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তাহাকে সেলিম সা ও কেদার রায় উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সুচতুর মানসিংহ একেবারে উভয়কে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া প্রথমে সেলিম সার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করেন। আরাকানীরা জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ উভয় সংগ্রামেই পারদর্শী ছিল। কাজেই মানসিংহকে তাহারই আয়োজন করিতে হয়। তৎপূর্বে আরাকানরাজ ও কেদার রায়ের সন্ধিভঙ্গ হওয়ায় মানসিংহের পক্ষে মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। মানসিংহ এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই মহাসুযোগ সহসা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বিলম্ব না করিয়া ১৬০৩ খ্রিঃ অব্দের প্রথমেই আরাকানরাজ সেলিম সার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। জলে স্থলে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যদিও আরাকানীরা ও তাহাদের সহিত মিলিত ফিরিঙ্গিরা মোঘলদিগকে বাধা দিবারো জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মানসিংহের শিক্ষিত সৈন্যগণের নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। মানসিংহ তাহাদিগকে পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

মগরাজকে দমন করিয়া মানসিংহ পুনর্বার কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহার অনেক রণতরী ও সৈন্য মগদিগের সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়ায়, তিনি সে বৎসর উক্ত সংকল্প ত্যাগ করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৬০৪ খ্রিঃ অব্দে মানসিংহ নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আবার কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। কেদার রায়ও পূর্ব হইতে

তাহা অবগত হইয়াছিলেন। তিনিও বিপুল মোঘলবাহিনী ও রণতরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পাঁচশত রণতরী সংগ্রহ করেন। শিক্ষিত বাঙালি ও ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ সেনা ও সেনাপতিগণ সেই সমস্ত রণতরীতে দুর্জয় কামান স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গের সমস্ত নদনদী ও সমুদ্র আন্দোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন কেদার রায় অনেক পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা সমবেত করিয়া ছিলেন। মানসিংহ প্রথমত মোঘল সেনাপতি কিলমক্‌কে কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবারো জন্য আদেশ দেন। কিলমক্ সসৈন্যে শ্রীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, কেদার রায়ের সেনা তাহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া অবরোধ করিয়া ফেলে। এইরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় কিলমক্‌কে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হয়। মানসিংহ কিলমকের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া তাহার সাহায্যের জন্য একদল মোঘল সেনা পাঠাইয়া দেন। আবার বাঙালি সৈন্যের সহিত মোঘল সৈন্যের ঘোরতর অগ্নি ক্রীড়া উপস্থিত হইল। কামানের গর্জনে ও সৈন্যের হুঙ্কারে ব্যোম ও বসুধা ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। বাঙালির অত্যদ্ভুত বীরত্বে মোঘল ও রাজপুতগণ চমকিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে কেদার রায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মোঘলের বিশ্বধ্বংসকর গোলা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষের ভয়াবহ অগ্নিযুদ্ধ হইল। অবশেষে কেদার রায় আহত হইয়া পড়িলেন। মোঘলেরা জয়লাভ করিয়া তাহাকে বন্দি করিয়া ফেলিল, ও তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া চলিল। মানসিংহের নিকট নীত হওয়ার কিছুপরে তিনি এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয়ধামে চলিয়া যান।[৪]

এইরূপে মহাপ্রাণ কেদার রায়ের অবসান হয়। যিনি স্বাধীনতা লক্ষ্মীর প্রিয় সেবক হইয়া মগফিরিঙ্গি ও পাঠান মোঘলের সহিত অবিরাম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মানসিংহের সর্বনাশিনী প্রবৃত্তি অবশেষে তাহার ধ্বংস সম্পাদন করে। সুচতুর আরব বাদশাহ পাঠান বাঙালি ও মগ ফিরিঙ্গির উচ্ছেদের জন্যই মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। তাই বাংলার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া মানসিংহ বাঙালি জাতিকে একেবারে নির্বীর্য করিয়া যান। কেদার রায়ের সহিত তাহাকে তিনবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথমবারে তাহার সেনাপতি মন্দা রায় কেদার রায়ের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জন দেন। দ্বিতীয়বার স্বয়ং মানসিংহ বহু সৈন্য লইয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হন এবং তাহার অদ্ভুত রণক্রীড়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই আবার স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। তৃতীয়বার তাহার সেনাপতি কিলমক অবরুদ্ধ হইলে মানসিংহ তাহার উদ্ধারের জন্য বিপুল মোঘল বাহিনী পাঠাইলে মোঘলের দুর্জয় কামান কেদারকে আহত করিয়া ফেলে। যে মহাপুরুষ তিনবার মোঘল বাহিনীর সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া কামানের গোলা ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মগ, ফিরিঙ্গি ও পাঠানের সহিত অত্যদ্ভুত রণক্রীড়া করিয়াছিলেন, বাঙালি জাতির নিকট তিনি কি প্রাতঃস্মরণীয় নহেন? দেবতার ন্যায় তিনি কি বাঙালির নিকট হইতে পূজা পাইতে পারেন না? বাঙালির চির প্রিয় প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা তিনি কি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন? অধিকন্তু তাহার চরিত্রে প্রতাপের ন্যায় নিষ্ঠুরতা ও চতুরতা স্পর্শ করে নাই। তিনি কখনও মোঘল সম্রাটের কৃপাভিখারি হন নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় তিনি স্বাধীনতারই সেবা করিয়াছেন ও প্রকৃত বীরের ন্যায়ই অবশেষে আপনার জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। তাই তাহার বীরত্ব কাহিনি বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বর্তমান মহাপুরুষ পূজার যুগে আমরা কেদার রায়ের পূজা দেখিতে চাই। বাঙালি কবির লেখনীতে তাহার গৌরব চিত্রিত হউক, বাংলার পল্লী বালকগণের কণ্ঠে তাহার নাম ধ্বনিত হউক। আর বাঙালি মাত্রেই তাহার নাম শ্রবণে মস্তক অবনত করুক। যে জাতির মধ্যে কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে জাতি যে ধন্য, ইহা সকলের মনে

জাগরুক থাকুক। আর আমরা যে কাপুরুষের বংশধর নহি, ইহা সর্বদা জপমন্ত্রের ন্যায় আমাদের মনে উদয় হউক।

কেদার রায় যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রাজনৈতিক জগতে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধে তাহার অনেক কীর্তি পূর্ববঙ্গকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাহারা বিক্রমপুর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ভূমি ও বৃত্তিদান করিয়া তাহারা আপনাদের সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থদিগের তিনটি প্রধান সমাজ পরস্পরের গৌরববর্ধনের জন্য চেষ্টা করিত। শ্রীপুরের রায়বংশ বিক্রমপুরের, বাকলার রায়বংশ, চন্দ্রদ্বীপের ও যশোরের রায়বংশ যশোর সমাজের গোষ্ঠীপতি থাকিয়া স্ব স্ব সমাজের গৌরব রক্ষার জন্য সতত যত্ন করিতেন। এই তিন সমাজে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি অনেক ভূসম্পত্তি ও বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষ পরম্পরা ক্রমে আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণেও কোন কোন স্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সৎকীর্তি ব্যতীত চাঁদ রায় ও কেদার রায় অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘিকা খনন করিয়া আপনাদের ধর্ম প্রবৃত্তিরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিলামাতা মানসিংহ কর্তৃক নীতি হইয়া অদ্যাপি জয়পুর রাজ্যের অম্বর নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্তি নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন লাখুরিয়া গ্রামের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটিতে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। তাহার পদোপরি কেদার রায়ের নাম খোদিত আছে। কেদারপুর নামক গ্রামেও তাহাদের অনেক কীর্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা রাজবাড়ি মঠ তাহাদের বিরাট কীর্তির পরিচয় দিতেছে। পদ্মার তীরস্থ সেই বিরাট শিবমন্দির জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া ও অশ্বত্থ বট ইত্যাদি বৃক্ষ অঙ্গে ধারণ করিয়া, তাহাদের সুনাম ঘোষণা করিতেছে। এই চতুশ্চূড় মন্দির নানাপ্রকার খোদিত চিত্র ইষ্টকে ভূষিত হইয়া বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যেরও সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার নিকট কেদারবাটি নামক স্থানে দুই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা অদ্যাপি অবস্থিত আছে। ততভিন্ন আরও অসংখ্য কীর্তিচিহ্ন পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বিরাজ করিতেছে। ফলত এই সমস্ত কীর্তি ও তাহার অপূর্ব বীরত্ব আলোচনা করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কেদার রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ এই অধঃপতিত বাঙালি জাতির মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি বাঙালি জাতীয়তার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা ব্যতীত পতিত জাতির উদ্ধারের আর কোন আশা নেই, ইহা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ বৈশাখ

১. The king of Patanaw was Lord of the greatest fort of Bengala, until the Mogul slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Moguls and still not withstanding Mogul's greatness, are great Lords specially he of Siripur of Ciandeca. (Purcha's Pilgrims)। এই শ্রীপুরের অধীশ্বর কেদার রায় ও চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য।

২. The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar Nim Rai came from Karnat and settled at Arapphulharia is Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family. (James wise–on the Barah Bhuyas, Asiatic Society's Journal 1874 ওয়াইজ সাহেব প্রবাদ অবলম্বন করিয়া আকবরের

রাজত্বের ১৫০ বৎসর পূর্বে নিমরায়ের আগমনের কথা লিখিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহারও পূর্বে নিমরায় আসিয়াছিলেন। যে সময় সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের স্বদেশকারী নিমরায়ের কর্ণাট হইতে আগমনই সম্ভব।

৩. অনেকে শিলামাতাকে যশোরেশ্বরী বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। জয়পুরের রাজবংশের বিবরণে লিখিত আছে যে, মানসিংহ কেদার রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪. Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, truned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid slige to Kilmack the imperial commander in Srinagar. Kilnack held out, till a body of troops was sent to his act by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious, Cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja (Inayatrlla's Takmillu-i-Akbarnama Elliots History of India vol VI.)

কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়

চাঁদ রায়ের পর বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। সেনবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা দনুজমর্দন বা দনৌজা মাধব চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। তাহার দৌহিত্র বসু-বংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং ইহারা অনেকদিন হইতে পরাক্রান্ত ভুঁইয়া-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মোঘল-বিজয়ের সময়ে কন্দর্প রায় বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ অতি পরাক্রান্ত বাঁর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল ; তিনি যবনপতি গাজিকে যুদ্ধে নিহত ও মগদিগের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় কর্তৃক হোসেনপুর হইতে যবনগণ বিতাড়িত হয়।[১] মোঘলেরা প্রথমে বঙ্গ জয় করিলে দায়ুদ উড়িষ্যা লইয়া ক্ষান্ত হন। পরে মোঘলেরা পূর্ববঙ্গ জয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন।[২] কন্দর্প রায় মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর কখনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। রাল্‌ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্দর্প রায়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কন্দর্প রায় বন্দুক ক্রীড়া ভালবাসিতেন।[৩] কন্দর্প রায়ের পর তাহার শিশু পুত্র রামচন্দ্র বাকলার অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে জেসুইট প্রচারক ফন্‌সেকা তাহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৫৯৮—৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফার্নাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউয়েন নামে চারি জন জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইহারা বঙ্গদেশ ব্যতীত আরাকান প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ফনসেকা চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে গমন করেন। তৎকালে সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে আপনার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ; এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ফনসেকা বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও, তাহার বিবেচনাশক্তি অধিকবয়স্কের ন্যায়ই ছিল। রামচন্দ্র ফনসেকাকে তাহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে, আমি চ্যাণ্ডিকানে আপনার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাইতেছি। আপনার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইতেছে বলিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্তব্য মনে করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আপনার রাজ্যের মধ্যে গির্জা নির্মাণ ও লোকদিগকে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী করিবার আদেশ প্রদান করুন। রামচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদিগের সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া নিজেই তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পরে তিনি ফনসেকাকে আজ্ঞাপত্র ও দুই জনের উপযোগী বৃত্তি প্রদান করেন।[৪] ফনসেকার বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সে সময়ে বাকলায় রামচন্দ্রের আশ্রয়ে অনেক পর্তুগিজও বাস করিত। কার্ভালোর সহিত যুদ্ধের পর আরাকান-রাজ সন্দ্বীপ অধিকার করিলে, রামচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য স্বীয় রাজ্য হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আরাকান-রাজ সেই সুযোগে বাকলা অধিকার করিয়া লন এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্য অধিকার করিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন।[৫] বাকলা মগগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত

দুর্দশাপন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণেও মগগণ কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের উল্লেখ আছে।[৬] কিন্তু তাহার পর রামচন্দ্র পুনর্বার বাকলা অধিকার করিয়া লন। রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ-কায়স্থ সমাজের একাধিপত্যলাভ ও চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের জন্য বিবাহরাত্রিতেই আপনার জামাতাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার সামন্ত রামনারায়ণ মল্ল চতুঃষষ্টি-ক্ষেপণী-যুক্ত, কামানে সজ্জিত ও সৈন্যে পরিরক্ষিত একখানি নৌকা আনিয়া দেন ; রামচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন। তিনি কামানের ধ্বনি দ্বারা স্বীয় গমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[৭] রামরাম বসু বলেন যে, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে তাহা শুনিয়া স্বীয় শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশালধারীর বেশে প্রতাপাদিত্যের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন, এবং তোপধ্বনি দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন করেন। বসন্ত রায় তাহার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার হয়। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, বিবাহরাত্রিতে রমাই ভাঁড় নামে একজন লোক রামচন্দ্রের আদেশমতে স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের বধের আদেশ প্রদান করেন। ফলত প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা সকল প্রবাদ অপেক্ষা প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের সহিত অনেক দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সম্ভবত এই বিবাহসময়ে রামচন্দ্র কিছুকাল স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকান-রাজ বাকলা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কার্ভালোও প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হয়। রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যকে জয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।[৮] বাকলাতেই লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। রামচন্দ্র মোঘল ও মগ কর্তৃক আক্রান্ত পর্তুগিজদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জালেস ফিরিঙ্গি আপনার প্রাধান্যবিস্তারের জন্য রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহার অধিকারস্থ সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা অধিকার করিয়া লয়। গঞ্জালেস নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইবে। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীর ছিলেন, তিনি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ ছিলেন, এবং মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গিগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ঢাকার নবাব তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।[৯] চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাহুবলের জন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বংশানুক্রমে তাহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কচুয়া নামক স্থানে প্রথমে তাহাদের রাজধানী ছিল। পরে কন্দর্প রায় মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপিত করেন।[১০] বাকল নামে কোন নগর ছিল কি না, জানা যায় না ; থাকিলে, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ভীষণ মহাপ্লাবনের কথা আইন-আকবরীতেও লিখিত আছে।

প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্য হিন্দু ভুঁইয়াত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিরূপ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাহা সকলেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। যদিও কোন মুসলমানি ইতিহাসে তাহার বিবরণ বর্ণিত হয় নাই, তথাপি জেসুইট প্রচারকগণের বিবরণ হইতে আমরা তাহার পরাক্রমের পরিচয়

পাইয়া থাকি। তাহারা বারোভুঁইয়ার মধ্যে শ্রীপুর ও চণ্ডীকানের অধিপতিকে ক্ষমতাশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সেই চণ্ডীকানেরই অধিপতি ছিলেন। এই চণ্ডীকান বা চণ্ডীকা সাগর দ্বীপের নামান্তরমাত্র। প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন, এই জন্য ইউরোপিয়গণ কর্তৃক তিনি চণ্ডীকানের অধিপতি বলিয়া কথিত হইতেন। প্রতাপাদিত্য কিরূপে আপনার পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে কি পরিমাণে প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়, আমরা প্রতাপাদিত্য নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিব।

এই সমস্ত ভুঁইয়া ও জমিদারগণের ইতিহাসের আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙালি এককালে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। কেবল ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা নহে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব সংস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বাঙালি বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যাহারা সীতারাম রায় ও উদয়নারায়ণের বিবরণের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাঙালিগণ রাজসরকারে কার্য প্রাপ্ত হইয়াও অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত হইতেন না। জানকীরাম ও দুর্লভরাম প্রভৃতি তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। আমরা আমাদের ইতিহাসের আলোচনা করি না, তাই আমরা আমাদিগকে কাপুরুষের সন্তান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আমাদের পিতৃপিতামহগণ কাপুরুষ ছিলেন না। কেবল আমরাই কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি। ইতিহাস গুরুগম্ভীরস্বরে আমাদের পূর্বপুরুষগণের বীরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

সাহিত্য ১৩১১ অগ্রহায়ণ

১. কন্দর্প রায় সম্বন্ধে ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ।।
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ।।
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ স নৃপোত্তমঃ।।
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাৎ ততঃ।
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।।"

২. "In 1574, he (Murad Khan) was attached to Munim's Expedition of Bengal. He conquered for Akbar the district of Fathabad, Sirkar Bogla and was made Governor of Jellasur in Orisa, after Daud had made peace with Munim." (Bloch-man's Ain-i-Akbari)

৩. "From Chatigan in Bangala I came to Bacola ; the king where of is a Jentile, a man very well disposed and delighted much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotten cloth and cloth of silke. The houses be very faire and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The woman weare great store of silver hoops about their neckes and armes, and their legs are ringed with silver and copper and ringes made of elephant's teeth."—*Harton Rylay's Ralph Fitch. P. 118.*

৪. "And it appeared to be by the disposition of our lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez. who was ill with fever. I too should fall ill, and

should be transferred to Ciandeca ; so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacola, I had scarecely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose discretion sarpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up, and I a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going, and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the Company trusting that his Highness would give permission to the erection of churches and the making of christians. The king said, 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualities,' and so he gave me a letter of authority, and also assigned a maintenance sufficient for two of us."—*Beveridge's Bakarganj. pp. 30-31.*

৫. ডুজারিক আরাকান-রাজ কর্তৃক বাকলা-অধিকারের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—
"The king of Arracan, was proud of having taken the island of Sundwip from the Portuguese ; and desiring now to pursue his design of conquering all the kingdoms of Bengal, he suddenly threw himself upon that of Bacola, of which he possessed himself without difficulty as the king of it was absent and still young."—*Beveridge's Bakarganj. P. 34.*

"For whiles the king of Arracan having lately achieved so great matter in Pegu, and added Sundwiva and the kingdome of Baccala intended to annex Chandecan, to the rest of his conquest."—*Purcha's Pilgrim's. Pt. iv. Bk. V. P, 514.*

৬. "মগজাতিশস্ত্রপাতৈঃ মর্তব্যা সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারো ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি।
মগান্তে যবনো ভাবী কল্কিদেবাবধির্দ্বিজাঃ।"

৭. "যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপাযেমে নৃপোত্তমঃ।।
ততো বিবাহযামিন্যাং ক্রুরো যশোহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধিপত্যার্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ।।
মন্ত্রণাং পাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃতাসৌ ভীমবিক্রমঃ।
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্বধং প্রতি।
এতৎসর্বং রামচন্দ্রঃ শ্রুত্ব পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিংকর্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ।।
মল্লকুলোদ্ভবো মল্লো রামনারায়ণঃ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা সকলসংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুঃষষ্টিদণ্ডযুক্তো নৌরানীতা মহামতিঃ।।
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতা।
তস্যামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধং।
তূর্ণং গমনবার্তাঞ্চ নালীকধ্বনির্ভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শত্রুপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ।"

উজীরপুরের সিংহরায়গণ উক্ত রামমোহন মল্লের বংশোদ্ভব। তাহারাও কায়স্থ-বংশজ।

৮. "রামচন্দ্রস্তস্য সুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্ধরঃ শূরো ভীমসেনসমো বলী।
জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং।

স্বরাজ্যে হ্যানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলঃ।"

*   *   *

মহাযোধো মহারথো বিক্রমে কেশরিসমঃ।
ভাসুরস্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।।—ঘটককারিকা।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ আমোদ প্রমোদের জন্য তাহার নৌকায় উপস্থিত হন ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র তাহাকে বন্দি করিয়া আনেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ভুলুয়া হইতে এইরূপ প্রবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রামচন্দ্র যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভুলুয়ায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণমাণিক্য তাহাকে ধৃত করিবার জন্য তাহার রণতরীতে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইলে, তিনিই অবশেষে ধৃত হন। সিংহ মহাশয় উক্ত প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ঘটককারিকায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াই বন্দি-অবস্থায় আনয়ন করেন। প্রাচীন ঘটককারিকা অপেক্ষা বর্তমান প্রবাদের অধিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

৯. "কীর্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ।।
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গসৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্বানতাড়য়ৎ।।
জাহাঙ্গীরপুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ।।"—ঘটককারিকা।

১০. "স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটিসংজ্ঞকং।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুকাটিং তথৈব চ।।"

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"চতুর্বর্ষসহস্রানি প্রথমং কলিযুগস্য চ।
গমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপে তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি।।
মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ।।"

প্রতাপাদিত্যের কথা

বাঙালির ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। বাংলার সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ থাকিলেও বাঙালির সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছুই নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক যুগেও বাঙালির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশ্য এ সময়ের কতক পুঁথিপত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা যথাসময়ে লিখিত না হওয়ায় এবং কল্পনা ও অতিরঞ্জনে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা সুকঠিন। সেই সকল পুঁথিপত্র আবার অধিকাংশ স্থলেই প্রবাদ-অবলম্বনে লিখিত। 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' কথাটা মানিয়া লইলেও, যেখানে মূলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে তাহার সার্থকতা কোথায়? প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আমরা তাহার অনেক কথারই মূল খুঁজিয়া পাই না। যদিও প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে সেকালে ও একালে অনেক পুঁথিপত্র ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃত ইতিহাস হইতে প্রতাপ-সম্বন্ধে কোনও কোনও কথা জানিতে পারা যায় বটে. কিন্তু আনুপূর্বিক কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই আমরা প্রতাপের সম্বন্ধে লিখিত ও কথিত বিবরণসমূহ আলোচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্বাপর আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সকল জেসুইট পাদরি এদেশে আসিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম কথা। তাহাদের কথা লইয়া ডুজারিক, সামুয়েল পার্শা প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই ক্রমে প্রচারিত হয়। কিন্তু এদেশে ইংরেজ-আগমনের পূর্বে অবশ্য এ-সকল কথা লোকে জানিতে পারে নাই। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী ও মির্জা সহন লিখিত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের কথা জানা যায়। তাহারা ভারতবাসী হওয়ায় তাহাদের লিখিত বিবরণ যে এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কোনও কোনও গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়, রামরাম বসু-প্রণীত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রই ইহার প্রমাণ। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পারসিক ভাষায় প্রতাপাদিত্যের কিছু কিছু বিবরণ আছে, কিন্তু আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ না থাকায় তিনি তাহার গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে বোধ হয় বসু-মহাশয় বাহারিস্তান প্রভৃতির কথা অবগত ছিলেন, বাহারিস্তানের কোনও কোনও কথা তাহার গ্রন্থেও দেখা যায়। রাজনামা নামে এক পারসিক গ্রন্থের কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এক্ষণে কিন্তু তাহার অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। সে যাহা হউক আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে নতুন তথ্য প্রকাশ করিয়াছে এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সে-কথা জানাইয়া দিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষজীবন সম্বন্ধে নতুন আলোক প্রদান করিয়া যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সে কথা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। পাদরিগণ, আবদুল লতিফ ও মির্জা সহন প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক, কাজেই তাহাদের বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত কথা অনেক পরিমাণেই জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ সকল বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের এক এক সময়ের কথাই জানা যায়, তাহার আনুপূর্বিক প্রকৃত বিবরণ কি তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই সকল বিবরণের পর আমরা ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গল হইতে প্রতাপের কোনও কোনও বিবরণ জানিতে পারি। কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এ-সকল প্রতাপের অনেক পরে লিখিত এবং প্রকৃত ইতিহাসের সহিত তাহাদের যথেষ্ট অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের কথাই সমস্ত বাংলায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রামরাম বসু মহাশয় তাহার রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতাপাদিত্যের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহ-মুখশ্রুত বিবরণ ও কোনও কোনও পারসিক ভাষায় লিখিত বিবরণ দেখিয়াই তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার গ্রন্থে কিছু কিছু ইতিহাসের কথা থাকিলেও জনশ্রুতি যে তাহার প্রধান অবলম্বন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাকে প্রতাপের প্রকৃত বিবরণ বলা যায় না। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার বসু-মহাশয়ের ভাষা পরিবর্তন করিয়া তাহার গ্রন্থের যে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে নতুন কোনও কথাই নাই। তাহার পর গবর্নমেন্টের Gazetteer, Statistical Account প্রভৃতিতে ঐ সকল গ্রন্থ ও প্রবাদ অবলম্বন করিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক উপন্যাস গ্রন্থেও কিছু কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ঔপন্যাসিক বিবরণই অধিক। অবশেষে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয় তাহাতেও অনেক স্থলে প্রবাদই স্থান পাইয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কোন কোন উপন্যাস ও নাটকও রচিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণসমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের 'প্রতাপাদিত্য' প্রকাশ করি। তাহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 'প্রবাসী' পত্রে আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী ও বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ দিয়া নতুন তথ্য জানাইয়া দেন। সর্বশেষে সতীশচন্দ্র মিত্র তাহার যশোহর খুলনার ইতিহাসে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত প্রবাদ ও কল্পনা বিজড়িত করিয়া এরূপ করিয়া তুলিয়াছেন যে, কোনটি প্রকৃত ইতিহাস, কোনটি প্রবাদ বা কল্পনা তাহা স্থির করা কঠিন। আমরা এই সকল বিবরণ আলোচনা করিয়া প্রতাপাদিত্য-সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সে-সময়ের প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রবাদ সকলের মূল কিরূপ তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব। এ-প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপেই প্রতাপের জীবনী আলোচনা করিব।

বারোভুঁইয়া ঃ

মোঘল-আমলে বঙ্গদেশে বারো জন ভুঁইয়ার কথা জানা যায়, ইহারাই বাংলার প্রকৃত মালিক ছিলেন। আকবরনামা, ডুজারিক ও পার্শার গ্রন্থ এবং রামরাম বসু প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে একথা জানা গিয়াছে। কাজেই মোঘল আমলের এই বারোভুঁইয়ার কথা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। হিন্দু-আমল হইতে এই বারোভুঁইয়া প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে হিন্দু রাজত্বকালে বারোভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কোনও কোনও ইংরেজ লেখকও হিন্দু-আমলের বারোভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও মোঘল-আমলের বারোভুঁইয়ার বিদ্যমানতা দেখিয়া, পূর্ব হইতে যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মোঘল-আমলে যে-বারো জন ভুঁইয়া ছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে। ডুজারিক, পার্শা প্রভৃতি উক্ত বারোজনের মধ্যে তিনজনকে হিন্দু ও অবশিষ্ট নয়জনকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিন্দু তিনজন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান বা

চান্দেকানের রাজা। আমরা জানিতে পারি, চাঁদরায়-কেদাররায় শ্রীপুরের, কন্দর্পরায়-রামচন্দ্র রায় বাকলার ও প্রতাপাদিত্য চ্যাণ্ডিকানের রাজা। কাজেই প্রতাপাদিত্য যে বারোভূঁইয়ার অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ভুঁইয়াদের মধ্যে ঈশা খাঁর নামই দেখা যায়, তিনি সকল ভুঁইয়ার প্রধান বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থে এবং আকবরনামায়ও উল্লিখিত হইয়াছেন। কেহ কেহ অবশিষ্ট আটজনের মধ্যে কোন হিন্দু ভুঁইয়ার নামোল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে বিশিষ্ট্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বংশ-পরিচয় ঃ

কুলগ্রন্থ, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ ও বংশপরম্পরায় প্রচলিত বিবরণ হইতে প্রতাপাদিত্যের বংশ-পরিচয় জানিতে পারা যায়। এই বংশ-পরিচয়কে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোনও কোনও ইতিহাসের দ্বারা তাহার কোনও কোনও কথা সমর্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র গুহ যশোর রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামের নিকট বাস করেন, তথায় বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগো-দপ্তরের কার্যে নিযুক্ত হন। তাহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। শিবানন্দও কাননগো-দপ্তরের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। এই শ্রীহরির পুত্রই প্রতাপাদিত্য। ইহারা সপ্তগ্রাম হইতে পরে গৌড়ে গমন করেন। সে-সময় সুলেমান কররানি গৌড়ের মসনদে উপবিষ্ট। তিনি দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও, একরূপ স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাহার পুত্র দায়ুদের সহিত শ্রীহরির পরিচয় ঘটে, দায়ুদের রাজত্বকালে শ্রীহরি তাহার প্রধান কর্মচারী হইয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও কতলু খাঁ দায়ুদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তবকাৎ-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এ কথা জানিতে পারা যায়। কতলু ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল।

যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ

দায়ুদ বাংলার শেষ পাঠান নরপতি। ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আকবর বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে, মোঘলেরা তাহাকে অনেকবার পরাজিত করিয়া অবশেষে নিহত করে। মোঘলদিগের সহিত সংঘর্ষকালে দায়ুদ গৌড় হইতে উড়িষ্যায় পলায়নকালে তাহার সমস্ত ধনরত্ন বিক্রমাদিত্যের হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি সে-সমস্ত নৌকা বোঝাই করিয়া দায়ুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তবকাৎ-ই-আকবরী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে এ কথা জানা যায়। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাহারা সুন্দরবনের যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তাহা চাঁদ খাঁ নামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের জায়গির ছিল। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া তথাকার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আবাসস্থান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ইহারই নিকটে যশোরেশ্বরী নামে পীঠদেবতার স্থান ছিল। তাহার পর দায়ুদের নিধন ঘটিলে, তাহার সেই সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বিক্রমাদিত্য যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও যশোর-সমাজ গঠন করেন। তাহাদের রাজ্যের চিহ্ন ও যশোর-সমাজ আজও বিদ্যমান আছে। অবশেষে বাদশাহ-দরবার হইতে তাহারা তাহাদের জমিদারি মঞ্জুর করিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে একজন ভুঁইয়া হইয়া উঠেন।

প্রতাপের বাল্যজীবন ঃ

গৌড়েই প্রতাপের বাল্যজীবন আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়। তথায় তিনি পারসিকাদি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাও আরম্ভ হয়। পরে যশোরে আসিয়া বিশেষভাবে অস্ত্রপরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বসু-মহাশয় বলেন, একদিন একটি উড্ডীয়মান পক্ষীকে

শরবিদ্ধ করিয়া নিপাতিত করায়, বিক্রমাদিত্য দুঃখিত ও ভীত হইয়া প্রতাপকে সভ্যভাবে শিক্ষিত করিবার জন্য আগরায় পাঠাইয়া দেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তিনি ইহাতে আপত্তি করিলে বিক্রমাদিত্য তাহা শুনেন নাই। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফলে তিনি নাকি পিতৃদ্রোহী হইবেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রতাপ আগরায় গিয়া বাদশাহ আকবরকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং যশোরের রাজস্ব যাহা তাহার দ্বারা দাখিল করা হইত, তাহা গোপন করিয়া, নিজ নামে যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়া আসেন। এ-সকল কথার অবশ্য আমরা কোনও ঐতিহাসিক সমর্থন পাই নাই। সুতরাং ইহার সত্যতাসম্বন্ধে বলিতে পারি না। তবে প্রতাপ যে যশোর-রাজ্যের ভুঁইয়া হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য মানিয়া লইতে হয় এবং তাহাও যে বাদশাহের অনুমোদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোর-রাজ্য-বিভাগ ঃ

প্রতাপের একচ্ছত্রত্বলাভের আসা দিন-দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, বিক্রমাদিত্য যশোর-রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া প্রতাপকে দশ আনা ও বসন্তরায়কে ছয় আনা সম্পত্তি দিয়া যান। যশোর-রাজ্য ভাগীরথী হইতে মধুমতী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব ভাগ প্রতাপের ও পশ্চিম ভাগ বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। কিন্তু চাকসিরি বা চকশ্রী নামে একটি স্থান পূর্বদিকে বসন্তরায়ের অধিকারে থাকায় প্রতাপাদিত্য তাহা পাইবারো জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন এবং বসন্তরায়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠেন। ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও ঘটনাপরম্পরায় এ সকল কথাকে মানিয়া লওয়া যায়। প্রতাপ অবশেষে বসন্তরায়কে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্যের ভুঁইয়া হইয়াছিলেন। যে-সময়ে পাদরিগণ এদেশে আসেন, তখন প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর-রাজ্যেরই রাজা। তাহাদের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

প্রতাপের রাজধানী গঠন ঃ

যশোর নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ধূমঘাট নামক স্থানে প্রতাপ তাহার রাজধানী গঠন করেন। বসন্তরায় তাহাদের স্থাপিত যশোরেই অবস্থান করিতেন। এই দুই নগর পরে এক হইয়া যশোর বা ধূমঘাট নামেই অভিহিত হয়। প্রতাপ যশোরেশ্বরী পীঠদেবতার স্থান নির্ণয় করিয়া তাহার মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, বসু-মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন। ধূমঘাটে দুর্গনির্মাণ, তাহার নিকটবর্তী স্থানে জাহাজাদি রাখিবার এবং কামান. বন্দুক ও গোলাগুলি প্রস্তুতেরও স্থান হয়। প্রতাপের কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ সাগরদ্বীপে তাহার নৌবাহিনীর প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন। এই সাগরদ্বীপকে ইউরোপীয়েরা চ্যাণ্ডিকান বা চান্দেকান বলিয়াছেন, সেইজন্য তাহাদের নিকট প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (Last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

উড়িষ্যায় প্রতাপ ঃ

প্রতাপ মোঘলের অধীনতা স্বীকার করিলেও মধ্যে মধ্যে স্বাধীনতা অবলম্বনের ইচ্ছা করিতেন। যখন মোঘলেরা উড়িষ্যার কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানদিগকে দমন করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্য একবার উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার আনীত গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ হইতে তাহা বুঝা যায়। উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে উক্ত শিবলিঙ্গ উৎকল হইতে প্রতাপকর্তৃক আনীত ও বসন্তরায় কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া লিখিত ছিল, অনেকে তাহা দেখিয়াছেন। প্রস্তর-ফলক, শিবলিঙ্গ ও তাহার মন্দিরের এখন আর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু গোবিন্দদেব আজও বিদ্যমান আছেন। উড়িষ্যায় প্রতাপ কোন পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিশ্বকোষে এবং পরে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-

খুলনার ইতিহাসে প্রতাপ মোঘলপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি যে, তিনি পাঠানপক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন। কারণ পাঠান-সর্দার কতলু খাঁর সহিত তাহার পিতা বিক্রমাদিত্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একথা আমাদের প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। মোঘলেরা জমিদারদিগকে তাহাদের সহিত যোগ দিবারো জন্য আহ্বান করায়, প্রতাপাদিত্য তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের সে কথা অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের সহিত কতলু খাঁর বন্ধুত্ব এবং কতলুর কনিষ্ঠ পুত্র জমাল খাঁকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি নিয়োগ করায়, প্রতাপাদিত্যের পাঠানপক্ষে যোগদানই যে অধিকতর সম্ভবপর ইহাই মনে হয়। আবার আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার পরেই মোঘলদিগের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মোঘলদের সহিত সংঘর্ষারম্ভ ঃ

উড়িষ্যায় প্রতাপ পাঠানদিগের সহিত যোগ দেওয়ায় এবং স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ করায়, মোঘলেরা তাহার দমনে প্রবৃত্ত হয়। যে-সময়ে আজিম খাঁ বাংলার সুবেদার ছিলেন, সেই সময়ে প্রথমে মোঘলদের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথমে আবরাম খাঁ নামে মোঘল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন সেনাপতি আজিম খাঁর সময়ে এদেশে ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রতাপের বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বসু-মহাশয় তাহার নিপাতের যে কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। ইব্রাহিম খাঁ ইহার পর অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তবে তিনি পরাজিত হইতে পাবেন, কারণ আমরা দেখিতেছি স্বয়ং আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ঘটককারিকাতে যে আজিমের নিহত হওয়ার কথা আছে, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য, কারণ আজিম অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তবে যশোর-চাঁচড়ার রাজবংশের কাগজপত্রে ও অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে, আজিম প্রতাপকে দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকৃত কোনও কোনও স্থান চাঁচড়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবেশ্বর রায়কে প্রদান করা হইয়াছিল। ভবেশ্বর যুদ্ধে আজিমকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখানে একটা কথা বলিবার আছে যে, ইব্রাহিম ও আজিমের যুদ্ধযাত্রা স্বতন্ত্র কি একই তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বসন্তরায়ের হত্যা ঃ

ইহার পর প্রতাপ অনেক দিন পর্য্যন্ত নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি বলসঞ্চয় করিতে চেষ্টা করেন, সৈন্য, হস্তী, রণতরী, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি-নির্মাণের বিপুল আয়োজন এ-সময়ে তিনি করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরে মোঘলদিগের সহিত তাহার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার বিপুল আয়োজনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বলসঞ্চয় আরম্ভ করিয়া প্রতাপের একচ্ছত্রত্বলাভের প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়া উঠে, কারণ তিনি পিতৃব্য বসন্তরায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সমস্ত যশোর-রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বসু-মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ-তিথিতে তিনি যখন শ্রাদ্ধকার্যে ব্যাপৃত, তখন প্রতাপ কাপুরুষতাসহকারে শ্রাদ্ধস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। বসন্তরায়ের কোন কোন পুত্রও প্রতাপের হস্তে নিহত হন। ইহা কোন ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও বসন্তরায়ের বংশীয়গণ পুরুষপরম্পরাক্রমে একথা বলিয়া আসিতেছেন। রামরাম বসু-মহাশয়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতাপের রাজ্যে পাদরিগণ ঃ

প্রতাপ যে-সময়ে যশোর-রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময় ১৫৯৮ খ্রিঃ অব্দে

গোয়ার জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রধান পাদরি নিকোলাস পাইমেন্টা বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্নান্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামে দুই জন পাদরিকে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর ১৫৯৯ খ্রিঃ অব্দে মেলসিওর ফনসেকা ও এন্ড্রু বাউয়েস আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন। ইহারা বাংলার নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। সোসা বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাদরিরা প্রধান প্রধান ভুঁইয়াদের সহিত সাক্ষাৎও করেন। বাকলার রামচন্দ্র রায় ও চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাতের কথা তাহারা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান কোথায় সে-কথা আমরা পরে বলিব। ১৫৯৮ খ্রিঃ অব্দে প্রথমে সোসা ও ১৫৯৯ খ্রিঃ অব্দের শেষভাগে তাহার একটি গির্জা নির্মাণ করেন, তাহাই বাংলার প্রথম গির্জা বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু ব্যান্ডেল ও চট্টগ্রামে একই বৎসরে গির্জা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। চ্যাণ্ডিকানের গির্জা নির্মাণে রাজা ও যুবরাজ পাদরিদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন।

কার্ভালোর হত্যা ঃ

পর্তুগিজদের মধ্যে কার্ভালো নামে একজন সর্দার জলযুদ্ধে বিশেষরূপ দক্ষ ছিল। কার্ভালো শ্রীপুরের ভুঁইয়া কেদাররায়ের অধীনে সন্দ্বীপে অবস্থিতি করিত। আরাকান-রাজ সন্দ্বীপ অধিকারের চেষ্টা করিলে কার্ভালো সেখান হইতে চলিয়া আসে, ক্রমে ক্রমে সে চ্যাণ্ডিকান উপস্থিত হয়। চ্যাণ্ডিকানের রাজা তাহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরাকানের রাজা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন। তিনি কার্ভালোর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এইরূপ কথিত হয় যে, প্রতাপাদিত্য আরাকানরাজকে ভয় করিতেন, তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি কার্ভালোকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। কার্ভালো চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে, রাজা প্রথমে তাহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে লইয়া আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে তাহার ঔদাসীন্য দেখিয়া পাদরি ও অন্যান্য পর্তুগিজগণ কার্ভালোর হত্যা আশঙ্কা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন। কার্ভালো কিন্তু চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তিনদিন পরে রাজা তাহাকে ও তাহার অনুচরদিগকে বন্দি করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে তাহাদের হত্যাসম্পাদন হয় বলিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিলেন। প্রতাপকর্তৃক কার্ভালোর হত্যা সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন যে, ইহার অনেক পরে কাশীম খাঁর সুবেদারী সময়ে আরাকানরাজের একজন পর্তুগিজ সর্দার কাপ্তেন ডোরমশ কার্ভালো তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোঘলপক্ষে যোগ দিয়াছিল বলিয়া বাহারিস্তানে উল্লেখ আছে। এই ডোরমশ বা ডো-আমো পর্তুগিজ ডোমিঙ্গস (Domingos) শব্দের ফারসি অপভ্রংশ। প্রতাপকর্তৃক হত কার্ভালোরও ডোমিঙ্গ নামই ছিল। সুতরাং এই দু-জনই এক ব্যক্তি। কিন্তু এক নামের কি দুই ব্যক্তি হইতে পারে না? আর ডোরমশ ও ডোমিঙ্গকে একই প্রমাণ করিতে চেষ্টা যে কষ্টকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুজারিকের গ্রন্থে প্রথমোক্ত কার্ভালোকে ডোমিনিক (Dominique) নামে উল্লিখিত দেখা যায়। কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া পাদরিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। পাদরি ও অন্যান্য পর্তুগিজগণ চ্যাণ্ডিকান হইতে পলায়ন করেন। তাহাদের গির্জা ভূমিসাৎ হয়। এখানে আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি যে, দুই কার্ভালো একই ব্যক্তি হইলে, যশোরের ঘটনার দীর্ঘকাল পরে কার্ভালোর কোনও সংবাদ না পাওয়ার কারণ বুঝা যায় না। গঞ্জালেশ ফিরিঙ্গির নামই সে-সময়ে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরাকান-রাজ ও কার্ভালো দুই শত্রুর মিলনও অসম্ভব। সতীশবাবু এ সম্বন্ধে আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবাদ বা তাহার কল্পনাপ্রসূত।

চ্যাণ্ডিকান কোথায়?

চ্যাণ্ডিকান কোথায় এ-সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রতাপাদিত্যে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা নানা প্রমাণে দেখাইয়াছিলাম যে, সাগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। সার টমাস রোর মানচিত্রে এঞ্জিলি বা হিজলির পরপারে চ্যাণ্ডিকান দ্বীপ (He de Chundican) অঙ্কিত আছে। এই মানচিত্র সার টমাস রোর সহচর বেসিন কর্তৃক অঙ্কিত। সামুয়েল পার্শাও লিখিয়াছেন যে, চ্যাণ্ডিকান গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত (Chandican which lyeth at the mouth of the Ganges)। আর বহুস্থলে প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা (The last King of Saugur Island) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব ও সতীশচন্দ্র মিত্র ধূমঘাটকে চ্যাণ্ডিকান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেভারিজ সাহেব চ্যাণ্ডিকান প্রদেশকে চাঁদ খাঁর জায়গির বলিয়া চাঁদখাঁ হইতে চ্যাণ্ডিকান কথার উৎপত্তি মনে করেন এবং ধূমঘাটকেই চাঁদখা জায়গিরের প্রধান স্থান মনে করিয়া তাহাকেই চ্যাণ্ডিকান নগর বলিতে চাহেন। বেভারিজ সাহেব কোনও মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি অবশ্য সার টমাস রোর মানচিত্র দেখেন নাই। সতীশবাবুও ধূমঘাটকেই চ্যাণ্ডিকান বলিতে চাহেন। তিনি সার টমাস রোর মানচিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ঢাকার নিকট সাতগাঁ অঙ্কিত থাকার কথা বলিয়া উহা অবিশ্বাস্য মনে করেন। অবশ্য উক্ত মানচিত্র জরীপ করিয়া অঙ্কিত নহে, উহাতে কেবল প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থানই দেখান হইয়াছে। কাজেই কোন স্থান কোনদিকে তাহা উহা হইতে বুঝিয়া লওয়া যায়। আর ঢাকার পার্শ্বেই সাতগাঁ অঙ্কিত নাই, উভয়ের মধ্যে দূরত্বও দেখান হইয়াছে। গঙ্গার মোহনায় যে চ্যাণ্ডিকান অবস্থিত, আমরা পার্শার এ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সতীশবাবু সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। অবশ্য ধূমঘাট কদাচ গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত নহে। আর ধূমঘাট ও যশোর যে পরস্পর সংলগ্ন ও একই নগর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সতীশবাবুও তাহা স্বীকার করেন। তাহা হইলে কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ যশোর হইতে পরদিন মধ্যরাত্রিতে চ্যাণ্ডিকানে পৌঁছিলে, উভয় স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তাহা কি বোধ হয় না? বেভারিজ সাহেবও তাহা মনে করিয়াছিলেন। সতীশবাবু এই বিলম্বের কারণ কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিতে চাহেন। এরূপ বলিবার কারণ তাহার মত বজায় রাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর তিনি বা ফক্‌নার সাহেব ঈশ্বরীপুরে পূর্ব-পশ্চিমে স্থিত কয়েকটি সমাধি দেখিয়া তাহা মুসলমানদিগের কবর নহে এবং খ্রিস্টানদিগেরই সম্ভব বলিয়া সেইখানেই পাদরিদিগের গির্জা নির্মিত হইয়াছিল,* অতএব ঐ স্থানেই চ্যাণ্ডিকান বলিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত কবরগুলি খ্রিস্টানদিগের হইলেও বহু পর্তুগিজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য করিত। তাহাদের কবর হওয়া কি সম্ভব নহে? সুতরাং এরূপ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। ফলতঃ সাগরদ্বীপই যে চ্যাণ্ডিকান তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদখা জায়গির হইতে তাহার উক্ত নাম হইলেও হইতে পারে। সতীশবাবু প্রতাপের রাজধানী সাগরদ্বীপে ছিল বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। আমরা ধূমঘাট-যশোরকেই প্রতাপের রাজধানী বলিয়াছি। আমাদের প্রতাপাদিত্য দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

জামাতৃ-বিদ্বেষ ঃ

বাকলার রাজা কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী বা বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপ চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা রাজ্য ও সমাজের আধিপত্যের জন্য বিবাহরাত্রিতেই জামাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বসু-মহাশয় বলেন যে, বিবাহ সময়েই ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

এক সময়ে রামচন্দ্র যে অধিক দিন নিজরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র ছিলেন এবং আরাকান-রাজ তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা জানা যায়। রামচন্দ্রের বিবাহসময়ে তাহা হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ এবিষয়ে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এ-কথা যশোর ও বাকলা উভয়ত্রই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র নিজ পত্নী ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে যশোর হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

প্রতাপ ও মানসিংহ ঃ

আমরা বলিয়াছি যে, প্রতাপ অনেক দিন নীরব থাকিয়া বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাহার রাজ্যের গৌরবও দিন-দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। পণ্ডিত, কবি ও অন্যান্য গুণিগণ তাহার দরবারে উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইতেন। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস তাহার গানে প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপের দানও অসীম ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সকল দিক হইতে তাহার গৌরব বর্ধিত হওয়ায় ক্রমে তাহার আবার স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি সে-ভাব প্রকাশ করিতেও আরম্ভ করেন। বসন্তরায়ের হত্যার পর তাহার এক পুত্র রাঘব রায় বা কাঁচু রায় প্রথমে উড়িষ্যার ঈশা খাঁ লোহানীর নিকট পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সমস্ত কথা জানাইলে এবং সে-সময় পাঠানেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে ১৬০৬ খ্রিঃ অব্দে আবার বাংলায় পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্বে মানসিংহ ১৬০৪ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলায় সুবেদারী করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমবার সুবেদারী সময়ে কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানগণ, ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি ভুঁইয়া তাহার নিকট পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বারে তাহার প্রতাপাদিত্যের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মানসিংহ রাজধানী রাজমহল হইতে যশোর অভিমুখে যাত্রা করিলে, হুগলির কাননগো দপ্তরের মোহরের ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের অদিপুরুষ ভবানন্দ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কয়েকটি পরগণার জমিদারি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পরগণাগুলির জমিদারি সনন্দের তারিখ ১০১৫ হিজরী (১৬০৬ খ্রিঃ অব্দ) লিখিত আছে, সুতরাং এই সময়েই মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইসলাম খাঁ চিস্তির সময়ে ভবানন্দ 'মজুমদার' উপাধিলাভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সে-সময়েও মোঘল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। ভবানন্দ যে পূর্বে প্রতাপাদিত্যের সরকারে কাজ করিতেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি মোঘল সেনাপতিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যে দেশদ্রোহী তাহাও বলা যায় না। কারণ তিনি সরকারের কর্মচারী আর প্রতাপাদিত্য সরকারের বিদ্রোহী। নিমকহারামী দোষটাও কম নহে। মানসিংহ যশোর অভিমুখে যাত্রা করিয়া কোনও কোনও স্থানে নতুন পথ নির্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার নির্মিত সে পথকে আজিও গৌড়-বঙ্গের রাস্তা বলিয়া থাকে। যশোর-দুর্গের নিকটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কয়েক দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলে। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষের কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নাই, তবে ভবানন্দের সনন্দ, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা, বসু-মহাশয়ের গ্রন্থ এবং রাজপুতানা-জয়পুরের বংশাবলী পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ প্রতাপের গড় দখল করিয়াছিলেন। উক্ত বংশাবলীতে কেদাররায়ের সহিত মানসিংহের যুদ্ধের কথাও আছে এবং তিনি তাহার নিকট হইতে 'শিলাদেবী' নামে প্রতিমা অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী লইয়া যান বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহা সত্য নহে। আমাদের প্রতাপাদিত্যে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, অন্নদামঙ্গল, ঘটককারিকা এবং পরবর্তী গ্রন্থসমূহে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, এ কথা যে সত্য নহে তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বংশাবলী ও বসু-মহাশয়ের গ্রন্থেও একথা নাই। বাহারিস্তান তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। নানাদিক দিয়া আলোচনা করিলে মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া যায়। সংঘর্ষে অবশ্য প্রতাপই পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাঁচু রায় মানসিংহকে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাহার সঙ্গে বাইশজন আমীরও আসেন। এই বাইশ জন আমীর হত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ঈশ্বরীপুরে বার ওমরার গোর বলিয়া কতকগুলি সমাধি আমীরদিগের গোর বলিয়া কথিত হয়। যুদ্ধে হতাহত হওয়া অসম্ভব নহে। কাঁচু রায় যে মানসিংহের নিকট হইতে 'যশোরজিৎ' উপাধি পাইয়া পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

শেষ সংঘর্ষ ঃ

ইসলাম খাঁ চিস্‌তি ১৬০৮ খ্রিঃ অব্দে বাংলার সুবেদার হইয়া আসেন। ইনি ফতেপুর শিকরীর প্রসিদ্ধ ফকির শেখ সেলিম চিস্তির পৌত্র, যাহার নামানুসারে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সেলিম নাম হয়। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ ইসলাম খাঁর দেওয়ান হইয়া আসেন। ইহার অনুচর আবদুল লতিফ খাঁর ভ্রমণ-কাহিনী ও ইসলাম খাঁর অন্যতম সেনাপতি মির্জা সহনের প্রণীত বাহারিস্তান হইতে প্রতাপাদিত্যের সে-সময়ের কথা জানিতে পারা যায়। ইসলাম খাঁ রাজমহলে আসিলে, প্রতাপের দূত শেখ বদী তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে লইয়া নানা উপহার-সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুবেদার রাজকুমারের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া প্রতাপাদিত্যকে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। লতিফ লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের মতো সৈন্য ও অর্থ বলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না। তাহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা ও বিশ হাজার পাইক এবং পনেরো লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল। ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় যান ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। পথিমধ্যে অনেক জমিদার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য শেখ বদীর সহিত উপহার লইয়া উপস্থিত হন। সুবেদার প্রতাপাদিত্যের সম্মান করিয়া তাহাকে ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে তাহার সহিত যোগদানের কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেন। প্রতাপ কিন্তু যথাসময়ে সুবেদাররের সহিত যোগ দেন নাই। ইহাতে সুবেদার যারপরনাই ক্রুদ্ধ হন। শেষে যখন সংগ্রামাদিত্যকে কতকগুলি রণপোত সহ পাঠাইয়া সুবেদারের নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন সুবেদার ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সকল রণপোত এমারতের জিনিসপত্র বহিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জা সহনকে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল করার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইনায়েৎ খাঁ প্রধান সেনাপতি হইয়া স্থলসৈন্যের এবং সহন রণতরী ও তোপ লইয়া যাত্রা করিলেন। এই সহনই তাহার বাহারিস্তান গ্রন্থে এই সকল বিবরণ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহারা ঢাকা হইতে নানা নদনদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ইছামতী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে সালিখা থানার প্রতাপের সৈন্যের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য রণতরী, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। কমল খোজা ও কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাহার সহকারি-স্বরূপে গমন করেন। কমল খোজা নৌসেনার ও জমাল খাঁ স্থলসৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিলে ক্রমে মোগলেরা জয়লাভ করিতে আরম্ভ করে। কমল খোজা নিহত হন। উদয় ও জমাল ক্রমে হটিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে

মোঘলেরা ধুমঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া হকীম খাঁকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ধৃত হইয়া ঢাকায় নজরবন্দি রূপে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। হকীম খাঁ তাহার পর যশোরে আসিয়া মোঘল-সৈন্যের সহিত যোগ দেন। প্রতাপের সেনাপতি জমাল খাঁও তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মোঘলদিগের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে মোঘলদিগের বলবৃদ্ধি হইয়া উঠে। মোঘলেরা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, কিছুক্ষণ উভয়পক্ষের গোলাবৃষ্টির পর প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া ইনায়েতের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ইনায়েৎ তাহাকে ঢাকায় লইয়া গেলে ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এদিকে মির্জা সহন যশোরে থাকিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্যের কি হইল জানা যায় না, তিনি যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। প্রতাপেরও পরিণাম কি হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আগরায় পাঠাইতে তাহার যে বারাণসীতে দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল, ইহার কোনও ঐতিহাসিক সমর্থন নাই। ইসলাম খাঁর সময়েই যে প্রতাপের পতন ইহা বাহারিস্তান সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বসু-মহাশয়ও সেই কথা বলিয়াছেন।

প্রবাসী ১৩৩৯ *বৈশাখ*

প্রতাপাদিত্যের কথা ঃ

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। বাহারিস্তানের গ্রন্থকর্তার নাম মির্জা সহন নহে, মির্জা নথন। যদুবাবু ভুল করিয়া সহন পড়িয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তদীয় Mughal North-East Frontier Policy নামক গ্রন্থে এই ভ্রম-সংশোধন করিয়াছেন। পুরাতন আসামী বুরঞ্জিগুলিতে এই নথনের নাম অনেকবার করা হইয়াছে।

২। বঙ্গের 'বারোভুঁইয়া' নাম যে আসামের বারোভুঁইয়ার অনুকরণ তাহা আমার এক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বারো' কথাটা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক নহে। যে-আমলে দেশে কোন অধিরাজ ছিল না, ছোটবড় অনেকগুলি জমিদারের অধীনে দেশ ছিল, সেই আমলকেই বারোভুঁইয়ার আমল বলিত। Bengal : Past and present, Vol. XXXV, p. 30. "How the number of the Chiefs came to be fixed at 'twelve'." দ্রষ্টব্য।

৩। প্রতাপের বংশ-পরিচয়ের জন্য রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত'-এর উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

৪। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য দায়ুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই যে যশোর-রাজ্য মোঘলের নিকট হইতে বকশিস পাইয়াছিলেন, ইহা আমার প্রবন্ধে বেশ পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। Bengal : Past and Present, Vol. XXXVI, P. 16 দ্রষ্টব্য। হতভাগ্য দায়ুদের প্রধান অন্তরঙ্গ ছিল দুইজন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি— কতলু খাঁ ও শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। এই দুইজনই দায়ুদের সর্বনাশের মূল হইয়াছিল। কতলু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোঘলের হাতে উড়িষ্যা-রাজ্য ইনাম পায়, আর শ্রীহরি পায় যশোর রাজ্য। কতলুর সহিত মোঘলের আবার অল্প দিনের মধ্যেই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যশোর-রাজ্যে চিরদিন মোঘলের অনুগত ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা একেবারে মিথ্যা কথা এক পতনকালের সংঘর্ষ ভিন্ন তাহার সহিত মোঘলের কোনও দিন আর কোনও সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া বিন্দুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

৫। নিখিলবাবু লিখিয়াছেন—"যে সময় আজিম খাঁ বাংলার সুবেদার ছিলেন সেই সময়ে প্রথম মোঘলদের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।" আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। তিনি এক রকম বিহার সীমান্তে ছাড়াইয়া বাংলায় ঢোকেন-ই নাই! প্রতাপাদিত্যের সহিত সংঘর্ষ অনেক দূরের কথা। নিখিলবাবু চাচড়া রাজবংশের কাগজপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাগজপত্রের কোনটায় যদি আজিম খাঁ-প্রতাপ সংঘর্ষ সমর্থিত হয় তবে তাহা সর্বসাধারণ্যে চিত্রাদি-সহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। সতীশবাবুর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' দেখা যায় (পৃ. ৪৭৯) এই বংশের ভবেশ্বর সিংহ আজিম খাঁর সুবাদারীর কালে চারিটি পরগণার সনন্দ প্রাপ্ত হন। মোঘলপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই নাকি এই সনন্দ-প্রাপ্তির কারণ। এই মূল্যবান দলিলখানি থাকিলে চিত্রসহ উহার পাঠ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৬। কার্ভালো সত্যই প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। কাশিম খাঁর সুবাদারীর আমলের কার্ভলো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। Bengal : Post and Present, Vol. XXXV, P. 28, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। বসু-মহাশয়ের প্রতাপাদিত্যচরিতেও দেখা যা, মানসিংহ যশোরে অতি বন্ধুভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন (নিখিলবাবুর সংস্করণ, ৬২ পৃষ্ঠা)। মানসিংহের বঙ্গীয় ভৌমিকদমনের ইতিহাস 'আকবরনামা' হইতে বেশ বিস্তৃতরূপেই জানা যায়। প্রতাপের সহিত সংঘর্ষের কোন কথা কোথাও নাই। প্রতাপ আগাগোড়া মোঘলপক্ষে ছিলেন। একটা নিতান্ত মিথ্যা কথা ভারতচন্দ্রের প্রসাদে বাংলায় কুখ্যাত হইয়া আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার প্রতাপাদিত্য নাটকে ইহা লইয়া কত রঙ্গই না করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্য করার জন্যই নাকি মানসিংহ তাহাকে কয়েকটি পরগণা বকশিস দিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। বোর্ড-অব-রেভেনিউর অনুমতি ও আনুকূল্যে আমি নিজে কৃষ্ণনগর গিয়া কৃষ্ণনগর জমিদারির মূল সনন্দগুলির ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছি এবং পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাদি করিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি। জাহাঙ্গীরের আমলের বাদসাহী সনন্দ দুই খানা আছে। প্রথমখানার তারিখ ১৩ শাবান, ১০১৫ হিজরি = ৪ ডিসেম্বর, ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয়খানা ১০২২ হিজরির—প্রথমখানার ৫ বছরের পরবর্তী। দ্বিত্তীয়খানার বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন নাই। এই সনন্দদ্বয় চিত্রাদি-সহ যথাসময়ে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

প্রথমখানার মর্ম এই যে ভবানন্দ বাঙালির দুই ভ্রাতা বসন্ত ও দুর্গাদাস দিল্লিতে যাইয়া বাদশাহী দরবারে আরজী পেশ করিয়াছেন ও সুবা বাংলার সরকার সাতগাঁর অধীন তিনটি পরগণার চৌধুরাই এবং কানুনগুই পুরুষানুক্রমে উক্ত ভবানন্দ ভোগ করিতেছেন এবং সম্প্রতি নদীয়া পরগণার কতকগুলি জনশূন্য গ্রামে জনবসতি করাইয়া এবং মহদপুর নামকরণ করাইয়া সুবাদার রাজা মানসিংহ এই পরগণারও চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দ বাঙালিকে প্রদান করিয়াছেন। মহদপুরের আয় ১২,০০০ টাকা। মানসিংহ মহদপুরের চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দকে প্রদানের সনন্দ বাদশাহী শেরেস্তায় দাখিল করিয়াছেন। বাদশাহ আদেশ দিলেন পুরুষানুক্রমে উপভুক্ত তিন পরগণার চৌধুরাই ও কানুনগুই ভবানন্দের অব্যাহত থাকিবে। নূতন পরগণা মহদপুর 'জাহাঙ্গীরপুর' নাম প্রাপ্ত হইবে এবং উহার চৌধুরাই ও কানুনগুইও ভবানন্দে সমর্পিত হইল ও এই সমর্পণ বাদশাহের অনুমোদন লাভ করিল। সুবাদার কুতবউদ্দিন আদেশ পাইলেন, জাহাঙ্গীরপুরের আয় যদি খালসা-বিভাগে লওয়ার উপযুক্ত হয় তবে উহা খালসা-বিভাগে যাইবে, নচেৎ উহা জাগিরদারের বেতন-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

পুরাতন তিন মহালের নাম বাগোয়ান, মন্যারি, নদীয়া। নতুন মহালের নাম জাহাঙ্গীপুর ওরফে মহদপুর।

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিবার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হইতে এই সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, উপরের সংক্ষিপ্তসার হইতে ঐতিহাসিকগণ এখন তাহা বিচার করিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ, এই আমলের ইতিহাসের মালমশলা যাহা পাওয়া যায় তাহা যথাসম্ভব ঘাঁটিয়া যশোহর-রাজ্য সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে পাঠানরাজের বিশ্বাস-হননের পুরস্কার-স্বরূপ শ্রীহরি যশোররাজ্য মোঘলের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য চিরদিন মোঘলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার চেষ্টা, স্বাধীনতা-সমর ইত্যাদি নিছক মিথ্যা কথা। স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছিলেন কতলু খাঁ, ঈশা খাঁ, মাস্তম খাঁ কাবুলী, ঈশা খাঁর পুত্রগণ, ওসমান খাঁ, এবং হিন্দু ভুঁইয়ার মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়।

জবরদস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসিয়া প্রবলপ্রতাপে ভুঁইয়া দমন আরম্ভ করিলে প্রতাপ তাহাকে যথোচিত সাহায্য না করায় ইসলাম খাঁ প্রতাপের দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। আত্মরক্ষার্থ অবশেষে প্রতাপ মোঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের ফলেই তাহার পতন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রবাসী ১৩৩৯ আষাঢ়*

প্রতাপাদিত্যের কথা ঃ

বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা 'প্রতাপাদিত্যের কথা' নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম, আষাঢ় সংখ্যায় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনায় সুদক্ষ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সে-সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথায় তাহার আলোচনা করিতেছি। তাহার প্রধান কথা এই যে, প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা একেবারেই মিথ্যা কথা। কোনও কোনও মুসলমান লিখিত ইতিহাসে প্রতাপের সহিত মোঘল-সংঘর্ষের কথা নাই বলিয়া এ কথাটা যে একেবারে উড়াইয়া দিতে হইবে, তাহা আমরা মনে করি না। যাহা এদেশের পুঁথিপত্রেও লোকের মনে চিরজাগরূক হইয়া আছে, সে-কথাটাকে বিশিষ্ট কোনও প্রমাণ না দেখাইয়া কেবল অনুমানের বলে উড়াইয়া দেওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। নিম্নে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আমরা বলিয়াছি আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভট্টশালী মহাশয় তাহার কোন প্রমাণ নাই বলিতেছেন। চাঁচড়ার রাজবংশের কাগজপত্র হইতে তাহা জানা যায় বলিয়া ওয়েস্টল্যান্ড সাহেবের যশোরের বিবরণে, খুলনা গেজেটিয়ার প্রভৃতিতে তাহা লিখিত আছে। চাঁচড়ার রাজবংশীয়গণও সে-কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। ভট্টাশালী মহাশয় সে দলিলের চিত্রসহ পাঠ দেখিতে চাহেন, অবশ্য রাজবংশীয়েরা তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন যে, আজিম খাঁ বিহার-সীমান্ত ছাড়াইয়া বাংলায় প্রবেশই করেন নাই। স্টুয়ার্ট কিন্তু তাহার টাঁড়ায় অবস্থানের কথা বলিয়াছিলেন। ব্লকম্যানের আইন-ই-আকবরীতে আজিমের বাংলা বিহার দুইবার নিয়োগের কথা আছে। প্রথমবার অবশ্য তিনি প্রায় বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বাংলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষরূপে আদেশ দেওয়া হয়। সেই সময়ে তিনি মাশুম খাঁ প্রভৃতিকে দমন করেন। উড়িষ্যার কতলু খাঁকে দমনের ব্যবস্থা হয়। আজিম যে বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাহা ঘটককারিকা হইতেও জানা যায়। যদিও ঘটককারিকার প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিমের মৃত্যুকথা মিথ্যা, তথাপি তাহাদের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল ইহা মনে করা যাইতে পারে। আজিম খাঁ বাংলায় না আসিলে, বাংলার নিভৃত পল্লীতে বসিয়া ঘটককারিকার লেখক কিরূপে তাহার কথা

জানিতে পারিলেন, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? লোকপরম্পরায় শ্রুত আজিমের কথা তিনি যে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যে সংঘর্ষ ঘটে নাই, একথা ভট্টশালী মহাশয় জোর করিয়াই বলিতেছেন। তিনি প্রথমে রামরাম বসু মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, বসু-মহাশয় যশোরে মানসিংহকে প্রতাপ কর্তৃক অভ্যর্থিত হওয়ার কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু মানসিংহ যে প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ-কথাও বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তবে প্রতাপ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যশোরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বসু-মহাশয় না বলিলেও আমরা কিন্তু প্রতাপ ও মানসিংহের সংঘর্ষের কথা অন্য দিক হইতে জানিতে পারি। ভট্টশালী মহাশয় বলিতেছেন, 'আকবরনামা'য় মানসিংহের বঙ্গীয় ভৌমিকদমনের কথা আছে, কিন্তু প্রতাপের সহিত সংঘর্ষের কোনও কথা নাই। একথাটা তাহার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বলিয়াছি প্রতাপের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহের দ্বিতীয়বার বাংলায় আগমনকালে। সুতরাং 'আকবরনামা'য় সে-কথা কিরূপে থাকিবে? প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষের কথা অন্নদামঙ্গল ও ঘটককারিকা ছাড়িয়া দিলেও আমরা সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও জয়পুরের বংশাবলী পুঁথি হইতে তাহা জানিতে পারি। কোথায় কৃষ্ণনগর আর কোথায় জয়পুর! এই দুই স্থানের রাজবংশে একথাটা বদ্ধমূল হইয়াই আছে। একে অপরের কথা নকল করিয়াছে একথা বলা যায় না। প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযানে ভবানন্দের সাহায্যের কথা কেবল ভরতচন্দ্র বলেন নাই, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও সে কথাটা আছে। দুই-ই কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদেশে লিখিত, একথাটা তাহাদের বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণনগর রাজবংশের যে-দলিলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, মানসিংহ ভবানন্দকে মহদপুর পরগণার চৌধুরাই ও কাননগুই প্রদান করেন। তবে তিনি তাহার লিখিত দলিলের সংক্ষিপ্তসার হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ এই সনন্দলাভ ঘটিয়াছিল কি-না তাহা ঐতিহাসিকগণকে বিচার করিতে বলিতেছেন। অবশ্য ঐতিহাসিকগণ কি বলিবেন বলিতে পারি না, তবে আমাদের কথা এই যে, মানসিংহ ভবানন্দকে মহদপুর পরগণার সনন্দ দিলেন কেন? কোনও কারণ না থাকিলে এরূপ পুরস্কার দিবার কারণ কি? যদি বলা যায় ভবানন্দের কার্যদক্ষতার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মানসিংহ বাংলায় আসিয়া আট মাস মাত্র অবস্থিতি করিয়াও আফগানদিগের দমনে ব্যস্ত থাকিয়া, ভবানন্দের কার্যদক্ষতার এমন কি পরিচয় পাইলেন, যাহাতে তাহাকে এইরূপ একটি পরগণা পুরস্কার দিয়া বসিলেন! এ-কথা হয়তো উঠিতে পারে যে, বসন্ত দুর্গাদাসের আরজীতে প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্যের জন্য উক্ত পরগণা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। সে কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা আপনাদের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া সে কথা চাপিয়া গিয়া থাকিবেন। সুতরাং কৃষ্ণনগর রাজবংশে বংশপরম্পরায় যে কথা চলিয়া আসিতেছে যে, ভবানন্দ প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযানে মানসিংহকে সাহায্য করার মহদপুরের সনন্দ পাইয়াছিলেন এ-কথা আমরা অস্বীকার করিতে যাইব কেন? ফলতঃ আজিম খাঁর ও মানসিংহের সহিত সংঘর্ষের যে-সকল প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে এ-কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, প্রতাপের সহিত মোঘলের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহার স্বাধীনতালাভের চেষ্টাই তাহার কারণ এবং পাঠানদিগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মোঘলদিগের বিরুদ্ধে তাহাকে চালিত করিয়াছিল। তাহাকে দমনের চেষ্টা পাঠান-দমনেরই অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতাপ যে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তাহা জেসুইট পাদরিগণের কথা ও

আবদুল লতিফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে বুঝা যায়। তিনিও কেদার রায় প্রভৃতির ন্যায়ই আপনার পরাক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন।

নিখিলনাথ রায়, *প্রবাসী ১৩৩৯, শ্রাবণ*

প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা ঃ

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে মোঘল সেনার অধিনায়ক মহারাজ মানসিংহ শিলাময়ী যশোহরেশ্বরী দেবীকে স্বীয় রাজধানী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন—শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই পূর্বাপর এই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুর রাজকীয় দপ্তরে প্রাপ্ত 'বংশাবলী' নামক পুরাতন পুথি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অম্বরের শিলাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন—ইনি বারোভুঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী আজিও ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার পুরাতন কালের সেবাইতের বংশধরগণ কর্তৃক সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। যশোহরেশ্বরী ব্যতীত প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্মীনারায়ণচক্র ও রাজরাজেশ্বরচক্র নামক দুই গৃহদেবতা ছিলেন। কিন্তু এখন বিগ্রহদ্বয়ের একটিও যশোহরে নাই—লক্ষ্মীনারায়ণ খুলনা জিলার মূলঘর গ্রামে এবং রাজরাজেশ্বর ফরিদপুরের কাজুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। বিগ্রহ দুইটি কি সূত্রে, কোন সময়ে, কে যশোহর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্তমান সময়ে কিরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, এ স্থলে আমরা সেই কথা বলিবার প্রয়াস পাইব।

সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপুর্ব জমিদার বৈদ্য রায়চৌধুরী বংশের স্থাপয়িতা জানকীবল্লভ সরকার খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত মূলঘরের নিকট কোনও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করিতেন। তৎকালে এ অঞ্চলে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত—ভদ্রলোক খুব কমই ছিলেন। এই খড়রিয়া পরগণা যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল ; সুতরাং প্রজাদের অভাব অভিযোগ তাহার নিকটই করিতে হইত। এক সময় এ প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় পরগণার প্রজাবর্গ একযোগে তাহার প্রতিকার প্রার্থী হইয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিলে মহারাজ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার রামদাস দেওয়ান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর অর্পণ করেন। রামদাস পরগণায় উপস্থিত হইয়া, তদন্তে প্রজাগণের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, মূলঘর গ্রামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।* এই স্থানেই জানকীবল্লভের সহিত রামদাসের আলাপ-পরিচয় হয়। একদিনের আলাপেই দেওয়ান জানকীবল্লভের বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া জলাশয় খনন কার্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করিলেন। জানকীবল্লভের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরব্ধ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। জানকীবল্লভের কার্যতৎপরতা ও কার্যক্ষমতা দেখিয়া দেওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনি এরূপ কুৎসিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? আমার সহিত রাজধানীতে চলুন। আপনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কর্তব্যপরায়ণ, তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন।" জানকীবল্লভ দেওয়ানের সহিত যশোহরে চলিয়া গেলেন এবং তাহারই চেষ্টায় রাজকীয় জরিপী সেরেস্তায় মোহরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কার্যদক্ষতাগুণেকালে প্রধান কাননগুহর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন 'কল্পতরু যাগ' আরম্ভ করেন, তখন জানকীবল্লভের উপর অনেক কার্যের ভার ছিল। এবারও সকল কার্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করেন। মহারাজা জানকীবল্লভের কার্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে কোনও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলায় জানকীবল্লভ সময় বুঝিয়া সুলতানপুর, খড়রিয়া এবং বেলফুলিয়া

প্রভৃতি পরগণার জমিদারি প্রার্থনা করেন। মহারাজও ওই পরগণাগুলির জমিদারি-সনন্দ সহ 'মজুমদার' উপাধি প্রদান করিয়া জানকীবল্লভকে সম্মানিত করেন। জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া, জানকীবল্লভ মূলঘরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া পরগণা শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দিল্লির সম্রাটের সহিত যশোহরেশ্বরের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন তৎকালীন প্রথানুসারে মহারাজ অধীনস্থ জমিদারীদিগের নিকট রসদ, সৈন্য ও নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজাদেশে জানকীবল্লভও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, নৌকা ও রসদ লইয়া স্বয়ং যশোহরে উপস্থিত হইলেন। জানকীবল্লভ কেবল যে নৌকা, সৈন্য ও রসদ যোগাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সহিত শেষ যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপাদিত্যের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দি হইলেন, আর বিজয়ী মোঘলবাহিনী 'আল্লা-হো-আকবর' রবে দিক প্রকম্পিত করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশোদ্যত হইল। জানকীবল্লভ দেখিলেন—রাজা গিয়াছেন ; এখন বুঝি রাজার গৃহ-দেবতাও মুসলমান হস্তে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েন। তাই তিনি অতি দ্রুত দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রাজরাজেশ্বরচক্র' নামক শালগ্রামশিলা দুইটি আনিয়া একেবারে স্বীয় বাসভূমি মূলঘরে প্রস্থান করিলেন। জানকীবল্লভ বিগ্রহদ্বয়কে তথায় রীতিমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার ও পূজার ব্যয় নির্বাহ জন্য স্বীয় জমিদারি হইতে কতকটা জমি দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহার পরে জানকীবল্লভের মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরগণের মধ্যে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়, তখন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গৃহদেবতাদ্বয়ও বিভক্ত হইয়া 'লক্ষ্মীনারায়ণ' দশআনী অংশের ও 'রাজরাজেশ্বর' ছয় আনী অংশের হস্তে আইসেন। কিছুদিন পরে ছয় আনী অংশের প্রধান শাখা মূলঘর হইতে উঠিয়া গিয়া ফরিদপুর জেলার কাজুলিয়া গ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। মূলঘর হইতে যাইবার সময় ইহারা 'রাজরাজেশ্বরকে' লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতেই 'রাজরাজেশ্বর' কাজুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলঘর গ্রামে থাকিয়া দশ আনী শাখার সরিকগণ কর্তৃক পালাক্রমে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এখন বিত্তচ্যুত হইয়াছেন বটে ; কিন্তু এখনও তাহারা সেই দেবোত্তরের উপস্বত্বে অতি ভক্তির সহিতই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা-পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

জানকীবল্লভের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মূলঘরের বাটিতে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বসন্তবাবু যখন লক্ষ্মীনারায়ণ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার পূর্বেতিহাস বলিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, যেন একজন তীর্থের পাণ্ডা অতি গৌরবের সহিত তাহার অধিকারভুক্ত তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখাইয়া তাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। তীর্থস্থান ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ দেখিলে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, সে দিন আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আর মনে হইয়াছিল, যিনি সুশিক্ষাগুণে যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। যাহার নাম ফিরিঙ্গি, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণ ব্যাধভীত পশু সম দিশাহারা পলায়ন করিয়াছিল—যাহার প্রবল প্রতাপে দিল্লিশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই অমিত-তেজা যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ কোথায়—আর কোথায়ই বা তাহার সেই অতি সাধের, অতি গৌরবের পবিত্র গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর বিগ্রহদ্বয়! সকলই কালের গতি।

অশ্বিনীকুমার সেন, *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা* ১৩২৩

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খনিত সেই জলাশয় এখনও মূলঘর গ্রামে বর্তমান। কয়েক বৎসর হইল, খুলনা জিলাবোর্ড কর্তৃক সুসংস্কৃত হইয়া ইহা গ্রামের 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। —লেখক

ঈশা খাঁ

১.
রজনীকান্ত চক্রবর্তী

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ, ঈশা খাঁকে ভাটিপ্রদেশের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাটিপ্রদেশ, পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারিশত ক্রোশ দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ বিস্তৃত, এইরূপ লিখিত আছে। এই প্রদেশের অধিকাংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত। সমস্ত ভাটিপ্রদেশ যে ঈশা খাঁর অধীন ছিল, এমত বোধহয় না। এই প্রদেশের বৃহদংশ বাক্‌লার ভুঁইয়া কন্দর্পনারায়ণ রায়ের ও যশোরের প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বে চাঁদ খাঁ মসন্দর ও খান জাহান্‌ আলী ভাটিপ্রদেশের এক একটি প্রকাণ্ড অংশে আধিপত্য করিতেন। পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দক্ষিণ বঙ্গে ঈশা সাধারণত রাজত্ব করিতেন। ঈশা খাঁর পিতা কালিদাস গজদানী অযোধ্যাবাসী রাজপুত ছিলেন। মুসলনমানেরা বলপূর্ব্বক তাহাকে মুসলমান করে। তিনি এক পাঠান নারীর পাণিগ্রহণ করেন। মুসলমান হইয়া কালিদাস, সলিমান খাঁ নাম ধারণ করেন। সলিমান খাঁ, তাজ খাঁ ও সেলিম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। ঈশা খাঁ শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রথমত দাসরূপে বিক্রিত হইয়া দূরদেশে নীত হন। কিছুদিন পরে তিনি তাহার মাতুল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। প্রতিভাবলে ঈশা খাঁ একজন ভুঁইয়া হইয়া উঠেন, ক্রমে তিনি খিজিরপুর পরগণার ভার পান। ঈশা খাঁ হোসেন শার বংশীয় ফাতিমা খানম্‌ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ প্রথমত মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। মোঘলদের তাড়িত পাঠানদের অনেকে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল আশ্রিতগণের মধ্যে মাসুম খাঁ কাবুলী প্রধান। মাসুম খাঁ কাবুলি একজন তারবর্তি সৈয়দ্‌, ইহার পিতৃব্য হুমায়ুনের উজির ছিলেন। আজিম খাঁ সুবাদারী গ্রহণ করিয়া তার্সন খাঁকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তার্সন খাঁ, তাজপুরের দুর্গে পাঠানদের কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। শাহাবাজ খাঁ, ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ঈশা খাঁকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজধানী অধিকার করিলে ঈশা খাঁ সাগর-মধ্যস্থ একটি দ্বীপে আশ্রয় লইলেন, শাহাবাজ খাঁ তাহার অনুসরণক্রমে যে স্থানে সাগরতীরে উপস্থিত হন, তাহা অদ্যাপি শাহাবাজপুর নামে খ্যাত। শাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁর রাজ্যে উপনীত হইলে মাসুম খাঁ কাবুলী ধৃত হইতে হইতে বাঁচিয়া যান। ঈশা খাঁ এই সময়ে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন ;[৫] তিনি ফিরিয়া আসিলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তার্সন খাঁ মাসুম খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। সাত মাস ব্যাপী যুদ্ধের'পর বাদশাহী সৈন্য নামমাত্র জয়লাভ করে। মাসুম খাঁ ভয়ে উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন।

এই সময়ে ঈশা খাঁ কিছুদিন শান্তভাব অবলম্বন করেন। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিলে, তাহার বিরুদ্ধে সেনা প্রেরিত হয়, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদশাহী দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মানসিংহের সময় ঈশা খাঁ পুনরায় স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করেন। ইহার সঙ্গে নৌ-যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ নিহত হন। ১৫৯৯—১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়। ঈশা খাঁর পুর্বে এই প্রদেশ কোচ হাজো প্রভৃতি জাতির অধিকারে

ছিল। নেত্রকোণার মদন কোচ ও বোকাই নগরের বোকাই কোচের নাম শুনা যায়। ঈশা খাঁর সময় শুনা যায়, ৩৬০ জন আউলিয়া পদ্মা পার হইয়া পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। অনেক স্থানে ইহাদের সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের দ্বারা অনেক নীচজাতীয় লোক মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ঈশা খাঁ শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্বক আনিয়া বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ীর হরণ ব্যাপারে শ্রীমন্ত খাঁ নামক, চাঁদ রায়ের এক কর্মচারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। স্বর্ণময়ী পরে সোনাবিবি নামে বিখ্যাত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর সোনাবিবি শ্রীপুর, আরাকান ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যরক্ষা করেন। তাহার পুত্রগণ অকর্মণ্য ছিল। তিনি মগদের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন।

একডালা, এগার সিন্ধুর নামক দুটি দুরাক্রম্য দুর্গ ঈশা খাঁর অধিকারে ছিল। মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে, ঈশা খাঁর অধিকারস্থ এগারসিন্ধুর দুর্গ অধিকারার্থ উপস্থিত হইলে ঈশা খাঁ তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। যুদ্ধকালে মানসিংহের হাতের তরবারি পড়িয়া যায়, ঈশা খাঁ মানসিংহকে তরবারি প্রদানের ইচ্ছা করেন। ঈশা খাঁর মহত্ত্বে পরিতুষ্ট হইয়া মানসিংহ তাহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করেন। ঈশা খাঁকে বন্দি না করিয়া, মানসিংহ ঈশা খাঁকে সঙ্গে করিয়া আগ্রায় বাদশাহের নিকট গমন করেন। বাদশাহ মানসিংহের মুখে সমস্ত শুনিয়া ঈশা খাঁকে মসনদ্ আলী উপাধি ও বাইশটি পরগণার জমিদারি দান করেন। মুক্তার হোসেন গ্রন্থরচয়িতা মহম্মদ খাঁ, "বার বাংলার অধিপতি" ঈশা খাঁর আশ্রিত ছিলেন।

কত্রা নগরে ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল। কিন্তু অনেকে বলেন, খিজিরপুরে রাজধানী ছিল। খিজিরপুর নায়ারণগড়ের নিকট। ঈশা খাঁর রাজ্যে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ পর্যটক রাল্‌ফ ফিচ্ ও জেসুইট পাদরী ফ্রান্সিস্ ফার্নাণ্ডেজ আদি আগমন করেন। তাহারা ঈশা খাঁর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ঈশা খাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কলাগাছিয়া নামক স্থানে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এগার সিন্দুর ও একডালা নামক প্রাচীন দুর্গদ্বয়ের সংস্কার করিয়াছিলেন। ঈবৎ নগর ও জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানবংশীয়গণ ঈশা খাঁর বংশজাত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন।[৬]

২.

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

বারোভুঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ঈশা খাঁকে আবুল ফজল অন্যান্য সকল ভূস্বামীর অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা কালিদাস গজদানি যে কীভাবে ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ৫টি রাজ্য সংগঠিত করেছিলেন তার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। মূলে রাজপুত বৈশ্য কালিদাস শেরশাহর পুত্র ইসলাম শাহর রাজত্বকালে (১৪৪৫-৫৩) গৌড়ে এসে আফগানদের সঙ্গে অহরহ মেলামেশা করতেন। সেই সময়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় তার নাম হয় সোলেমান খাঁ। তিনি ইসলাম কবুল করেছেন শুনে সুলতান ইসলাম শাহ যথেষ্ট খুশি হলেও তার ভাটি জমিদারি যেভাবে মাথা তুলে উঠছে তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পারেননি। সোলেমানকে দমনের জন্য তিনি ভাটিতে ফৌজ পাঠালে তারা তাকে বন্ধুভাবে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে শমন সদনে পাঠিয়ে দেয় ও তার পুত্র ঈশা ও ইসমাইলকে তুরানী দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে। সেই ব্যাপারীরা উভয় ভ্রাতাকে জাহাজে তুলে বিদেশে চালান দেয়।

ইসলাম গ্রহণের পর কালিদাসের এক আফগান রমণীর সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তাঁর পুত্র ঈশাকে মাতৃ পরিচয়ে আফগান বলা হোত। মোঘলরা বলত ঈশাও আফগান। এই নয়া আফগান যখন অগ্রজের সঙ্গে বিদেশে ক্রীতদাসের জীবনযাপন করছিলেন সেই সময়ে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরে হুমায়ুন এসে যখন দিল্লি অধিকার করেন সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে ঈশার পিতৃব্য কুতুবুদ্দীন উভয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বহু অন্বেষণের পর খুঁজে বার করে দেশে ফিরিয়ে এনে সুকৌশলে ভাটি জমিদারিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে হোসেন শাহ বংশীয়া ফতেমা খানমের সঙ্গে ঈশার বিবাহ হওয়ায় তার মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে যায়। কররানিদের পতনের পর তার সম্প্রসারিত ভাটি রাজ্য মোঘল বিতাড়িত বহু আফগানের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই আশ্রয়প্রার্থী আফগানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাসুম খাঁ কাবুলি।

কররাণিদের পতনের পর অন্যান্য জমিদারের মত ঈশা খাঁ সেই রাজবংশের আনুগত্য থেকে মুক্ত হোলেও মোঘলের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। তাকে দমন করবারো জন্য খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ ওই নদীবহুল ভূভাগে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মীর-নাওয়ারা শাহবর্দীকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্থলবাহিনীসহ সেখানে যাত্রা করেন। ভাওয়ালে বাদশাহী ফৌজের ঘাঁটি স্থাপিত হলে তিনজন আফগান জায়গিরদার এসে খান-ই-জাহানের প্রতি আনুগত্য জানান। কিন্তু মোঘলের শত্রু তো তারা নন, তাদের নায়ক ঈশা খাঁ ও তার দক্ষিণহস্ত মাসুম খাঁ কাবুলি। তারা বিদ্রোহপ্রবণ থাকলে এই আনুগত্যের কোন অর্থ হয় না। শাহবর্দী ও মহম্মদ কুলির নেতৃত্বে খান-ই-খানান দুটি শক্তিশালী জল ও স্থলবাহিনীকে সেই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। শাহবর্দী পূর্বে বিদ্রোহপ্রবণ থাকলেও এখন বাদশাহর অনুগত ভৃত্য হয়েছেন শুনে খান-ই-খানান তার কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে শাহবর্দীর নৌবহর যুদ্ধের সময়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাসত্ত্বেও কস্তাল নামক স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মোঘল ফৌজ ঈশা খাঁকে পর্যুদস্ত করে, তার পরিত্যক্ত বহু রণসম্ভার তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু এই সাফল্য একেবারেই সাময়িক। কারণ, ঈশা খাঁর দুজন অনুচর মজলিশ দিলওয়ার ও মজলিশ প্রতাপ তাদের নৌবহরসহ সেখানে এসে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করলে মোঘল পক্ষের বহু সৈনিক হতাহত হয়; বহু সৈনিক নৌকা চড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। মহম্মদ কুলি যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আফগানদের হাতে বন্দি হন। অবস্থা প্রতিকূল দেখে খান-ই-খানান যুদ্ধ অমীমাংসিত রেখে নিজ রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

পরবর্তী ফৌজদার সাহাবাজ খাঁ কুম্বু তাঁড়ায় এসে দেখেন যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। দক্ষিণে কতলু খাঁ লোহানির নেতৃত্বে উড়িষ্যার আফগানরা আবার সংঘবদ্ধ হয়েছে, পূর্বে মাসুম খাঁ কাবুলি ভাটি অঞ্চলে গিয়ে মোঘলদের উত্তর-পূর্ব বাহিনীর অধ্যক্ষ তরসুন খাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করছেন। সর্বত্র বিদ্রোহ। ভূষণার কেদার রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রমুখ যেসব ভূস্বামী রয়েছেন তারা কেউই মোঘলদের গ্রাহ্য করে না। সাহাবাজ খাঁকে আবার নূতন করে বাংলা জয় করতে হবে। শুধু আশার কথা এই যে বিদ্রোহপ্রবণ শাহবর্দী লোকান্তরিত হওয়ায় তার অধীনস্থ তিন হাজার নৌ-সৈন্য বাদশাহী ফৌজে ফিরে এসেছে এবং ভুঁইয়ারাজদের মধ্যে কোন সংহতি নেই।

সাহাবাজ লক্ষ্য করলেন যে মাসুম খাঁ কাবুলির নিজস্ব কোন রাজ্য না থাকলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী আক্রমণশীল। তার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সাহাবাজ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেন। খিজিরপুরের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তার সৈন্যদের পক্ষে সুবর্ণগ্রাম ও সেখান থেকে ঈশার সদর কত্রাভুতে পৌঁছান কষ্টসাধ্য হয়নি। তারপর এগারসিন্ধু দুর্গ অধিকার করে সাহাবাজ ব্রহ্মপুত্র তীরে পৌঁছালে মাসুম খাঁ

কাবুলি তার সম্মুখীন হন, কিন্তু পরাজিত হয়ে এক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাকে বন্দি করবারো জন্য সাহাবাজ খাঁ জাল বিস্তার করছেন এমন সময়ে ঈশা খাঁ এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ সেখানে এসে মোঘল ছাউনি টোকের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। সেই ফাঁকে মাসুম খাঁ নিজ সৈন্যদের সেখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে অদূরে মোঘলের দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ এরসুন খাঁর বিচ্ছিন্ন বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আকবরের এক শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষ এই তরসুন খাঁ। কিন্তু অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে আহত ও বন্দি হন। মাসুম খাঁ তাকে বোঝালেন : মোঘলদের ত্যাগ করে শাহবর্দীর মত আমাদের সঙ্গে যোগ দাও; আমরা তোমায় মাথায় তুলে নেব। জায়গির দেব, আমিরী দেব, কিন্তু সে কথায় কান দিলেন না, বাদশাহর প্রতি তিনি বেইমানি করবেন না। তখন মাসুম খাঁ রুষ্ট হয়ে তাকে শমন সদনে পাঠিয়ে দেন।

সাত মাস ধরে এইভাবে ঈশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে তাকে বশীভূত করা গেল না দেখে সাহাবাজ ভগ্নহৃদয়ে তাঁড়ায় ফিরে এলেন। তার এই ব্যর্থতার কথা আকবরের কাছে পৌঁছালে তিনি বাংলা ও বিহারের সকল অফিসারের প্রতি আদেশ পাঠালেন, যেমন করে হোক ভাটির বিদ্রোহী জমিদারকে ধ্বংস করো। কিন্তু তারা করবেন কি? বিদ্রোহ তো শুধু ভাটিতে নয়, সর্বত্র চলছে। মোঘল শক্তি নামেই বাংলা জয় করেছে—কোন জমিদারই তার কাছে মাথা নিচু করেন নি। তার উপর উড়িষ্যা থেকে আফগানরা এসে পশ্চিম বাংলায় মাঝে মাঝে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু বাদশাহ যখন ঈশা খাঁর ধ্বংসের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন সে কাজ আগে করতে হবে। সম্মিলিত বাদশাহী ফৌজ বিপুল রণসম্ভার নিয়ে ভাটির দিকে এগিয়ে গেল। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মাসুম খাঁ কাবুলি দুইটি দুর্গ তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। ঈশা খাঁরও সাধ্য ছিল না যে সেই বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হন। তাই শত্রুর অনুগ্রহ লাভের আশায় পূর্ব যুদ্ধে যে সব হস্তী ও কামান হস্তগত করেছিলেন সেগুলি সাহাবাজ খাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে বাদশাহর প্রতি আনুগত্য জানালেন (১৫৮৫)। এই সংবাদে আকবর খুশি হলেও ঈশা খাঁর প্রতি কোমলতা দেখাতে নিষেধ করেন। তার আদেশ মোঘল শিবিরে পৌঁছালে সৈন্যাধ্যক্ষরা নূতন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেন। ঈশা খাঁ যখন দেখলেন যে আর যুদ্ধ চালান নিরর্থক তখন বাদশাহর কাছে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে অনুকম্পা ভিক্ষা করেন। মাসুম খাঁ কাবুলিও নিজ পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ আগ্রায় পাঠিয়ে মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন।

তারপর সাত বৎসর চুপচাপ। সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু সমস্যা থাকায় আকবর ঈশা খাঁ ও অন্যান্য ভূস্বামীদের দিকে নজর দেবার অবসর পাননি। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে মান সিংহ বাংলার ফৌজদার হয়ে এসে দেখেন যে কোন ভূস্বামীই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেননি, বরং সবাই সামরিক বল বাড়িয়ে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের পূর্বসুহৃদ আফগানরা রয়েছে, তার উপর পর্তুগিজরা এসে অনেকের ঘাড়ে ভর করেছে। মাসুম খাঁ কাবুলি তার যে পুত্রকে আগ্রায় প্রতিভূ পাঠিয়েছিলেন সে চুপিচুপি পালিয়ে এসে নিজস্ব জমিদারি বেশ বাড়িয়ে ফেলেছে। তার পিতাও হজ শেষ করে ভাটিতে ফিরে এসে যথেষ্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। মানসিংহ বুঝলেন, এদের যদি এখনই শেষ করা না হয় তাহলে একদিন এরাই বাদশাহী শাসন খতম করবে। তাই তিনি সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর ভাটির দিকে রওনা হন।

তার আগমন সংবাদে আফগানরা গা ঢাকা দেওয়ায় তিনি বিনা যুদ্ধে ভাটি রাজ্যের অর্ধাংশ জয় করলেন। কিন্তু সমস্যা শুধু ঈশা খাঁ নন—বিদ্রোহী আরও রয়েছে। তাদের বিরোধিতার জন্য মোঘল শক্তি কোথাও স্থিতিলাভ করতে পারছে না। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে

গিয়ে মানসিংহ গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হলে ঈশা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলি প্রভৃতি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি রোগশয্যা থেকেই যুদ্ধ পরিচালিত করতে লাগলেন—তার পুত্র হিম্মৎ সিংহ সসৈন্যে ভাটিতে গিয়ে ঈশা খাঁকে এগারসিন্ধু দুর্গে আটক করে ফেললেন।

তারপর থেকে উভয় পক্ষে চলে লুকোচুরি খেলা। পর বৎসর ৫ সেপ্টেম্বর মানসিংহের অপর এক পুত্র দুর্জন সিংহ ঈশা খাঁর সদর কত্রাভু আক্রমণ করে স্থলযুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করেন। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলবার পর ভাটি রাজ্যের সকল অঞ্চল থেকে আফগান নৌবহর এসে দুর্জন সিংহকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে তিনি নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেলেন না। একদিন শত্রু নিক্ষিপ্ত একটি গুলি এসে তার বক্ষস্থল বিদ্ধ করায় তিনি ধরাশায়ী হলেন।

দুর্জন সিংহের মৃত্যুতে ঈশা খাঁ আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হলেও এক অভূতপূর্ব আশঙ্কায় তার মন অভিভূত হয়ে পড়ে। মানসিংহ এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, নূতন নূতন সৈন্য এনে তিনি শুধু বিদ্রোহ দমন করবেন না, পুত্রহত্যার প্রতিশোধও নিতে আসবেন। তার সম্মুখীন হবার মত শক্তি ঈশা খাঁর নেই। ভয় ব্যাকুল চিত্তে তিনি মানসিংহের শিবিরে দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে মোঘল সেনাপতি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে ঈশা যদি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তিনি নূতন অভিযানে বিরত থাকবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ঈশা খাঁ নিজে গিয়ে মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে আগ্রায় আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাদশাহ পরাজিত শত্রুর প্রতি কোনরূপ রূঢ়তা দেখাবার পরিবর্তে তাকে ২২টি পরগণার জমিদারি ও মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। ঈশা খাঁও তার প্রতি আনুগত্য জানিয়ে ভাটিতে ফিরে আসেন। তারপর তিনি কোনদিন মোঘলের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, কিন্তু ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হলে পুত্র মুসা খাঁ আবার মাথা তুলে ওঠেন।...

পূর্বে বলেছি, ঈশা খাঁ বিবাহ করেছিলেন হোসেন শাহ বংশীয়া ফতেমা খানম নামে এক তরুণীকে। কিন্তু পরে এক সময়ে তিনি শ্রীপুররাজ চাঁদ রায়ের রূপলাবণ্যময়ী কন্যা স্বর্ণময়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে মুসলমানী প্রথায় বিবাহ করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী সোনাবিবি স্বামীর মৃত্যুর পর কি-ছুদিন ভাটি রাজ্য ভালভাবে পরিচালিত করলেও শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষায় অসমর্থ হন। আরাকানের মগেরা জলপথে কত্রাভু পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাকে নিজ প্রাসাদে অবরুদ্ধ করলে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত করেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে শত্রুকে আর ঠেকানো যাচ্ছে না তখন হিন্দু পদ্ধতিতে জহরের আগুনে জীবনাহুতি দেন।

[মধ্য যুগে গৌড় ॥ ২৭৯-২৮৪]

---

১. কোচবিহার থেকে ফিরে আসার সময়ে ময়মনসিংহ হাজরাদি পরগণার স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ হাজোর রাজধানী জঙ্গলবাড়ি অধিকার করেন। লক্ষ্মণ হাজো কোচজাতীয় ছিলেন। ঈশা খাঁ জঙ্গলবাড়িতে দ্বিতীয় রাজধানী করে তাকে নিরাপদ করবারো জন্য ব্রহ্মপুত্রের উজান পথে রাঙ্গামাটী দশকাহনিয়াতে দুটি দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন। —ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১২ ৯ম সংখ্যা।

২. ঈশা খাঁর রাজ্যের উত্তরে দশকাহনিয়া সেরপুরের উত্তরভাগে করৈবাড়ী পাহাড় থেকে সুসঙ্গের পাহাড়ের পূর্বসীমা পর্যন্ত এই সময়ে 'মুলুকে সুসঙ্গ' নামে অভিহিত হত। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ সিংহ রাজোপাধি পান।

দ্বাদশ আদিত্য

পাল ও সেনরাজদিগের রাজত্বকালে যাহারা সামন্তরাজ নামে পরিচিত ছিলেন, পাঠান ও মোঘল শাসনের সময় তাহাদেরই পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যাহারা বঙ্গের গৌরব স্বরূপ বিরাজ করিতেন, তাহারা বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের কাহিনী—বাঙালির বীর্য্য শৌর্য্য ও গৌরবের কাহিনী। পাঠানদিগের সময় দ্বাদশ ভৌমিকদিগের যে প্রভুত্ব ছিল, মোঘলদিগের সময় তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের সেনা ও দুর্গ তখনও ছিল বটে, কিন্তু মগ ও ফিরিঙ্গিদিগের ন্যায় তাহাদিগকে দমন করা ও ঢাকায় 'নওয়ারা' সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ভৌমিকগণ তখন বঙ্গের আকাশে ক্ষীণ-পুণ্য তারকা বটে—কিন্তু তাহাদেরই জ্যোতিঃ একদিন দিল্লির সম্রাটের পর্যন্ত চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল! বাদশাহ প্রকাশ্যে বলিতেন বটে যে, ভৌমিকগণ তাহারই সামন্ত নৃপতি—কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই জানিতেন যে, সামন্তগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন! সে স্বাধীনতা হরণ করিতে মোঘলদিগকে যে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা সেনাপতি ফিলম্যাক্ বা রাজা মানসিংহ বেশ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন!

যশোহরের প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্প রায়, সাঁতৈলে (সাঁতোড়ে) রামকৃষ্ণ, ভূষণায় মুকুন্দরায় প্রভৃতি যখন বীরদর্পে রাজ্য শাসন করিতেন—যখন বিক্রমপুরে কেদর রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণমাণিক্য, চন্দ্রপ্রতাপে চাঁদগাজি, খিজিরপুরো ঈশা খাঁ, ভাওয়ালে ফজল গাজি রাজত্ব করিতেন—তখন বঙ্গের প্রজা বুঝিবার সুযোগ পায় নাই যে, গৌড়ে বা টাণ্ডায়, রাজমহলে বা ঢাকায় একজন গৌড়পতি ছিলেন—দিল্লিতে বা আগ্রায় একজন সম্রাট ছিলেন। তখন পুঁটিয়া, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রভৃতি স্থানের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশের খ্যাতি, দিনাজপুর ও বিষ্ণুপুরের রাজবংশের গৌরব, বর্ধমান ও তমলুকের রাজকাহিনী বঙ্গদেশে স্বাধীন ভূস্বামীবর্গের বীরকাহিনীরূপে পরিচিত ছিল। সুলতান দায়ুদের পতনের উনবিংশ বর্ষ পরে যখন ধর্মযাজক সোয়াট্ পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন, তখন পূর্ববঙ্গেই তিনজন হিন্দু ও নয়জন মুসলমান ভৌমিক দর্শন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ আদিত্য ঃ

আকবরনামায় দেখিতে পাই, প্রতাপ-বেগেরার সাহায্যে সুবিখ্যাত খান্-জাহান্ ভাটী প্রদেশের ভৌমিক ঈশা খাঁকে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ-বেগেরা বঙ্গের প্রতাপাদিত্য কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন। পাল ও সেন রাজদিগের পরে—দীর্ঘকাল পাঠান-শাসনের অধীনে থাকিয়াও যে বাঙালির শৌর্য বিলুপ্ত হয় নাই—ভৌমিকদিগের কাহিনীই তাহার অন্যতম প্রমাণ। সেই কাহিনী ইহাই প্রমাণিত করে যে, ভৌমিকগণ বীর বঙ্গসেনার উপর নির্ভর করিয়াই বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, সম্রাট আকবরের সময়ে যে স্বাধীনতার উদ্ভব হইয়াছিল, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে! এই সুদীর্ঘ কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঙালির সামরিক শক্তিরই পরিচয় দেয়—আর পরিচয় দেয় তাহার

স্বাধীনতা-লিপ্সার! বন্ধুবর ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—"১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই তারিখে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদের মৃত্যু হইয়াছিল। আর, শ্রীহট্ট জেলায় মোঘলদের সহিত যুদ্ধে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ তারিখে পাঠান বীর ওসমান নিহত হন। এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল বাংলার মুসলমান ও হিন্দু ভৌমিকগণ মোঘলের সহিত, মোঘলশ্রেষ্ঠ আকবরের সেনাপতিগণের সহিত সমানে লড়িয়াছে। কখনও হারিয়াছে, কখনও জিতিয়া মোঘল সেনাপতিগণকে বিহার পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনদিনই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। আকবরের গোটা রাজত্বকালটায় আকবর কখনও বাংলা দেশে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।"[১]

বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ ঃ

ভৌমিকদিগের মধ্যে 'মরজ্‌বান্‌-ই-ভাটী' ঈশা খাঁই শ্রেষ্ঠ, কি প্রতাপাদিত্যই শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে বটে ; কিন্তু বাঙালির শৌর্য-কাহিনীর সহিত সাধারণভাবে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেকালের বৈদেশিক পর্যটকগণ ইহাদের প্রভুশক্তি দর্শন করিয়া যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় অত্যুক্তি নহে। তাহারা বলিয়াছেন—ভৌমিকগণ কাহারও অধীন ছিলেন না, কাহাকেও কর দিতেন না। তাহারা রাজনাম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু রাজার ন্যায়ই বাস করিতেন—গৌরব বিভবও তদ্রূপই ছিল। ডি-আভিটি ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে পারি (Paris) নগরীতে দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিবৃত্ত প্রচার করিয়াছিলেন।[২] ধর্মযাজক পাইমেন্টা যদিও কহিয়াছিলেন যে, ভৌমিকগণ একত্র ষড়যন্ত্র করিয়া মোঘলদিগকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইতিহাস এরূপ প্রমাণ দেয় না—বরং ইহাই দেখাইয়া দেয় যে, মিলনের মহত্ত্ব সেকালে বঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিল না। তাহা থাকিলে, ১৫৭৬ হইতে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৬ বৎসর ধরিয়া বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে রক্ত নদী বহিয়াছিল, মানসিংহ যাহার তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে রোহতশ গড়ে বা জয়পুরে অজ্ঞাত-বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইত!

কেদার রায় ঃ

বাঙালির বাহুবল তখন স্থল অপেক্ষা জলেই অধিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন বাঙালির রণপোতে বাঙালির কামান অনল বর্ষণ করিয়া মগ ও পর্তুগিজদিগকে বিপর্যস্ত করিত—মোঘল-নবাবের রাজপ্রাসাদে আকস্মিক ভূমিকম্প ঘটাইত—বঙ্গের রাজপুরুষগণ আহার-নিদ্রার অবসর পাইতেন না—সম্রাটের চিত্ত বিচলত হইত। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মোঘলদিগের নিকট হইতে সন্দ্বীপ কাড়িয়া লইয়া শ্রীপুররাজ কেদার রায় পর্তুগিজদিগকে অর্পণ করিলেন ; কারণ তাহার সহিত তাহাদের মিত্রতা ছিল। পর্তুগিজ কার্বোলিয়াস্‌ সন্দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করিলে পর একদিকে লাঞ্ছিত মোঘলশক্তি ও অপরদিকে পর্তুগিজের শত্রু মগরাজ কেদার রায়কে নিগৃহীত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আরাকানের সুসজ্জিত ১৫০ রণতরী সমরে অগ্রসর হইল। কেদার রায়েরও নৌবল ছিল। তিনি ১০০ রণতরী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কামানের ধূমে নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। বঙ্গবীরের অসাধারণ রণকুশলতায় মগের ১৪৯টি রণতরী ধৃত হইল। আরাকান-রাজ মেং রাজগী (সেলিম শা) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

পরাজিত আরাকানরাজ ক্রোধপ্রজ্বলিত হৃদয়ে পুনরায় নৌবাটক প্রেরণ করিলেন। তাহার একসহস্র রণতরী লাঞ্ছিত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিপুল বেগে অগ্রসর হইল। এবারও বীরভোগ্যা বিজয়লক্ষ্মী কেদার রায়ের কণ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। বঙ্গ-সাগরের তরঙ্গভঙ্গ

উপেক্ষা করিয়া[৩] সেদিন বঙ্গের রণতরী শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বাঙালি নৌসৈন্য সেদিন যে বিজয় লাভ করিয়াছিল, তাহা মানসিংহকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মন্দারায় ঃ

মানসিংহ কালবিলম্ব না করিয়া একশত 'কোষা' রণতরী প্রেরণ করিলেন। বিক্রমপুরের সুদক্ষ সেনাপতি মন্দারায় বা মধু রায় যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। পর্চ্চাস্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এসময়ে মন্দারায়ের ন্যায় বিখ্যাত নৌসেনাপতি বঙ্গে ছিল না। মন্দারায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি মন্দারায় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না—নিহত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, পর্তুগিজ কার্ভোলিয়াস্ এই যুদ্ধে কেদার রায়ের নৌতরণী পরিচালিত করিয়াছিলেন।[৪]

পর্চ্চাস্ যাহাকে 'মন্দ্রি' বা মন্দা রায় নামে পরিচিত করিয়াছেন, তিনি বিক্রমপুরের মধুরায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাহার বীরত্ব-খ্যাতি তাহার জন্য 'মুকুট-রায়' উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী মুকুটপুর এখনও বিক্রমপুরে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অতি সুপ্রশস্ত একটি রাজবর্ত্ম তাহার রাজধানী হইতে পদ্মা তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেখিয়াছি, কৃষকগণ তাহার অংশ-বিশেষ এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই রাজপথের যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, তাহা 'মুকুটপুরের দরজা' নামে পরিচিত। একদিন যে রাজপথে কত বঙ্গযোদ্ধা রণজয়ে গর্বিত হইয়া ডঙ্কা নিনাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছে, এখন তাহা কৃষকের হলের আঘাতে চিহ্নশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখনও দেউলগড় মুকুট রায়ের একটি গভীর পরিখার স্মৃতি বহন করিতেছে।[৫]

বীরের পত্র ঃ

মানসিংহের সেনাপতি যখন কেদার রায়ের সহিত সমরে নিহত হইলেন, তখন পদাহত মোঘলরাজশক্তি থর থর কম্পিত হইয়া উঠিল! মানসিংহ তখন মগদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কেদার রায়কে ভীত করিবার জন্য তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজদূত একখানি শাণিত অসি, একটি শৃঙ্খল ও একখানি পত্র লইয়া কেদারের সম্মুখীন হইলেন। মানসিংহ বড় দর্প করিয়া লিখিয়াছিলেন—

ত্রিপুর মগ বাঙালি, কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পালায়ী,
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি।

বঙ্গবীর দূতের সম্বর্ধনা করিয়া অসি গ্রহণ করিলেন, শৃঙ্খল লইলেন না এবং প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—

ভিনত্তি নিত্যং কবিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।।

ফতেজঙ্গপুরের নৌযুদ্ধ ঃ

মানসিংহ পত্র পাইয়া চমকিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই—বাঙালির বীর্য তাহাকে চমৎকৃতও করিয়াছিল। যখন তিনি শুনিলেন, মোঘল-সেনাপতি কিলম্যাক্ কেদার কর্তৃক শ্রীনগরে অবরুদ্ধ হইয়া দিনযাপন করিতেছেন, তখন আবার মোঘল-রণতরী ধাবিত

হইল—শ্রীনগরে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—কেদার রায় আবার পঞ্চশত কোষা লইয়া মোঘলের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এবারও মানসিংহ জয়লাভ করিতে পারিলেন না,—কেদারের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শেষে তাহাকেই স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। টাক্‌মিলা-ই-আকবর-নামায় কথিত হয় যে, ভীষণ অগ্নিক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া বন্দিকৃত হইলেন। সেই দারুণ আঘাতেই তাহার জীবলীলা শেষ হইল।[৬] রণাহত কেদার বন্দি হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার জয়গর্ব ক্ষুণ্ন হয় নাই। আজিও তাহার বীরগাথা মেঘনার উদাস কলস্বরের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া গগনে পবনে ধ্বনিত হইতেছে, আজিও বাঙালি তাহার সেই গর্বিত উক্তি বিস্মৃত হয় নাই—"তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ!" যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী মানসিংহ বানু ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী ডেমরার প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাহার বিজয়-কাহিনীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিক্রমপুরে ফতেজঙ্গপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৭]

ত্রিবেণী ঃ

কলাগাছিয়া দুর্গের স্মৃতি আজিও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ঈশা খাঁ যেদিন চাঁদরায়ের ভগ্নী[৮] সোনামণিকে লাভ করিবার জন্য চাঁদ ও কেদারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেদিন রায়বাহিনী দারুণ ক্রোধে ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল।[৯]

সোনামণি চাঁদরায়ের দুহিতা কি ভগ্নী ইহা লইয়া যেমন নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কলাগাছিয়া দুর্গই সোনাকান্দা বা সোনাকুণ্ডা দুর্গ কি না এবং তাহাই ত্রিবেণী দুর্গ নামে কথিত হয় কি না, ইহাও নানা মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে।[১০] জনপ্রবাদ কহিয়া থাকে যে, এই দুর্গে সোনামণি অনলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, সেই জন্যই ইহার নাম সোনাকুণ্ড। সোনাকাঁদা তাহারই অপভ্রংশ মাত্র। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যার সম্মিলনস্থান বঙ্গের ইতিহাসে ত্রিবেণী নামে পরিচিত। প্রয়াগের মহাতীর্থের ন্যায় এই ত্রিবেণীও বীর বাঙালির মহা তীর্থ। ইহাই বীরজায়ার রণক্রীড়ার পুণ্যক্ষেত্র—ইহাই তাহার চিতারোহণের মহাশ্মশান! একদিন এই দুর্গে দ্বিতীয়-বল্লালের বঙ্গসৈন্য বীরপদভরে ভ্রমণ করিত—তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে সুবর্ণগ্রামের পথ শত্রুমুক্ত রাখিত। পরবর্তীকালে চাঁদ রায় এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।[১১]

নেয়ামত বিবি ঃ

সোনামণি ঈশা খাঁর নিকট নিষ্কৃতি পাইলেন না—বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের কৌশলে তিনি খিজিরপুর দুর্গে ঈশা খাঁর অন্তঃপুরে বন্দিনী হইলেন। চাঁদ ও কেদারের সেনাগণ তখন প্রভুর তীব্র হৃদয়জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য খিজিরপুরে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিল! ইহাতেও কোন ফল হইল না। জনপ্রবাদ কহিয়া থাকে যে, সোনামণি শেষে ঈশা খাঁকে বিবাহ করিয়া নেয়ামত বিবি নাম ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১২] যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন নেয়ামত বিবি পতিপদে ভক্তিমতী হইলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী হাজিগঞ্জের দুর্গে অবস্থানকালে একবার ঈশা খাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি সুবর্ণগ্রাম আক্রমণকারী মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। আরও শুনিতে পাওয়া যায়, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরও তিনি শ্রীপুর, আরাকান ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১৩] ঈশা খাঁ ও মোঘলের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, সোনামণি তাহাতেও বীরপত্নীর কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

চিতারোহণ ঃ

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোনামণি দেখিলেন, ত্রিপুরা ও আরাকানপতির সহিত মিলিত হইয়া

কেদার রায় ঈশা খাঁর সোনারগাঁ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। তিনি হাজিগঞ্জ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ত্রিবেণী বা সোনাকুণ্ড দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ত্রিপুরা, আরাকান ও বিক্রমপুরের মিলিত বাহিনী ত্রিবেণী আক্রমণ করিল। বীরাঙ্গনা তখন চণ্ডীর বেশে স্বয়ং দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ বহুদিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল—লাক্ষ্যা তীর বহুদিন পর্যন্ত উভয় পক্ষের কামান গর্জনে কম্পিত হইতে লাগিল। আঘাতের পর আঘাতে যখন দুর্গপ্রাচীর ভাঙিয়া পড়িল, তখন দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া সোনামণি সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন! কেহ কেহ বলেন, শত্রুর গুলির আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।[১৪]

রাণী দুর্গাবতীর কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, চাঁদবিবির বীরগাথা আজিও সসম্ভ্রমে গীত হইয়া থাকে—কিন্তু বঙ্গরমণী সোনামণি বিস্মৃতা! সোনাকুণ্ড দুর্গ এখন কণ্টকলতায় সমাচ্ছন্ন, দেখিয়াছি বটমূল তাহার দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়াছে। তাহার সিংহদ্বার এখন বন্যলতায় সমাবৃত হইয়াছে—তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন মধ্যে এখন নির্বিবাদে কৃষকের হল চলিতেছে! বাঙালি কি কোনদিন তাহার বীরজননীর কীর্তিমণ্ডিত যজ্ঞক্ষেত্রের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিতে অগ্রসর হইবে না?

ভাটি জনপদ ঃ

মুসলমান ঐতিহাসিক যে প্রদেশকে 'ভাটি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার অবস্থান লইয়া অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পূর্বে ও পশ্চিমে চারিশত ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত জনপদের পূর্বদিকে যশোহর ও সমুদ্র, পশ্চিমে টাঁড়ার দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্যপ্রদেশ এবং উত্তরে লবণ-হ্রদ ও তিব্বতের পর্বতমালা।[১৫] সাধারণত 'ভাটি' বলিলে সমুদয় পূর্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্টের কিয়দংশ বুঝাইত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।[১৬]

ঈশা খাঁর রাজধানী ঃ

দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রধান ভৌমিক প্রবলপরাক্রান্ত ঈশা খাঁ এই 'ভাটি' প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তাহার রাজধানী কত্রাভুপুরে কি খিজিরপুরে কিংবা সোনারগাঁয়ে কিংবা কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়িতে ছিল, তাহা এখনও স্থিররূপে নির্ণীত হয় নাই। রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে আসিয়া বলিয়াছিলেন—'এই প্রদেশের রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১৭] এই বর্ষেই বাক্‌লা নামে রাজনগরী দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—নগরের রাজপথ সুপ্রশস্ত। গৃহগুলি দেখিতে সুন্দর এবং উচ্চ * * * রাজা একজন 'জেন্টাইল' (হিন্দু)। তিনি বন্দুক দ্বারা মৃগয়া করিতে ভালবাসেন। ঈশা খাঁর পৌত্র মিনিম্ খাঁ একখানি অপ্রকাশিত পত্রে বাংলার অধিপতি বলিয়া কথিত।[১৮] কেহ কেহ বলিতে চাহেন, এই বাংলা বা বঙ্গুই সোনারগাঁ।[১৯]

কালিদাস গজদানি ও তাহার পুত্র ঃ

কথিত হয় যে, কালিদাস গজদানি নামক জনৈক রাজপুত হিন্দু কায়স্থ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে স্থায়ীরূপে পূর্ব-ময়মনসিংহে বাস করিতেন। একজন মুসলমান পণ্ডিতের সহিত ধর্ম সম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ তাহারই পুত্র। কালিদাসের পুত্র মোঘল-শাসনে অবহিত হইতে চাহিতেন না। সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। ভারতে ইস্‌লাম সাহের রাজত্বকালে সলিম খাঁ, তাজ খাঁ এবং দরিয়া বা দরাপ খাঁ সর্বদাই তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া ধাবিত হইতেন। মোঘল কর্তৃক বারংবার উৎপীড়িত হইয়া কালিদাস পরিশেষে সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা তাহাকে আবার বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আবার মোঘলের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তিনি কৌশলে-জালে পড়িয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন! তাহার দুই পুত্র ঈশা এবং ইসমাইল ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইলেন। গজদানি-পরিবারের সহিত মোঘলের সমরে বাঙালি সৈন্যই যে গজদানিদিগের অধীনে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব-ময়মনসিংহের গজদানি বংশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বা ঈশা খাঁর বিদ্রোহ ঃ

বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের শ্রেষ্ঠ যিনি, ভৌমিকদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অগ্রণী যিনি—বাইশ পরগণার 'মালিক' ছিলেন যিনি—সেই ঈশা খাঁর বাল্যকাল তুরাণে ক্রীতদাস রূপে কাটিয়া গেল![২০] ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার উপর প্রসন্ন ছিলেন। ঈশা খাঁ মুক্তি লাভ করিয়া বঙ্গে আসিলেন ; বঙ্গে শক্তিসঞ্চয় করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে এতই প্রবল হইলেন যে, মোঘল-রাজশক্তিও নানা যুদ্ধে তাহার নিকট লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিল, কোচরাজ তাহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহের পুত্র তাহার সহিত জলযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। দায়ুদের পতনের পর অনেক পাঠান ঈশা খাঁর আশ্রয় লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার বহু সৈন্য যে বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা অবস্থানুসারে অনায়াসেই অনুমিত হয়। বঙ্গের যে যুগ স্বাধীনতালাভেচ্ছুদিগের বিদ্রোহের ও সমরাভিনয়ের যুগ! তখন কেদার রায় ও মগপতি মোঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছেন, ঈশা খাঁ মোঘল-শাসন মানিতেছেন না—বাদশাহের নৌ-আরা বিধ্বস্ত করিয়াছেন ; তখন কতলু-কিরাণী বর্ধমানে রণডঙ্কা বাজাইতেছেন ; ঈশা খাঁ তখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে ১৫টি স্থান কাটিয়া দিয়া মোঘল শাসন-কর্তা শাহবাজ খাঁকে সসৈন্যে জলমগ্ন করিয়াছেন![২১] শাহবাজ খাঁ তখন যুদ্ধোপকরণাদি পরিত্যাগ করিয়া ভাওয়াল হইতে পলায়ন করিবার জন্য ব্যগ্র—তখন ঈশা খাঁর সহিত ভীষণ যুদ্ধে মীর-ই-আদল্ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মোঘল-কর্মচারীদিগের পুত্রাদি বন্দিকৃত হইয়াছেন—বিহার ও বঙ্গের জায়গিরদারগণ তখন বিদ্রোহী ঈশা খাঁকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।[২২] বাংলার দুর্ভাগ্য যে, এই ঈশা খাঁ ইতিকথা এখনও লিখিত হয় নাই!

শাহবাজের সৈন্যসংগ্রহ ঃ

দিল্লিতে যখন এই সকল পরাজয়ের বার্তা যাইয়া পৌঁছিল, সম্রাট আকবর তখন বিরক্ত হইয়া শাহবাজকে জানাইলেন—যদি আপনার সৈন্য না থাকে তবে রাজা তোডরমল্ল ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সৈন্য সহ যাইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে পারেন। শাহবাজ রাজদূতকে জানাইলেন—আমার সৈন্যসংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে (numerous), তাহারা পরম উৎসাহী—আর আমার বাদশাহী সৈন্যের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশ হইতে বাঙালি-সৈন্য না লইলে কিরূপে শাহবাজের সেনা সহসা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল?[২৩]

সেনাপতি রঘুদাস কি বাঙালি?

ইহার কিছুকাল পর দেখিতে পাই মগরাজ শ্রীপুরের কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন—তখন 'বঙ্গরাজ্য' মগরাজের করতলগত হইয়াছে। তাহারা সোনারগাঁয়ে সৈন্য সমাবেশ করিয়া নিকটবর্তী মোঘলদুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। সোনারগাঁর শাসনকর্তা সুলতান কুলি খাঁর সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আহম্মদ নামক আর একজন বিদ্রোহী সসৈন্যে আগমন করিয়া আরাকান ও বিক্রমপুরের সেনার সহিত মিলিত হইলেন। রাজা মানসিংহ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং কুলি খাঁর সাহায্যার্থে সেনা প্রেরণ করিলেন। যে তিনজন সেনাপতি মানসিংহের আদেশে এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাদিগের একজনের নাম রঘুদাস। রঘুদাসের অন্য পরিচয় জানিবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি হয়ত বাঙালি ছিলেন।[২৪] মগরাজকে পরাজিত করিয়া মানসিংহ কিরূপে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

মোঘলের অসি ও আসল তুমার জমা ঃ

বঙ্গের ভৌমিক-নৃপতিদিগকে উৎখাত করিবার জন্যই মানসিংহ সসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, ঢাকার নৌ-আরার উন্নতিবিধানও সেই কারণেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মগ ও পর্তুগিজদিগকে দমন করা নৌ-আরার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পুর্ববঙ্গের ভৌমিকদিগের উচ্ছেদসাধন। তোডরমল্লের রাজস্ব-ব্যবস্থা যাহার পাদপীঠ রচনা করিয়াছিল, সেই 'আসলতুমার জমা' ও মানসিংহের 'তরবারি বাঙালিকে ক্রমে ক্রমে বীর্যহীন করিয়াছিল। 'আসলতুমার জমা' যখন ভৌমিকদিগকে স্বাধীন নৃপতির উচ্চপদবী হইতে সাধারণ 'জমিদার' শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া দিল, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার কর্তৃক বঙ্গভূমি পরিপ্লাবিত হইল। তাহাদেরও সৈন্য ছিল, তাহারাও আবশ্যক মত সেনা দিয়া সম্রাটের সাহায্য করিতেন, কিন্তু পূর্বের ন্যায় সে স্বাধীন প্রভুশক্তি আর থাকিতে পারিল না। রাজা মানসিংহ ও রাজপুতাদি যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের শাণিত খড়্গ সর্বদা ভৌমিক ও জমিদারদিগের মস্তকের উপর বিলম্বিত থাকিয়া তাহাদিগকে আর শক্তিসঞ্চয় করিতে দিল না। সে খড়্গকেও উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবীর মোঘল-শক্তির সহিত অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—মোঘল-সেনাপতিগণ বহুরুধিরপাত ও লাঞ্ছনার পর অনেক আয়াসে বঙ্গের জীবনীশক্তি হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মোঘলের শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই—প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা স্বাধীনই ছিল।[২৫] সম্রাট আকবর বঙ্গের বার্ষিক রাজকর ১০৬৯৩১৫২ টাকা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিনই এই টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারেন নাই।[২৬]

দ্বৈরথ সমর ঃ

এগার-সিন্ধু, একডালা, রণভাওয়াল, দেওয়ানবাগ, রাঙ্গামাটি, মশ্বাদি, সোনাকুণ্ড বা ত্রিবেণী, হাজিগঞ্জ প্রভৃতি দুর্গ একদিন ঈশা খাঁ কর্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়া বাঙালির রণলিপ্সার ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহাদের ইতিহাস জনপ্রবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া মর্যাদা হারাইয়াছে। এগার-সিন্ধুর দুর্গমূলে মানসিংহের সহিত ঈশা খাঁ যে দ্বৈরথ সমর ঘটিয়াছিল তাহা তাহার বীরকাহিনীকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

ঈশা খাঁর অনুপস্থিতিতে মানসিংহ এগার-সিন্ধু দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। মানসিংহের সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। স্থির হইল, ঈশা খাঁ ও মানসিংহে দ্বৈরথ সমর হইবে। সে সমরে যিনি জয়ী হইবেন, রাজ্য তাহারই অধিকারে আসিবে। মানসিংহ ভাবিয়াছিলেন বাঙালির বাহুতে আর কতটুকু শক্তি আছে—ঈশা খাঁ অক্লেশেই পরাজিত হইবেন। কিন্তু নিজের শক্তির উপর বোধ হয় তাহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি স্বয়ং দ্বৈরথ সমরে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া প্রথমে জামাতাকে প্রেরণ করিলেন। ঈশা খাঁ এ চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। যুদ্ধে মানসিংহের জামাতা নিহত হইলে পর মানসিংহ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষের সেনাদল নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সেই অপূর্ব অসিক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল—বীরের হৃদয়ে রুধিরতরঙ্গ বহিতে লাগিল। এমন সময় মানসিংহের অসি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। ঈশা খাঁর সৈন্যগণ হর্ষে গর্বে সিংহনাদ করিয়া উঠিল—মোঘল-সৈন্য দেখিল, মানসিংহের জীবননাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে![২৭]

ঈশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না—তিনি মানসিংহের কেশাগ্রও স্পর্শ না করিয়া আপন হস্তের শাণিত কৃপাণখানি মানসিংহকে দিতে চাহিয়াছিলেন। লজ্জিত, পরাজিত, ক্ষুব্ধ মানসিংহ সে অসি গ্রহণ করিলেন না। ঈশা খাঁ তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মল্ল যুদ্ধ চাহিলেন। মানসিংহ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। বন্ধু বলিয়া—বীর বলিয়া ঈশা খাঁর হস্ত ধারণ করিলেন। উভয় পক্ষের সেনাদল তখন মহোল্লাসে জয় নিনাদ করিয়া উঠিল। মানসিংহ ঈশা

খাঁকে লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁ সম্রাট কর্তৃক দ্বাবিংশটি পরগণার অধীশ্বর বলিয়া গৃহীত হইলেন। বোধ হয় এই জন্যই আবুল-ফজল বলিয়া থাকিবেন যে, ঈশা খাঁ দ্বাদশটি জমিদারকে নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন। বাংলার ভৌমিকদিগের স্বাধীনতা-সমরে ঈশা খাঁই ছিলেন প্রধান নায়ক। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—নায়কত্বের এই গৌরব প্রতাপাদিত্যের প্রাপ্য নহে। উহার প্রধান অধিকারী ঈশা খাঁ। একথা ঠিক। প্রতাপাদিত্য যে কেবল মোঘলের আনুগত্যই করিয়াছিলেন, এরূপ অভিমত বিচার-সহ নহে।

সোনারগাঁ ঃ

হিন্দুর সোনারগাঁ—পাঠানের সোনারগাঁ—ভৌমিকের সোনারগাঁর চিহ্ন আর নাই! হিন্দু ও পাঠান নৃপতিদিগের শেষ আশ্রয়স্থল—মুসলমান পীর ও ফকিরের মিলনক্ষেত্র সোনারগাঁর গৌরব-রবি, সোনাকুণ্ড দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। সোনামণির চিতাভস্ম তপ্ত থাকিতে থাকিতেই চাঁদপুরপতি বঙ্গের এই অংশ লুণ্ঠনব্যস্ত করিয়াছিলেন—তাহাদের চরণচিহ্ন অনসুরণ করিয়া মগদস্যু বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ঈশা খাঁর কোন চিহ্ন নাই. সেই সোনামণি এখন বিস্মৃতা—বঙ্গের সেই শেষ হিন্দুনৃপতিরও কোন চিহ্ন আর সোনারগাঁয়ে নাই। পাঠান বা মোঘলের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আছে একটি ভগ্ন সিংহদ্বার ও বিস্মৃত সোনারগাঁয়ের বিলুপ্তপ্রায় শ্মশান। এখন মগরাপাড়ায় ক্ষুদ্র একটি হাটে সুবিখ্যাত মুন্নাসাহেব দরবেশের জীর্ণ সমাধিমাত্র বর্তমান রহিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্ষুদ্র একটি দীপ তথায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া চারিদিকের অন্ধকারই কেবল বৃদ্ধি করিয়া থাকে।[২৮]

বাঙ্গালির বল— পৃঃ ২৮৯-৩০৭

১. প্রতাপাদিত্যের কথা—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৯।

২. The Bhuiyas according to them (European travellers) had been dependents of the King of Gour, but had acquired indepenence by force of arms. They refused to pay tribute or to acknowledge allegiance to any one. *From being prefects appointed by the King, they had become Kings, with armies and fleets at their Command,* ever ready to wage war against each other or to oppose the invasions of Portuguese pirates or Magh freebooters.—*The Barah Bhuiyas of Bengal* : J. A. S. B. Vol XLIII, Part I, 1874 and Vol XLIV, Part I, 1875.

৩. গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, ২৭৩ পৃষ্ঠা—রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

৪. Cadry lord of the place (Saripur) where he was suddenly assaulted with one hundred corser sent by Mansing, Governor under the Moghul, who having subjected the tract to his master, sent for this Navie against Cadry. Mandry, a man famous in these parts...ইত্যাদি।

After a bloudie fight Mandry was slain.—*Purchas*, Part VI : Book V, P. 513.

৫. বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৬. Raja Mansingh, after defeating the Magh Raja, turned his attention toward Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war, and had laid siege to Kilmack, the Imperial commander in Srinagur. Kilmack held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja—*Tukmila. I-Akbar-Nama* : Elliot Vol. VI, P. III.

৭. বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বলেন—"কেদার রায়ের মৃত্যুর পর সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, কিন্তু কেদার-মহিষী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ রায়, কালিঢালি, রামরাজা সর্দার, শেখ কালু প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া বীরদর্পে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।"—বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১১২ পৃষ্ঠা।

৮. কেহ কেহ বলেন ইহার নাম স্বর্ণময়ী। ইনি চাঁদ রায়ের দুহিতা। —প্রতিভা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪ সাল।

কেদার রায়, চাঁদ রায়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত। চাঁদ রায়ের পূর্বপুরুষ নিম রায় কর্ণাট হইতে পূর্ববঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায় কেদার রায়ের ভ্রাতা। গৌড়ের ইতিহাস—২য় ভাগ, ২৭২ পৃঃ। রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

৯. *J. A. S. B.* Part I, 1874.

১০. প্রতিভা—৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৪ পৃঃ।

১১. ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।

১২. She (Svarnamayee) embraced her husband's faith remaining throughout his life a devoted helpmate and defending his kingdom against his enemies, kith and kin, even after his decease.—*The Romance of an Eastern Capital* by F. B. Bradley-Birt, I.C.S.

১৩. ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।

The Romance of an Eastern Capital—F. B. Bradley-Birt, I.C.S.

১৪. *The Romance of an Eastern Capital*—F. B. Bradley-Birt, I.C.S.—Pp. 79-80. সোনাকাঁদা দুর্গ নারায়ণগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

১৫. Bhati is a low-lying country, and is called by that Hindi name because it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from east to west and nearly 300 from south to north. On the east lies the Sea and the country of Jessore, on the west lies the hill country south of Tonda ; on the north the salt Sea, and the extremities of the hills of Tibet—*Akbar-Nama* : Elliot, Vol. VI. P. 73.

'ভাটি'র বিশেষ বিবরণ ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যায় 'ভাটি' ছিল একটি বিশাল রাজ্য।

১৬. *J. A. S. B.*, No. I (1904), P. 57 etc.

১৭. The Chief King of all these countries is called Isa Can, and he is the chief of all the other Kings and is a great friend to all Christians—*R. Fitch.*

১৮. *J. A. S. B.* (New) Vol IX, 1913, Pp. 444-445.

১৯. প্রতিভা—৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৭ পৃঃ।

বাংলা নগরী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

২০. *Akbarnama* : Elliot, Vol VI, P. 73; বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোঘলের সংঘর্ষ—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্‌-এ—ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬।

২১. *Akbarnama* : Elliot, Vol VI, P. 75.

২২. *Akbarnama* : Elliot, Vol VI, P. 75-77.

২৩. He replied that his army was now numerous, and the men full of ardour.

—*Akbarnama of Abu-L-Fazl* : Elliot, Vol VI, P. 77.

২৪. *Tukmila-I-Akbarnama* : Elliot, Vol VI, P. 109.

অপর দুইজন মোঘল সেনাপতির নাম ইব্রাহিম আৎকা এবং দলপৎরায়।

২৫. The province of Bengal paid a nominal submission to the throne of Delhi, but during several reigns had been *virtually independent.*

—Mill's *History of British India,* Vol II, P. 303.

২৬. Grant's Analysis of Finances of Bengal.

২৭. *Akbarnama of Abul-Fazl* : Elliot, Vol VI, P. 73.

২৮. *The Romance of an Eastern Capital*—F. B. Bradley-Birt, I.C.S.—Pp. 79.81.

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোঘলের সংঘর্ষ

---

১. রাজমহল যুদ্ধের পর ঃ

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদের পতন হয়। অতপর যুদ্ধের অন্যান্য নায়কগণের কি হইল, খোঁজ লওয়া আবশ্যক।

দায়ুদের পক্ষের কত্‌লু ও শ্রীহরি যথাক্রমে উড়িষ্যা ও যশোররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় যুদ্ধে আহত হইয়া পলাইয়াছিলেন, ইহার পর অনেক দিন পর্যন্ত তাহার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালের স্বাধীনতা-সমরে আবার তাহার সহিত আমাদের দেখা হইবে।

পাটনা-হাজিপুরের জমিদার গজপতি দায়ুদের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। এই গজপতি প্রকৃত পক্ষে ভোজপুরের রাজা ছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণে এবং শোন নদের পশ্চিমে বর্তমান সাহাবাদ জেলায় এই ভোজপুর অবস্থিত। রেনেলের বাংলার মানচিত্রে এই ভোজপুরের অবস্থান পরিষ্কার দেখান আছে। এই ভোজপুর-রাজবংশ উজ্জয়িনীয়া রাজবংশ বলিয়া পরিচিত এবং ধারা নগরীর ভোজরাজকে ইহারা পূর্বপুরুষ বলিয়া দাবী করেন। বর্তমান ডুমরাও রাজবংশ এই গজপতির বংশধর।

গজপতির বিদ্রোহ বেশ প্রবল আকারই ধারণ করিয়াছিল। সমগ্র সাহাবাদ জেলা গজপতি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন; আবার জায়গিরদার ফরহত খাঁ, তাহার পুত্র ফরহঙ্গ খাঁ, এবং কারাতক খাঁ নামক আর একজন মোঘল নায়ক গজপতির সহিত যুদ্ধে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। আকবরের দূত পেশরু খাঁ রাজধানী হইতে বাংলায় খাঁজাহানের নিকট যাইবার পথে গজপতির হাতে পতিত হন এবং অনেক দিন বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। অবশেষে গজপতি যখন গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন আকবর প্রেরিত শাহবাজ খাঁ গজপতির গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। (জুন ১৫৭৬) গঙ্গা পুনরায় পার হইয়া যুদ্ধ করিয়া হঠিতে হঠিতে গজপতি জগদীশপুরের দুর্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তথায়ও পরাজিত হইয়া গজপতির দল শেরগড় ও রোহতাস্ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রোহতাস্ দুর্গ এই সময়ে জুনৈদের প্রতিনিধি এক আফগান নায়কের হস্তে ছিল। জুনৈদের পতনের পরে এবং গজপতির বিদ্রোহের সময় সে এই দুর্গ শাহবাজের হস্তে সমর্পণ করিল। শেরগড়েরও পতন হইল। পেশরু খাঁ আশ্চর্য উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া শাহবাজের নিকট চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মুজঃফর খাঁ রাজমহল যুদ্ধ শেষ করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং রোহ্‌তাস্ অধিকাব করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাহবাজের হাতে রোহতাসের পতন শুনিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। গজপতির কি হইল আকবরনামাতে আর তাহার উল্লেখ পাই না।

আকবরনামাতে দেখিতে পাওয়া যায় (Vol. III. P. 277) যে এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তোডরমল্ল বাঁশওয়ায় যাইয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বঙ্গলুণ্ঠনলব্ধ ৩০৪টি হাতি ও অন্যান্য ধনদৌলত উপহার দিয়া আকবরকে খুশি করিলেন। অনতিকাল পরেই তিনি গুজরাট যুদ্ধে প্রেরিত হন।

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহবাজ খাঁ যাইয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাটের আদেশমত রোহতাসের দুর্গনায়কত্ব মুহিব আলি খাঁর হস্তে অর্পিত হইল এবং বিবিধ

সম্মানে সম্মানিত হইয়া শাহবাজ খাঁ অনতিবিলম্বে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। (A. N. III. P. 280)

এই বৎসর আগস্ট মাসে বিহারের শাসনকর্তা মুজঃফর রাজধানীতে যাইয়া আকবরের সহিত দেখা করিলেন।

আকবর তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে তোডরমল্ল গুজরাট জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সম্রাট আদেশ করিলেন যে মুজঃফরের তত্ত্বাবধানে তোডরমল্ল এবং শাহ মনসুর রাজ্যের রাজস্ববিভাগ সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন। বিহারের শাসনভার সুজায়েৎ খাঁ এবং অন্যান্যের হস্তে ন্যস্ত হইল।

রাজমহলের যুদ্ধ এবং তাহারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য হাঙ্গামার নায়কগণের কাহার কি হইল, উপরে দেখাইলাম। অতঃপর খাঁ জাহান কি করিলেন, দেখা যাউক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদের পতন হয়। তখন বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই বৎসরের বাকি কয়টা মাস বোধ হয় খাঁ জাহানের তাঁড়ায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল। এই কয় মাসের কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে আবার খাঁ জাহানের বার্তা পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের গোটা বৎসরটাই বোধ হয় তিনি তাঁড়া আশ্রয় করিয়া রাজমহল হইতে তাঁড়া পর্যন্ত গঙ্গার দুই পারের এবং বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহবহ্নি ক্রমে ক্রমে নিভাইতেছিলেন।

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাতগাঁ অঞ্চলে আফগানগণ আবার গোলযোগ উপস্থিত করিল। দায়ুদের পরিবার ও পক্ষাশ্রিত লোকজন এই সময় সাতগাঁতে বাস করিতেছিল। এমন বিপদের মধ্যেও আফগানগণ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক পক্ষের নেতা ছিল মতি (ভাল নাম মুহম্মদ গাঁ খাসখেল), অপর পক্ষের নেতা জমশেদ। মতি দায়ুদের বাছা বাছা ধনরত্ন হস্তগত করিয়া মোঘল পক্ষ যোগ দিতে উদ্যত হওয়ায় জমশেদ তাহাতে বিরোধী হয়। মতি পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং মতির পক্ষের দুইজন নায়ক ষড়যন্ত্র করিয়া জমশেদকে হত্যা করে। এই সকল বার্তা পাইয়া খাঁ জাহান সাতগাঁর দিকে অগ্রসর হন। দায়ুদের মাতা নৌলকা সপরিজনে খাঁ জাহানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং সদাশয় খাঁ জাহান আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন। বন্দোবস্ত এই হয় যে খাঁ জাহান তাঁড়ায় ফিরিয়া গেলে নৌলকা যাইয়া খাঁ জাহানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সাতগাঁতেই আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষে কি বাধা ছিল, বুঝা গেল না।

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের শেষ অথবা মে মাসের প্রথমে যখন আকবর পঞ্জাবে ঝিলামের তীরে মৃগয়ার জন্য তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন, তখন খাঁ জাহান প্রেরিত দূত বাংলাদেশ হইতে যাইয়া নিবেদন করিল যে, সম্রাটের আশীর্বাদে বাংলাদেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং বিদ্রোহবহ্নি একেবারে নির্বাপিত হইয়াছে। কোচবিহাররাজ মল্লদেব বা নরনারায়ণ এই সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন পাঠাইয়া আবার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রথমে সম্রাট সমীপে বাংলার নবাবের উপঢৌকন উপস্থিত করা হইল। ইহার মধ্যে ৫৪টি ভাল ভাল হাতি ছিল। পরে কোচবিহারের রাজার নজর উপস্থিত করা হইল। এই কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। এইখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাংলাদেশের তিন দিকে তখন তিনটি স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল ; যথা—উত্তরপূর্বে কোচবিহার, পূর্বে ত্রিপুরা এবং পূর্বদক্ষিণে আরাকান রাজ্য। এই তিনটি রাজ্যের কোনটিই তখন রাজনৈতিক হিসাবে নগণ্য ছিল না, এবং তিনটিরই তৎকালীন ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল। আবুল ফজল যাহাকে আনুগত্য স্বীকার ও নজর প্রদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সম্ভবত নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার প্রীতি-প্রার্থনামূলক উপঢৌকন প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত বহু মুদ্রা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরনারায়ণ ১৫০৯ শকাব্দ বা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন

করেন। ঐ শকাব্দে মুদ্রিত তাহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাজত্বের চিহ্ন মুদ্রাপ্রচার এই বংশে ইহার পরেও অনেক কাল পর্যন্ত দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোচবিহার অধিকার করিবার জন্য বঙ্গের সুবাদার মিরজুমলাকে বেশ বড় অভিযান করিতে হইয়াছিল। কাজেই ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে আকবরকে উপঢৌকন পাঠাইয়া নরনারায়ণ সম্রাট আকবরের প্রীতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া (Akbar-Nama, III. P. 349) উহা অধীনতা স্বীকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"কোচবিহার-রাজ আবার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। প্রথমবার কবে করিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ আকবরনামাতে নাই। বোধ হয় পাটনার যুদ্ধের পরে কাকশালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দায়ুদের পক্ষীয় কালাপাহাড় ইত্যাদি ঘোড়াঘাট হইতে কোচবিহার অভিমুখে যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, (A. N. III, 169, 170) তখন আকবরের তুষ্টির জন্য কোচবিহার রাজ সম্ভবত পলায়মান পাঠানগণকে স্বীয় রাজ্যে স্থান দিতে সম্মত হন নাই,—এবং উপঢৌকনাদি দিয়া মোঘল সুবাদারের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় প্রথমবারের আনুগত্য স্বীকার।

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে খাঁ জাহান সম্রাট সমীপে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন যে, বাংলাদেশ একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দেশ জুড়িয়া অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে, কোথাও কোন গোলমাল নাই! ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক দিয়াই কিন্তু দেখা গেল যে, বাংলাদেশের আবহাওয়া খাঁ জাহান তখন পর্যন্তও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্বদিক্ আবার মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, পূর্বপ্রদেশস্থ আফগান জায়গিরদারগণ ভাটির জমিদার ঈশা খাঁর নেতৃত্বে মোঘল প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার আয়োজন করিতেছে।

২. ঈশা খাঁর অভ্যুদয় ঃ

এই সময়ের ইতিহাসের এক অদ্ভুতকর্মা পুরুষ এই ঈশা খাঁ! ঈশা খাঁর বংশধরগণ আজিও ময়মনসিংহ জেলায় প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারী। এই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য ইহারা একবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন,—তাহারই ফলে মুন্সী রামচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত কালীকুমার চক্রবর্তী "মসনদালি ইতিহাস" নামে বাংলা ভাষায় একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ঈশা খাঁ ২২ পরগণার মালিক ছিলেন, এই তথ্য সর্বজন-বিদিত। কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৫৭ পৃষ্ঠায় এই ২২ পরগণার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কেদারবাবু এবং অন্যান্য সকল লেখকই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঈশা খাঁ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে হারিয়া দিল্লি যাইয়া সম্রাট আকবরের নিকট হইতে এই ২২ পরগণার সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর ঈশা খাঁর অদ্ভুত রাজনীতি-কৌশল ও জীবনব্যাপী স্বাধীনতা-সমরের মর্যাদা অনেক লেখকই এইরূপে ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন।

দুই একজন তীক্ষ্নধী ঐতিহাসিক কিন্তু ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশা খাঁর মস্তক প্রকৃতপক্ষে কোন দিনই আকবরের নিকট নত হয় নাই। বেভারিজ সাহেব বলেন— "(In Akbar Nama, vol III) we are told more than once of his making submission and sending presents. But he was never really subdued, and has swamps and creeks enabled him to preserve his independence as effectually as the Aravalli Hills protected Rana Pratap of Udaipur." J. A. S. B. 1904. P. 61—অর্থাৎ আকবরনামার তৃতীয় খণ্ডে আকবরের নিকট ঈশা খাঁর বশ্যতা-স্বীকার ও উপঢৌকন প্রদানের একাধিকবার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশা খাঁ কখনই বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। আরাবল্লী পর্বত যেমন রাণা প্রতাপকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, ঈশা খাঁও তেমনি (তাহার রাজ্যের) বিল ও নদীনালার সহায়তায় ততখানি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে সুবে বাংলার বর্ণনায় লেখা হইয়াছে—"এই সুবার 'ভাটি' নামে

পরিচিত পূর্বাঞ্চল এই সুবার অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হয়। ইহা আফগান ঈশার শাসনের অধীন কিন্তু (এথায়) বর্তমান সম্রাটের নামেই খুৎবা পড়া হয় এবং টাকা মুদ্রিত হয়। ...এই অঞ্চলের সংলগ্নই এক বৃহৎ ভূখণ্ডে তিপ্রা জাতির বাস। (তাহাদের) রাজার নাম বিজয়মাণিক।"[১] (Ain-i-Akbari, II. Jarret. P. 117)

ঈশা খাঁ যে ভাটি অঞ্চলে একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন, আইন-ই-আকবরীর উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। একই নিঃশ্বাসে বিজয় মাণিক্য ও ঈশা খাঁর নাম করায় এই স্বাধীনতা স্বরূপও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু সুলেমান কররানীর মত ঈশা খাঁও অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে দায়ুদের দ্বিতীয় উদ্যমের সমকালে মোঘল নওয়ারার অধ্যক্ষ শাহবর্দিকে ঈশা খাঁ মারিয়া তাড়াইয়াছিলেন, অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আকবরনামার উক্তিগুলি দেখুন—

১৫৭৮ এর শেষে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার বর্ণনায় লেখা হইয়াছে—

"ভাটির জমিদার ঈশা খাঁ নানাবিধ ছলনা-চাতুরী দ্বারা সময় কাটাইতে লাগিলেন।" (Akbar-Nama ; III, P. 376.)

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খাঁর সহিত ঈশা খাঁর সংঘর্ষের বর্ণনায় আকবরনামাতে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তথাকার উক্তি,—

"বিচার-শক্তির পরিপক্কতায় এবং ধীরভাবে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া কার্যপ্রণালী স্থির করিবার ক্ষমতায় বঙ্গের "বারোভুঁইয়া"র উপর ঈশা খাঁ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরদর্শিতা হেতু এবং সাবধান বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঈশা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্তৃগণের সহিত কখনও দেখা করেন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন এবং উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া তুষ্ট রাখিতেন। দূর হইতে ঈশা খাঁ অধীনতাদ্যোতক নম্র বাক্য প্রয়োগ করিতেন।"

আকবরনামার এই বর্ণনায় ঈশা খাঁর স্বরূপ সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশা খাঁ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা নানা কারণে সঙ্গত বোধ করেন নাই বটে। (যেমন সুলেমান কররানীও করেন নাই) কিন্তু অধীনতাও কোন দিনই স্বীকার করেন নাই।

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে[২] র‍্যালপ্ ফিচ্ এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"এই দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। ইনি এই প্রদেশস্থ অন্যান্য রাজার উপরে রাজা।" "এই সকল রাজারা তাহাদের অধিরাজ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কারণ এই দেশে এত নদীনালা ও দ্বীপ আছে যে তাহারা একটা হইতে আর একটায় পলায়ন করে এবং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের সহিত পারে না।" *

এই সমস্ত উল্লেখ হইতে স্বাধীন রাজারূপে এবং বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সর্বপ্রধানরূপে ঈশা খাঁর মর্যাদা কতখানি ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মানসিংহের সহিত যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঈশা খাঁ দিল্লি যাইয়া আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া ২২ পরগণার সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচলিত জনপ্রবাদকে কোন কোন লেখক ইতিহাসের মর্যাদা দিয়াছেন, সেই যুদ্ধেরও বেশ বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে আছে। তাহার পরেও ঈশা খাঁ সম্পূর্ণ পরাজয় এবং দিল্লি গমনের বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। ঈশা খাঁর মৃত্যুর বিবরণ লিখিতে গিয়া আবুল ফজল বরং এই কথাই লিখিয়াছেন যে "ঈশা খাঁ কোন দিনই সম্রাট সমীপে উপস্থিত হন নাই।" (A. N. III. P. 1140) এত কথা লিখিয়া আকবরনামাতে আবুল ফজল ঈশা খাঁ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব সম্পন্ন কথাটাই লিখিতে ভুলিলেন বা গোপন করিয়া গেলেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাহা সত্ত্বেও যে সকল লেখক ঈশা খাঁর আকবরের অধীনতা স্বীকার ও মোঘল রাজধানীতে গমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

প্রকৃত কথা এই যে, ঈশা খাঁ স্বীয় বাহুবলে এবং রাজনীতি কৌশলে ২২ পরগণা সমন্বিত বৃহৎ রাজ্যাংশের মালিক হইয়াছিলেন এবং আকবরের সনন্দের কথা একেবারেই অলীক।

কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে, ঐ রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দকে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রদত্ত জমিদারির মূল দুই ফর্মান আজিও কিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। ঈশা খাঁকে আকবর ঐরূপ কোন ফর্মান দিয়া থাকিলে তাহা বা তাহার কোন অনুলিপি বা পরবর্তী কোন দলিলে তাহার উল্লেখ ঈশা খাঁর বংশধরগণের নিকট অবশ্যই পাওয়া যাইত। কিন্তু ডাক্তার ওয়াইজ অর্ধশতাব্দী পূর্বে অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদের ঘরে সাহসুজার পূর্বের কোন দলিল খুঁজিয়া পান নাই। (J. A. S. B. 1874. P. 214) ঈশা খাঁ আকবরের সনন্দ-প্রাপ্ত জমিদার হইলে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরেও ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁকে ঈশা খাঁর পুত্রগণের সহিত অনবরত লড়িয়া পূর্ববঙ্গে অগ্রসর হইতে হইত না।

মুদ্রার প্রমাণও এই স্থানে প্রণিধানযোগ্য। মোঘল আমলের পূর্বে পূর্ববঙ্গে সোনার গাঁ, ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ ইত্যাদি সহর টাঁকশাল রূপে বিখ্যাত ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বৎসরে (১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে) পূর্ববঙ্গ যখন সত্যসত্যই মোঘল সম্রাটের সম্পূর্ণ পদানত হয়, তখন নূতন রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) হইতে মুদ্রা প্রচারে বিলম্ব হয় নাই। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা পেটিকার তালিকায় দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত ৬৭৪ নং মুদ্রা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১২শ বৎসরে জাহাঙ্গীরনগরে মুদ্রিত মুদ্রা। জাহাঙ্গীরনগরে মুদ্রিত জাহাঙ্গীরের মুদ্রা এ যাবৎ যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুদ্রাটিই সর্বপ্রাচীন। ভবিষ্যতে হয় তো ৯ম—১১শ বৎসরে মুদ্রিত মুদ্রাও পাওয়া যাইতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর হইতে মুদ্রা প্রচারের পূর্বে পূর্বভারতে মুদ্রিত আকবরের যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের গায়ে শুধু দুইটি টাঁকশালের নাম মুদ্রিত দেখা যায়। একটি পাটনা। এই টাঁকশালে মুদ্রিত মুদ্রায় ৯৮৩ হিঃ = ১৫৭৫ খ্রিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া (Whitehead's Catalogue of the coins in the Panjab Museum, Lahore. Vol. II. Nos. 139 and 266) আকবরের রাজত্বের শেষ বৎসরের তারিখ পর্যন্ত (Brown's Catalogue of coins in the Provincial Museum, Lacknow, vol. II. no. 379) পাওয়া গিয়াছে।

আকবরের আর এক শ্রেণীর মুদ্রার উদ্ভবস্থানও বাংলাদেশ। এই চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলিতে একপীঠে ইসলামের মূল সূত্র মুদ্রিত আছে—আর একপীঠে মুদ্রিত আছে দুই লাইন কবিতা, অনুবাদ করিলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—

বাংলার মুদ্রাখানি ধরে মূর্তি সুশোভন।
আকবর শাহ যেই ইহারে করে মুদ্রণ।।

এই মুদ্রা কলিকাতা চিত্রশালায় দুইটি আছে লাহোর (Wright's Catalogue. No. 317a, 315b dated 1009 H and 1010 H.), লাহোর চিত্রশালায় দুইটি আছে—(Whitehead. No. 259, 260) লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় চারিটি আছে (Brown. Nos. 362-365)। রাইট সাহেব তাহার মুদ্রা দুইটি ঠিকমত পড়িতে পারেন নাই। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় Mr. W. Vest এই শ্রেণীর মুদ্রার একটি বর্ণনা প্রদান করেন। (J. A. S. B. 1909. P. 319-320) তিনিই দেখাইয়া দেন যে ভারতের চিত্রশালায় 'বাংলা' নামযুক্ত যতগুলি আকবরের মুদ্রা আছে, তাহাদের তারিখ (৩৯ রাজ্যা রোহণাব্দে) ১০০২ হিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০১১ হিঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৫৯৩ খ্রিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০২ খ্রিঃ পর্যন্ত। তিনি আরও বলেন যে 'বাংলা' গৌড়নগরেরই নামান্তর। এই সময়ে যে গৌড় নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, Mr. Vest তাহা খেয়াল করিয়া দেখেন নাই। আর গৌড়ের মুদ্রা-প্রসিদ্ধ নাম লক্ষ্মণাবতী বা জিন্নতাবাদ পরিত্যাগ করিয়া উহাকে বাংলা নামে অভিহিত করিবার কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুত, এই শ্রেণীর মুদ্রার উপরে প্রাপ্ত 'বাংলা' নামটি দেশের সাধারণ নামস্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এই খাস বাংলার মুদ্রা প্রথম দেখা দেয় তখন বোধ হইতেছে যে ১৫৭৫ হইতে ১৫৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থা

এমনি অশান্তিময় ছিল যে এই দেশে মুদ্রা মুদ্রণের দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে প্রথম মুদ্রা মুদ্রণ আরব্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও মুদ্রাগুলি সাধারণভাবে 'বাংলা'র মুদ্রা বলিয়াই অভিহিত হইত—সোনারগাঁ, চাটগাঁ, ফতেহাবাদ ইত্যাদি পূর্ববঙ্গীয় শহরে দূরে থাক্, বাংলা দেশের কোন শহরেই স্থায়ী টাঁকশাল বসান সম্ভবপর হয় নাই। মুদ্রার উপরে মুদ্রিত কবিতাটির মর্মার্থও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেন বাংলা দেশে আকবর শাহের ইহাই প্রথম মুদ্রা মুদ্রণ।

মানসিংহও এই কালেই বাংলা শাসনে প্রেরিত হইয়া ভৌমিক দমনে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে ১০০২ হিজরিতে 'বাংলা' নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচার বুঝি মানসিংহের সাফল্যেরই প্রথম নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে তাহা নহে আকবরনামা হইতে সঙ্কলিত নিম্নলিখিত তথ্যাবলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে।

১৫৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাজা মানসিংহ বিহার হইতে জলপথে উড়িষ্যা বিজয়ে যাত্রা করেন। (A. N. III. P. 934)

১৫৯২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে—আফগানদের সহিত উড়িষ্যার যুদ্ধ। আফগানগণ জলেশ্বর শহরের দিকে পলাইয়া যায় এবং মোঘলগণ পশ্চাদ্ধাবন করে। মোঘলগণ "মুদ্রার বদন সমূহ বাদশাহের নামাঙ্কন দ্বারা অলঙ্কৃত করে।" (III. 940) এই মুদ্রাই বোধ হয় আমাদের আলোচ্য 'বাংলা' নামাঙ্কিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যায় মুদ্রিত, মুদ্রা। এই মুদ্রার ধারাই পরবর্তীকালে বজায় রাখা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

জানুয়ারি—১৫৯৩ খ্রিঃ। উড়িষ্যার রাজা রামচন্দ্র ও মানসিংহের মধ্যে বিরোধ। সম্রাটের আদেশে সৌহৃদ্য পুনঃ স্থাপিত। (III. p. 968)

১৫ জানুয়ারি—১৫৯৩ আফগানগণের সহিত ভূষণাদুর্গের যুদ্ধে কেদাররায়ের পুত্র চাঁদরায়ের পতন। (III. 969)

মে—১৫৯৪ খ্রিঃ। মানসিংহ বঙ্গশাসনে প্রেরিত। (III. 1001)

মার্চ—১৫৯৫ খ্রিঃ। মানসিংহ তাঁড়ায় আসিয়া বঙ্গশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় ৪০ রাজ্যাব্দ এবং ১০০৩ হিজরি চলিতেছে। (III. 1023)

কাজেই দেখা গেল, মানসিংহের বঙ্গশাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতেই এই শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল।

অধ্যাপক হোডিভালা আকবরের মুদ্রার এই 'বাংলা' সম্বন্ধে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (J. A. S. B. 1920. P. 199-212)। তাহারও সিদ্ধান্ত এই যে আকবরের মুদ্রার 'বাংলা' কোন স্থান বিশেষের নাম নহে, (বঙ্গে মোঘল প্রভুত্বের সেই অস্থৈর্য্যের কালে) যখন যেখানে রাজধানী থাকিত তাহাই বাংলা নামে অভিহিত হইত। "Briefly, there would appear to be fairly good grounds for thinking that Bangala was not the real or fixed name of any town or city but an alternative or honorific designation by which the capital of the province at the time being was known." শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হইত যে রাজমহলকে বাংলার শহর বলা যায় না এবং ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার কোন স্থায়ী রাজধানীই স্থাপিত হয় নাই। বাংলা দেশ আকবরের রাজত্বে মোঘলের অধিকারে কতখানি আসিয়াছিল, ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে।

৩. ঈশা খাঁর রাজ্য ঃ

আবুল ফজল সর্বত্রই ঈশা খাঁকে ভাটির জমিদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকবরনামাতে এই ভাটির এক অবোধ্য বর্ণনা আছে। আইন-ই-আকবরী মতে সমগ্র সুবে বাংলার আয়তন চাটগাঁ

হইতে তেলিয়াঘরী পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর সীমানার পর্বতমালা হইতে সরকার মাদারণের (বর্তমান হুগলি জেলা,—মোটামুটি দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ (Jarret, II. P, 116)। এ দিকে কিন্তু ভাটির বর্ণনায় দেখা যায়, (Akbarnama, III. P. 646) ইহাও পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ ক্রোশ বিস্তৃত। অর্থাৎ বাংলা দেশ অপেক্ষাও ইহা বড় দেশ! এই অদ্ভুত দেশের চৌহদ্দিও অদ্ভুত। পূর্বে সমুদ্র ও হাবসিদের দেশ। পশ্চিমে খ্যান জাতির আবাস। দক্ষিণে তাঁড়া। উত্তরে আবার সমুদ্র এবং তিব্বতের সীমান্ত! অনেক লেখকই অনুমান করিয়াছেন যে নকলকারীর ভ্রমে, অথবা যেরূপেই হউক, এই বর্ণনা উলট্‌পালট হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ভুল ঢুকিয়াছে। আইন-ই-আকবরীর পূর্বোদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যায়, ভাটি সুবে বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং ইহার পরেই তিপ্রাদেশ দেশ। ইহা হইতেই এই দেশ যে ঢাকা-ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরা-শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঈশা খাঁর পূর্ব গৌরবের সময় তিনি ২২ পরগণার মালিক হইয়াছিলেন ইহা সর্বজন বিদিত কথা। প্রজাসাধারণের স্মৃতি এই বিষয়ে মোটামুটি অভ্রান্ত হইবারই কথা। এই ২২ পরগণার দুইটি তালিকা আমরা পাইয়াছি। একটি কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাহার ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। আর একটি ময়মনসিংহ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে "দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি" নামক এক পালাগান প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার ৩৬৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় তালিকা নিম্নে পাশাপাশি দেওয়া গেল।

কেদারবাবুর প্রদত্ত তালিকা	ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রাপ্ত তালিকা
১. আলেপ সাহি	আপাল সিংহ
২. মমিন সাহি	ময়মন সিংহ
৩. হুসেন সাহি	হুসেন শাহী
৪. বড় বাজু	
৫. মেরাউনা	
৬. হেরানা	
৭. খরানা	
৮. সেরালি	
৯. ভাওয়াল বাজু	ভাওয়াল
১০. দশ কাহনিয়া বাজু	সেরপুর
১১. সায়র জলকর	
১২. সিংধা মৈন	সিংধা
১৩. সিং নছরত উজিয়াল	নসিরুজিয়াল
১৪. দরজি বাজু	দরজি বাজু
১৫. হাজরাদি	হাজরাদি
১৬. জাফর সাহি	জয়রে সাই
১৭. বলদা খাল	বরদা খাত
১৮. সোনার গাঁ	স্বর্ণগ্রাম
১৯. মহেশ্বর দি	মহেশ্বর দি
২০. পাইট কাড়া	পাইট কাড়া
২১. কাটরাব	কাটরাব
২২. গঙ্গামণ্ডল	গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, মনরা, কুড়িখাই, জোয়ান শাহী, খাল্যাজুড়ি, জোয়ার হুসেনপুর

এই দুই তালিকায় যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহার সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ময়মনসিংহ-গীতিকায় বরদা খাতের নাম দুইবার দেখা যায়—উহাদের একটা বড়বাজু হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর কেদারবাবুর তালিকায় বড়বাজুর পরে মেরাউনা, হেরানা, খরানা এবং শের আলি এই যে চারটি পরগণার নাম দেখা যায়, এই স্থানগুলি বড়বাজুরই অংশ। বর্তমানে ইহাদের কতক অংশ নবোদ্ভূত যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর পূর্বপার, কতক পশ্চিমপারে পড়িয়াছে। (ময়মনসিংহের ইতিহাস—৬০ পৃষ্ঠা ও ময়মনসিংহের বিবরণ, ২৩ পৃষ্ঠা)। প্রথম তালিকায় সায়র জলকর ও দ্বিতীয় তালিকায় জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুড়ি পরগণা এই ভূভাগের বিভিন্ন নাম (ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৬১, বিবরণ, পৃষ্ঠা ৩৪)। বাকি রহিল মনরা ও কুড়িখাই। কুড়িখাই বরদাখাত পরগণার অন্তর্গত (ময়মনসিংহের বিবরণ, ৩৭ পৃষ্ঠা। কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত রাজমালা, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)। মনরা কোথায় স্থির করিতে পারিলাম না। বরদাখাতেরই অন্তর্গত মনরা-বাজার নামক একটি স্থান আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে ; কিন্তু কোন প্রমাণ দিতে পারিলাম না।

উপরের দুই তালিকার এক তালিকায়ও ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার নাম নাই। কৈলাশচন্দ্র সিংহের মতে পরবর্তীকালে দেওয়ান মজলিস গাজি নামক ঈশা খাঁর জনৈক বংশধর সমগ্র সরাইল পরগণার মালিক হন। (রাজমালা—৪৪৯ পৃষ্ঠা)। ঈশা খাঁর বংশাবলী বর্তমান যাহা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মজলিস গাজির নাম কোথাও নাই। কেদারবাবুর "ময়মনসিংহের বিবরণ"এ ঈশা খাঁর তিরোধানের পরে নসরৎ-উজিয়াল পরগণার মালিক ঈশা খাঁর পারিষদ একজন মসজিদ জালালের নাম পাওয়া যায় এবং খালিয়াজুড়ির মালিক স্বরূপ এক মজলিস বংশের নাম পাওয়া যায় (বিবরণ, পৃঃ ২৮ ও ৩২)। খালিয়াজুড়িও সরাইল সংলগ্ন পরগণা। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে খাঁজাহানের সহিত ঈশা খাঁর প্রথম সংঘর্ষ বর্ণনায় আকবরনামাতে ঠিক এই অঞ্চলেই মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস পরতাপ নামক দুইজন জমিদারের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার ঈশা খাঁর পক্ষাবলম্বন করাতেই যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যায়। এই দুই মজলিস সরাইল, খালিয়াজুড়ি ও জোয়ানসাহী অঞ্চলেই জমিদারি করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে। কৈলাসবাবু রাজমালা, ৪৫০ পৃষ্ঠায় সরাইলের মজলিস গাজির একটি বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হৃতসম্পত্তি দেওয়ান ছমদদ আলি মজলিস গাজির অধস্তন ১৩শ পুরুষ। কাজেই সরাইলের মালিক মজলিস গাজি ঈশা খাঁর সমসাময়িকই হইবেন বলিয়া ধরা যায়।[৩] সরাইল পরগণার আদি মালিক যে ঈশা খাঁ ছিলেন, পদ্যে বিরচিত ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় তাহার অনেক প্রমাণ আছে, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

এইবার ঈশা খাঁর বিশাল জমিদারির পরগণাগুলির একটা ধারণা করা যাউক। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, ত্রিপুরা জেলার পরগণাগুলি প্রায়ই একলপ্ত পরগণা ; ময়মনসিংহের পূর্বাংশের পরগণাগুলিও অনেকটা সেই রকমের। কিন্তু ঢাকা জেলার এবং ময়মনসিংহের পশ্চিমাংশের পরগণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (চলতি কথায় 'ছিটা') পরগণা।

১. আলাপসাহি বা আলাপ সিংহ। আয়তন ৫৬০ বর্গ মাইল। মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরীগণের অধিকৃত বিখ্যাত পরগণা। ঢাকা—বাহাদুরাবাদ রেল-লাইনের ধলা ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ময়মনসিংহ পার হইয়া পিয়ারপুর ষ্টেশন পর্যন্ত অংশের পশ্চিমে, বর্তমান কালের পুলিশ ষ্টেশন মুক্তাগাছা, ফুলবেড়িয়া ও ত্রিশালের প্রায় সমস্তটা জুড়িয়া এই পরগণা অবস্থিত। Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymeusing, Appendix C. Pargana map of the proposed central District দ্রষ্টব্য।

২. মমিনসাহি। এই পরগণা আলাপসিংহ হইতে বৃহত্তর। পরিমাণ ফল প্রায় ৬০৪ বর্গ মাইল। ইহা ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে, ব্রহ্মপুত্র হইতে পূর্ব-উত্তরে এবং পরে সোজা পূর্বে প্রায় শ্রীহট্টের সীমা পর্যন্ত ৪০। ৪১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। গৌরীপুর, গোপালপুর, কেল্লা বোকাই নগর ইত্যাদি বিখ্যাত স্থান ইহার মধ্যে পড়িয়াছে।

৩. হুসেনসাহি। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে মমিনসাহির দক্ষিণস্থ পরগণা। ইহার কতক অংশ জোয়ার হুসেনপুর নামে পরিচিত।

৪. বড় বাজু

৫. মেরাউনা

৬. হেরানা

৭. খরানা

৮. শের আলি

এই পাঁচ পরগণা বর্তমানে বড়বাজু, আটিয়া ও কাগমারী বলিয়া পরিচিত (ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৬০ পৃষ্ঠা)। এক সময়ে আটিয়া, কাগমারী ইত্যাদিও বড়বাজু নামে পরিচিত সরকার বাজুহার অন্তর্গত বৃহত্তম পরগণারই অন্তর্ভুক্ত ছিল, পৃথক নামে পরিচিত ছিল না। বর্তমানে নূতন ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদীর উদ্ভব হওয়ায় ইহাদের অনেক জমি যমুনার পশ্চিমপারে পড়িয়াছে। বর্তমান টাঙ্গাইল সবডিভিশন মোটামুটি এই তিন পরগণা লইয়া গঠিত। তিনটিই ছিটা পরগণা,—মোটামুটি, উত্তরাংশে কাগমারি, মধ্যে বড়বাজু ও দক্ষিণে, অনেকটা একলপ্তে, আটিয়া পরগণা। আটিয়া পরগণার কিছু জমি ঢাকা জেলায়ও পড়িয়াছে। কাগমারীর উত্তরে পুখুরিয়া নামক একটি বড় পরগণা দেখা যায়। ইহাও বড়বাজুর অন্তর্গত কি না, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পাইলাম না। তবে ইহা ঈশা খাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, ইহার উত্তরে জাফরসাহি এবং দক্ষিণে প্রকাণ্ড পরগণা বড়বাজু উভয়ই ঈশা খাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

৯. ভাওয়াল বাজু। ইহার নাম প্রকৃতপক্ষে রণভাওয়াল হওয়া উচিত। ইহার সীমানা—পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঢাকা জেলার সীমানা বাণার নদী, উত্তরে আলাপসিংহ পরগণা এবং পশ্চিমে আটিয়া পরগণা।

১০. দশ কাহনীয়া বা শেরপুর। ইহার সীমানা, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে গারো পাহাড়, পূর্বে সুসঙ্গ পরগণা।

১১ সায়র জলকর-পরগণা জোয়ানশাহী ও খালিয়া-জুড়ি। এই দুই পরগণা জলাভূমিতে পরিপূর্ণ—ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। জোয়ানশাহী ধনু নদী এবং মেঘনা নদীর অভ্যন্তরস্থ সুবৃহৎ পরগণা, অষ্টগ্রাম, ইটনা ইত্যাদি স্থান ইহার অন্তর্গত। দক্ষিণে ইহা ভৈরববাজারের ৪ মাইল উত্তর পর্যন্ত পৌছিয়াছে। খালিয়াজুড়ির আয়তন ১৩০ বর্গমাইল। ইহার সমস্তটাই প্রায় জলাভূমি। এই পরগণা জোয়ানশাহীর উত্তরে অবস্থিত এবং ধনু নদী দ্বারা দ্বিখণ্ডীকৃত। ইহার উত্তরে ও পূর্বে শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে জোয়ানশাহী পরগণা, পশ্চিমে নসিরুজিয়াল পরগণা।

১২. সিংধা মৈন। ইহা মমিনসাহি ও নসিরুজিয়াল পরগণার অন্তর্গত ছিটা তপ্পা, বর্তমান পুলিশ ষ্টেশন বারহট্টা, আটপাড়া ও কেন্দুয়ার অন্তর্গত। আচার্য চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী যখন মমিনসাহি পরগণা দখল করেন, তখন সিংধার মুসলমান জমিদারের সহিত তাহার অনেক বিরোধ করিতে হইয়াছিল।

১৩. নসিরুজিয়াল। এই পরগণা মোটামুটি বর্তমান কেন্দুয়া খানা।

১৪. দরজিবাজু। পরগণা দরজিবাজুর অনেকখানি সিংধা তপ্পা নামে পরিচিত। পূর্বোল্লিখিত ময়মনসিংহ জেলার Final Report এ Proposed Eastern District-এর পরগণা-মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরের উত্তরে এক রেখায় দরজিবাজু নামে অনেকগুলি ছিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল দেখা যায়।

১৫. হাজরাদি। পরিমাণ ফল ৩২২ বর্গমাইল। মহকুমা শহর কিশোরগঞ্জের ৬।৭ মাইল উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

১৭. জাফরসাহি। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে প্রায় সমগ্র জামালপুর মহকুমা লইয়া এই পরগণা গঠিত। তোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে ইহা সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত।

১৬. বরদাখাত। ইহা ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত এবং বৃহৎ পরগণা। এই পরগণার কতক অংশ ময়মনসিংহ জেলার মধ্যেও পড়িয়াছে। কুড়িখাই ইহার অন্তর্গত বৃহৎ তপ্পা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে এবং পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে বিস্তৃত। বিখ্যাত ভৈরববাজার ইহার অন্তর্গত। ভৈরববাজারের দক্ষিণেও বরদাখাত পরগণা ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ৩৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মোটামুটি ১২ মাইল প্রশস্ত। উত্তর-পূর্বে ত্রিপুরার মহারাজার সম্পত্তি চাকলে রোশেনাবাদ, এবং তাহার উত্তরে আবার ত্রিপুরা জেলার অন্যতম বৃহৎ পরগণা সরাইল-সতর খণ্ডল, ত্রিপুরা জেলার শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

১৮. সোনার গাঁ

১৯. কাট্‌রাব

২০. মহেশ্বর দি

ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার শীতল লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর অভ্যন্তরে সোনার গাঁ ও মহেশ্বর দি পরগণা অবস্থিত। কাটরাব সোনার-গাঁরই অন্তর্গত বৃহৎ তপ্পা। লক্ষ্যার পশ্চিম পারে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরাংশ কাটরাব তপ্পার অন্তর্গত। লক্ষ্যার তীরে তীরে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত ও লক্ষ্যার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ হইতে উত্তরেও এই তপ্পা ৮।১০ মাইল বিস্তৃত। সোনার গাঁর উত্তরে মহেশ্বর দি পরগণা। ইহার উত্তর সীমানা লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত (যাহা অনেক Survey Map এ ভুলক্রমে লক্ষ্যার প্রাচীন খাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে)।[৪]

২১. পাটিকাড়া। প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। ত্রিপুরা জেলার প্রধান নগর কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে যে ময়নামতী ও লালমাই পাহাড় নামে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২ মাইল লম্বা অনুচ্চ পর্বত-শ্রেণী আছে, তাহার পশ্চিমে স্থিত প্রায় ৮ মাইল প্রশস্ত নাতি-বৃহৎ পরগণা।

২২. গঙ্গামণ্ডল। নাতি-বৃহৎ পরগণা, পাটিকাড়ার অব্যবহিত উত্তরে এবং বরদাখাতের দক্ষিণাংশের পূর্বে অবস্থিত।

এই বিশাল জমিদারি অর্জন করিতে সময় লাগিয়াছিল এবং এই জমিদারির সমস্তটাকে লক্ষ্য করিয়া আবুলফজল "ভাটি" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। পরগণা জোয়ানশাহি, খালিয়াজুড়ি সরাইল ও বরদাখাতকে লক্ষ্য করিয়া ঈশা খাঁকে ভাটির অধীশ্বর বলা হইয়া থাকিবে। ঢাকা জেলার ভাটি বলিতে বরিশালকে বুঝায়। ময়মনসিংহে খালিয়াজুড়ি পরগণাকে ভাটি বলে।

৪. ঈশা খাঁর বংশ-পরিচয় ঃ

প্রকৃতি দেবী যাহাকে অনন্যসাধারণ গুণাবলি দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, ভাগ্যলক্ষ্মী যাহার প্রতি প্রসন্না হন, আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে তাহার সম্বন্ধে তাহার জীবন-কালেই কত কাহিনী রচিত হইয়া যায়, তাহার মৃত্যুর পরে তো কথাই নাই। পূর্ব-ভারতে আকবরের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রবলতম প্রতিবন্ধক, আমরণ স্বাধীনতা-সমরে লিপ্ত ঈশা খাঁ সম্বন্ধেও যে নানাবিধ গাল-গল্প দেশমধ্যে প্রচারিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। গ্রাম্য কবিগণ গাথা রচনা করিয়া ঈশা খাঁর শৌর্য-বীর্যের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। সারাদিন মাঠের কাঠফাটা রোদে কাজ করিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরে কৃষকগণ সেই সকল গাথা সামান্য বাদ্যযন্ত্র-যোগে গান করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিত। এমনি একটি গাথার খবর 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩২৪, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ২৫২-২৫৯ পৃষ্ঠায় "বীরাঙ্গনা স্বর্ণময়ী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও ময়মনসিংহগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' নামে এইরূপ একটি গাথা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল গাথার একটিও প্রাচীন নহে। জনপ্রবাদের

ঈশা খাঁকে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসের ঈশা খাঁ ইহাদের মধ্যে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে ইতিহাস-চর্চা মুসলমান সভ্যতার একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় অঙ্গ ছিল, বাংলাদেশে আসিয়া মুসলমান সভ্যতা যেন সেই অঙ্গ বর্জন করিয়া বসিয়াছিল। বাংলাদেশে কত বড় বড় সুলতান উদ্ভূত হইয়া সমগ্র পূর্ব ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া গেলেন,—কিন্তু তাহাদের একখানিও সমসাময়িক ইতিহাস বঙ্গদেশে লিখিত হয় নাই। আকবর সাহের সহিত ঈশা খাঁ মসনদালির আজীবন বিরোধের ইতিহাসও আমাদিগকে জানিতে হয় আকবরের সভাসদ ও বন্ধু আবুল ফজলের আকবরনামা পড়িয়া। বাংলার গ্রাম্য কবিগণ ঈশা খাঁ সম্বন্ধে গাথা লিখিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সমসাময়িক কোন বাঙালি ঐতিহাসিক তাহার কীর্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়া যান নাই।

ঈশা খাঁর বংশ-পরিচয়ের প্রারম্ভেও সেই আকবরনামাই আমাদের অবলম্বনীয়।

আবুল ফজল বলেন—(A. N. III. 647) "এই ভূঞার পিতার জন্ম রাজপুত জাতির 'বাইশ' শাখায়। এই ভাটি অঞ্চলে সর্বদাই তিনি আস্পর্দ্ধা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করিতেন। ইসলাম খাঁ নামক দুই জন সেনাপতি তাহাকে দমন করিতে বহু সৈন্য লইয়া ঐ দেশে যান। অনেক যুদ্ধের পর ঈশা খাঁর পিতা পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছু দিন পরে আবার তিনি বিদ্রোহী হন। অবশেষে এক কৌশলে তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। ঈশা এবং ইসমাইল নামে তাহার দুই পুত্র দাসরূপে বিক্রিত হন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পরে যখন বাংলাদেশে তাজ খাঁর প্রভুত্ব, তখন ঈশা খাঁর খুড়া কুতবুদ্দিন ভাল কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং অনেক খোঁজ করিয়া দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকেই তুরাণ দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। বিচার-বুদ্ধির পরিপক্কতায় এবং অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া কাজ করিবার ফলে ঈশা খাঁ খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলাদেশের বারভুঁইয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন।"

এই বিবরণে ঈশা খাঁর পিতার নাম দেওয়া নাই। ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ি ও হয়বত নগরের জমিদার দেওয়ান সাহেবগণের মতে এবং লোকপরম্পরাগত স্মৃতি অনুসারে তাহার নাম ছিল কালিদাস গজদানী।[৫] ওয়াইজ সাহেব যখন ঈশা খাঁর ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য দেওয়ান পরিবারে খোঁজ করেন, তখন তিনি জানিয়াছিলেন যে, কালিদাস গজদানী হুসেন শাহের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে দেওয়ান সাহেবদের আদেশে বিরচিত 'মসনদালি ইতিহাসে' লিখিত আছে যে কালিদাস সুলতান জালাল শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ডাঃ সেন কর্তৃক মুদ্রিত পালা গানটিতে 'গিয়াসুদ্দিন' এবং "জালাল শাহে" গোল বাধিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। যদি তৎকালীন বঙ্গদেশের সুলতানের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কালিদাসের মুসলমান হওয়ার কথাটার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকে, তবে এই সুলতান কে হওয়া সম্ভব তাহা নিম্নলিখিত কাল-পর্যায় পর্যালোচনা করিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

১৪৯৩ খ্রিঃ—হুসেন শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫১৮ খ্রিঃ—তৎপুত্র নসরৎ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩২ খ্রিঃ—তৎপুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩২ খ্রিঃ—হুসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৩৭ খ্রিঃ—শের খাঁর গৌড় আক্রমণ।

১৫৩৮ খ্রিঃ—মামুদ শাহের পরাজয়, পলায়ন, হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ ও মৃত্যু।

১৫৪০ খ্রিঃ—শের শাহ ভারত সম্রাট।

১৫৪৫ খ্রিঃ—ইসলাম শাহ ভারত সম্রাট। বিহারে রাজপ্রতিনিধি সুলেমান কররাণী—বঙ্গে মুহম্মদ খাঁ শূর।

১৫৫২ খ্রিঃ—ইসলাম শাহের মৃত্যু। মহম্মদ আদিল শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৫২ খ্রিঃ—বঙ্গে ইসলাম শাহের প্রতিনিধি মুহম্মদ খাঁ শূরের মুহম্মদ শাহ্ গাজী নামে স্বাধীনতা ঘোষণা, আদিলের সহিত যুদ্ধ, পরাজয় ও মৃত্যু। তাজ খাঁ কররাণীর আদিলের সভা হইতে পলায়ন।

১৫৫৪ খ্রিঃ—মুহম্মদ শাহ্ গাজীর পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহের রাজ্য প্রাপ্তি। সুলেমান কররাণীর সহায়তায় আদিলের সহিত যুদ্ধ— আদিলের পরাজয় ও মৃত্যু।

১৫৬০ খ্রিঃ—বাহাদুরের ভ্রাতা গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহের রাজ্য প্রাপ্তি।

১৫৬৩ খ্রিঃ—জালাল শাহের মৃত্যু। সুলেমান কররাণীর বঙ্গ অধিকার।

১৫৬৩-১৫৬৪ খ্রিঃ—বঙ্গে তাজ খাঁর শাসন। তাজ খাঁর মৃত্যু। বঙ্গে ও বিহারে সুলেমান কররাণীর একাধিপত্য।

১৫৭২, অক্টোবর। সুলেমান কররাণীর মৃত্যু (A. N. III; P. G. F.n.)

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ, শেষভাগ। মোঘল নৌবহরের অধ্যক্ষ শাহবর্দ্দির সহিত ঈশা খাঁর সংঘর্ষ। শাহবর্দ্দির পূর্ববঙ্গ ত্যাগ।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১৫৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দ সাত বৎসর ইসলাম খাঁর রাজত্ব। এই সময়ের মধ্যেই কালিদাস গজদানী দুইবার বিদ্রোহী হন এবং শেষবারে ধৃত ও নিহত হন ও তাহার পুত্রদ্বয় দাসরূপে বিক্রিত হন। জালাল শাহের রাজত্ব ইহার অনেক পরের ঘটনা, কাজেই কালিদাস গজদানীর জালাল শাহের কন্যা বিবাহ করার কথা একেবারেই অলীক।

ইসলাম শাহের রাজত্বকালে কালিদাস বিদ্রোহী হন কেন? বার বার বিদ্রোহী হওয়াতে মনে হয় যেন এই নবোদিত শূর বংশের বিরুদ্ধে তাহার অদম্য ক্রোধ ছিল। হুসেন শাহের বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহকে তাড়াইয়া শের শাহ্ বাংলাদেশ অধিকার করেন। ইহা ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। তাহার পর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন। ইহার পরেই ইসলাম খাঁর রাজত্বে কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ। মাহমুদ শাহের পূর্ণ নাম গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে গিয়াসুদ্দিন নামক বঙ্গের কোন সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যদি কালিদাস গজদানি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহার দেওয়ান পদে বৃত হইয়া থাকেন, তবে তাহা এই গিয়াসুদ্দেন মাহমুদ শাহ।

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান হন। মুদ্রার প্রমাণে জানা যায় যে, তিনি ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ফিরোজ শাহ কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাহার পরেই মাহমুদ শাহের রাজত্ব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহের রাজত্ব শেষ হইবার পূর্বেই মাহমুদ শাহের মুদ্রা দেখা দিয়াছে। একটি দুইটি নহে, এই রকম বহু সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই হুসেনী যুগের শেষ অধ্যায় এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুদ্রার প্রমাণে এই মনে হয় যে নসরৎ শাহের রাজত্বের শেষ দিকে রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছিল এবং মাহমুদ শাহ পূর্বাংশের অধিপতি হইয়াছিলেন। মাহমুদ শাহের পতনের পরে, যিনি পতন ঘটাইয়াছিলেন সেই শের শাহের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে অন্ততঃ দুইবার বিদ্রোহের আভাস আমরা পাই। শের শাহ্ খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পশ্চিম ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। এই খিজিব খাঁ মাহমুদ শাহের এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিরূপে খিজির খাঁ বিদ্রোহোন্মুখ হইলে শের শাহ গাক্কার বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া দ্রুত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া খিজির খাঁকে দমন করেন, তাহা আমরা পূর্বের এক অধ্যায়ে বারোভুঞার আমলের পূর্ববর্তী যুগের আলোচনায় দেখিয়াছি। ইহা ৯৪৮ হিজরি—১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। ইহার অব্যবহিত পরেই, কালিদাস গজদানী যে অঞ্চলে পরবর্তীকালে হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব ময়মনসিংহ—শ্রীহট্ট অঞ্চলেই যে বিদ্রোহীগণ দলবদ্ধ হইয়া পলায়িত হুমায়ুনের এক ছেলের নামে মুদ্রা পর্যন্ত মুদ্রিত করিয়াছিল, এই ব্যাপারটি এই পর্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই। এই বিদ্রোহের দুইটি সাক্ষী বর্তমান

আছে---দুইটি মুদ্রা। একটি পাওয়া যায় এই আমলের বহু মুদ্রার সহিত ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার যশোদল গ্রামে—উহাই ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম মুদ্রাপেটিকার বিবরণীর ২য় খণ্ডে ১৮২ পৃষ্ঠায় ২৩৯নং রূপে বর্ণিত হইয়াছে (J. A. S. B. 1910. P. 150)। আর একটি পাওয়া যায় শ্রীহট্ট জেলার সোনাখিরা গ্রামে। এই মুদ্রাটি শিলং মুদ্রাপেটিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় ২৪নং রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মুদ্রায় মুদ্রিত রাজার নাম --"বরবক-উদ্দুনিয়া-উদ্দিন আবুল মুজঃফর বরবক্ শাহ বিন হুমায়ুন শাহ খালিদুল্লাহ মুলকহ্ ও সুলতানত্"। ইহার তারিখ স্পষ্ট ৯৪৯ হিজরি। যশোদলে প্রাপ্ত মুদ্রাটির তারিখের অঙ্কের ৯৪—বেশ স্পষ্ট, কিন্তু শেষের অঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে। মুদ্রা দুইটি তুলনা করিয়া একই ছাঁচের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয় না। ৯৪৯ হিজরীতে শের শাহের পূর্ণপ্রতাপ রাজত্ব—তথাপি ময়মনসিংহ শ্রীহট্টে এই রকম মুদ্রার প্রচার দেখিয়া মনে হয়, শের শাহের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলের এই স্থানে একটা আড্ডা ছিল। শের শাহের মৃত্যুর পরে ঠিক এই অঞ্চলেই কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ দেখিয়া মনে হয়, উহাও একই কারণ সম্ভূত এবং একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাহমুদ শাহের এক কন্যা বিবাহ করিয়া খিজির খাঁ শের শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জোগাড় করিয়াছিলেন। সম্ভবত কালিদাস আর এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শের পুত্র ইসলাম খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম শাহ ভারত সম্রাট হন। তিনি সুলেমান কররাণীকে বিহারের শাসনকর্তা এবং মুহম্মদ খাঁ শূরকে বঙ্গের শাসনকর্তা করেন। এই সময় কালিদাস গজদানীর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৫৪৬ অথবা ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত কালিদাস গজদানীর পতন হয় এবং ঈশা খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা ইসমাইল দাসরূপে বিক্রিত হন। তখন ইহাদের বয়স ১০/১২ বছর হইবার কথা।[৬] ১৫৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে তাজ খাঁ কররাণীর শাসন। এই সময় ঈশা খাঁর খুড়া অনেক খুজিয়া দুই ভাইকে তুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই সময় ঈশা খাঁর বয়স মোটামুটি ২৭/২৮ বৎসর। পৈতৃক জমিদারির আশ্রয়ে ঈশা খাঁ স্বীয় প্রতিভা বলে ক্রমশ এতটাই ক্ষমতা অর্জন করিতে সমর্থ হন যে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৩৯/৪০ বছর বয়সে তিনি বঙ্গীয় ভৌমিক গণের এক ভৌমিক রূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং বাদশাহী নাওয়ারা আক্রমণ করিবারও সাহস রাখেন।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাহার প্রকাশিত ময়মনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় ঈশা খাঁর এই যুগের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই উপাদান পদ্যে রচিত ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা"। এই রাজমালা এবং অন্যান্য উপাদান অবলম্বনে এই সময়কার ত্রিপুরারাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

সমসাময়িক ত্রিপুরার ইতিহাস ঃ

১৪৬২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে বিজয় মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৭] অবিলম্বে তাহার জয়ন্তিয়া রাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল এবং জয়ন্তিয়া জয় করিতে হাড়ি সৈন্যের বৃহৎ এক দল পাঠান হইল। পরে কাছাড়ের রাজার মধ্যস্থতায় এই বিরোধের মীমাংসা হয়। এই ঘটনা ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধার্য করা যায়। জয়ন্তিয়া যুদ্ধের পরে বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম বিজয়ে চলিলেন ; কিন্তু তাহার অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য বঙ্গদেশীয় পাঠানগণের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইলে পাঠানগণকে ধরিয়া চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইল। এই সংবাদ শুনিয়া গৌড়েশ্বর সেনা পাঠাইয়া চট্টগ্রাম দখল করিলেন। এই ঘটনা কবে হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই ; তবে ১৫৪৩ হইতে ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই ইহা মুহম্মদ খাঁ শূর বা তাহার পুত্র বাহাদুর শাহ এবং জালাল শাহের আমলের ঘটনা। ইহার পরে বিজয় মাণিক্য চাটগাঁ বিজয় করিলেন এবং পাঠান সেনাপতি গৌড়েশ্বরের শালা মমারক খাঁকে ধরিয়া আনিয়া চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দিলেন। এই সময়

বঙ্গদেশে মহা গোলমাল চলিতেছিল। মুহম্মদ শাহ দিল্লির নিকট আদিলের সহিত যুদ্ধে মারা গিয়াছেন, তাহার পুত্র বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে আবার আদিল মারা পড়িলেন, ইত্যাদি। এই সুযোগে বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ বিজয়ে চলিলেন। পাঁচ হাজার নৌকার এক বৃহৎ বহর লইয়া অনেক সৈন্য সহিত তিনি সম্ভবত সরাইল হইতে যাত্রা করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া স্নান দান ও সহস্র সুবর্ণ ধ্বজ উৎসর্গ করিলেন। ঐ দেশের জমিদারের নিকট হইতে পাঁচ দ্রোণ ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিলেন। এই স্থান আজিও পাঁচদোনা নামে বিখ্যাত,—মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ একটি বিখ্যাত গ্রাম। প্রাচীন কাগজপত্রে আজিও পাঁচদোনার অনেক তালুক "তালুক ত্রিপুরাপতি" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। লোকে কিন্তু ত্রিপুরাপতি বিজয় মাণিক্যের নাম ভুলিয়া গিয়াছে।[৮] এই দান ত্রিপুরারাজের কোন সেনাপতির বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

বিজয় মাণিক্যের এই পূর্ববঙ্গাভিযানের সময় সৌভাগ্য ক্রমে সঠিকরূপে নির্দেশ করা যায়। রাজমালায় দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া ঐ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বিজয় মাণিক্য মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ রকমে লক্ষ্যা নদীতে স্নান করিয়া এবং পদ্মা নদীতে স্নান করিয়াও বিজয় মাণিক্য মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এইরকম একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাটি ত্রিপুরারাজের মুদ্রা-সংগ্রহের মধ্যে ছিল। ত্রিপুরার মহারাজার ব্যয়ে "রাজমালার" যে নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট আগরতলায় যে সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই মুদ্রার পাঠ সম্বলিত একখণ্ড কাগজও দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা ১৮৮১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রা এবং ইহাতে লেখা আছে "লক্ষ্যাস্নায়ী শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য দেবঃ।" বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মুদ্রার প্রচার পরবর্তী প্রতাপশালী রাজা অমর মাণিক্যের রাজত্বেও দেখা যাইবে।

এই ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দ বাংলার বড় দুর্দিন। বাহাদুর শাহ তখন বঙ্গের সুলতান ; কিন্তু এক দিকে দিল্লির সম্রাটের সহিত বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি দিল্লির সম্রাটের নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্তার সহিত বিরোধ করিয়া বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। দেশময় অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ। এদিকে বিহারের অধিপতি সুলেমান কররাণী বাংলাদেশের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বিজয় মাণিক্য এই সুযোগে ইছামতী নদী বাহিয়া পদ্মানদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং সোনার গাঁ ও বিক্রমপুরে নানা উৎপাত করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিলেন। কেনাগড় হইয়া শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে ও ইটাতে ভ্রমণ করিয়া উনকোটি তীর্থ হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। ইহার পর আর বিজয় মাণিক্যের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ১৪৯৩ শক বা ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বসন্ত রোগে পরলোক গমন করেন।

তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র অনন্ত মাণিক্য দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪৯৪ শকে বা ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে অনন্তকে বধ করিয়া অনন্তের শ্বশুর সিংহাসন অপহরণ করেন এবং উদয় মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ত্রিপুরার রাজা হইয়া বসেন। তাহার সময়েই রাজধানীর নাম রাঙামাটির পরিবর্তে উদয়পুর রাখা হয়। এই বৎসর বাংলায় সুলেমান কররাণীর মৃত্যু হয় এবং বায়াজিদ ও পরে দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় চট্টগ্রাম লইয়া ত্রিপুরে পাঠানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। গৌড়েশ্বরের সৈন্যগণ চট্টগ্রাম যাইবার পথে ত্রিপুর সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং ত্রিপুর সৈন্যগণ শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়। পীরোজ খাঁ অন্নি এবং জামাল খাঁ পন্নি নামক পাঠান সেনাপতিদ্বয়ের নেতৃত্বে মেহারফুলগড়ে অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লা শহরের নিকটে ত্রিপুরগণ আবার পরাজিত হয়। এইরূপে পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পরে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে উদয়মাণিক্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদেরও পতন হয়। ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিজয়মাণিক্যের সৎভ্রাতা অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সিংহাসনারোহণ বৎসরাঙ্কের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। আগরতলার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর

দেববর্ম্মন মহোদয়ের নিকট অমর মাণিক্যের দুইটি রৌপ্য মুদ্রা আছে। উহাদের মধ্যে একটির উপর লিখিত আছে—"শ্রীশ্রীযুতামরমাণিক্যদেব শ্রীঅমরাবতী মহাদেব্যৌঃ শক ১৪৯৯।" এই শকাব্দ রাজমালা মতেও (রাজমালা, ১৮৬ পৃষ্ঠা) অমর মাণিক্যের রাজ্যারোহণের বৎসর।

এই অমর মাণিক্যের সহিত ঈশা খাঁ উত্থানযুগের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এই অমর মাণিক্যের রাজত্ববিবরণ রাজমালার যে খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও পুরাতন 'রাজমালার' অন্তর্গত এবং পরবর্ত্তী খণ্ডের মুখবন্ধ মতে—

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেই ত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।

রাজমালা—২৭১ পৃষ্ঠা।

এই জন্যই অমর মাণিক্যের রাজত্বের বিবরণে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও—কোন কোন স্থানে—"পূর্ব্বপ্রসঙ্গ পরে,—পর পূর্ব্বে কত" হইয়া গিয়াছে। আমরা অমর মাণিক্যের রাজত্বের ঘটনাগুলির পারম্পর্য যেমন বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি তেমনই সাজাইয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

১৫৭৭ খ্রিঃ [১৪৯৯ শক] অমর মাণিক্যের ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ।

১৫৭৮ খ্রিঃ—ভুলুয়ার রাজা গন্ধর্বমাণিক্যের সহিত যুদ্ধ ও ভুলুয়ারাজের পরাজয়। বাকলা আক্রমণ। বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু।

১৫৭৮ খ্রিঃ—দিল্লির ওমরাহের বঙ্গ আক্রমণ। সরাইলে ঈশা খাঁর পরাজয় ও ত্রিপুরার রাজার সাহায্য প্রার্থনা। মহারাণীর স্তনধৌত জল খাইয়া মহারাণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া মহারাজা ও মহারাণীর নিকট ঈশা খাঁর পুত্রস্নেহ লাভ। ঈশা খাঁর উপঢৌকন ও মসনদালি আখ্যা প্রাপ্তি। ত্রিপুরাসৈন্য ঈশা খাঁর সাহায্যার্থে সরাইলে অগ্রসর হইল এবং এই খবর পাইয়াই বঙ্গসৈন্য পলায়ন করিল।

[১৫৭৮ খ্রিঃ—১৫৮০ খ্রিঃ] অমর সাগর খনন। বঙ্গদেশীয় মজুরের সাহায্যে অমর সাগর খনন আরব্ধ হয়। ত্রিপুরা মহারাজের অনুরোধে পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারবর্গ নিম্নলিখিত মত মজুর পাঠাইয়া অমর সাগর খননে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১। বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়	৭০০
২। বাকলার বপু	৭০০
৩। সলৈ গোয়ালপাড়ার গাজি	৭০০
৪। ভাওয়ালের জমিদার (গাজি?)	১০০০
৫। অষ্টগ্রামের জমিদার	৫০০
৬। বানিয়াচুঙ্গের জমিদার	৫০০
৭। রণভাওয়ালের জমিদার	১০০০
৮। সরাইলের ঈশা খাঁ	১০০০
৯। ভুলুয়ার জমিদার	১০০০
মোট	৭১০০

এই তালিকায় পূর্ব্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধান জমিদারগণের একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং তাহাদের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহারও একটা আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রিপুরা রাজার আমল বঙ্গদেশ যত,"

*　*　*

কেহ ভয়ে, কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বারবাঙ্গালার দিছে তরপে না দিল।।

আমল মানে "অধিকার" ধরিলে ভুল করা হইবে। আমল মানে এখানে "প্রভাব"। এই সকল জমিদারের কেহ ত্রিপুরারাজকে ভয় করিত, কাহারও কাহারও সহিত তাহার প্রীতি ছিল ; আর সরাইল, ভুলুয়া ইত্যাদি ত্রিপুরা-রাজের এক রকম অধীনই ছিল বলিতে হইবে। আরও লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ঈশা খাঁ এই সময় সরাইলের ঈশা খাঁ নামেই পরিচিত।

১৫৮১ খ্রিঃ [১৫০৩ শক] ত্রিপুরারাজের তরপ আক্রমণ এবং তরপের জমিদার ফতে খাঁকে বন্দি অবস্থায় উদয়পুরে আনয়ন। এই যুদ্ধে ঈশা খাঁ ত্রিপুরারাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মনের নিকট এই শ্রীহট্ট যুদ্ধের স্মৃতি, অমর মাণিক্যের একটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। উহার লিপির পাঠ—"শ্রীহট্টবিজয়ি শ্রীশ্রীযুতামরমাণিক্য দেব শ্রীঅমরাবতি দেব্যৌঃ শক ১৫০৩"।[২] রাজমালায় আছে ১৫০৪ শকের পৌষ মাসের শেষে ফতে খাঁকে লইয়া কুমার রাজধর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ। অমর মাণিক্যের কঠিন পীড়া ও আরোগ্য লাভ।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ। আরাকানের সহিত যুদ্ধ। চট্টগ্রাম ও রাম অধিকার। ফিরিঙ্গিগণের আরাকানের সহিত যোগদান। রামুতে ত্রিপুরা সৈন্যের পরাজয় এবং কর্ণফুলীর উত্তর পারে আশ্রয় গ্রহণ।

১৫৮৬ খ্রিঃ—আরাকান-রাজ সেকান্দর শাহার (সিংহাসনারোহণ—১৫৭১ খ্রিঃ) ত্রিপুরা আক্রমণ ও চট্টগ্রাম অধিকার। ত্রিপুরা সৈন্যের পরাজয়। কুমার জুঝার সিংহের রণে পতন। অমর মাণিক্যের নিজে যুদ্ধে গমন ও পরাজয়। আরাকান রাজের উদয়পুর লুণ্ঠন। অমর মাণিক্যের আত্মহত্যা। রাজধরের সিংহাসনারোহণ। রাজধরের ১৫০৮ শকাব্দে মুদ্রিত মুদ্রা আমার নিকট আছে।

শেষের বৎসরের ঘটনা কয়েকটির সহিত আপাতত আমাদের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু এই ঘটনাগুলি আরাকানের ইতিহাসের লুপ্ত পত্র—Phayre-এর পুস্তকে অথবা নবপ্রকাশিত Mr. Harvey প্রণীত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এই সকল ঘটনার কোন উল্লেখ নাই—এইজন্য উপরে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে বঙ্গের সুবাদার শাহবাজ খাঁর আমলের ঘটনা বিবৃত করিবার সময়ও এই ত্রিপুরা-মঘ-দ্বন্দ্বের আলোচনা করা আবশ্যক হইবে।

খাঁ জাহানের সঙ্গে ঈশা খাঁর কাস্তলে মেঘনা তীরে সরাইল-জোয়ানশাহীর সীমানায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কাস্তল জোয়ানশাহী পরগণায় মেঘনাতীরস্থ বিখ্যাত গ্রাম অষ্টগ্রামের অল্প দক্ষিণ-পশ্চিমে। (Akbarnama III. P. 377)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই ঈশা খাঁ ত্রিপুরারাজের শরণাপন্ন হন। রাজমালায় লিখিত আছে—

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত।
দিল্লির উমরা সৈন্য আইসে অকস্মাৎ।।
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে।
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে।।
শুভদিনে ইছা খাঁ যে মিলে নৃপ স্থান।
যোড়হস্তে কহিলেক রাজা বিদ্যমান।।
দিল্লির উমরা যত সরাইলে আইসে।
রাজসৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে।।

রাজমালা—১৯১ পৃষ্ঠা।

কাজেই খাঁ জাহানের সহিত দ্বন্দ্ব যে সরাইলে হইয়াছিল এই বিষয়ে আকবরনামা ও রাজমালা পরস্পরকে সমর্থন করিতেছে ; এবং রাজমালায় যে ঈশা খাঁকে সরাইলের ঈশা খাঁ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছে, এবং সরাইল পরগণার সীমায় গিয়া খাঁ জাহানের ঈশা খাঁকে যে পাইতে হইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ঈশা খাঁর অভ্যুদয় সরাইলেই হইয়াছিল। রাজমালায় দেখা যায়, এই সময় অষ্টগ্রামে অর্থাৎ জোয়ানশাহী পরগণায় ভিন্ন জমিদার ছিলেন ; এবং তিনি ৫০০ শত মজুর পাঠাইয়া অমর সাগর খননে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁর মসনদ-ই-আলি, সাধারণ কথায় মসনদাল্বি বা মসনদালি উপাধিটি যে আকবর প্রদত্ত নহে,—জনপ্রবাদ মতে যেই সময়ে আকবর এই উপাধি ঈশা খাঁকে দিয়াছিলেন তাহার পূর্ব হইতেই ঈশা খাঁর এই উপাধি ছিল—খাঁ বাহাদুর আওলাদ হাসান সাহেবও এই অনুমান করিয়া গিয়াছেন।[১০] এই শ্রেণীর উপাধি তখন আফগানগণের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। সুলেমান কররাণী হজরত-ই-আলা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতা বৎসারসের জন্য বঙ্গাধিপতি তাজ খাঁর উপাধি ছি মসনদ-ই-আলি। (J. B. O. R. S. Vol IV-P. 188) মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় তাহার প্রশংসনীয় "হিজলীর মসনদ-ই-আলা" নামক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে এই সময়ের আরও কয়েকটি মসনদ-ই-আলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সময় আফগান জাতীয় বা পক্ষীয় কেহ ক্ষমতাশালী হইলেই এই শ্রেণীর উপাধি ধারণ করিতেন। তবে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রাজমালায় যখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ঈশা খাঁর এই উপাধি ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যের প্রদত্ত, তখন এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। ঈশা খাঁ তখন ত্রিপুরা মহারাজার খর্পরিগত সরাইল পরগণার ক্ষুদ্র জমিদার মাত্র—বিপদে আপদে ত্রিপুরা মহারাজার অনুগ্রহ ভিখারী। প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি অমর মাণিক্য যে এক রকম তাহার অধীনস্থ জমিদার ঈশা খাঁকে আফগানদের মধ্যে চলতি উপাধি দিয়া সম্মানিত করিবেন, ইহাতে অসঙ্গত, অশোভন বা অসম্ভব কিছুই নাই।

ঈশা খাঁর দেওয়ান উপাধি তাহার দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত কামানের লিপিতে ব্যবহৃত হয় নাই—তথায় তাহার আখ্যা শুধু 'মসনদাল্বি'। এই উপাধি সম্ভবত তাহার পৈতৃক এবং জনপরম্পরাগত,—সরকারি দলিলপত্রে ইহার ব্যবহার ছিল না।

খাঁ জাহান—ঈশা খাঁ সংঘর্ষ ঃ

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে দেখা গেল, ইব্রাহিম নাড়াল এবং করিমদাদ মুসাজাই নামক আফগান সর্দারদ্বয় ঈশা খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। আকবরনামায় এই সর্দারদ্বয়ের কোন পরিচয় নাই। আকবরনামায় বর্ণনায় বোধ হয় তাহারা ভাওয়ালের নিকটবর্তী কোন স্থানের জমিদার ছিলেন। ভাওয়াল, তালেপাবাদ, সেলিমপ্রতাপ, চাঁদপ্রতাপ এবং সুলতানপ্রতাপ তখন গাজিবংশের অধিকারে। কাজেই তাহারা সম্ভবত সোনার গাঁ—মহেশ্বরদির জমিদার ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মোঘল নাওয়ারার অধ্যক্ষ শাহ বর্দ্দিকে পর্যন্ত বিদ্রোহীগণ দলে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল!

খাঁ জাহান সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন। পথে গোয়াঁস নাম স্থানে দায়ুদের মাতা নৌলখা সপরিজনে আসিয়া খাঁ জাহানের আশ্রয় লইলেন। এই গোয়াঁস মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পরগণা—ঐ নামে একটি ক্ষুদ্র শহরও রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়। উহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ সদর রাস্তার উপরে। গঙ্গা পার হইয়া উত্তরবঙ্গে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তাহাও গোয়াঁস হইয়াই গিয়াছে। এই স্থান বর্তমান মুর্শিদাবাদ শহর হইতে ১৩/১৪ মাইল সোজা পুবে এবং তাঁড়া শহর হইতে ৩৪/৩৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

পূর্বেই আফগান সর্দার মতি বা মুহম্মদ খাঁ খাসখেলের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই মতি দায়ুদের বাছা বাছা ধনরত্ন স্বীয় হস্তগত করিয়াছিল। কাজেই তাহার প্রতি নৌলখার ভাল ভাব আসিবার কথা নহে। এই সময় মতিও আসিয়া খাঁ জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিলে নৌলখা সুযোগ পাইলেন। নৌলখার অভিযোগে মতির প্রাণদণ্ড হইল। এই ব্যাপারের উপর আবুল ফজল বক্র কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—"এই সময় মতি ও নৌলখায় বিরোধ উপস্থিত হইল। খাঁ জাহানের অভিপ্রায় ছিল মতিকে শেষ করিয়া দেওয়া,—মতির প্রাণদণ্ড হইল। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, মতির বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া,—সঙ্গে সঙ্গে মতির হাত হইতে কি ধনদৌলত ছিনাইয়া লওয়া হইল তাহা যাহাতে প্রকাশ না পায় সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া গেল!" (A. N. III. 376)

ক্রমে কুচ করিয়া মোঘল সৈন্য পূর্ব দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। শাহ্ বর্দিও বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার সম্রাটের পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন। খাঁ জাহান যখন ভাওয়াল শহরে[১১] আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন, তখন ইব্রাহিম নাড়াল ও করিমদাদ প্রমুখ আফগানগণ আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ঈশা খাঁর উচ্চ শির কিন্তু নমিত হইল না। শাহবর্দি ও মুহম্মদ কুলির অধীনে বৃহৎ সেনাদল ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া গেল। বাদশাহী নাওয়ারা লক্ষ্যার উজানে বাহিয়া সম্ভবত লাখপুর হইয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দিয়া এগারসিন্দুর পৌঁছিল। এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে—বামার নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে ঠিক তাহারই সম্মুখে। নামটি প্রকৃত পক্ষে এগার-সিন্ধু অর্থাৎ এগারটি নদীর মিলন-স্থল। ময়মনসিংহ জেলার বর্তমান কালের ১' = ৪ মাইল মানচিত্রেও এখন পর্যন্ত এই স্থানের 'সিন্ধু'গুলির খাত চিত্রিত আছে, গনিয়া ১১/১২টি এখনও পৃথক করা যায়। এগার সিন্দুরে এক সময় বৃহৎ কেল্লা ছিল, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[১১]

এগারসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়া বাদশাহী নাওয়ারা ধীরে ধীরে সরাইলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মেঘনা বাহিয়া উহা যখন কাস্তুলের নিকট পৌঁছিয়াছে এমন সময় ঈশা খাঁ উহার গতিরোধ করিলেন। কাস্তুল বা সাধারণ কথায় কাইটাইল অষ্টগ্রাম হইতে দুই মাইল পশ্চিমে, মেঘনার প্রাচীন খাত ধলেশ্বরী নদীর তীরে। ঈশা খাঁ তখন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, বাদশাহী ফৌজের সহিত আঁটিয়া উঠা তখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে হঠিলেন। বিনা সাহায্যে বাদশাহী ফৌজের সহিত লড়া অসম্ভব দেখিয়া তিনি ত্রিপুরারাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে গেলেন। সম্ভবত নিজের সৈন্য সামন্ত পশ্চাতে রাখিয়া তিনি মেহারকুল পরগণার উপর দিয়া অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লা শহরের নিকট দিয়া উদয়পুর রাজধানীতে পৌঁছিলেন। রাজার কাছে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে মন্ত্রীগণ প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর বাদশাহের সহিত বিরোধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে মহারাজকে বারণই করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরারাজের নিয়োগে অনেক পাঠান সর্দার ছিল। রাজমালায় লিখিত আছে যে এই রকম দুই পাঠান সর্দার তাজখাঁ বাজখাঁর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা ঈশা খাঁকে উজীরের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। ঈশা খাঁ কিন্তু বুদ্ধি করিয়া মহারাণী অমরাবতীর শরণাপন্ন হইয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে তাহার স্নেহ-কোমল মাতৃ-হৃদয় গলাইয়া ফেলিলেন। মহারাণী তাহাকে স্তনধৌত জল পান করাইয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে মহারাজের স্নেহ পাইতেও তাহাকে বেগ পাইতে হইল না। অমরমাণিক্য ঈশা খাঁকে মসনদালি খ্যাতি দিয়া তাহার সাহায্যার্থ ৫২০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন।[১৩]

এদিকে কিন্তু ত্রিপুরার সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই পাশার দান বদলাইয়া গিয়াছে! আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—ঈশা খাঁর পরাজয়ের পরে বাদশাহী সৈন্য যখন সরাইল-জোয়ানসাহিতে লুটতরাজে মত্ত এমন সময় মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিস প্রতাপ নামক এই অঞ্চলের দুই জমিদার সহসা ঐ অঞ্চলের নদীনালাগুলি হইতে অসংখ্য যুদ্ধনৌকা বাহির করিয়া বাদশাহী নাওয়ারা আক্রমণ করিলেন। এই দুই জমিদার জোয়ানসাহী ও খালিয়াজুড়ির জমিদার বলিয়া পূর্বে অনুমিত হইয়াছে। অমর মাণিক্যের অমরসাগর খননে যাহারা সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অষ্টগ্রাম ও বানিয়াচঙ্গের দুই জমিদারের কথা জানা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই। বানিয়াচঙ্গের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হবিবখাঁর এক পুত্রের নাম ছিল মজলিস আলমখাঁ (শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড—৩০ পৃষ্ঠা)। এই সময় এই অঞ্চলে মজলিস নামের যেন ছড়াছড়ি দেখা যায়। বাদশাহী সৈন্য আক্রমণকারী মজলিস প্রতাপ ও মজলিস দিলাওয়ার যে খালিয়াজুড়ি, জোয়ানসাহী (অষ্টগ্রাম) অথবা বানিয়াচঙ্গের জমিদারের মধ্যে হইবেন, এই কথা অনেকটা নিশ্চিততার সহিত বলা যায়। এই সময়ের আর এক জমিদারী "তরফ"—শ্রীহট্টের বিখ্যাত পরগণা। রাজমালা হইতে জানা যায়, উহার এই সময়কার জমিদারের নাম ছিল ফতে খাঁ।

মজলিসদ্বয়ের আক্রমণের সম্মুখে বাদশাহী নাওয়ারা দাঁড়াইতে পারিল না। বাদশাহী কোষার যোদ্ধা ও মাঝিমাল্লাগণ নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বাদশাহী ফৌজের অন্যতম অধ্যক্ষ মুহম্মদকুলী প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া পরাজিত ও বন্দি হইলেন। শাহবর্দি প্রাণ লইয়া পলাইলেন। বাদশাহী ফৌজের এমন পরাজয় বাংলাদেশে বোধ হয় আর হয় নাই। ত্রিপুরাধিপতির সাহায্য-সেনা লইয়া ঈশা খাঁ সরাইলে আসিয়া দেখেন, বাদশাহী ফৌজ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।[১৪] ঈশা খাঁ সানন্দে ত্রিপুরারাজকে বাদশাহী সৈন্যের ও নাওয়ারার পরাজয়-বার্তা লিখিয়া জানাইলেন।

এদিকে পরাজিত বাদশাহী ফৌজের ও নাওয়ারার ভগ্নাংশ যখন আসিয়া ভাওয়াল পৌঁছিল এবং এই বার্তাও শুনা গেল যে ত্রিপুরা মহারাজের অসংখ্য সৈন্য লইয়া ঈশা খাঁ সরাইল পৌঁছিয়াছে, তখন বাদশাহী সৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত খাঁ জাহান তাঁড়ায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আকবরনামাতে লিখিত আছে, প্রত্যাবর্তন-পথে টীলা গাজি নামে একজন জমিদার বাদশাহী সৈন্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই,—আবুল ফজলের ভাষায়—"বাদশাহের কর্মচারিগণের নিরাশার মধ্যাহ্নে বিজয়ের আলোক প্রকাশিত হইল।" চারিদিকে বিশিষ্ট জমিদারগণের মধ্যে এই টীলা গাজির সাহায্য না পাইলে এবার খাঁ জাহানকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই টীলা বা টালা গাজি বর্তমান তালেপাবাদ পরগণার মালিক ছিলেন। (J. A. S. B. 1874. P. 201 and Dacca Gazetteer. P. 24.) ভাওয়ালের মূল গাজিবংশের সহিত তাহার কি সম্পর্ক ছিল জানা যায় না। এই সময় ইব্রাহিম নাড়ালও নিজের পুত্রকে নানাবিধ উপহার সহ খাঁ জাহানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খাঁ জাহান মানে মানে তাঁড়ার নিকটে তিনি যে শ্রীহট্টপুর নামক দ্বিতীয় শহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তথায় ফিরিয়া আসিলেন—এবং আশ্চর্য 'দৈবানুকূল্য সম্বন্ধে শাহানসাহের নিকট বার্তা প্রেরণ করিলেন।' ভাবটা এই যে দৈব সহায় ছিল তাই ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি, নচেৎ ফিরিবার আর কোন আশাও ছিল না! এমন দেশেও যুদ্ধ করিতে লোকে যায়?

ভাটির যুদ্ধ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরেই ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খাঁ জাহান মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বিষয়ে আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"ভাটির যুদ্ধ হইতে সফলকাম (বিফলকাম?) হইয়া ফিরিয়া খাঁ জাহান শ্রীহট্টপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ের সারল্য আত্মসুখলিপ্সার উন্মাদনকরী মদ্যের নেশায় কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইমানের পর্দা ছিন্ন হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন... এবং জীবনের সূত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দেড় মাস যাবৎ উদর বেদনায় ভুগিয়া তিনি ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর পরলোক গমন করিলেন।"

সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক ব্লকম্যান সাহেব তাহার আইন-ই-আকবরীর প্রথম ভাগের অনুবাদে (৩৩ পৃষ্ঠা) আবুল ফজলের উপরিউদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, ঠিক সময়ে কালের আহ্বানে মহাপ্রস্থান করাতেই খাঁ জাহান বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন,—আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ইমানের পর্দা অব্যাহত রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইত। সেই আমলে বাংলাদেশে চাকরি শাস্তির সামিল বলিয়াই গণ্য হইত। তাহার উপর আবার দুর্ধর্ষ আফগানগণের সহিত মহামারী প্লাবিত বাংলাদেশে যুদ্ধ। আবার এমন নদী-নালা বিল সমাকুল স্থানে যুদ্ধ, সেখানে মোঘলগণের প্রধান বল অশ্বারোহীসৈন্য কোন কাজেই আসে না—নৌকাই যেথাকার প্রধান যুদ্ধোপকরণ। সেই নৌবহরের অধ্যক্ষ শাহবর্দিও বিদ্রোহী হইতে হইতে রাজভক্তির গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এদিকে মতির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া এবং বঙ্গদেশ লুণ্ঠন-লব্ধ অজস্র ধনদৌলত অশ্রান্ত বেগে মনটাকে আগ্রা দিল্লি অভিমুখী করিয়া আরাম আয়েসের দিকে ঠেলিতেছিল। এমতাবস্থায় শরিয়াতে যে ভূত চাপে নাই,—আবুল

ফজলের ভাষায় ইমানের পর্দা যে ফাঁক হয় নাই, তাহার জন্য আকবরের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিবার আবুল ফজলের কারণ আছে।

ভারতবর্ষ ১৩৩৬ আষাঢ় – অগ্রহায়ণ

১. বিজয় মাণিক্য ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। আইন-ই-আকবরীর প্রণয়ন শেষ হয় ১৫৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে বিজয়মাণিক্যের পরে ক্রমান্বয়ে অনন্ত (১৫৭১-৭২), উদয় (১৫৭২-৭৬) জয় (১৫৭৬) অমর (১৫৭৭-১৫৮৬) এবং রাজধর (১৫৮৬-১৬০০) এই পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে প্রত্যন্তরাজ্যগুলির বিবরণ সংগ্রহে আইন-ই-আকবরীতে অনেক পুরনো খবর স্থান পাইয়াছে। বাকলার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারিব।

২. ফিচ্‌ ১৫৮৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে সাতগাঁ পৌঁছেন এবং ২৮শে নভেম্বর শ্রীপুর হইতে ব্রহ্মদেশে রওনা হন। (Ralph Fatch. Horton Ryley. P. 99. III. 153.

৩. "About the time of Isa Khan, Sarail Pargana passed into the hands of the Dewan family, the first Zamindar Majlis Gazi, being of Isa Khan's family." Final Report on the Servey and Settlement Operations in the District of Tippera, 1915-1919. P. 76, para 139.

এই মজলিস গাজির পৌত্র মহম্মদের স্ত্রীর নির্মিত একটি মসজিদ সরাইলে আছে। উহার শিলালিপির ইংরেজি অনুবাদ এই —"In the reign of Badshah Aurangzeb known as Alamgir this mosque was built by the wife of Nur Muhammad, son of Majlis Sahaba z in the auspicious month of Ramzan in the year 1080H." Ibid P. 77. হিজরি ১০৮০ সন খ্রিস্টাব্দের ১৬৬৯-এর ১ জুন আরম্ভ হইয়াছিল। সাধারণত তিন পুরুষে ১০০ বছর ধরা হয়। কাজেই ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে জীবিত নূর মহম্মদের পিতামহকে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁর অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় জীবিত বলিয়া সহজরূপেই ধরা যায়। ইনি আকবরনামা কথিত দুই মজলিসের একজনের পুত্রও হইতে পারেন।

৪. ঢাকা জেলায় যখন জরিপ চলিতেছিল (১৯১৬ খ্রিঃ) তখন Settlement Officer শ্রীযুক্ত এস্কলি সাহেবকে এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্ভবত এই ভুল মুদ্রিত ম্যাপগুলি হইতে দূর করিতে হইলে বিস্তর ব্যয়বাহুল্য হইবে বলিয়া তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ময়মনসিংহের গেজেটিয়ার প্রণয়ণকারী Mr. F. A. Sachse মহোদয়ও দেখিলাম এই ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন—"The dried up bed between Atalia and Lakhpur (*Sic* Lakhipur) is wrongly called the Lakshya in the Revenue Maps This river (i.e. Lakhya) branches off from the Brahmaputra at Lakhpur " Mymensing Gazetteer. 1917. P. 7.

৫. জন-প্রবাদ মতে, কালিদাসের রামদাস নামে এক ভ্রাতা ছিল। পূর্ব ময়মনসিংহের কোন কোন কায়স্থ পরিবার রামদাস গজদানীর বংশধর বলিয়া দাবি করেন। এইরূপ একজন রামদাস গজদানীর বংশধর প্রসিদ্ধ চিত্র-পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি আমার পিতা ও খুল্লতাত মহাশয়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি নিম্নে তাহাই লিখিতেছি।

"রামদাস গজদানী ও কালিদাস গজদানী দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ রামদাস বাদশাহের বড় কার্যকারক (দেওয়ান) ছিলেন—দৈনিক পূজায় গজ দান করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তজ্জন্যই গজদানী উপাধিতে ভূষিত হন। কতকদিন পরে বাদশাহের বিরাগভাজন হইয়া (উভয়কে) দেশত্যাগী হইতে হয়। দুই ভ্রাতা সপরিবারে কিছুকাল বীরভূম জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে নিজ গুরুর সহ বাস করেন। হরিপুরেও নিশ্চিন্ত না হইতে পারিয়া গুরুকে সেখানে রাখিয়াই ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বর দি পরগণাস্থিত কেট্টাব গ্রামে আসিয়া বাসস্থান স্থির করেন। কিন্তু উহাতেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ রামদাস ও কনিষ্ঠ কালিদাস দুই ভ্রাতারই আকৃতি প্রকৃতি এক প্রকার ছিল এবং সুপুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে অনুসন্ধানে রামদাস কোথায় আছেন জানিতে পারিয়া গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হয় এবং কালিদাসকে রামদাস মনে করিয়া ধরিয়া দিল্লি নিয়া যান। তখনই রামদাস পুনঃ কেট্টাব পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহের নসিরুজ্জিয়াল পরগণার খাগুরিয়া গ্রামে বাস নির্দেশ করেন। ...রামদাস হইতে আমি ১৬ পুরুষ। কথিত আছে রামদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস দিল্লিতেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া কোন বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়া রহিয়া গেলেন। তাহারই পুত্র ঈশা খাঁ। ... ঈশা খাঁ বাংলা জয় করিয়া কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়ির বাসস্থান নির্দেশ করেন।

"মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ময়মনসিংহে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন ঈশা খাঁ বংশের কোন ধারাবাহিক

ইতিহাস নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া ইতিহাস লিখিতে বলেন। তখনই রামদাস গজদানীর নাম উল্লেখ না করিয়াই (ইতিহাসে) শুধু কালী গজদানীর বংশধরদের নামই লিখা হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমাদের বংশ ও জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান-বংশ যে এক বংশ তাহা ঐ বংশের সকলেই অম্লানবদনে স্বীকার করিতেন এবং প্রাচীন লোকদের মধ্যে সকলেই জ্ঞাত ছিল।"

আকবরনামাতেও কালিদাস গজদানীর ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া বিদ্রোহী হইবার কথা আছে। খালিয়াজুড়ি পরগণার সংলগ্ন পশ্চিমেই নাসিরুজিয়াল পরগণা।

কালিদাস মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। আকবরনামা মতে ঈশা খাঁ ও ইসমাইলের উদ্ধারকারী তাহার কুতবুদ্দিন নামে আর এক ভ্রাতা ছিল। কালিদাসের রামদাস নামে ভাই-এর কথা সত্য হইলে, দেখা যাইতেছে ইহারা তিন ভাই ছিলেন।

কায়স্থ পত্রিকায় ১৩২২ সনের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস মহলানবীশ মহাশয় 'গজদানি বংশ' নামক একটি প্রবন্ধে কালিদাসকে কালাপাহাড়ের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—এই একত্ব একেবারেই অসম্ভব। এই প্রবন্ধ মতে কালিদাস জ্যেষ্ঠ, রামদাস কনিষ্ঠ। খাগুরিয়া গ্রাম এবং গজদানীবংশের গুরুবংশ পূর্ণানন্দবংশের অধিষ্ঠান খাগুরিয়ার সংলগ্ন কাইটাইল গ্রাম থানা কেন্দুয়া হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে।

৬. এই হিসাবে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন বছর, অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন মামুদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে ঈশা খাঁর জন্ম হইয়াছিল। কালিদাস গজদানী গিয়াসুদ্দিনের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকিলে ঈশা খাঁর জন্ম ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন বৎসরই হইয়াছিল,—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৭. এই শকাব্দ রাজমালায় স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লিখিত নাই। এই সনাঙ্ক এই ভাবে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—

"যুবক হইল রাজা ষোড়শ বৎসরে।
রাজনীতি কর্ম দৈত্য নারায়ণের ঘরে।।" (নারায়ণে করে?)

রাজমালা—১২৯ পৃঃ

ইহা রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরবর্তী কথা। কাজেই ১৫/১৬ বছর বয়সেই বিজয় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষত ইহার পূর্বে বিজয়ের ছোট ভাই ইন্দ্র মাণিক্যকে রাজা করা হইয়াছিল।

সেইকালে নৃপে পাত্রে পুত্র সমর্পিল।
সাতচল্লিশ বর্ষে নৃপের বয়স হৈয়াছিল।।
সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে।
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হৈল শরীরে।।

তৃতীয় ছত্রের "সাতচল্লিশ বর্ষ" সাতচল্লিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত অর্থে ধরিতে হইবে। নচেৎ ৪৭ বর্ষে ৪৭ বর্ষই রাজ্যভোগ ধরিলে ১ বছর বয়সে রাজা প্রাপ্তি বুঝায়—বিজয়ের রাজ্য প্রাপ্তির বিবরণে কিন্তু তাহা বুঝায় না। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর অনন্ত মাণিক্য দেড় বছর রাজত্ব করেন—তাহাকে মারিয়া তাহার শ্বশুর ১৪৯৪ শকাব্দে রাজা হন। (রাজমালা—১৬৫ পৃঃ) কাজেই বিজয় মাণিক্য ১৪৯৩ শকে মারা গিয়াছিলেন এবং ১৪৯৩ - (৪৭—১৬)=১৪৬২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৮ প্রতিভা, চতুর্থ বর্ষ, ২৪৩ পৃষ্ঠা—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নন্দী লিখিত "পাঁচদোনার দেওয়ান দর্পনারায়ণ" নামক প্রবন্ধ।

৯ ত্রিপুরারাজের রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজ-কুমারের অনুমতিক্রমে অমর মাণিক্যের মুদ্রা দুইটির ছাপ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই অবকাশে উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১০. "The balance of probabilities, therefore lies in favour of the theory that the guns were cast before the battle (i.e. the battle with Manasinha, defeated in which Isa Khan is believed to have been taken to Delhi and given the Sanad for 24 Parganas and the title of Masnad-i-Ali. N. K. B.) and that Isa Khan possessed the titles of Dewan and Masnad-i-Ali —then. *** the title of Masnad-i-Ali must have been assumed by Isa Khan on his declaring his independence, just as the title Hazrat-i-Ala was assumed by one of his predecessors "Sulaiman Karrani". Dacca Review, 1911, P. 222.

১১. বেভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন—ইহা ঢাকা জেলার রণভাওয়াল। বেভারিজের নির্দেশ বোধ হয় ঠিক নহে; রণভাওয়াল ময়মনসিংহ জেলার পরগণা, আর খাঁ জাহানের তালিপাবাদের উপর দিয়া প্রত্যাবর্তন দেখিয়া মনে হয়—তিনি আসিয়াছিলেনও এই পথেই। এই পথে আসিয়া ঢাকা জেলার ভাওয়ালে আসিয়াই ছাউনি ফেলা সম্ভবপর, ময়মনসিংহের রণভাওয়ালে নহে। ভাওয়ালের গাজি জমিদারের রাজধানী ছিল লক্ষ্যা

তীরে বর্তমান কালীগঞ্জের সংলগ্ন চৌরা নামক স্থানে। টেইলার সাহেব বর্তমান নাগরীকে ভাওয়াল গ্রাম বলিয়াছেন। (Taylor, Topography P. 110)। নাগরী বর্তমান কালীগঞ্জ হইতে ৪/৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। রেনেলের মানচিত্রে যেখানে ভাওয়াল শহর অঙ্কিত আছে (৬নং মানচিত্র) তাহা নাগরী গ্রাম বলিয়াই বোধ হয়। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন কিন্তু নাগরীর অস্তিত্বই ছিল না। নাগরী বর্তমান কালে ঢাকা জেলাস্থ দেশীয় খ্রিস্টানগণের এক বড় উপনিবেশ। এই স্থান, এক মতে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে, এক মতে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান উপনিবেশে পরিণত হইয়া বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠে। (Mr. H. E. Stapleton's article in J. A. S. E. 1922, P. 50. f.n. 3 and page 51, para 1. Also "History of the Portuguese in Bengal" by J. A. Campos, P. 248) চৌরা (স্থানীয় লোকে উচ্চারণ করে 'চৈরা') বর্তমান কালীগঞ্জ হইতে সোজা এক মাইল উত্তরে এবং টঙ্গি ভৈরব রেল লাইনের আধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্টেশন আড়িখোলা হইতে দেড় মাইল পূর্বোত্তরে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গ্রামের নাম নূতনতম থানাম্যাপগুলিতে দেওয়া হয় নাই এবং চৌরার প্রকাণ্ড দীঘিটি বড়নগর গ্রামের অন্তর্গত দেখান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিন ভাওয়ালরাজের কালীগঞ্জ কাচারির নায়েব ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন, বড়নগর চৌরার অদূরবর্তী গ্রাম। (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, অগ্রহায়ণ, ১৩২১, ২৫৩ পৃষ্ঠা। "ভাওয়ালের গাজিবংশ নামক প্রবন্ধ। কাছেই চান্দাইয়া নামে এক গ্রাম আছে—চলতি কথায় লোকে চৌরার সহিত ইহার নাম যুক্ত করিয়া—'চৈরা চান্দাইয়া' বলে।

১২. The fort of Egarasindur must have commanded a very strong position when the Brahamputra flowed below its ramparts. The Brahamputra has now dried up to the narrowness of a canal and the whole of the old river-bed which is more than a mile broad is now under cultivation. But the grandeur of the position of Egarasindur can still be seen at a glance if one stands on the citadel of the fort, Occupying the apex of the angular price of land formed by the sharp bend of the Brahamputra, it was almost unassailable when the river was full. The now dried up channel called the Sankha river whose old bed can still be seen near Shah Jahan's mosque, also afforded protection. The earthen rampart of the fort still stands about 8 feet high in place and the buruz and the gateway still show traces of masonry construction... The town of Egarasindur must have been a very considerable one at the time of its highest prosperity. Toke on the opposite side was a big mart and seems to have been to Egarasindur, what Howrah now is to Calcutta.

"Notes on antiquarian remains on the Lakhya and the Brahamputra."
Dacca Review. Feb.—Feb.—March. 1917. P. 326-27.

১৩. ইছা খাঁয়ে সেইকালে মনে বিবেচিল।
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল।।
রাণী স্তন ধৌতজল ইছা খাঁ খাইল।
রাজা রাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল।।
সেই কারণ হৈল ইছা খাঁর তরে।
ইছা খাঁ মচলন্দানি খ্যাতি দিল পরে।।
ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল।
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল।।
* * * *
তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি।
সৈন্য সনে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি।
রাজমালা—১৯২ পৃষ্ঠা।

১৪. সৈন্যসনে বিদাল হৈয়া গেল শীঘ্রগতি।।
সরাইলে গিয়া সৈন্য রহিল তখন।
বঙ্গসৈন্য তত্ত্ব পাইয়া ভঙ্গ সেই ক্ষণ।।
এই বার্তা নৃপতিকে লিখে ইছা খাঁয়।
মহারাজা তুষ্ট হৈল এই যে বার্তায়।।
রাজমালা—১৯২ পৃঃ

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।।
বর-পুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।"

—ভারতচন্দ্র

ভূমিকা

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌবর-স্থল ; আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার দোষের একটা কথা ব্যতীত আর কিছুই জানি না, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি আর কী হইতে পারে? প্রতাপাদিত্য যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি একাকী লোক-বল প্রস্তুত করিয়া মোগল-সম্রাটের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; ইহা বড় সাধারণ কথা নহে। এরূপ অসাধারণ বাঙালির জীবনী প্রত্যেক বাঙালির জানা কর্তব্য ; এ জন্য আমরা প্রতাপাদিত্যের লীলাভূমি দেখিতে এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য গত পৌষ মাসে সুন্দর-বন প্রদেশে গমন করি। ঐ প্রদেশে গমন ও অবস্থাকালে মহারাজ বসন্ত রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা অন্নদাতনয় রায়, শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ; বিশেষত যশোহরেশ্বরীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহৃদয়তা আমি কখন বিস্মৃত হইব না।

প্রতাপাদিত্যের গুরু ও পুরোহিত মহাশয়ের বংশধর ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট আমি পরমোপকৃত, বিশেষত আঁধারমাণিকের ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট ঘটককারিকা প্রাপ্ত হওয়াতে আমি চির-কতৃজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, উক্ত কারিকা 'কায়স্থ-কারিকা' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত।

শ্রীসত্যচরণ শর্মা

উপহার-পত্র

স্বদেশ-হিতৈষী, কায়স্থকুল-তিলক, বঙ্গীয় সাহিত্য-বন্ধু,
টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী M.A.B.L..
মহোদয়ের কর-কমলে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ
প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত সাদরে
অর্পণ করা হইল।

গ্রন্থকার।

প্রথম অধ্যায়
মহারাজ প্রতাপাদিত্য

বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইবার উপক্রমকালে, পাঠান নরপতিগণের উচ্ছেদ ও মোঘলদিগের উদয়সময়ে, বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ প্রবল পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। এই দ্বাদশ নরপতির রাজ্য-বিভাগানুসারে পুরাকালে কখন কখন সমগ্র বঙ্গদেশ "বারোভাটি বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হইত।[১]

সেই রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতেন। তাহারা অনেক সময় প্রবল নৃপতিকে নামমাত্র রাজস্ব প্রদান করিয়া অধীনতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু যখনই অবকাশ পাইতেন, তখনই ভীম-বিক্রমে শত্রুকুল নির্মূল করিতে দৃঢ়ব্রত হইতেন। তাহারা জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন নিমিত্ত যুদ্ধস্থলে জীবন বিসর্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না—বীরপুরুষের ন্যায় তাহারা শরীর হইতে উত্তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করিয়া, যেন জন্মভূমির শত্রুপদস্পর্শকলঙ্ক পরিধৌত করিতেন। সেই সময় বীরপ্রসবিণী বঙ্গললনাগণও বীরাঙ্গনার ন্যায় স্বাধীনতারক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। তাহারা অমূল্য সতীত্বরত্ন যবনস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বীরপ্রসবিনী চিতোর-রমণী ব্যতীত ভারতের সর্বত্র নিতান্ত সুলভ নহে।[২]

সেই সকল ভৌমিক নৃপতি বর্তমানকালের হাস্যাস্পদ শক্তিশূন্য রাজা-মহারাজদিগের ন্যায় ব্যসনাসক্ত, স্বার্থচিন্তানিরত অথবা জীবন-বিহীন ছিলেন না। তাহাদিগের সৈন্যসকল সর্বদা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিত। তাহাদিগের রণপোতসকল বঙ্গোপসাগরবক্ষে সগর্বে বিজয়পতাকা উত্তোলন করিয়া শত্রু-আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিত। তাহাদিগের দেশজাত পণ্যদ্রব্যে বাণিজ্যপোতসকল পরিপূরিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পরিচালিত হইত। তাহাদিগের স্বদেশ-প্রেম সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া, স্বদেশরক্ষার্থ সকলকে মিলিত করিত। এই তিন শত বৎসরের মধ্যে আমাদিগের এরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, আমরা এরূপ দুর্বলহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদিগের অনুকরণ করা তো দূরের কথা, তাহাদিগের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে সকল বঙ্গীয় বীর, জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়াও সমুদ্রপথের নানাপ্রকার বিপদ অতিক্রমপূর্বক সিংহল-বিজয় করিয়াছিলেন ;[৩] শত শত শতাব্দীর পূর্বে যে জাতির জলযুদ্ধের কথা কবিকুলকীর্তি কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল,[৪] যে বাঙালি জাতি, কত দিবারাত্রি সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করায় কত দ্বীপ আবিষ্কার, কত নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন[৫], কত নূতন স্থানে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বীরজাতির কথা এক্ষণে অধঃপতিত আমাদির্গের নিকট কবিকল্পনা প্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। হায়! যে দেশবাসীর সমুদ্রপোত আরোহণ করিয়া চীনপরিব্রাজকগণ আপন দেশে গমন করিয়াছিলেন, সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকার সময় অতি নিপুণতার সহিত যাহারা নৌকাসকল রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সমুদ্রগমনভীরু আমরাই কি সেই দেশের অধিবাসী? কুরুক্ষেত্র-সমরে যে দেশবাসীর ভূজবল সাদরে গৃহীত হইয়াছিল,[৬] যে দেশের যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ দেশেও ধাবিত হইয়াছিল, যে দেশের জনগণের প্রবল প্রতাপে দিক্‌সকল প্রকম্পিত হইয়াছিল[৭], যে দেশের লোক বৈরনির্যাতন *জন্য* অত্যুচ্চ-পর্বতরাজী অতিক্রম করিয়া, কাশ্মীরমণ্ডলে উপনীত

হইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রাণ-পরিত্যাগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শত্রু-দেবমূর্তি নষ্ট করিয়া, আপনাদিগের অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা এবং যুদ্ধনিপুণতা প্রদর্শন করেন,[৮] যে দেশের অধিবাসী চির-তুষারাবৃত হিমালয়শিখর অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন প্রভৃতি প্রদেশ আপনাদিগের পাণ্ডিত্য ও প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহারা মুসলমান শাসনকালে অসাধারণ যুদ্ধনিপুণতাসহকারে স্বাধীনতা-সংস্থাপন ও আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্ত অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই জাতির বংশধর? যে সকল বিকারগ্রস্ত পুরুষ 'বাঙালিরা চিরকালই কাপুরুষ, মনুষ্যত্ববিহীন, শত্রু-পদ পূজক'—এইরূপ কথা কহিয়া থাকেন, সেই সকল অজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য আমরা কহিব,—বাঙলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পাঠানগণ অনেক যত্নেও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। বঙ্গে মোঘল আগমনের পরও ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঘোরতর পরাক্রমে মোঘলবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষ বৈভববিক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্রাটের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষ সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য হিন্দু-মুসলমান সকলকে ভ্রাতৃভাবে একত্র করিয়া, জননী জন্মভূমির অধীনতাপাশ-বিমোচন নিমিত্ত প্রচুর রুধিরধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যে পুরুষ মগ ও ফিরিঙ্গি আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করিয়া বৈদেশিক শত্রুগণকে দমন করিয়াছিলেন, যিনি ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের নিকট 'চণ্ডীখানের' অধীশ্বর বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন, তিনিই বঙ্গের গৌরবস্থল—মহারাজ প্রতাপাদিত্য।[৯]

প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের অন্তর্গত যশোর-নগরের অধীশ্বর ছিলেন। এই যশোরপ্রদেশ পুরাকাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ। অনেক পুরাণে যশোরনগরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতীর অঙ্গবিশেষ এ স্থানে পতিত হওয়াতে এ প্রদেশ বহু দিন হইতে তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।[১০] প্রতাপাদিত্যের সমকালে কবিরাম নামক একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া এ্যনাম-দেশ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি, 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়া, তাহাতে যে সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যশোরবর্ণনাকালে লিখিয়াছেন, "গোকর্ণ-কুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ-নামক এক জন ক্ষত্রিয়রাজা পশ্চিমদেশ হইতে এ স্থানে আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত বামাচারী ছিলেন। ধেনুকর্ণ যশোরেশ্বরীর নিকটস্থ নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া নগর স্থাপন করেন।" দিগ্বিজয়প্রকাশকার যশোররাজ্যের বিস্তৃতি কথনকালে ইহার "পশ্চিম সীমায় ছয়-যোজন দূরবর্তী কুশদ্বীপ নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বে ভূষা (ভূষণা), বাকলা এবং মধুমতী সরিৎ। উত্তরভাগে কেশবপুর এবং দক্ষিণে সুন্দরবন নির্দেশ করিয়াছেন।" মহারাজ বিক্রমাদিত্য, গৌড় পরিত্যাগ করিয়া, এ প্রদেশ অবস্থান করাতে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত যশোর-শব্দে হকার বৃদ্ধি হইয়া যশোহর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।"[১১]

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার জন্য অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাকবি শ্রীহর্ষ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক ও কবিকুলচূড়ামণি শ্রীহর্ষের সহিত তাহার ভৃত্য অগ্নিকুলোদ্ভব মহাবাহু বিরাট বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইনি বঙ্গের গুহবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। বিরাটের একাদশ পুরুষ অধস্তন রামচন্দ্র নিয়োগী নামে একজন দরিদ্র-পুরুষ পূর্ববঙ্গে বাকলাতে বাস করিতেন। দারিদ্র্যতায়-প্রপীড়িত রামচন্দ্র স্বীয় অবস্থাপরিবর্তনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামে গমন করেন। সে সময় সপ্তগ্রাম বর্তমান কালের শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয় নাই। তখন এ স্থানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবিকা-উপার্জনের জন্য সমবেত হইত ইউরোপীয় প্রভৃতি

বৈদেশিক নাবিকগণ, দিগ্‌দিগন্তর হইতে বাণিজ্যদ্রব্যে অর্ণবযান সকল পুরিপুরিত করিয়া, এ স্থানে আগমন এবং তাহার বিনিময়ে ভারতীয় বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশে গমন করিত। তৎকালে ইহার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া বৈদেশিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত। ভগবতী সরস্বতী তখন নানাদেশীয় অর্ণবযান সকল হাররূপে বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিতেন। সরস্বতীর অবনতির সহিত সপ্তগ্রামের অবনতির প্রারম্ভ হয়। যদি কখন বঙ্গে বেগবতী স্রোতস্বতীর আকারে সরস্বতী প্রবাহিতা হন, তখন যে আবার ভারতীয় বাণিজ্য স্বীয় প্রাধান্যকে প্রাপ্ত হইতে না পারিবে, তাহা কে কহিতে পারে?[১২]

রামচন্দ্র জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করত নানাপ্রকার পথক্লেশ অতিক্রমপূর্বক একাকী সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র শ্রীকান্ত ঘোষ নামক এক জন তাহার স্বদেশীয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া জীবিকা-উপার্জনের পন্থা-উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন। গৃহস্বামী, গৃহাগত কুলীন রামচন্দ্রের বুদ্ধি-মত্তা, নির্ভীকতা, অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হন। কালক্রমে তিনি স্বীয় কন্যার সহিত রামচন্দ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করান। এই বিবাহের সহিত রামচন্দ্রের ভাগ্যচক্রও পরিবর্তিত হইল। নিঃসহায় দরিদ্র যুবক বিপদসম্পদপূর্ণ বিদেশে একজন সহায় প্রাপ্ত হইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুর ও শ্যালক কর্তৃক সপ্তগ্রাম সরকারে কাননগুর কার্যালয়ে একজন লেখকের কর্মে নিযুক্ত হন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রামচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হন। পুত্রের জন্মোপলক্ষে তাহাদিগের বাসস্থান উৎসবময় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রগণকে ধনবিতরণ প্রভৃতি সদানুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না। যথাসময়ে নামকরণকালে নবকুমারের ভবানন্দ নাম রক্ষিত হয়। কালক্রমে রামচন্দ্রের শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামে অপর পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রত্রয় বাল্যকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মাতৃভাষা ব্যতীত সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষাও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালকত্রয়ের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দকে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং কর্মক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে স্বীয় কার্যালয়ে জনৈক লেখকের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

রামচন্দ্র যৎকালে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজ-কার্য সকল সম্পন্ন করিতেছিলেন, সে সময় গৌড় হইতে একজন ক্রূরপ্রকৃতির পাঠান সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। নিপুণতার সহিত কার্য করিলেও তিনি শাসনকর্তার কুটিল দৃষ্টিতে পতিত হন। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য উৎপন্ন হয় যে, রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া, স্বীয় কার্য পরিত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ হইলেও তাহার হৃদয় যৌবন-সুলভ উদ্যমে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নীরবে শাসনকর্তার অত্যাচার সহ্য না করিয়া, তাহার প্রতিবিধানের জন্য বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগরে গমন করিতে মনস্থ করেন। রামচন্দ্র অবিবেকী প্রভুর উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া, পুত্রকলত্র প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়-নগরে উপস্থিত হন। গৌড়নগর ও সময় বিশৃঙ্খলা পরিপূর্ণ। বঙ্গেশ্বর জালালউদ্দিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহার বালকপুত্রের বিরুদ্ধে তৎকালে নানাপ্রকার চক্রান্ত হইতেছে, সকলেই এই পরিবর্তনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। এরূপ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে রামচন্দ্র তাহার কতিপয় পূর্ববন্ধুর সাহায্যে একটি রাজকার্যে নিযুক্ত হন।

পাঠান নৃপতিগণের শীর্ষস্থানীয় সম্রাট শেরশাহর দেহাবসানের পর উনবিংশতি বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সিংহাসনে চারিজন ব্যক্তি অধিরোহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে মহম্মদ খাঁ সুর ও

তাহার পুত্র বাহাদুর শা, প্রভুশক্তির সহিত ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্রতা লাভ করেন। বাহাদুর বঙ্গবিহারের আধিপত্য লাভ করিয়া, ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলে তাহার ভ্রাতা জালালউদ্দিন গৌড়ের সিংহাসনে বৎসরত্রয় উপবেশন করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন। গৌড়াধিপের অকালমৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ একমত হইয়া তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে গৌড়রাজ্যে অভিষেক করেন। দুর্ভাগ্য বালক সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতে অল্প সময়ের মধ্যে গায়সুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। বঙ্গের এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় সুলেমান-ই-করসানী আলি হজরত অনায়াসে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করেন।

এই রাজবিপ্লবের কিছু দিবস পূর্বে রামচন্দ্র গৌড়নগরে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিবর্তনের সময় রামচন্দ্রের ন্যায় একজন কার্যতৎপর, উচ্চাভিলাষী, নির্ভীক পুরুষ যে সুলেমানের ন্যায় একজন অসাধারণ ব্যক্তির—যিনি সামান্য অবস্থা হইতে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া ও সকল শ্রেণির মানুষের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের চরিত্র অধ্যয়নপূর্বক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ একজন বিচক্ষণ নরপতির বিশেষ কৃপার পাত্র হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। রামচন্দ্র কর্মে নিযুক্ত হইয়া, কিছুদিন পরে পুত্রকলত্র-আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে সপ্তগ্রাম হইতে গৌড়ে আনয়ন করেন। সপ্তগ্রামের কর্ম পরিত্যাগ করাতে রামচন্দ্রের সৌভাগ্য সোপানের দ্বার উদঘাটিত হইল। স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়াতে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য করিতে প্রবৃত্তি হইলেন। ইহার সহিত বন্ধু-বান্ধবগণেরও অবস্থা পরিবর্তিত হইল। পরিচিত অপরিচিত কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রের করুণায় বঞ্চিত হইতেন না। রামচন্দ্র যে সময় সপ্তগ্রামে অবস্থান করেন, সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দের শুভ পরিণয়কার্য সম্পন্ন করেন। কালক্রমে ভবানন্দের শ্রীহরি নামে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইনি ভবিষ্যতে বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১৩] রামচন্দ্র ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামক কৃতবিদ্য পুত্রত্রয়কে রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃত্রয় সুভ্রাতৃভাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

সুচতুর সুলেমান বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আপনাকে অন্তঃ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য উত্তর ভারতবর্ষে উদীয়মান মোঘল-শক্তিনেতা উদারচেতা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, নানাপ্রকার উপহারসহ দিল্লিতে দূত প্রেরণ করেন। দূত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, সম্রাটসমীপে বঙ্গেশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সম্রাট তাহাকে অতিসমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। আকবর বিনা রক্তপাতে সুলেমানের বশ্যতায় অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সুলেমানও বিনা প্রয়াসে দিল্লিশ্বরের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া অধিকতর আনন্দিত হইলেন। সুলেমান এইরূপে উত্তরদিক হইতে রাজ্য-আক্রমণভীত মুক্ত হইয়া, রাজ্যশাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ এবং ইহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধের জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। পুত্রত্রয়সহ রামচন্দ্র এই সুযোগে আপনাদিগের কার্যনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা সুলেমানের হৃদয়ে অঙ্কিত করেন।

সুলেমান রাজ্য মধ্যে আপনার ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রধান শত্রু উড়িষ্যার রাজন্যবর্গকে উচ্ছেদ করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠান সেনানীর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া, উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। গঙ্গাবংশাবতংস মহারাজ মুকুন্দদেব ইতিপূর্বে অবরুদ্ধ গৌড়ের দ্বারদেশে ভল্লাঘাত করিয়া হিন্দু-ভুজবলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিবস পূর্বে তিনি অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশপূর্বক মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া, সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন ও ত্রিবেণীতটে সুপ্রশস্ত ঘাট নির্মাণ করিয়া, রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ

ও আপনার রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[১৪] এক্ষণে তিনি মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে পদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় সৈন্যগণসহ ঘোরতর বিক্রমে চতুর্দিক হইতে মুসলমানবাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন। উভয়পক্ষীয় বীরগণ ভৈরববিক্রমে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উৎকল-বীরগণ স্বদেশভক্ত বীরগণ, পূর্ববিজয় স্মরণ করিয়া আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, দেশের সাধারণশত্রুকে পদদলিত করিবার জন্য, জন্মভূমিকে অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, ঘোরতররূপে ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুসলমান বীরগণ হিন্দু বীরগণের বাহুবলে ও রণপাণ্ডিত্যে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে চতুর্দিকে পলায়ন করিলেন। সুলেমান স্বীয় সৈন্যের পরাভববার্তা অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হন এবং উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করিতে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করেন। এই সভাতে মুসলমান মন্ত্রিগণ কর্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে নূতনপরিগৃহীত-মুসলমানধর্ম জনৈক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণযুবক[১৫] মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"রাজন্! সেবক উড়িষ্যা বিজয় করিতে প্রস্তুত আছে। অধীনকে এ কার্যে নিযুক্ত করিলে, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা সম্পন্ন করিতে সে বিমুখ হইবে না।" সুলেমান মুসলমানধর্মে নবদীক্ষিত যুবকের কথায় আহ্লাদিত হইয়া, তাহাকে নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ ও সম্মানে বিভূষিত করিয়া, বিপুলবাহিনীর সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহাপুরুষ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়। ব্রাহ্মণকুলপাংশুল কালাপাহাড়, নবীন উদ্যমে পাঠানসৈন্য পরিচালনা করিয়া চতুর্দিক হইতে উড়িষ্যাদেশ আক্রমণ করিলেন। উৎকলবাসীরাও প্রতিপদে বীরপুরুষের ন্যায় পাঠানদিগকে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। জন্মভূমিভক্ত উৎকলবাসীদিগের অজস্র শোণিতপ্রবাহে উৎকলদেশের সমস্ত ভূমি আরক্ত প্রায় হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে যে সকল পাঠান যাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ সেই সকল পাঠান, কালাপাহাড় কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, তাহা সম্পন্ন করিল। যে গঙ্গাবংশীয় বীরগণ অসাধারণ ভুজবলে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাদিগের কীর্তিকলাপ দর্শকগণকে মোহিত করিয়া থাকে, যাহারা মুসলমানদিগের পরমনিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইতেন, আজ সেই গঙ্গাবংশ-নৃপতির পরাজয়ের সহিত উড়িষ্যার স্বাধীনতাসূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। আজ হিন্দুর বাহুবলে হিন্দুর রাজ্য বিধ্বংস হইল। স্বজাতি ও স্বদেশ-দ্রোহী কালাপাহাড়ের এই পাপ-কথা চিরকাল ধিক্কারের সহিত উচ্চারিত হইবে।[১৬] যত দিন এইরূপ রাজপ্রসাদলোভী কালাপাহাড়ের দল বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, ততদিন দেশের কল্যাণকামনা বিড়ম্বনামাত্র।

বহুদর্শী রামচন্দ্র এক্ষণে সাংসারিক উন্নতি চরম সীমায় উপনীত। এই সুখের দিবসে তিনি, পুত্রপৌত্রাদিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, পরমসুখে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভবানন্দ পিতার মৃত্যুর পর অতি সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিলেন। সুলতান সুলেমান রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে ভবানন্দকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভবানন্দও বিচক্ষণতাসহকারে রাজকার্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বঙ্গেশ্বরের স্নেহ ইহার প্রতি অধিকতর ঘনীভূত হয়। বঙ্গের সিংহাসনে সুলেমানের ন্যায় ন্যায়বান, কার্যতৎপর ও বিচক্ষণ নরপতি অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছেন। ইনি অতি অল্পকাল রাজত্বের মধ্যে যেরূপ সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেরূপ উদাহরণ মুসলমান-ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। ইনি রাজকার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য একশত পঞ্চাশৎ বিদ্বান ব্যক্তির সহিত একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন;[১৭] এই পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি রাজ্যশাসনবিষয়ক সুকঠিন প্রশ্নসকল সমাধান করিতেন। সুবিজ্ঞ সুলেমান ভবানন্দের প্রতিভা-পরিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, এই মন্ত্রিসমাজ মধ্যে তাহাকে এক জন সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন।

ভবানন্দ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া, রাজ্যের আয়-ব্যয় ও শাসনবিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি রাজ্যের অনাবশ্যকীয় ব্যয়সকল হ্রাস করিয়া, বহুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে বঙ্গের বাণিজ্য বিশেষরূপে উৎকর্ষ লাভ করে। সে সময়ে গৌড়েশ্বরের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সে সময় প্রজাসকল বিনাব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্ত হইত ও হিন্দু-মুসলমান সকলেই নির্বিবাদে প্রীতিভাবে কালযাপন করিত।

কালক্রমে শিবানন্দের জানকী-বল্লভ নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভবিষ্যতে ইনি বসন্তরায় নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং শিবানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ বাল্যকাল হইতে অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া, দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ইহারা উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হইয়া বাংলা, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য সুকুমারবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্তমানকালের বিলাসসাগর সংমগ্ন পরস্ত্রীদুগ্ধপালিত কুমারগণের ন্যায় সে সময় ধনবান্‌দিগের সন্তানগণ পালিত হইতেন না। ভ্রাতৃদ্বয় অল্পসময়ের মধ্যে অশ্বারোহণ, অস্ত্রব্যবহার ও মল্লবিদ্যায় পারগ হইয়া উঠিলেন। বালকদ্বয় বাল্যকাল হইতেই অধিকাংশ সময় রাজপুত্র বৈজিয়দ ও দাউদের সহিত সহবাস, অধ্যয়ন ও ক্রীড়া করিতেন। এই নিমিত্ত বালকচতুষ্টয় পরস্পর দৃঢ় মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। বিশেষত রাজকুমার দাউদ বালকদ্বয়ের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, এক সময় তিনি ক্রীড়াকালে শপথপূর্বক কহিয়াছিলেন,—"যদি আমি কখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগের দুই ভাইকে রাজ্যের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

৯৮১ হিজরী বা ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমান মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার বৈজিয়দ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে অদৃষ্টক্রমে বহুদিবস রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় ভগ্নীপতি নীচাশয় নিষ্ঠুর হুসো কর্তৃক নিহত হন। হুসো সপ্তাহমাত্র বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া, আমীর লোদী কর্তৃক নিহত হইয়া, স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেন। হুসোর মৃত্যুর পর সুলেমানের কর্মচারিগণ সকলে মিলিত হইয়া, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তাহার পূর্বকথা অনুসারে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে যথাক্রমে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি প্রদান করিয়া, রাজসম্মানে সম্মানিত করত প্রধান কার্যে নিযুক্ত করেন। দাউদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পিতৃপদবী অনুসরণ পূর্বক অল্পদিবসের মধ্যে লোকসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন ও শাসন করাতে রাজ্য মধ্যে অচিরকালেই সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। কোষাগারে দিন দিন ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছে, জনসাধারণ ও সৈন্যবর্গ তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া, হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রবলা বাসনা অঙ্কুরিত হন। তিনি দিল্লিশ্বরের অধীনতাপাশ মোচন করিয়া, স্বীয় নামে রাজ্যমধ্যে খুতবা[১৮] পড়িবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে মনস্থ করেন। যুদ্ধপ্রিয় দুরাকাঙ্ক্ষী পাঠান সেনানীগণ সুলতানের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দাউদ যখন দেখিতে লাগিলেন, ধনাগার পরিপূর্ণ, প্রজাসকল অনুরক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় দুই লক্ষ সর্বপ্রকার আয়ুধসম্পন্ন সৈন্য শত্রু দমন করিতে সমর্থ এবং বিংশতি সহস্র খণ্ড কামান শত্রুমস্তকোপরি অনবরত অগ্নিগোলক উদ্গিরণ করিতে প্রস্তুত,[১৯] তখন তাহার প্রতীতি হইল, এরূপ অবস্থায় অপর ব্যক্তির অঙ্গুলি পরিচালনার বশবর্তী হইয়া থাকার ন্যায় ঘৃণার বিষয় পৃথিবীতে আর কিছু নাই ; দুর্বল ব্যক্তিই অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বলবান্‌ ব্যক্তি আত্মরক্ষাবিষয়ে সমর্থ হইয়াও যদি পরাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতম জীব জগতে আর কে আছে? দাউদ মোঘলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পাঠান

মন্ত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই দাউদের অতিপ্রায়ানুসারে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিবার অভিমত প্রদান করেন। দাউদের আজ্ঞানুসারে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গসকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূরিত হইল, চতুর্দিক হইতে সৈন্যসকল সংগৃহীত এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দূরদর্শী ভবানন্দ দাউদের যুদ্ধবাসনা অবগত হইয়া, পরিজনবর্গকে আহ্বান করিয়া কহেন,—"দেখ, দাউদের যেরূপ মনোগত ভাব দেখিতেছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, মোঘলদিগের সহিত তিনি যুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না; এই যুদ্ধ কিন্তু একবার প্রজ্বলিত হইলে এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস না হইয়া সমাপ্ত হইবে না ; অতএব এরূপ সঙ্কটসময়ে সপরিবারে রাজধানীতে অবস্থান করা আমি কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। আমার বিবেচনায় কোন সুদূর, নিভৃত ও দুর্গম প্রদেশে আবাসস্থান নির্বাচন করিয়া, তথায় বাসস্থান নির্মাণ এবং পরিবারবর্গ ও ধনাধি প্রেরণ করা উচিত। রাজ্যবিপ্লবকালে দেশমধ্যে যেরূপ অরাজকতার অবস্থা উপস্থিত হয়, সেরূপ অবস্থাতে আমাদের বর্তমান রাজসম্মান আমাদিগকে কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। সে জন্য আমি বলিতেছি, ভগবান্ না করুন, আমাদিগের এ প্রভুতা চলিয়া যাইবার পূর্বে তোমরা কোন দুর্গম স্থান অন্বেষণ করিয়া, তথায় গৃহ নির্মাণ কর। যদি আমাদিগের পক্ষে জয় হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলের বিষয়।" ইত্যাদি কহিয়া, ভবানন্দ বিরত হইলে, সকলে তাহার কথা অনুসারে স্থান নির্বাচনের নিমিত্ত বঙ্গদেশের চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

লোকসকল নানা দেশ ও নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, তন্মধ্যে যিনি দক্ষিণপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণিত দেশে বাসস্থান নির্মাণ করিতে সকলেই অভিমত প্রদান করিলেন। ইহা যশোর প্রদেশ ; পূর্বে ইহা চাঁদ খাঁ মছন্দরী-নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের জায়গির ছিল। তাহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে বর্তমান কালে তাহা অস্বামিকরূপে পতিত আছে। এ প্রদেশ ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ; ইহার চতুর্দিক নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত। এই সকল নদী ভীষণকায় কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর প্রাণীর ক্রীড়ার স্থল। এ জন্য তাহা দুরবগাহ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দুর্গম স্থান সুরক্ষিত হইলে, তাহা সর্বথা শত্রুগণের অনতিক্রম্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বিচার করিয়া ভবানন্দ যশোর প্রদেশ দাউদের নিকট জায়গিরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তথায় গৃহনির্মাণের জন্য লোক সকল প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামরাম বসু প্রায় শত বৎসর পূর্বে লিখিয়াছেন,—"সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী-নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যস্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরীর আরম্ভ হইল। সদর মফঃস্বল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল। চতুষ্পার্শে গোলা গঞ্জ সদর বাজার নগর চাতর ও বাগবাগিচা। এইমতে সে স্থান দুই তিন বৎসরে অতি শোভান্বিত স্থান তৈয়ার হইল।" পরিজনগণসহ ভবানন্দ গৌড় হইতে নানাবিধ দ্রব্য সমভিব্যহারে নৌকাযোগে যশোর যাত্রা করিলেন। গৌড়ে কেবল মধ্যম ভ্রাতা পুত্রসহ শিবানন্দ এবং শ্রীহরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বঙ্গেশ্বর দাউদ মোঘলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মোঘল সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মোঘলরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য তিনি শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি অমাত্যগণসহ সসৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দাউদ আমীর লোদীর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া মোঘল সীমান্তপ্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। লোদী, খান্ যমান-স্থাপিত যমানিয়া নগর আক্রমণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস

করিয়া ফেলেন। এই সময় লোদীর সহিত যোনপুরের শাসনকর্তা মোঘল সেনানী মুনিম খাঁর একটি সামান্য সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। সুচতুর মুনিম খাঁ অল্প সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক আফগান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া লোদীর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। লোদী যে সময় মুনিম খাঁর সহিত সন্ধিবন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন, সে সময় দুই জন আফগান সেনানী লোদীর শিবির পরিত্যাগ করিয়া দাউদের কাছে উপস্থিত হন। ইহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম রাজু বা কালাপাহাড়, অপরের নাম জালাল খাঁ।

দাউদ সেনানীদ্বয়ের মুখে লোদীর কার্যকলাপ অবগত হইয়া তাহার কার্য তিনি সন্দিগ্ধভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দাউদের এইরূপ প্রতীত হইল যে, তাহার আত্মীয় এবং লোদীর জামাতা তাজ নামক জনৈক ব্যক্তিকে লোদী বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লোদীর ন্যায় একজন শক্তিসম্পন্ন সেনানী রাজশক্তি-উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, এ কথা অবগত হইয়া দাউদ শঙ্কিত হইলেন। কিরূপে লোদীকে সমূলে উৎখাত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনও করিতে লাগিলেন। তবাকত-ই-আকবরী প্রণেতা নিজামুদ্দীন আহমদ বলেন, কুতুল খাঁ ও শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের সহিত লোদীর মনোমালিন্য ছিল, লোদীকে কোনরূপে ইহলোক হইতে দূর করিতে পারিলে তাহারা যথাক্রমে উকিল ও উজির পদ লাভ করিতে পারিবেন, এই আশায় তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া লোদীকে নিহত করেন। তারিখ-ই-দাউদী প্রণেতা আবদুল্লা বলেন, বঙ্গেশ্বর দাউদ, লোদীকে একখানি মনোমুগ্ধকর পত্র লিখিয়া তাহাকে আপনার কাছে আহ্বান করেন, তারপর কতলু খাঁর প্ররোচনায় তিনি গৃহাগত লোদীকে শমন-সদনে প্রেরণ করেন। বহিঃশত্রুর সহিত বিবাদকালে দাউদ লোদীকে হত্যা করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। মোঘলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় লোদীর ন্যায় একজন বিচক্ষণ সেনানী বঙ্গেশ্বরের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকিলে দাউদকে বোধ হয় পরাভূত হইতে হইত না।

আকবর-সেনানী মুনিম খাঁ, দাউদকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পাটনার অপর পারে হাজিপুরক্ষেত্রে পাঠানদিগকে আক্রমণ করেন। এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য দিল্লিশ্বর আকবর বহু সৈন্য পরিচালনা করিয়া হাজিপুর ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। উভয়পক্ষে কতিপয় দিবসব্যাপী তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাতে গুজর খাঁ, কালাপাহাড়, সুলেমান, মানক্রী ও বাবু মানক্লী প্রভৃতি দাউদের সেনানী সকল অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মোঘলবাহিনী পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। দাউদের সৈন্য হাজিপুরক্ষেত্রে পরাজিত হইল, মোঘলসৈন্য বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া অমিত পরাক্রমের সহিত পাটনা-দুর্গ আক্রমণ করেন। আকবর-সেনানী বিজয়লাভ করিয়া, দাউদকে বিহ্বল করিবার জন্য যুদ্ধনিহত পাঠানগণের মস্তক নৌকাপরিপূর্ণ করিয়া, বঙ্গাধিপের নিকট প্রেরণ করেন।

দাউদ হাজিপুরের যখন পতনের কথা অবগত হইলেন, তখন তিনি পাটনায় অবস্থান করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া নিশীথরাত্রে নৌকা করিয়া গৌড়াভিমুখে গমন করেন। নৌকায় গমন করিবার পূর্বে তিনি তাহার বাল্যসখা পরম সুহৃদ বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিয়া যাবতীয় ধনরত্ন তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন। বিক্রমাদিত্য বঙ্গেশ্বরের বহুমূল্য ধনরত্ন নৌকা পরিপূর্ণ করিয়া দাউদের পশ্চাৎ অনুগমন করেন।[২০] সম্রাট আকবরের সৈন্যগণ তৎপরদিবস অতি প্রত্যুষে পাটনা-দুর্গ অধিকার করে। ৯৮৩ হিজরিতে সম্রাট পাটনা-দুর্গ হস্তগত করেন। পাটনা বঙ্গদেশের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং পাটনা অধিকারেই বঙ্গদেশ অধিকৃত হইয়াছে, এই সময় সূচিত করিবার জন্য মুসলমান ইতিহাসলেখক "মুল্ক-ই-সুলেমানজী দাউদ রফৎ" অর্থাৎ সুলেমানের রাজ্য দাউদ নষ্ট করিলেন, এই পংক্তিতে ৯৮৩ হিজরি সূচিত করিয়াছেন।[২১]

দাউদসেনানীগণ হাজিপুর ও পাটনাক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ মোঘল-বাহিনীকে পুনরাক্রমণ করেন। কিন্তু পাঠানগণের দুরদৃষ্টবশত তাহারা প্রতিক্ষেত্রে পরাজিত হইতে লাগিলেন। কালাপাহাড়, সুলেমান ও বাবু মানক্লী ঘোড়াঘাট[২২] অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য মুনিম খাঁ মাজন খাঁ-ই-কোয়াকসাল নামক সেনানীকে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কালাপাহাড় প্রভৃতি বীরগণ পুনরায় পরাজিত হইয়া, কোচবিহারে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইহারা এ স্থান হইতে মোঘলদিগের গতিবিধি গুপ্তরূপে অবগত হইতে লাগিলেন এবং অবকাশ প্রাপ্ত হইবামাত্র ঘোরতর বিক্রমে মোঘলগণের উপর পতিত হইয়া, তাহাদিগকে বিধ্বংস করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না।

দাউদ, সেনানীগণের পরাজয়বার্তা অবগত হইয়া, গৌড়েও অবস্থান অবিধেয় বিবেচনা করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে গমনের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) ও জানকীবল্লভকে (বসন্তরায়কে) আহ্বান করিয়া যে কথা কহেন, তাহা আমরা বসু মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—"আমার যে কিছু সম্পত্তি গৌড়ে আছে, তাহা সমস্ত একাদিক্রমে যশোরে চালান কর, পশ্চাৎ আনা যাইবেক।"... "এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র, বাদশাহের যতেক ধন স্বর্ণ রূপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতুদ্রব্য ও আর আর যে কিছু ছিল এবং প্রধান প্রধান সকল এবং তাহার আর সমস্ত চাকরদের যাবতীয় ধন এবং শহরবাসী লোকের ধান্য ও চাউল অবধি যাবতীয় সামগ্রী এবং লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্যন্ত লুট যাওয়নের ভয় প্রযুক্ত সমুদায়িক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল। ইহারা সহস্রাবধি বৃহৎ নৌকায় সামগ্রী বোঝাইয়া যশোরে চালান করিলেন, পরে গৌড় ধনহীন শহর হইয়া রহিল।"

মোঘলগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, অতি দ্রুতবেগে গৌড়াভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মুনিম খাঁ, গৌড়ে উপস্থিত এবং দাউদের পলায়নবার্তা অবগত হইয়া, মহম্মদ কুলি খাঁ, বারলাসকে দাউদের পশ্চাৎ অনুসরণের জন্য প্রেরণ করেন। কুলী খাঁ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মুনিম খাঁ কুলি খাঁর প্রত্যাগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া, স্বয়ং বিজয় বাহিনী পরিচালনা করিয়া, বহুক্লেশে উড়িষ্যায় দাউদের সমীপবর্তী হন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। দাউদ অসামান্য শূরতার সহিত যুদ্ধ করিলেও পরাজিত হন। মুনিম খাঁ, দাউদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া গৌড়নগরে প্রত্যাগমন করিলেন ; অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বঙ্গদেশের জলবায়ু তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়াতে তিনি জ্বরগ্রস্ত হইয়া গৌড়নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। আকবর-সেনানীগণের মধ্যে মুনিম খাঁর উড়িষ্যা আক্রমণ একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই অভিযানে তিনি যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যও লক্ষিত হয়।

দাউদ মুনিম খাঁর মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ঘোরতর বিক্রমে শত্রুকুল নির্মূল করিবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাহার সেনানী ও সৈন্যগণকে নির্দিষ্ট স্থানে এক সময়ে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দাউদ একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ভদ্রকের শাসনকর্তা নাজর বাহাদুরকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তিনি মোঘল-রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া, দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে দলবলও পুষ্ট হইতে লাগিল। উৎকলী, বাঙালি, পাঠান প্রভৃতি সৈন্যগণ দলে দলে তাহার পতাকার নিম্নে আগমন করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, মানক্লীদ্বয় প্রভৃতি সেনানীগণ আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন। আবার পরহস্তগত নষ্ট রাজ্য দাউদের আত্মাধীন হইল। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে দাউদ মোঘলগণকে পরাজিত করিয়া, আকমহল[২৩] দুর্গ হস্তগত করেন এবং তাহা সুরক্ষিত করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর খানজাহান হুসেন কুলি খাঁ নামক সেনানীকে প্রধান সেনানায়ক পদে নিযুক্ত করিয়া, বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। খানজাহান আমীরগণের অকর্মণ্যতা বশত প্রথমত দাউদের কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। আকবর কর্মচারিগণের কার্যশিথিলতা এবং খাজা আবদুল্লা নক্সা বন্দির মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, বিহারের শাসনকর্তা মজফ্ফর খাঁকে খানজাহানের সাহায্যের জন্য গমন করিতে আদেশ করেন।

মজফ্ফর খাঁ বহু সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে করিয়া, কুলি খাঁর সহিত মিলিত হন এবং আকমহল ক্ষেত্রে ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে দাউদ যে ব্যূহ রচনা করেন, বীরবর কালাপাহাড় তাহার দক্ষিণপক্ষ, মানক্রী বীরদ্বয় বামপক্ষ এবং তিনি স্বয়ং মধ্যভাগ পরিচালন করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথমেই শত্রুপক্ষ হইতে এক ভীষণ গোলক দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর জানাইদের উপরে নিপতিত হওয়াতে তিনি পঞ্চত্ব লাভ করেন। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও পাঠান ও বঙ্গীয় বীরগণ পরমোৎসাহে নিপুণতা পূর্বক, ভৈরব-বিক্রমে মোঘলগণকে বিপর্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দাউদের অদম্য পরাক্রম বীর্যবান পাঠানগণ মধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহাদিগকে দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিল। দাউদ অসাধারণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেও বিজয়লক্ষ্মী তাহার প্রতি অপ্রসন্না। যে সময় ঘোরতররূপে চতুর্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত, যে সময় মৃত্যুভয় বিরহিত পাঠানগণ স্বাধীনতা-সংরক্ষণ জন্য কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধনিরত, সেই সময় তাহাদিগের সেনানীপ্রবর কালাপাহাড় সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। দাউদ সৈন্য, কালাপাহাড়কে বিপন্ন দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। খানজাহান এই অবকাশে অধিকসংখ্যক সৈন্য সেই দিকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিপুল-পরাক্রমের সহিত দাউদকে আক্রমণ করিলেন। দাউদ, পলায়মান সৈন্যগণকে একত্র করিবার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে সকলকে আহ্বান করিয়া, মোঘলসৈন্য-বারিধিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাড়বানলের ন্যায় অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, শত্রু-হস্তে পতিত হন। এরূপ কথিত হয়, খানজাহান দাউদের শিরশ্ছেদন করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অদ্য পাঠানশক্তি বঙ্গদেশে দ্বিশত ষট্ত্রিংশৎ বৎসর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, চিরকালের জন্য সমাপ্ত হইল।

---

১. ১) যশোহর—প্রতাপাদিত্য। ২) চন্দ্রদ্বীপ—কন্দর্পনারায়ণ। ৩) শ্রীপুর (বিক্রমপুর)—চাঁদ রায়, কেদার রায়। ৪) ভূষণা—মুকুন্দরাম রায়। ৫) ভুলুয়া—লক্ষ্মণমাণিক্য। ৬) খিজিপুর—ঈশা খাঁ মসনদ আলি। (পিতার নাম কালিদাস)। ৭) ভাওয়াল—ফজেল গাজি। ৮) বিষ্ণুপুর—হাম্বীর মল্ল। ৯) তাহিরপুর—কংসনারায়ণ। ১০) দিনাজপুর—গণেশ রায়। ১১) পুঠিয়া। ১২) পাবনা।

২. যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন ঘোড়ানাচ নামক স্থানে দেপাল নামক একজন সমৃদ্ধিশালী রাজা বাস করিতেন। তাহার পরিবারবর্গ মুসলমান হস্তে পতিত হইবার ভয়ে নদী মধ্যে নিমগ্ন হন। সুবিখ্যাত বিভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন, পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত এক জন সমৃদ্ধিশালী জমিদার অধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, উচ্চ ছাদের উপর হইতে সন্তানগণকে নিক্ষেপ করিয়া, অবশেষে স্বয়ং নিপতিত হইয়া পঞ্চত্বলাভ করেন। এরূপ শত শত অলিখিত ঘটনা এখনও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। রাজা মুকুট রায় যুদ্ধে নিহত হইলে, তাহার কন্যা সুশীলা জলে নিমগ্ন হইয়া সতীত্ব রক্ষা করেন।

৩. সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ দেখুন।

৪. রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় দেখুন।

৫. যাবা প্রভৃতি দ্বিপে হিন্দু-উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই দ্বীপের শেষ হিন্দু স্বাধীন রাজার নাম শ্রীরাম। ইহারই সময় এই দ্বীপে মুসলমানদিগের অভ্যুদয় হয়।

৬. মুঙ্গেরে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপতি দেবপালের যুদ্ধাশ্ব

কাম্বোজপ্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। কাম্বোজ-দেশ সিন্ধুনদের উত্তরপশ্চিমদিগবর্তী। পুরাকালে ইহা অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

৭. Journ. As. Soc. Beng 1855 Part 1.

৮. রাজতরঙ্গিণী।

৯ Arracan. Chandican and Siripur are by Fernandez placed in Bangala, as so many Kingdoms—P. 3 "After which twelve of them joined in a kind of Aristocratic and vanquished the Mogolls, [it seems this was in the time of Emmaupaxda (হুমায়ুন বাদশা)] and still not withstanding the Mogolls Greatness are great Lords, specially he of Sripur and of Chandican"—P II. Early Travels in India. ইহা সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহার মধ্যে বঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। Du Jarric-এর Historic de Indes Orientales নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালাদেশে যে ১২ জন ভৌমিক (Boyons) ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলাপতি এবং চণ্ডিখাঁপতি, এই ৩ জন হিন্দু এবং অবশিষ্ট নয় জন মুসলমান ছিলেন। এই বারজনের মধ্যে ঈশা খাঁ এবং প্রতাপাদিত্য প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন।

১০. "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।"— পীঠমালা।

১১. দিগ্বিজয়প্রকাশ, যশোরদেববর্ণন, ৯২৯ শ্লোক হইতে দর্শন করুন। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডে অন্তর্বর্তী যশোর-দেশের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জেনারেল কানিংহাম বিবেচনা করেন, আরবী 'জশর' শব্দ হইতে যশোর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যশোর নদীপ্রধান প্রদেশ সুতরাং যশোর অর্থাৎ সেতু-নামে নগরের বা প্রদেশের নাম কল্পনা করেন।

১২. প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ সপ্তগ্রামকে মুসলমান সাম্রাজ্যের "বুলগাকখানা" অর্থাৎ বিদ্রোহীদিগের আড্ডা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

১৩. তবাকত-ই-আকবরী প্রণেতা নিজামুদ্দীন আহম্মদ তাহার গ্রন্থে শ্রীহরিকে ভ্রমক্রমে শ্রীধর বাঙালি এবং ইহার বিক্রমাদিত্য উপাধির পরিবর্তে বিক্রমজিৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১৪. একজন উৎকল কবি যবনজয়ী স্বদেশবাসী ভুজবঙ্গের কথা কীর্তন কালে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিয়াছিলেন যে, স্বামিবিয়োগ বিধুর রাঢ় এবং বারেন্দ্রভূমির যবনীগণের অঞ্জন-পরিধৌত অশ্রুজলে গঙ্গা যমুনার স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আজ তাহার 'ভাববাহী' নামে অভিহিত হইবে কি?

রাঢ়বরেন্দ্রযবনীনয়নাঞ্জনাশ্রুপুরেণদূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভকবণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ।।"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত নৃহিংসদেবের তাম্রলিপি।

১৫. ইনি ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন; জনৈক মুসলমান কন্যার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া, মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত হন। ইহার পূর্বনাম রাজু। যোনপুর অঞ্চলে আর একজন কালাপাহাড় ছিলেন। তিনি আমাদের বাংলার কালাপাহাড় হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬. বর্তমান কালেও উৎকলবাসীরা কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যের কথা কীর্তন করিয়া থাকেন। কালাপাহাড় উড়িষ্যার দেবদেবীর প্রতিমা ধ্বংস যে পরিমাণে করিয়াছে, এরূপ আর কেহ করে নাই। উড়িষ্যার আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখে কালাপাহাড়ের কীর্তিব্যঞ্জক নিম্নের কবিতাটি কীর্তিত হইয়া থাকে।

আইল কালাপাহাড়, ভাঙ্গিল লোহার বাড়।
খাইল মহানদী-পানি, স্বর্ণ থালিবে হেড়া পরশন্তি মুকুন্দস্করাণী।।

১৭. See Blochman's Ain-Akbari.

১৮. বাজেশ্বরের মঙ্গলার্থ নমাজবিশেষ। সুলেমানের সময় বঙ্গদেশে আকবরের নামে খুতবা পঠিত হইত।

১৯. Stewart's History of Bengal, 152 P.

২০. তবাকত-ই-আকবরী।

২১. তারিখ-ই-দাউদী প্রণেতা আবদুল্লা।

২২. বর্তমান রঙপুর জেলার অন্তর্গত।

২৩. বর্তমান রাজমহলের প্রাচীন নাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ-বিজয়ের পর মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল[১] নবোপার্জিত রাজ্যের শাসনকার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য দাউদের রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারিগণকে পূর্বের ন্যায় স্বীয় স্বীয় কার্যে নিযুক্ত করিবেন, এরূপ মর্মে ঘোষণাপত্র চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। দাউদের দুরবস্থার পর "বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়" সন্ন্যাসীর বেশে দেশের অবস্থা কিরূপভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখিবার জন্য বরেন্দ্রভূমিতে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। বিক্রমাদিত্য টোডরমলের ঘোষণাপত্রের কথা জ্ঞাত হইয়া, তাহা কতদূর কার্যে পরিণত হয়, ইহা অবগত হইবার জন্য তাহার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আকমহলে প্রেরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের প্রেরিত চর আকমহলে উপস্থিত হইয়া, রাজ্য টোডরমলের কার্যকলাপ সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিয়া পুনরায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং টোডরমল-সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিক্রমাদিত্যের কাছে নিবেদন করেন। বিক্রমাদিত্য টোডরমলের নিকট ভয়ের কোন কারণ নাই অবগত হইয়া, আকমহলে তাহার নিকট গমন করেন। গুণগ্রাহী টোডরমল বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে যথোচিত সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব-সম্বন্ধীয় জটিল জ্ঞাতব্য বিষয়সকল পরিষ্কাররূপে অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হন। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত করিয়া সুশৃঙ্খলাসহকারে রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য ইতিপূর্বে দাউদের নিকট হইতে যে জমিদারি প্রাপ্ত হন, তাহা তাহাদিগের অধীন থাকিবে, টোডরমল এই মর্মে সম্রাটের নিকট হইতে একখানি আদেশপত্র আনয়ন করিয়া দেন। "বঙ্গভূমে যশোহরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও তাহার পূর্বধার-ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহৎ রাজ্য তাহারা প্রাপ্ত হন।"[২]

বিক্রমাদিত্য যশোহর শাসনের নিমিত্ত বসন্তরায়কে তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং টোডরমলের সহিত বঙ্গের রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি অল্পসময়ের মধ্যে রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া, নূতন রাজধানী যশোহর নগরে গমন করিবার জন্য টোডরমলের আজ্ঞা-প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যানুসারে আপনাদিগের সেবা করিতে ত্রুটি করি নাই। নবাব দাউদের রাজত্বকালে আমি এ রাজ্যের একজন প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলাম, তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। যদিও তাহার অবসানের সহিত আমারও এ রাজ-সম্পদ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া, লৌকিক রীতি-অনুসারে আপনাদিগের আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে, জীবনের অবশিষ্ট সময় ঈশ্বর-উপাসনায় অতিবাহিত করিব।" ধার্মিক টোডরমল বিক্রমাদিত্যের ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার প্রদান করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে বিদায় প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য আকমহল হইতে নৌকাযোগে যথাসময়ে যশোহর নগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে নগর উৎসবময় হইয়া উঠিল। বসু মহাশয় বলেন, "তিনি বাংলার লোকদিগকে সেই সপ্তাহে লক্ষতঙ্কা বিতরণ করিলেন এবং সর্বত্র দেবালয়ে যাগযজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে দশ দিনের মধ্যে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন সাঙ্গ করান।" বিক্রমাদিত্য এইরূপে নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য করিয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যে সময় বঙ্গেশ্বর সুলেমান উড়িষ্যার স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য অজস্র শোণিতধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন, যে সময় উড়িষ্যার স্বদেশভক্ত বীরগণ প্রতিপদে মুসলমানগণকে বাধা দিয়া স্বদেশ রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন।[৩] ভবানন্দ পৌত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন, এবং অকাতরে যথেষ্ট পরিমাণে ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি পৌত্রকে অসাধারণ লক্ষ্মণসম্পন্ন অবলোকন করিয়া, নবকুমারের নামকরণকালে 'প্রতাপাদিত্য' নাম প্রদান করেন। প্রতাপাদিত্য পরম রূপবান ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি বাল্যকালে গৌড়নগরে অতিবাহিত করিয়া, সে সময় পুরস্ত্রীগণ যশোহরে গমন করেন, সেই সময় তাহাদিগের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরে অবস্থানকালেই বালক প্রতাপাদিত্য পারস্যভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তিনি অল্পকালের মধ্যে পারস্য-ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস করেন। প্রতাপাদিত্য যশোহরনগরে উপস্থিত হইয়া, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পৌরুষজনক বিদ্যাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হন। তিনি শরচালনা ও অশ্বারোহণে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না। প্রতাপ সম্বন্ধে এ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র গল্প কথিত হইয়া থাকে। এক সময় শরচালনাকালে কুমার উড্ডীয়মান একটি ক্ষুদ্র পক্ষীকে শরাঘাতে নিহত করেন। নিহত পক্ষী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হয়। শরবিদ্ধ পক্ষী কাহা কর্তৃক নিহত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া, যখন বিক্রমাদিত্য অবগত হইলেন যে, তাহার পুত্র কর্তৃক এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি প্রতাপাদিত্যকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহার কুকার্যের জন্য বহুবিধ ভর্ৎসনা করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ নিষ্ঠুরকার্য হইতে নিরস্ত থাকিতে আদেশ করেন।

প্রতাপের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান দেখিয়া বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এ পুত্র ভবিষ্যতে পিতৃদ্রোহী হইবে। বালকের বাল্যকাল হইতে এই সকল অদ্ভুত কর্মপরম্পরা অবলোকন করিয়া তাহাদিগের এ ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে থাকে। প্রতাপকে তিরস্কার করিতে হইলেই প্রতাপের গুরুজনেরা তাহাকে "পিতৃদ্রোহী" বলিয়াই যখন তখন ভর্ৎসনা করিতেন। প্রতাপের সুকুমার হৃদয়ে এইরূপে তাহার গুরুজন কর্তৃক পিতৃদ্রোহ-বীজ রোপিত হয় এবং ক্রমশ ইহা বিবর্ধিত হইয়া বিষমাকার ধারণ করে। বাল্যকাল হইতে প্রতাপ যদি এরূপ ভাবনাযুক্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে পিতৃহত্যাজনিত-পাপে লিপ্ত হইতে হইত না।

প্রতাপ বাল্যকাল হইতে সুলেমানের প্রাধান্যলাভ, তাহার উড়িষ্যা বিজয়, উড়িষ্যাবাসীদিগের প্রবল পরাক্রম, দাউদের মোঘলগণের সহিত যুদ্ধ, স্বাধীনতারক্ষার জন্য অসীম ক্লেশ স্বীকার, দাউদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তাহার পিতৃদেব বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধস্থলে বিক্রমপ্রকাশ, নবীন উদ্যমের সহিত দাউদের ঘোরতর যুদ্ধ ইত্যাদি বীরত্ব-বিষয়ক নানাপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয়কে স্বভাবতই যুদ্ধপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাঠানগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ ঘোরতর বিক্রমে মোঘলগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, মোঘলগণ পরাজিত হইয়া কিরূপ আত্মরক্ষা করিতেছে, পাঠানগণ অনুসৃত হইয়া কিরূপে পলায়ন করিতেছে, এরূপ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে—ইত্যাদি বিষয় প্রতাপ অভিজ্ঞ ও অভ্যাগতের নিকট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন।[৪] এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রতাপ বালক-হৃদয় বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য উদ্বিগ্ন হইল। বিদেশবাসী মোঘল-পাঠান বঙ্গ-রাজ্যের জন্য অবিরাম শোণিতধারা প্রবাহিত করিতেছে; আর দেশের হতভাগা অধিবাসীরা শৃঙ্খলিত হইবার জন্য নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে। বঙ্গীয়দিগের এই জড়তা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা

তাহার কোমল মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রতাপ সেই সুকুমার বয়সে আর এক জন ব্রাহ্মণকুমারের সহিত মিলিত হন, তিনিও কিরূপে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়, সেই দুর্বহ চিন্তায় আক্রান্ত হইতেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে পরস্পরবিদ্বেষী বঙ্গীয়গণের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়, এই সকল বিষয় উভয়ে একত্র হইয়া চিন্তা করিতেন। এই অসাধারণ বালকের নাম শঙ্কর চক্রবর্তী।[৫] বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত শঙ্করের চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়াতে উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন। তাহাতেই শঙ্কর প্রতাপের মনোরাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হন। শঙ্কর-সমাগমে প্রতাপের স্বদেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিস্পৃহা চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়িত। এই সময় আর একটি বালক ইহাদিগের সহিত মিলিত হন। তাহার নাম সূর্যকান্ত গুহ। প্রতাপ অধিকাংশ সময় এই সকল বন্ধুর সহিত সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যমধ্যে ভীষণকায় ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু সকল মৃগয়া করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রতাপ মৃগয়াকালে এরূপ অসীম-সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন যে, তাহা সচরাচর জনসাধারণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে যশোহরে আগমন করিলে পর তাহার পিতার দেহত্যাগ হয়। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতি যশোহরে আহূত হন, তাহারা সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া, বিপুল-পরিমাণে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক পরিমাণে অন্যান্য জাতিও যশোহরে আগমন করেন। বিক্রমাদিত্যের স্বজাতীয় এবং জ্ঞাতি-কুটুম্ব এ প্রদেশে না থাকাতে, অতিদূরতর প্রদেশ হইতে তাহারা অতি অল্প পরিমাণেই আগমন করেন। স্বজনের অভাব দূর করিবার জন্য বসন্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে স্বজাতীয়গণকে আনয়ন করিয়া, এ প্রদেশে বাস করাইবার জন্য বিক্রমাদিত্যকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য বসন্ত রায়ের এই সৎপ্রস্তাব অতি আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। তিনি বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ অতি সমাদরের সহিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যশোহর নগরে আনয়ন করিলে, বসন্তরায় স্বয়ং গমনপূর্বক আহুতগণের অভ্যর্থনা করিয়া, উপযুক্ত স্থানে তাহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ তাহাদিগের রাজ্য মধ্যে যিনি যথায় বাসস্থানের জন্য ভূমি-নির্বাচন করিলেন, তিনি তথায় উপযুক্ত পরিমাণে ভূমি বৃত্তিরূপে প্রাপ্ত হন। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ বহুল পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর ভূমি রাজসংসার হইতে প্রাপ্ত হন। বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী গ্রামে গ্রামে সংস্থাপিত হইল। অল্পদিনের মধ্যে এই বনস্থলী জনপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা বিক্রমাদিত্যের সমাজ বলিয়া সে সময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময়ে এক কবি নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যশোহরে উপনীত হইয়া তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"যশাহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো বসন্তঃ কালভৈরবঃ।।"

যশোহরপুরীর অতুচ্চ মন্দিরসকল কাশীর রমণীয়তাকে ও মণিকর্ণিকা নাম্নী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকার পূত সলিলকে অনুকরণ করে। অশেষ-শাস্ত্রবিৎ তর্কপঞ্চানন এই নগরের সাক্ষাৎ ব্যাসদেব এবং দোর্দণ্ড-প্রতাপ বসন্ত রায় এ স্থানের কালভৈরবের ন্যায় বিরাজিত হন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে লোকক্ষয়কর মহামারীতে বঙ্গের বিশাল রাজধানী গৌড়নগর শ্রীভ্রষ্ট হইলে পর বিপুল অরণ্যানীর মধ্যে এই নব প্রতিষ্ঠিত নগর দিন দিন যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে, তাহাতে ইহার যশোহর নাম নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। তৎকালে যশোহরনগরে গুণিজনের প্রধান আশ্রয়ভূমি ছিল। সকল প্রকারের গুণিজন এ স্থানে বিশেষরূপে আদৃত ও পূজিত হইতেন।

এই রূপে একটি নবীন সমাজ সংস্থাপন করিয়া বিক্রমাদিত্য অতি সমারোহের সহিত

প্রতাপাদিত্যের বিবাহের উদ্যোগ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে রাজধানীতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুণিগণ নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আগমনের সুবিধার জন্য নানা স্থানে নৌকা ও কর্মচারিসকল প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি রাজধানী গমন করিবেন, তাহাদিগের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, তাহার ব্যবস্থা ঐ সকল কর্মচারিগণ যত্নের সহিত করিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত জনগণের সম্মিলনে যশোহর আনন্দময় হইয়া উঠিল। সমাগত ব্যক্তিগণের প্রীতির জন্য নানা প্রকার ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া, সুমধুরকণ্ঠ গায়কগণ কর্তৃক জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের ভাবপরিপূর্ণ সুললিত সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। মৎস্য-মাংসবহুল অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রচুর-পরিমাণে অনুষ্ঠান হইল। এইরূপে মহা সমারোহের সহিত প্রতাপের বিবাহকার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিতগণ বিদায়কালে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে যাহারা এ প্রদেশে বাস করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন, তাহারা জীবিকার জন্য রাজসংসার হইতে যথেষ্ট-পরিমাণে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন, প্রতাপের এই জীবন-পরিবর্তনের সহিত তাহার চরিত্রও পরিবর্তিত হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতাপের অমানুষিক পরাক্রম, অসাধারণ উচ্চাভিলাষ, দলবদ্ধ হইয়া হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল গভীর অরণ্য মধ্যে সর্বদা মৃগয়া ইত্যাদি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিক্রমাদিত্য তাহার পুত্রের এই কার্যমধ্যে 'পিতৃদ্রোহিতা' যেন দিন দিন স্ফুটতররূপে দেখিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল বিক্রম, পাছে পুত্র হইতে ভ্রাতার কোন প্রকার অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে এক সময় বসন্ত রায়ের নিকট পুত্র-পরিত্যাগ বাসনা প্রকাশ করেন। ধার্মিকবর বসন্ত রায় এরূপ গুণবান সর্ববিদ্যা-সম্পন্ন পুত্র হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, এইরূপ কহিয়া ভ্রাতাকে এরূপ দুষ্ট সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করেন।

প্রতাপ যৎকালে গৃহে অবস্থান করিতেন, সে সময় তিনি রাজ্যের আয়ব্যয় ও শাসন-ব্যবস্থা অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সে সময় তিনি কঠোরভাব ধারণ করিতেন, সে সময় তাহাকে যমরাজ-প্রতিম বলিয়া বোধ হইত ; কিন্তু অন্য সময় তাহার মধুর বাক্য, সহৃদয় ব্যবহার দেখিলে, তাহাতে যে অণুমাত্র কঠোরতা আছে, তাহা বোধ হইত না। প্রতাপের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিক্রমাদিত্য পুত্রের সকল কার্যে সর্বদা তীক্ষ্ণতাই অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রের সকল কার্যে ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, যাহাতে সংসার মধ্যে কোনরূপ অশান্তি উৎপন্ন না হয়, সে জন্য তিনি প্রতাপকে কিছু দিবস দূরদেশে রাখিতে বাসনা করেন। দূরতর প্রদেশে কিছু দিন অবস্থান করিলে, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিয়োগজনিত বেদনা হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর করিয়া তাহার স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিয়া থাকে। বিক্রম এরূপ বিবেচনা করিয়া. আগ্রাতে তাহাদিগের কর্মচারীর পরিবর্তে প্রতাপকে প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করেন। আগ্রা সে সময় ভারতের রাজধানী। ইহা দূরতর প্রদেশে অবস্থিত, এখানে কিছু দিবস অবস্থান করিলে, কুমারের বহুদর্শিতা বহুল পরিমাণে বর্ধিত, বিদ্বদ্গণ-সমাগমে মনও উন্নত এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে। বিক্রমাদিত্য এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, বসন্ত রায়কে তাহার মনোগতভাব জ্ঞাপন করিয়া কহেন.—"প্রতাপ এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে এবং রাজকার্যেও প্রবীণতা লাভ করিতেছে ; এরূপ স্থলে আমি বিবেচনা করি, তাহাকে কিছুদিনের জন্য আগ্রাতে রাখিলে আমাদিগের সকলপ্রকার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।"

সম্রাট আকবর এক্ষণে ভারতসিংহাসনে অধিরূঢ়। তিনি যেরূপ গুণবান, ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী, সেরূপ বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতসিংহাসনে মুসলমান-নৃপতিগণের মধ্যে কেহ আরোহণ করেন নাই। সকল শ্রেণীর গুণিগণের তিনি উৎসাহদাতা। এ জন্য সকল দেশের গুণিজনসমাগমে তাহার সভাস্থলে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কুমার যদি প্রতিভাবলে সম্রাটের

করুণালাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ নানা প্রকার জল্পনা করিয়া, বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে আগ্রা-প্রেরণে স্থিরসঙ্কল্প হয়েন। বসন্ত রায় ভ্রাতার এ প্রস্তাবে বিনীতভাবে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"কুমার বুদ্ধিমান হইলেও এখনও অপরিণতবয়স্ক। এরূপ অবস্থায় তাহাকে দূরতর প্রদেশে প্রলোভনবস্তু পরিপূর্ণ রাজধানী মধ্যে প্রেরণ করা কি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন? রাজপুরুষগণ আপন-আপন পক্ষের প্রভুতারক্ষার জন্য কিরূপ কূটনীতি অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা আপনি বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। যদি কুমার এইরূপ কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিপদগ্রস্ত হয়, তখন তাহাকে কে রক্ষা করিবে? যদি বা প্রতাপ সম্রাটের কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন অন্যের ঈর্ষা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে কি সে সমর্থ হইবে?" এই সকল বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রায় কুমারের আগ্রা গমনে বাধা প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিলে, তাহার পিতৃদ্রোহিতা বিলুপ্ত হইবে বিবেচনা করিয়া বসন্ত রায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পুত্রের আগ্রা গমনের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করেন। বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুসারে প্রতাপকে আগ্রা যাইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ পিতৃব্যের আদেশানুসারে আগ্রা-গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৌকাসকল সজ্জিত হইল ; শঙ্কর, সূর্যকান্ত, সুন্দর প্রভৃতি সহচরগণ আগ্রা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ নির্দিষ্ট দিবসে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে অভিবাদন করিয়া, সহচরগণসহ নৌকাতে আরোহণ করিলেন। যশোহরের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ইহাদিগের বিদায় দেখিবার জন্য যমুনার তটে সমবেত হইলেন। কুমার ভক্তিপূর্ণ ও সস্নেহ বাক্যে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা করিয়া নৌকাযোগে আগ্রা যাত্রা করিলেন। মহারাজ বসন্ত রায় প্রতাপের সহিত পদ্মা পর্যন্ত গমন করিয়া, তাহাকে বিদায় প্রদান করিয়া যশোহরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রতাপ পিতৃব্যের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে আগ্রা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তাহার এরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল যে, তিনি পিতৃব্যের চক্রান্তেই জনক-জননী ও জন্মভূমি-বিচ্যুত হইলেন। পূজনীয় পিতৃদেব পিতৃব্য কর্তৃক চালিত। পিতৃব্যই তাহার বিরুদ্ধে পিতার হৃদয়ে বিজাতীয় বিদ্বেষভাব রোপণ করিয়াছেন ; পিতৃব্যই গোপনে তাহার উচ্ছেদ-বাসনা পোষণ করেন। তাহার প্রতি তিনি যে স্নেহ প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ বাহ্যিক এবং কপটতা-পরিপূর্ণ। প্রতাপ এই সময় হইতে বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ ভ্রমধারণা হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রতাপ সহচরগণসহ গঙ্গবক্ষে নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বঙ্গের ভূতপূর্ব রাজধানী গৌড়নগরে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের আর পূর্বশ্রী নাই।[৮] খ্রিস্টের জন্মগ্রহণের কত শত বৎসর পূর্ব হইতে যে নগর ভারতের অন্যান্য নগরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে, যে নগরের অতুল সমৃদ্ধির কথা পাশ্চাত্য-নরপতিগণের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইত, যে নগর কখন লক্ষ্মণাবতী, কখন বা জেন্নিতুয়াবাদ[৯] নামে অভিহিত হইয়াও স্বীয় প্রাচীন নাম পরিত্যাগ করে নাই, যে নগর দৈর্ঘ্যে অন্যূন ৭/৮ ক্রোশ এবং প্রস্থেও প্রায় সার্ধক্রোশ-পরিমিত ছিল, আজ তাহা জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যে নগরের রাজপ্রসাদ, বিস্তৃত রাজপথ, নগরদ্বারা ও প্রাকার এবং উপাসনা-গৃহ-সকল ভারতে অতুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত, যাহার কারুকার্য এখনও দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, সেই নগর হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। যথায় নাগরিকগণ উৎসব-নিমগ্ন হইয়া ক্রীড়া করিত, এখন তথায় চতুর্দিক নরকঙ্কালপরিপূর্ণ হওয়াতে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য জীবন ক্ষণভঙ্গুর! ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও মানব স্বাধীনতারক্ষার জন্য উদ্যমশীল, জন্মভূমিরক্ষার জন্য অসীম পরাক্রম, অথবা দিগ্‌দিগন্তরে স্বজাতীয় কীর্তিপরম্পরা ঘোষণা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত কেন না হন, ইহা বড়

আশ্চর্যের বিষয়। কয়েক মাসের মধ্যে কত সহস্র লোক মানবলীলাসংবরণ করিলে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যদি সেই সকল ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর শরীরের আশা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর শান্তির জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া, সমরানল প্রজ্বলিত করিতেন, তাহা হইলে তাহারা সমগ্র ভারতের অদৃষ্টচক্র যুগ-যুগান্তরের জন্য পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইতেন। তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য সেই সকল মহাত্মার পবিত্র নাম প্রত্যেক নরনারী কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। কমলদলগত জলবিন্দুর ন্যায় এ জীবন অত্যন্ত চঞ্চল, ইহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করিয়াও কেন যে মনুষ্যগণ পরাধীনতার তীক্ষ্ণ-অঙ্কুশযাতনা ভোগ করে, কেন যে অবিবেকী প্রভুর নির্দয় কশাঘাত সহ্য করে গৃহ শস্যপরিপূর্ণ হইলেও কেন যে উপোষণে দীনের ন্যায় দিনযাপন করে, তাহা বুঝি না। প্রতাপ সহচরগণসহ এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। গৌড়নগর বিধ্বংস হইবার পর মোঘলকর্মচারিগণ রাজধানী পরিবর্তন করেন। প্রতাপ এ স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া আবার গন্তব্য অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহারা পাটনা নগরে উপস্থিত হন।

ইহাই প্রাচীন পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর। এই স্থানে নন্দবংশীয় মহারাজগণ প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কূটনীতিবিশারদ চাণক্য অলৌকিক কৌশলে এই স্থানেই নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন; এই স্থান হইতে মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মবুদ্ধি অশোক-প্রেরিত ধর্মপ্রাণ শ্রমণগণ, নানাপ্রকার অচিন্তনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মিশ্র, তুরস্ক, রুশ, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন, পূর্ব-উপদ্বীপ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশের ধর্মবিবর্জিত পশুপ্রায় মনুষ্যসমাজ মধ্যে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্মের সার্বভৌম প্রেম ও উপাদেয় উপদেশ সকল অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উপবেশন করিয়া, প্রাণিজগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাভাগ প্রিয়দর্শী স্বীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে রুগ্ননিবাস সংস্থাপন এবং উপদেশপরিপূর্ণ শাসন বাক্য সকল শিলাতলে ক্ষোদিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। মহাবীর আলেকজান্ডার যখন নানাদেশ পরাজয় করিয়া, বিজয়বাহিনীসহ উত্তর-ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন এই প্রাচীন মগধ রাজ্যের ভুজবল ও ঐশ্বর্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার সৈন্যগণ মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল—ইত্যাদি প্রাচীনকথা সকল প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাহাদিগকে অভূতপূর্ব আনন্দে পূরিত করিতে লাগিল। তাহারা পাটনায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র অনবরত গমন করিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে তাহারা কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় তাহারা পুণ্যকৃত সকল সম্পন্ন করিয়া চরণাদ্রিদুর্গের (বর্তমান চুনার) পাদদেশে উপস্থিত হন। এই দুর্গকে অনেকে বঙ্গের দ্বারস্বরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন। মহাকবি ভর্তৃহরি রাজ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ পূর্বক, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, এই স্থানের যে নিভৃত-গিরিগহ্বরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি তাহা দর্শন করিয়া শের শাহ প্রভৃতির সহিত কিছুদিন পূর্বে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই সকল বিষয়ক নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে বিন্ধ্যাচল-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যস্থানে তাহারা ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর পূজনাদি সমাপন করিয়া, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থে গমন করেন। কালিন্দীর কৃষ্ণজলরাশি গঙ্গার নির্মল সলিলের সহিত মিলিত হওয়াতে যে অপূর্ব দৃশ্য উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার উৎফুল্লনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ স্থানে তাহারা কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তাহারা গঙ্গার বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনার তটে কোন স্থানে হরিণযূথ সতর্কতার সহিত বিচরণ করিতেছে, ময়ূর-ময়ূরীদল কোন স্থানে দলবদ্ধ হইয়া, বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে কেকাধ্বনি

করিতেছে, কোথাও বা তাহারা পুচ্ছজাল বিস্তার করিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিতেছে, কোথায় বা কূর্মকুল, কোথায় বা কুম্ভীরদল শাবকগণসহ আতপতাপে পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত করিতেছে, কোন স্থানে সারস সকল আহার অন্বেষণ, বাল-হংস, মৎস্যরঙ্গ, বক প্রভৃতি পক্ষিসকল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি স্বভাব-শোভা দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা চারিমাস জলপথে অতিবাহিত করিয়া, নির্বিঘ্নে আগ্রা নগরে উপস্থিত হন। আগ্রা সে সময়ে ভারতের রাজধানী ছিল। সম্রাট সে স্থলে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন ; এজন্য ভারতের নানা প্রদেশের নানা লোক-সমাগমে এখানকার সুপ্রশস্ত রাজপথ পরিপূর্ণ থাকিত। প্রতাপ আপনাদের কর্মচারী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, এক সুরম্য অট্টালিকাতে অবস্থান করিলেন।

প্রতাপ পথিক্লেশ দূর করিয়া, এক দিন সুমুহূর্তে নানাবিধ বহুমূল্য উপহারদ্রব্য সঙ্গে লইয়া সম্রাটের দর্শনার্থ গমন করেন। প্রতাপ দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাট হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা জাতীয় বিদ্বানগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্রাট দেখিতে নাতিখর্ব, বরং একটু দীর্ঘভাবাপন্ন, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার শরীর সুদৃঢ় এবং সুবিভক্ত, কপাল ও বক্ষ উন্নত, হস্ত ও ভুজদ্বয় দীর্ঘ। সম্রাটের নাসিকার বামভাগে মাংসময় মটর-সদৃশ আঁচিল থাকাতে তাহার মুখশ্রীকে অধিকতর সুন্দর করিয়াছে। তাহার স্বর গম্ভীর এবং কথাগুলি সুমধুর। তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত, যেন তিনি ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। সম্রাট স্বনামলিখনে[১০] অনভিজ্ঞ হইলেও পণ্ডিতজন-সহবাসজনিত তাহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, তিনি অতি নিপুণতার সহিত পদ্যাদির দোষগুণ বিচার করিতে পারিতেন। আকবর এরূপ সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন যে, অতি অল্পলোকেই তাহার ধর্মমত অবগত ছিলেন। তিনি যখন তিলক পরিয়া মালা লইয়া রাখী-পূর্ণিমার দিন রক্ষা বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণসহ শাস্ত্রালাপ করিতেন, তখন তাহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হইত। আবার যখন গোয়া হইতে পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণকে অতি সমাদরের সহিত আনয়ন করিয়া তাহাদিগের কাছে খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্ব সকল অবগত হইতেন, তখন তিনি খ্রিস্টিয় 'ক্রুশ' অতি সম্মানের সহিত রক্ষা করিতেন, সে সময় তাহাকে পাকা খ্রিস্টান বলিয়া বোধ হইত। সম্রাট প্রতাপের আগমনকথা অবগত হইয়া, তাহাকে যথোচিত সম্মানসহ গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

আকবরের বিরাট সভা দেখিবার পর হইতেই প্রতাপের হৃদয় মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল বেগে উপস্থিত হইল। মধ্য এশিয়া হইতে কতকগুলি মুষ্টিমেয় বীরপুরুষ আগমন করিয়া, অসি বলে ভারতবাসীকে পরাজয় করিয়া, তাহাদিগের অতুলনীয় ধনে ধনবান হইয়াছে। কিরূপে এই পরাজিত জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কোন উপায়ে পুনরায় হিন্দুগৌরব, হিন্দু-প্রাধান্য, হিন্দুভুজবল এবং হিন্দুসাম্রাজ্য-সংস্থাপন জন্য সকলে এক হইয়া কার্য করিতে সমর্থ হয়, এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে গাঢ়তররূপে উপস্থিত হয়। কিরূপে পরস্পর আচারব্যবহার, পরিচ্ছেদ ও ভাষাবিভিন্ন হিন্দুগণ একমত হইয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিরূপে হিন্দুগণ আত্মমর্যাদা বুঝিতে পারিয়া, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধস্থলে শত্রুকুলমন্থনে প্রবৃত্ত হয়, তিনি বন্ধুগণসহ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতাপ যখন শ্রবণ করিতেন, রাজপুতনায় প্রবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাজপুতগণ প্রতিপদে প্রতিহত হইয়াও, যখন মোঘলবাহিনীকে নিপীড়ন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না, তখন তাহার ঘোরতমসাবৃত হৃদয়াকাশে এক একবার আশা বিদ্যুৎরেখা প্রবাহিত হইত। আবার যখন তিনি দেখিতেন, মানসিংহ ভগবানদাস, বিহারী মল প্রভৃতি রাজপুতগণ সম্রাটের নিকট বহুল পরিমাণে সম্মান

ও আধিপত্য লাভ করিলেও যখন যবন-সম্বন্ধ নিবন্ধন আপামর হিন্দু কর্তৃক ধিকৃত, নিন্দিত ও ভর্ৎসিত হইতেছেন, তখন তাহার মনে আশার সঞ্চার হইত যে, হিন্দুগণ এখনও জীবনবিহীন হয় নাই। প্রতাপ যখন দেখিলেন, মহামতি টোডরমল অসাধারণ প্রতিভাবলে মোঘলরাজ্যের রাজস্ব-সংস্কার করিতেছেন; মানসিংহ, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুসেনানীগণের ভুজবলে মোঘলরাজ্যের সীমা চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া মনে করিতেন, যদি কখনও ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া হিন্দুর রাজ্য হিন্দুকে পুনরায় প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহারা সুচারুরূপে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

প্রতাপ আগ্রাতে অবস্থানকালে মোঘল-সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি বিষয় সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকের অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান কর্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ সম্রাটের দরবারে গমন করিতেন, এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে প্রতাপ আমীরগণের স্নেহপাত্র হন।

এক সময় সম্রাট আকবর, নানাপ্রকার কথোপকথনকালে সভ্যগণকে একটি সমস্যা জিজ্ঞাসা করেন। সমাগত সভ্যগণ, সকলেই এক একটি কবিতা রচনা করিয়া সমস্যাপূরণ করেন; সম্রাটের কিন্তু কোনটাই মনোনীত না হওয়াতে তিনি পুনরায় ইহা পূরণ করিতে আদেশ করেন। প্রতাপাদিত্য স্বীয় প্রতিভা-প্রদর্শনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া, সম্রাটের সন্নিকট গমন করেন এবং যথাযথ অভিবাদনপূর্বক কহিলেন "জাঁহাপনার আজ্ঞা হইলে এ সেবক সমস্যাপূরণ করিতে পারে।" হৃৎতত্ত্বজ্ঞ সম্রাট এক জন উন্নত-ললাট, প্রশস্ত-বক্ষ, দীর্ঘ-কায়, আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদধারী যুবককে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া সমস্যাপূরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ সম্রাটের আজ্ঞায় উৎফুল্ল হইয়া সমস্যা-পূরণ করিলেন।[১১] প্রতাপের পাদপূরণ সম্রাটের মনোনীত হওয়াতে তিনি তাহাকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। অদ্য হইতে প্রতাপ সম্রাটের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন; ইহার সহিত তাহার ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের পথ উদঘাটিত হইল। প্রতাপ স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আকবরের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কিরূপে নীতি অবলম্বন করিয়া দুর্জয় পাঠানগণকে পরাস্ত করিতেছেন, কোন্ নীতি অনুসারে বিশাল ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কোন্ নীতিবলে মুষ্টিমেয় মোঘল-সৈন্য লইয়া কোটি কোটি ভারতবাসীকে পদদলিত করিতেছেন, প্রতাপ এই সকল বিষয় লক্ষ্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রতাপ যতই মুসলমানদিগের শাসন-নীতি অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তিনি বুঝিতে লাগিলেন, মোঘলেরা যাদুবলে এই বিশাল রাজ্য শাসন করিতেছে, ইহাতে তাহার স্বাধীনতা-প্রাপ্তি-স্পৃহা বলবতী হইয়া তাহাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। প্রতাপ যে সময় আগ্রায় অবস্থান করেন, সে সময় তিনি অবকাশক্রমে বন্ধুগণসহ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তিনি পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যথেষ্টরূপে নানাবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন।

প্রতাপ বন্ধুগণসহ নানাদেশ পর্যটন করিয়া পুনরায় সম্রাটসমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে প্রতাপ ও শঙ্কর ভারতের রাজধানী, মোঘল-গৌরবের কেন্দ্রভূমি আগ্রা নগরীতে অবস্থান করিয়া মোঘল-সাম্রাজ্য বিধ্বংসের পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন। কি উপায়ে মুসলমান-রাজশক্তি ভারত হইতে দূরীকৃত, অন্তত বঙ্গদেশ হইতে নিষ্কাষিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিরূপে আবার হিন্দুগণ পুনরায় আপনাদিগের প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয়,

তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচতুর আকবর যেরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন, এরূপভাবে ইহার সন্ততিগণ যদি রাজ্যপালন করেন, তাহা হইলে মুসলমানরাজ্য যে আবার বহুকালের জন্য ভারতে দৃঢ়মূল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ সাধারণতই ধর্মভীরু ও অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। সম্রাট হিন্দুচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রায় অর্ধ-হিন্দু হইয়াছেন, ইনি হিন্দুদার-গ্রহণ করিয়া হিন্দুহৃদয়ে যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, ইহার সন্ততিগণও যদি এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ অচিরকালমধ্যে যে যবন সংসর্গ-দুষ্ট হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হিন্দু-কুলাঙ্গার, পাপিষ্ঠ বিহারীমল[১২] রাজসম্মানলাভের জন্য যেরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি অপরপক্ষে ভারত-গৌরবরবি মহাভাগ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ ভীম-পরাক্রমের সহিত মোঘলসৈন্য-বারিধি হইতে চিতোর-তটভূমিকে রক্ষা না করিতেন, যদি তাহার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মেবারবাসী ঘোরতর বিক্রমের সহিত স্বাধীনতা ও প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আজ রাজপুতনা মনুষ্য-সমাজের নিকট পরমপবিত্র তীর্থস্থলরূপে কখনই পরিণত হইত না। তাহা হইলে যবন-সংসর্গে রাজপুতগণ অপবিত্র হইত, বিহারীমল প্রভৃতির অসদুদাহরণের দুষ্টফল ধ্বংস হইত না। এখন কি উপায়ে বঙ্গদেশকে স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন করিতে পারা যায়, কিরূপে বাঙালিগণের হৃদয়মধ্যে স্বাধীনতার কমনীয় মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে জন্মভূমির জন্য স্বার্থপরিত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিতে পারা যায়, বন্ধুদ্বয় এই সকল বিষয়ের সিদ্ধির জন্য সর্বদা চিন্তানিমগ্ন থাকিতেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপ সম্রাটসহ ঘনিষ্ঠতার সহিত কুমার সেলিম, বিপুলধী বীরবল, মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল, মহাবীর মানসিংহ, উদরধী ফৈজী, আবুলফজল প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষিগণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতে লাগিলেন। তাহারা যুবকদ্বয়ের প্রতিভা-পরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। যে সকল মস্তিষ্কের দ্বারা এই বিশাল মোঘল রাজ্য পরিচালিত হইতেছে, যে সকল ব্যক্তির অসাধারণ ভুজবলে দিন দিন রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইতেছে, তাহাদিগের স্বভাবচরিত্র বন্ধুদ্বয় বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ যখন দেখিলেন, মোঘল-সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত তাহার সবিশেষরূপে পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের বার্ষিক দেয় করপ্রদান রহিত করিয়া দেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। তিনি প্রতাপকে কর না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতাপ সবিনয়ে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহেন, "মদীয় পিতৃদেব বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিয়া খুল্লতাত বসন্ত রায়ের উপর রাজ্যশাসনের ভার অপর্ণ করিয়াছেন, জানি না, কোন্ অভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া খুল্লতাত আগ্রাতে করপ্রেরণে এরূপ শৈথিল্যপ্রকাশ করিতেছেন। আমি ও বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ইহার কারণ জানিবার জন্য আমি স্বদেশে লোক প্রেরণ করিয়াছি। আমার বোধ হয়, উপযুক্ত শাসন বিনা রাজ্যমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাগণ কর্মচারিগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি ; এক্ষণে জাঁহাপনা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেবক তাহাই সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত।" প্রতাপ ইত্যাদি কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে সম্রাট কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "প্রতাপ, তুমি যদি তোমাদিগের দেয় রাজস্ব কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া প্রদান কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি ; আমি বিবেচনা করি, তুমি ঈশ্বরের কৃপায় সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবে।" সম্রাট এই সকল কথা কহিলে প্রতাপ অভিবাদন করিয়া অর্থ-সংগ্রহের জন্য কিছু দিনের সময় প্রার্থনা করিলেন। ভগবানও সেই সময় তাহার অভীষ্টসিদ্ধির

সোপানদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতাপ অল্পসময়ের মধ্যে, প্রদেয় রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে সম্রাট তাহার মধ্যে তিন লক্ষ টাকা প্রতাপকে প্রত্যর্পণ এবং ফারমান প্রদানপূর্বক তাহাকে পৈতৃক রাজ্যে নিয়োগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

সম্রাটের নিকট হইতে ফারমান প্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপ স্বদেশে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশে উপস্থিত হইলে পিতৃব্য যদি রাজ্য অধিকার-পক্ষে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি সম্রাটের নিকট হইতে কিয়ৎপরিমাণে সৈন্য-সাহায্য গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সুদক্ষ, রণনিপুণ, যুদ্ধপ্রিয় দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। গমনকালে প্রতাপ এবং শঙ্কর প্রত্যেক দেশ, নগর ও গ্রামের অবস্থা অতি সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস, মোঘলকুলগৌরব আকবরের সময় বঙ্গদেশ অপত্য-নির্বিশেষে সুশাসিত এবং রাজপুরুষদিগের প্রবল অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত হইত ; এরূপ যাহারা বিবেচনা করেন, তাহারা পরম ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। সে সময় বঙ্গদেশের নিরীহ প্রকৃতির প্রজাগণ মুসলমানদিগের প্রপীড়নে এরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই সম্রাটসেনা আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, নির্দয়তার সহিত প্রজামাত্রের গৃহলুণ্ঠন ও দাহ করা মোঘলদিগের প্রাত্যহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সে সময় দুর্বল ব্যক্তিরা বলবানের ভয়ে সর্বদা ভীত হইয়া সময় যাপন করিত। প্রকাশ্য রাজপথ ও জলপথ দস্যুগণের বিহার-ভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গে পাঠান-শক্তি তখন সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় নাই। তাহারা অধিকাংশই জমিদার, রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থান করিতেন। কিঞ্চিন্মাত্র সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা দলবলসহ মোঘলগণের উপর আক্রমণ করিতেন। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন হইবে বিবেচনা করিয়া ইহাদিগের সহিত হিন্দুগণও দলে দলে মিলিত হইতেন। যখন বঙ্গদেশে এইরূপ অরাজকতা সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান ছিল, সেই সময় প্রতাপ বিপুলবাহিনী সহ প্রয়াগাদি অতিক্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন।

বারাণসী হিন্দুজগতের কেন্দ্রভূমি। প্রায় সকল দেশের প্রত্যেক হিন্দুর সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে কাশীর সহিত সম্বন্ধ আছে। কি রাজনৈতিক, কি ধর্মনৈতিক, সকল বিষয়ের যদি কাশীকে কেন্দ্র করিয়া কার্য করা যায়, তাহা হইলে সেই মত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইতে বেশি সময় ও প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মহাপ্রাজ্ঞ ভগবান বুদ্ধদেব প্রাণীজগতের শোক তাপ দূর করিবার জন্য এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপে ধর্মচক্র ঘুরাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই স্থান হইতে হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্যসংস্থাপন জন্য কেহ যদি নীতি-চক্র ঘুরাইতে পারে, তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টচক্র তাহার সহিত ঘূর্ণিত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের চতুর্দিক হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ও স্থানে আগমন করিয়া, কর্মাভাবে অকর্মণ্য হইয়া জীবনাতিবাহিত করিতেছেন, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে সেই সকল স্বার্থবিহীন সাধকগণ দ্বারা অসাধ্য-সাধনাও সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অন্যান্য দেশের উপর বারাণসীর এইরূপ প্রভাব অবলোকন করিয়া মহাভাগ শঙ্কর এই স্থানে তাহাদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করিবার জন্য প্রতাপের সহিত পরামর্শ করেন।

কাশীতে অবস্থানকালে প্রতাপ পুণ্যকৃত্যসকল অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। চিরকাল হইতেই কাশী হিন্দু-জগতের বিশ্ববিদ্যালয়, এ স্থানের দরিদ্র বিদ্যার্থিবর্গের অভাবমোচনের জন্য তিনি বহুল অর্থব্যয় করেন। জনসাধারণের স্নানের সুবিধার জন্য প্রতাপ ভগবতী চতুঃষষ্টি যোগিনীর নিকট গঙ্গার তটে একটি উৎকৃষ্ট ঘাট নির্মাণ

করেন। বর্তমানকালে কাশীর ঘাটসমূহের মধ্যে ইহা একটি অতি প্রাচীন ঘাট এবং বাঙালিদিগের অতি প্রাচীন কীর্তি। প্রতাপ ভগবতী চতুঃষষ্টির সম্মুখে অসুরমর্দ্দিনী ভদ্রকালীর একটি প্রতিমা স্থাপন করেন। এ সময় কাশীবাসী জনসাধারণকে প্রতাপ বহুলপরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ও অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাপ কাশীবাসী নানাদেশীয় জনসমূহের হৃদয়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বারাণসীতে এইরূপ বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দলবলসহ প্রতাপ কয়েক দিবসের পর বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা নগরে উপস্থিত হন। প্রতাপ দেশের অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ই তাহার সূক্ষ্মদৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিল না। তিনি দেখিলেন যে, সম্রাট আকবর শাণিত-অসিবলে রাজস্বপ্রদানে অস্বীকৃত মোঘল রাজ পুরুষগণকে দমন করিলেও তাহাদিগের হৃদয় হইতে অশান্তি বহ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই। পূর্বে তাহারা প্রতারণা করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনোপার্জন করিত, এক্ষণে সম্রাটের নূতন নিয়মানুসারে সে সমস্ত উপার্জনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে অসন্তুষ্ট তুর্কিগণ গত বিদ্রোহে পরাস্ত হইলেও তাহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে দুর্বাসনা পোষণ করিতেছে। এই সকল প্রদেশের প্রজাবর্গ রাজপুরুষ ও বিদ্রোহিগণের প্রবল অত্যাচারে এরূপ জর্জরিত হইয়াছে যে, রাজশক্তির বিভীষিকা তাহাদিগের হৃদয়ে অণুমাত্র ভীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। বায়ু যেরূপ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে প্রচণ্ড বল ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলকে সমূলে উন্মুলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অত্যন্ত নিরীহ দুর্বল প্রজা প্রবলরূপে পীড়িত হইলে তাহারাও ভৈরব মূর্তি ধারণ করিয়া নানাপ্রকার ঐশ্বর্যসম্পন্ন রাজশক্তিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধযাত্রী সেনাগণের সর্বদা ইতস্তত গমনাগমন জন্য ক্ষেত্রসকল মর্দিত, গৃহসকল লুণ্ঠিত, মন্দির সকল কলুষিত ও প্রজাসকল উৎপীড়িত হইতেছে; প্রতাপ দেশের এই সকল অবস্থা দেখিতে দেখিতে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মোঘলগণের পাশব অত্যাচার হইতে কিরূপে দেশকে বিমুক্ত করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলকে একপ্রাণে মিলিত করিয়া দেশের সাধারণ শত্রু অত্যচারিগণকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলে পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিক্ষিত হয়, কিরূপে দুষ্ট প্রবলপক্ষের বিপক্ষে মুক্তকণ্ঠে অভিমত প্রকাশ ও খড়্গপাণি হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে সকলে অভ্যস্ত হয়, কিরূপে বঙ্গীয়গণ দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া প্রভৃতি নীচ-প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহাঁর স্থলে সহানুভূতি ও স্বজাতিপ্রেম অভ্যাস করে, কিরূপে সকলে আপন-আপন দুরাবস্থার বিষয় অনুদিন অনুশীলন করিয়া উত্তেজিত হয়, কিরূপে কুক্রিয়াসক্ত অসুর-প্রকৃতির ধনবানগণ দেশের কল্যাণার্থ মুক্তহস্ত হন, কিরূপে সকলে আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দেশের স্বার্থের জন্য মন ও শরীর অর্পণ করিতে দৃঢ়ব্রত হন, প্রতাপ, শঙ্কর এবং সূর্যকান্ত এই বন্ধুত্রয় একপ্রাণ হইয়া তাহার উপায়-উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ প্রভৃতি যখন কিছু দিন পূর্বে দিল্লিতে গমন করেন, তখন তাহাদিগের হৃদয় অন্যরূপ ছিল, এখন তাহারা জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য যেন কি এক কঠোর ঘোরতর ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন, এখন হইতে তাহারা জন্মভূমির উদ্ধার-বাসনায় কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সুখ-দুঃখে অবিকম্পিতভাবে কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহারা জন্মভূমির অধীনতা-পাশ ছেদন করিবার জন্য এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগের প্রস্তাবিত পথে যেরূপ কোন বাধা উপস্থিত হউক না, তাহা তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হন।

১. টোডবমল্ল ক্ষত্রিয়কুলে একজন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে কালক্রমে গুণদর্শী সম্রাট আকবরের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। টোডরের বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাহার বিধবা মাতা অতিকষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করেন। প্রথমত তিনি একজন মুহুরীর কর্মে নিযুক্ত হন। তিনি যে সময় গুজরাটের রাজস্ব-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, সেই সময় হইতে তাহাব সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয়। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বের উনবিংশতিতম বৎসরে মুনিম খাঁর সহিত বঙ্গদেশে আগমন কবেন। যুদ্ধকালেও তিনি অসাধারণ বীরপুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেন। তিন বৎসর পরে বঙ্গদেশ হইতে পুনরায় গুজরাটে গমন করেন। সম্রাটের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে তিনি ভারতের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের রাজস্বব্যবস্থা পুনঃসংস্কার করেন। রাজত্বেব দ্বাত্রিংশৎতম বৎসরে এক জন ক্ষেত্রী তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পায়। উক্ত বৎসরে সুবিখ্যাত বক্তা বীরবলের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দুর্দান্ত মুসলমানজাতি ইসুফজাই দমনে গমন করেন। রাজত্বের চতুস্ত্রিংশতম বৎসরে তিনি, বার্ধক্যবশত সম্রাট আকবরের অনিচ্ছাসত্ত্বে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কিছু দিবস পরমপবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে বাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। বাদাওনী ১০ নভেম্বর—১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইহার মৃত্যুকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ টোডরমলের হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল। এক সময় সম্রাটের সহিত পাঞ্জাবে গমনকালে ব্যস্ততাবশত তাহার ঠাকুর হারাইয়া যায়। উক্ত ঠাকুর প্রত্যহ পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। টোডরমল্ল পানাহার পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আকবর টোডরমল্লের বিপদের কথা অবগত হইয়া, তাহাকে জলগ্রহণের জন্য অনেক অনুরোধ করেন ; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায় ; অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া, তাহার বিগ্রহ-অন্বেষণের জন্য বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে ঠাকুর পূজা করিয়া টোডরমল্ল অন্নগ্রহণ করেন। তাহার রাজত্বের উনত্রিংশতম বৎসরে গুণগ্রাহী সম্রাট তাহার গৃহে গমন করিয়া, তাহাকে সম্মানিত করেন। টোডরমল্ল হিন্দুগণকে হিন্দুর পরিবর্তে পারস্যভাষায় কাগজপত্র লিখিতে বাধ্য করেন। ইহাতে হিন্দুদিগের রাজনীতিক্ষেত্র বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়। টোডরমল্লের জন্মভূমি মনসুর লাহোর প্রদেশ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান কালে আউধের অন্তর্গত লোহারপুর নামক স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। (Proceedings A. S. B. Pt 1871, pp 178) আমাদিগের দেশে অনেকেই ভ্রমবশতঃ ক্ষেত্রীদিগকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট কবেন। উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব-প্রদেশে ইহারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিগণিত হন। রাজপুত বা ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নে ইহাদিগের আসন।

২. রামরাম বসু।

৩. প্রতাপাদিত্যের জন্ম বা মৃত্যুর সময় কোন স্থানে নির্দেশ হয় নাই। সুতরাং তাহার জন্মমৃত্যুর সময় নির্ধারণ করিতে হইলে, আমাদিগকে অনুমান প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভবানন্দ প্রভৃতির সাহায্যে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া যখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময় সম্রাট ভবানন্দের কার্যে আহ্লাদিত হইয়া, তাহাকে কয়েকখানি পরগণাসহ ফারমান প্রদান কবেন। ঐ ফারমানে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে বা ১০১৫ হিজরি উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রতাপাদিত্য সংসারলীলা সংবরণ করেন, ইহা আমরা নিশ্চয়রূপেই অবগত হই। তাহার রাজত্বকালে যে পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারক ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন, সে সময় তিনি তাহার দ্বাদশবৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। রামরাম বসুর লিখিত এবং জনপ্রবাদে আমরা অবগত হই যে, দাউদ ও শ্রীহরি উভয়ে সময়বয়স্ক ছিলেন। দাউদ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পঞ্চবিংশতি বা ষড় বিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং আমরা অবিসংবাদে অনুমান করিতে পারি, শ্রীহরির যদি বিংশতি বা একবিংশতিতম বৎসরের সময় পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা প্রতাপাদিত্যকে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা প্রতাপাদিত্যের উনবিংশ বা বিংশতিতম বৎসরে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করি, তাহা হইলেও আমরা উক্ত সময়ে উপস্থিত হই, অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়েও প্রতাপেব জন্মকাল অবধারিত হয়।

ভবিষ্যপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে, ধূম্রঘট্টপত্তনে (ধূমঘাটে) এক জন কায়স্থ রাজা উৎপন্ন হইবেন। তিনি বঙ্গের স্বাধীনতাসংস্থাপন জন্য দিল্লিশ্বরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্বলাভ করিবেন। এই কায়স্থ-রাজাই আমাদিগের প্রতাপাদিত্য।

যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধুম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।। ইত্যাদি।

৪. যাহারা অপরিণতবয়স্ক বালকের এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাহাদিগের সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্য গ্রন্থকারের পরিজ্ঞাত নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিত হইল।—এক সময় একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক মানচিত্র-পরিদর্শনকালে কহিয়াছিল,—"ভারতবর্ষে যদি কেহ লোক থাকিত, তাহা হইলে ইহা কখনও পরাধীন হইত না। কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, ত্রিপুরা, নিজাম, মহাসুর, বরোদা, রাজপুতনা প্রভৃতি (উক্ত প্রদেশ সকল সে সময় নীলবর্ণে রঞ্জিত থাকায় বালক উহাদিগকে স্বাধীনরূপে গ্রহণ করে) প্রদেশ সকলকে যদি কেহ মিলিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত মুহূর্তে স্বাধীন হয়।"

৫. জীবনীকোষকার ইহাকে শঙ্কর ভট্টাচার্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৬. পুরাকালে যশোহর নানাপ্রকার শিল্পীর আবাসস্থল ছিল। বর্তমানকালে তাহাদের বংশধরগণ স্থানভ্রষ্ট হইলেও কোন কোন বিষয়ে এখনও এ প্রদেশে বেশ নিপুণ শিল্পী দেখিতে পাওয়া যায়।

৭. The principal city Gouro seated on the banks of the Ganges, three leagues in length, containing one million and two hundred families and well fortiffed; along the streets, which are wide and straight, rows of trees to shade the people which sometimes is in such numbers that some are trod to death.

Fariay Sousa Portugues Asia Pt Ist 416—17 pp, (Steaven's Translation 1794.)

৮. সম্রাট হুমায়ুন এই নাম প্রদান করেন। ইহার অর্থ স্বর্গপুরী।

৯. সম্রাট জাহাঙ্গীর তাহার জীবনীতে এবং ক্যাথলিক পাদরিরা নিজেদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এ কথা কীর্তন করিযাছেন।

১০. রামরাম বসুর গ্রন্থ ৬২ পৃষ্ঠা হইতে সমস্যাটি উদ্ধৃত হইল ঃ
সম্রাটের সমস্যা :—সেতভুজঙ্গিনী যাতে চলি হেঁ।
প্রতাপের পূরণ :

শোবর কামিনী নীর নিহাবতি রিত ভালি হেঁ।
চিরমচরকে গঠপর বাপিকে ধারেস্থ চম্প চলি হেঁ।
রায়বেচারী আপন মনমে উপামাও চাবি হেঁ।
কেছঙ্গ মরোরতি সেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ।

১১. বিহারীমল, ইনি মানসিংহের পিতামহ ও ভগবানদাসের পিতা, রাজপুতদিগের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে আকবরের সভায় আগমন করিয়া সম্রাটকে কন্যা-সম্প্রদান করেন ও পাঁচহাজারী পদে সম্মানিত হন। ইহার পুত্র ভগবানদাস, সেলিমের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া আমীর-উল-ওমরা উপাধি এবং পাঁচহাজারীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল মহাপুরুষ বর্তমান জয়পুর রাজবংশের বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ইতিহাস যত দিন বর্তমান থাকিবে, তত দিন এই সকল কুলাঙ্গারের কুকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

যশোহরে উপস্থিত হইবার পূর্বেই বহু সৈন্যসহ প্রতাপাদিত্যের আগমনবার্তা যশোহরে উপস্থিত হইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতাপের আগমনবার্তা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। তাহারা পুত্রের আগমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ধীরে ধীরে সমুদয় সৈন্য-পরিচালনা করিয়া, যশোহরের সমীপবর্তী হইলেন। পিতৃব্য বসন্ত রায় যশোহর হস্তগত করিবার পক্ষে পাছে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতাপ সৈন্যগণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া নগর অবরোধ করিয়া অবলীলাক্রমে ধনাগার হস্তগত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপের ঈদৃশ আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, প্রতাপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তাহার পিতৃব্যদেব তাহার অভীষ্টসাধনের প্রধান অন্তরায় হইবেন, এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ নগর ও রাজকোষ হস্তগত করিতে না পারিলে, ইহাতে লোকক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নগর আক্রমণ করেন। নগরাক্রমণকালে প্রতাপ পিতৃব্যের হস্ত হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হওয়াতে অল্পসময়ের মধ্যে অবলীলাক্রমে সমস্ত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। নগরবাসীরা প্রতাপের আগমনে এবং তাহার এরূপ দারুণ ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণসহ তাহার সাক্ষাৎ-বাসনায় সন্নিবেশিত শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হন। প্রতাপ পিতৃব্যের আগমনবার্তা অবগত হইয়া, অতি বিনীতভাবে তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া অভিবাদ্যবর্গকে যথারীতি অভিবাদন করেন এবং পিতার সম্মুখে করজোড়ে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে লজ্জিতভাবে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া, তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে উপবেশন করিতে আদেশ করেন। প্রতাপ বিনীতভাবে পিতার নিকটে উপবেশন করিলেন ; বিক্রমাদিত্য প্রতাপের অসদাচরণের কথা উল্লেখ না করিয়া নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন—"কোন্ পিতা পুত্রের সমৃদ্ধি-কামনা না করিয়া অধঃপতন চিন্তা করিয়া থাকেন? আমি তোমার রাজপদলাভের কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছি, এরূপ আর কে হইয়াছে? তুমি দিল্লিশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি পরমানন্দিত হইয়াছি ; তুমি যেরূপ বুদ্ধিবলে রাজপুরুষগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছ, সেইরূপ আপামর প্রজাসাধারণের আনন্দের উৎসস্বরূপ হও। আমি দিন দিন অন্তিম-দিবসের সমীপবর্তী হইতেছি ; আমার বিষয়ভোগ-বাসনা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমার রাজ্য-ভোগ-স্পৃহা আর নাই ; তুমি রাজকার্যে পারদর্শী ও যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছ, এক্ষণে তুমি অবিচলিত-চিত্তে রাজ্যপালন কর, ইহাই আমার একমাত্র কামনা।" বিক্রমাদিত্য ইত্যাদি নানা প্রকার আলাপ করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদে আগমন করিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় প্রতাপের অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন এবং তাহারা দিবসের অধিকাংশ সময় ঈশ্বর-উপাসনায় এবং বৈষ্ণব-কবি ও কবিতা লইয়া বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিতেন।

যে সময় বসন্ত রায় প্রভৃতি গুরুজনবর্গ মহাকবি গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণসহ কবিতা-

রচনা এবং প্রাচীন কবিদিগের মর্মস্পর্শী কবিতা সকল শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন, সে সময়ে দৃঢ়ব্রত প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্যকান্ত, মদন, সুন্দর প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণসহ মিলিত হইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপনের জন্য, পুনরায় হিন্দু-প্রাধান্য হিন্দুহৃদয়ে জাগরিত করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ এই সময় হইতে আপনার রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বভাবদুর্গম সুন্দর-বনপ্রদেশে বহুসংখ্যক খাল খনন করাইয়া এ প্রদেশকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছিলেন।[১] এই সময় হইতে প্রতাপ শ্রমজীবী সৈন্য নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা এরূপ কার্যদক্ষ হইয়াছিল যে, অল্পসময়ের মধ্যে ইহারা শুষ্কভূমি নদীরূপে পরিণত এবং বিস্তৃত নিবিড় অরণ্য ক্ষেত্ররূপে পরিবর্তিত করিত।[২] প্রতাপ এই সকল শ্রমজীবী সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক অভেদ্য মৃন্ময় দুর্গ নির্মাণ ও সুস্বাদু-সলিলপূর্ণ সরোবর খনন করেন। দেখিতে দেখিতে রাজ্য মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য-সংস্থাপিত সমাজ, আজ প্রতাপ কর্তৃক সঙ্কীকৃত হইল, যাহারা রাজ-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিবার জন্য ইতিপূর্বে আগমন করিয়াছিলেন, আজ তাহাদিগের পুত্রগণের উপর প্রতাপ ও তাহার অনুচরবর্গের কার্যকরী শক্তি প্রভূত প্রভূতা বিস্তার করিতে লাগিল। এই সকল ব্যক্তি প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে যথাসাধ্য কার্য করিয়া মাতৃপূজার সহায়তা করিতে লাগিলেন।

দূরদর্শী প্রতাপ পর্তুগিজ জলদস্যুদিগকে দমন ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানসকল প্রস্তুত করেন, কালক্রমে প্রতাপ নৌবলে এরূপ বলীয়ান হইয়াছিলেন যে, মোঘল, মগ বা পর্তুগিজরা ইহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

সুচতুর প্রতাপ মোঘলশক্তির উচ্ছেদ করিবার জন্য মোঘলরাজপুরুষদিগের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে অতি গোপনভাবে স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে সামরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ধনুর্বাণ, খড়্গ এবং বন্দুক ব্যবহারে সকলকে সিদ্ধহস্ত করিবার জন্য তিনি সকলকে সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে অনেকেই শরচালনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যে দেশেব ভিতর যুগান্তর উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে যুবকবৃন্দ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় পরম উৎসাহের সহিত অস্ত্রশস্ত্রচালনার বিশেষরূপে চর্চা করিতে লাগিল। প্রতাপ বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে বন্দুক আদি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালমধ্যে দেশমধ্যে সামরিক শক্তি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে যাহারা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইত, তাহারা এক্ষণে ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তু অথবা শত্রু সংহার করিবার জন্য সকলের অগ্রবর্তী হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল।

প্রতাপ যখন ভবিষ্যৎকালে ঘোরতর যুদ্ধের বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত, সেই সময় উদার-চরিত্র ধর্মপ্রাণ মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্য একজন ধর্মভীরু, ঈশ্বরপরায়ণ, কর্মদক্ষ, নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি বসন্ত রায়ের উপর রাজ্যপালনের ভার ন্যস্ত করিয়া, নির্বিবাদে কালাতিপাত করিতেন, প্রতাপ পিতৃবিয়োগের পর হইতে বসন্ত রায়কে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে আরম্ভ করেন। যথাকালে প্রতাপ পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন, এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যশোহর নগরে নানা দেশিয় লোকের সমাগমে লোকারণ্য হইয়া উঠে, অতি সুশৃঙ্খলার সহিত এই লোক-সমষ্টির পরিচর্যা করিয়া প্রতাপ সকলকে গুণানুসারে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

প্রতাপ পিতৃদায় হইতে মুক্ত হইয়া, আবার স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, স্বদেশ মধ্যে ঈপ্সিত বিষয় সকল সম্পন্ন করিয়া সমীপবর্তী রাজন্যবর্গের সহিত একপ্রাণে মিলিত

হইবার জন্য তিনি উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়ে উৎকলবাসিগণ বর্তমান উৎকলীদিগের ন্যায় অধঃপতিত মনুষ্যত্ব-বিহীন হয় নাই,[৩] তখনও তাহাদিগের ছোট-বড় নৃপতিবর্গ আপনার দেশ আপনারাই শাসন করিতেন ও স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যুদ্ধস্থলে অকাতরে জীবন বিসর্জন করিতেন, বিজেতার পদসেবা তখন তাহাদিগের স্বপ্নরাজ্যেরও বহির্ভূত ছিল। প্রতাপ এই উৎকলীদিগের শক্তি উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তীর্থযাত্রা উপলক্ষ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিতে মনন করেন। তাহার ইচ্ছার সহিত উৎকলগমনের আয়োজন হইতে লাগিল। শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ, যুদ্ধনিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, অসীমসাহসিক সৈন্য-নির্বাচন করিয়া উৎকলযাত্রার উদ্যোগ করিলেন। শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রতাপ নির্বাচিত সৈন্য-সমষ্টি সঙ্গে লইয়া উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। উৎকলদেশে গমনের পূর্বে প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাঠানগণ মোঘলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেশের মধ্যভাগে গুপ্তরূপে অবস্থান করিতেছে ; দেশ মধ্যে অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ; যে স্থানে দস্যু বা চৌরভয় কিছুমাত্র ছিল না, এক্ষণে সেই সকল স্থল দুর্দান্ত দস্যুগণের লীলাভূমি হইয়াছে।[৪] দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে দেখিতে প্রতাপ জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। প্রতাপ এ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, যথাবিহিত পুণ্যকৃত্য সকল সম্পন্ন ও দরিদ্রগণকে বহুল পরিমাণে ধন বিতরণ করেন। উৎকলদেশে অবস্থানকালে মোঘল-প্রপীড়িত বহুসংখ্যক উৎকলী ও পাঠান প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই তাহার অনুগত হন ; তাহারা প্রতাপের নিকট দুঃখকথা কীর্তন করিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মোঘলানুগৃহীত উৎকলীগণ প্রতাপকে মোঘল-বিদ্বেষিগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে দেখিয়া তাহারা তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রতাপ যে সময় উড়িষ্যাদেশে অবস্থান করেন, সে সময় মহারাজা বসন্ত রায় উড়িষ্যাদেশ হইতে তাহার চির অভীষ্ট উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের পরম কমনীয় বিগ্রহ আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। ভগবান উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেব উৎকলীদিগের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে তাহা লইয়া আসা সাধারণ কথা নহে। প্রতাপ কৌশল করিয়া দেবদ্বয়ের পূজকগণকে বহু ধনদান করিয়া উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেবকে হস্তগত করেন। দেবতাদ্বয় সহ স্বদেশাভিমুখে প্রতাপের প্রত্যাগমনকালে উড়িষ্যাবাসীরা, তাহাদিগের দেবতা অপহৃত হইয়াছে অবগত হইয়া, প্রতাপকে আক্রমণ করেন। যে সকল ব্যক্তি ইতিপূর্বে প্রতাপের প্রশংসার কথা শুনিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছিল, তাহারা এই অবকাশে জনসাধারণকে প্রতাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। তাহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া প্রতাপকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। প্রতাপ উৎকলবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, অল্পকালের মধ্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্বিঘ্নে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উৎকলবাসীদিগের পরাজয়বার্তা তড়িদ্‌বেগে দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইল। উৎকলী রাজন্যবর্গ আপন আপন সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রতাপের গতিরোধ করিবার জন্য বিদ্যুদ্‌গতিতে ধাবিত হইলেন। প্রতাপও নিশ্চিন্ত নহেন ; উৎকলীদিগের ঘোরতর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি বিশিষ্ট সৈন্যগণকে একত্র করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম বিভাগে কতিপয় অসীম সাহসিক সৈন্য প্রেরণ করিয়া গন্তব্যপথের সংবাদ-সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বিভাগ তিনি স্বয়ং পরিচালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অহর্নিশ যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত। কি শয়ন, কি উপবেশন, কোন সময়েই কেহ নিশ্চিন্ত নহে ; সকলেই আশু ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইলেন। প্রতাপ এইরূপ সৈন্য-পরিচালনা করিয়া, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হন। উৎকলী রাজন্যবৃন্দ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুবর্ণরেখার তটে বঙ্গীয় সেনাকে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপও সিংহবিক্রমে উৎকলীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ঘোরতর সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইল। শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যেন বহুরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেক সৈন্যকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বঙ্গীয় সেনা ও সেনাপতির কাছে উৎকল-বীর্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া পড়িল। সুবর্ণরেখার তটভূমে প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণের যুদ্ধবিষয়ক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপ প্রভৃতি বীরগণের হৃদয় উৎফুল্ল হইল ; তাহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বঙ্গীয়গণ উপযুক্ত নায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইলে, যুদ্ধস্থলে নির্ভীকতা, শূরতা ও আত্মরক্ষণপরায়ণতা দেখাইতে বিমুখ নহে। প্রতাপ সমবেত উৎকলী রাজন্যবর্গকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজাকে বন্দি করেন। বন্দি নৃপতিগণকে যথেষ্টরূপে সম্মানিত ও বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিয়া বিদায় প্রদান করেন। প্রতাপের পরম শত্রুগণও আজ তাহার সদয় ব্যবহারের নিকট পরাস্ত হইল। প্রতাপ উৎকলীয় নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা-সংস্থাপন করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ, শঙ্কর প্রভৃতি বীরগণ যেরূপ অদ্ভুত শূরতা ও ধীরতার সহিত উৎকল-ভূমি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহাতে তাহাদিগের সেনা-পরিচালন-বিষয়ক অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশিত হয়। তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত এবং আহ্লাদে অধীর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া, প্রবল শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া এবং তাহাদিগকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করা নিতান্ত সাধারণ কথা নহে। দশ সহস্র গ্রীকের প্রত্যাগমনের ন্যায় প্রতাপের প্রত্যাগমনও একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গীয়দিগের মধ্যে যদি কেহ 'যোনাফন' থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি এই ঘটনাটিকে অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় বাহুবলের কীর্তিকাহিনী জগৎ-সমক্ষে উদঘাটিত করিতেন, তাহা হইলে আজ সেই বঙ্গীয় বীরেন্দ্রগণ চির পূজিত দেবতার ন্যায় প্রপূজিত হইতেন।

এই সময় হইতে প্রতাপ দেবানুগৃহীত বলিয়া সাধারণের নিকট অভিহিত হইতে লাগিলেন। দেবানুগৃহীত না হইলে কে কোথায় অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুল-বাহিনী পরাস্ত করিতে সমর্থ হন?

প্রতাপ উৎকল বিজয় করিয়া নিরাপদে যশোহরের সন্নিকটবর্তী হইলে, মহারাজ বসন্ত রায় অতি সমারোহের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। স্থানে স্থানে বিজয়-তোরণ সকল সংস্থাপিত এবং রাজপথ ও গৃহসকল সুসজ্জিত হইল। এই বিজয়বাহিনী দেখিবার জন্য চতুর্দিকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রতাপ উৎকল দেশ হইতে আনীত প্রতিমা সকল বিনয় পূর্বক পিতৃব্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। ধর্মপরায়ণ বসন্ত রায়, তাহার চির-অভীষ্ট দেবতাসকল প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন এবং তাহা স্থাপন করিবার আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অল্পকাল মধ্যে দেবতা প্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রব্য-সম্ভার সংগৃহীত হইল! বসন্ত রায় উৎকলেশ্বর মহাদেবকে অতি সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করিলেন।[৫] প্রতাপ-আনীত গোবিন্দদেবও এই সময়ে স্থাপিত হন। প্রতাপ যৎকালে উড়িষ্যাদেশ হইতে গোবিন্দদেবকে আনয়ন করেন, সে সময় যুদ্ধকালীন ব্যস্ততাবশত সুবর্ণরেখা পার হইবার সময় ভগবতী রাধিকা নদী মধ্যে পড়িয়া যান। যুদ্ধ অবসানের পর প্রতাপ ভগবতীর উদ্ধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

লোকমধ্যে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বসন্ত রায় তাহার জন্য একটি রাধিকা নির্মাণ করান ; কিন্তু স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে, ইহা গোবিন্দদেবের মনোনীত

হয় নাই। এইরূপে কতকগুলি রাধিকা নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল রাধিকা-প্রতিষ্ঠার জন্য আবার অন্য কৃষ্ণ নির্মিত হয়। প্রতাপাদিত্য এই সকল দেবতাকে তাহার রাজ্যের নানা স্থানে স্থাপন করেন।[৬]

এই সময়ে প্রতাপ যশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী-মূর্তিও সংস্থাপন করেন। এই যশোরেশ্বরী সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা কীর্তিত হইয়া থাকে। এক সময় প্রতাপের প্রাসাদরক্ষক কমল খোজা নামক জনৈক মুসলমান কর্মচারী[৭] নিশীথকালে প্রাসাদের অদূরবর্তী ইছামতী নদীতটে অপূর্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ করেন। রাত্রিকালে ইহার কারণ নির্ধারণ করিবার অবকাশ না পাওয়াতে দিবাভাগে ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হন। এইরূপ প্রত্যহ নিশীথ রাত্রে এই অপরূপ জ্যোতি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করেন। যশোহর প্রদেশের লোকেরা কহেন, যশাপাটনী নামক জনৈক ব্যক্তি নদীতীরে অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করেন। প্রতাপ এই অনৈসর্গিক কথা শ্রবণ করিয়া, সেই নিশীথরাত্রে কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। একখানি শিলা হইতে অদ্ভুত জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া তাহারা বিমোহিত হন। প্রতাপ পরদিন প্রাতকালে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া অতি সমারোহের সহিত তাহার পূজা-অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জনসাধারণ এই অপূর্ব কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে ইহার পূজা করিতে আগমন করিলেন ; দেখিতে দেখিতে ইহা তীর্থস্থলে পরিণত হইল। প্রতাপ প্রত্যহ অনন্যমনে ভগবতীর পূজা মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ প্রতাপের একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ভগবতীর বরপুত্র এবং প্রধান ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

লোকসাধারণের এরূপ বিশ্বাস হইল যে, প্রতাপ ভগবতীর অনুগ্রহে সমর-দুর্জয় হইয়াছেন এবং ইহারই কৃপাবলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। দৈববলে বলীয়ান প্রতাপ সেই সময় হইতে হিন্দু মুসলমান সকলেরই নিকট সসম্ভ্রমে পূজিত হইতে লাগিলেন।

১. লবের খাল প্রভৃতি বহুসংখ্যক খাল এই সময় খনিত হয়।

২. পশ্চাৎকালে সীতারাম এইরূপ শ্রমজীবী বা বেলদার সৈন্যগঠন করিয়া বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

৩. বঙ্গদেশে উৎকলবাসীর বাহুবলের বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকিলেও বর্তমান কালের বঙ্গীয় রমণীরা কোন অসমসাহসিক ব্যক্তির কথা নির্দেশ করিতে হইলে তাহারা শব্দের তাৎপর্য না বুঝিয়া "থাণ্ডাইত" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহারা উড়িষ্যার বীর জাতি।

৪. The Country was so safe, that a man might have travelled with his Gold in his hand, 155 p. Early Travels in India.

৫. এরূপ কিংবদন্তী যে, মহারাজ বসন্ত রায় বেত-কাশীতে (ইহা সুন্দরবন প্রদেশ) উৎকলেশ্বর মহাদেবকে স্থাপন করেন। ইহার অভ্রভেদী মন্দিরের এখন আর কোন চিহ্নও নাই। নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি সুন্দরবন প্রদেশে অবস্থানকালে মহারাজ বসন্ত রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হই।

নির্মমে বিশ্বকর্মা যৎ পদ্মযোনি প্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্।।
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ।।

৬. বেহালা প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ-স্থাপিত প্রতিমূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের নিকটও এই মূর্তি ছিল, এক্ষণে উহা ২৪ পরগণা বারাসতে আছে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্যবতীতে নিমগ্ন হন, এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধবা ব্রাহ্মণী নামে অভিহিতা হন।

৭. কমল খোজা সম্বন্ধে কিংবদন্তীতে কথিত হয় যে, এক সময় প্রতাপ পার্শ্ববর্তী কোন নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ বিপক্ষ-সেনানীর রণপাণ্ডিত্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। কমল খোজা প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিলেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দি হন। এই সকল বন্দিগণের মধ্যে যাহারা তাহার অধীনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহাদিগকে তিনি যোগ্যতানুসারে কার্য প্রদান করেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে ধন ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে সকল বন্দি প্রতাপের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন, তাহাদিগের মধ্যে কমল খোজা একজন প্রধান ব্যক্তি। কমল খোজা মুসলমান হইলেও প্রতাপের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা-সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নানা প্রকার বিজয়লব্ধ দ্রব্য আনয়নপূর্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন তাহার রাজ্যসীমা, লোকবল ও প্রভুতা সংবর্ধিত হইতে লাগিল। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার প্রতাপের প্রতাপবর্ণনাকালে কহিয়াছেন, "তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজয় করিয়া রাঢ়দেশীয় রাজন্যবর্গকে অধীনস্থ করেন এবং সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন"।[১] এ সময় প্রতাপ শঙ্করাদি কর্মচারিগণসহ বঙ্গের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অসাধারণ পরিশ্রমের সহিত কার্য করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাদিগের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বঙ্গের চিরস্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন। বিস্তৃত রাজ্যের চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য দুর্গসকল নির্মাণ করিতে প্রারম্ভ করিলেন। ভাগীরথীতটে বর্তমান নৈহাটির অনতিদূরবর্তী জগদ্দল নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হইল। ইহাতে বাসোপযোগী সুন্দর অট্টালিকারও অভাব রহিল না।[২] এইরূপে শত্রু-আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য প্রতাপ গঙ্গার পশ্চিম পারে কলিকাতার সমীপবর্তী সালিকা গ্রামে আর একটি দুর্লঙ্ঘ দুর্গ নির্মাণ করেন।[৩] রায়গড়, মাতলাদুর্গ প্রভৃতি অপরাপর অনেকগুলি দুর্গম দুর্গ এই সময় প্রস্তুত হয়। মহাভাগ প্রতাপ রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ-নির্মাণ করিয়া স্বীয় বাসস্থানের জন্য ধূমঘাটে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তি পাঁচ বৎসর অবিরাম কার্য করিয়া ইহা নির্মাণ করে। এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত এবং মৃন্ময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও বহুসংখ্যক কামানে সুসজ্জিত হইল। চারিদিকে চারিটিমাত্র দ্বার, এইরূপ এই দুর্গের মধ্যে আরও চারিটি দুর্গ নির্মিত হয়, প্রত্যেক দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। এই সকল দুর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান, সুপ্রশস্ত রাজপথ ও পণ্য-বীথিকা নির্মিত হইল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হইলে যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, সে জন্য বিশেষরূপ দৃষ্টি প্রদান করা হইল। পঞ্চম দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, ইহা বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ শিল্পকর অতি নিপুণতার সহিত নির্মাণ করিল।[৪] ধূমঘাটরাজধানী নির্মিত হইলে পর প্রতাপাদিত্য পরিজনবর্গসহ শুভদিবসে গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশের দিবস ধূমঘাট উৎসবময় হইল এবং অরণ্যপ্রদেশ লোকারণ্য হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশে তৎকালে প্রতাপের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিলেন না, তিনি ভৌমিকগণের নেতা বলিয়া কথিত হইতেন। বঙ্গীয়গণ তখন তাহার অঙ্গুলি-পরিচালনার সহিত চালিত হইতেন এবং তাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন ও আত্মসংরক্ষণ জন্য প্রাণাধিক প্রিয়জনকেও পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। বর্তমানকালের পতিত বঙ্গীয়দিগের ন্যায় তাহারা আপনার প্রাধান্য লইয়া ব্যস্ত বা পরস্পর সমবেদনাশূন্য ছিলেন না। প্রতাপ যখন বাহুবলে সকলের শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তখন পণ্ডিত-কুলতিলক কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন প্রতাপের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৫] এ প্রস্তাব মহারাজ বসন্ত রায় এবং শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি প্রতাপের বন্ধুবর্গ অতি সমাদরের সহিত অনুমোদন করিয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যাভিষেক হইবার পূর্বে

স্বদেশভক্ত শঙ্কর বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ধূমঘাট হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বপতিগণকে প্রতাপের রাজ্যাভিষেকে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। মুসলমান, পর্তুগিজ প্রভৃতি সকল জাতিই নিমন্ত্রিত হইলেন। ইহা নামে রাজ্যাভিষেক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃপূজন-যজ্ঞের পূর্বানুষ্ঠান। এই মহাযজ্ঞে মাতৃভক্ত হিন্দু, মুসলমান, উৎকলী, বিহারী, আসামী সকলে একত্র হইলেন। "রাজাগণ, অধ্যাপক, কায়স্থ ও বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ লোকদের আগমন পাঁচ দিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌঁছিবামাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন আপন প্রভুদের সেবাতে নিযুক্ত, কদাচিত কাহা দিয়া কোন ক্রটি হয় না, সকলেই সানন্দ * * * ধূমঘাট পঞ্চোক্রোশি লোকারণ্য হইল। হাট ঘাট বাট নগর চাতার বালাখানা ও তহখানায় লোক পরিপূর্ণ।"[৬] দেখিতে দেখিতে বৈশাখী পূর্ণিমা উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্য শাস্ত্রবিধানানুসারে অভিষেকের পূর্ব-দিবস সংযতভাবে অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রসকল উচ্চারণ করিয়া প্রতাপকে অভিষিঞ্চন করিলে পর তিনি পবিত্র জলে পূত ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নানা প্রকার রত্নখচিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সিংহাসনারোহণের সহিত চতুর্দিক হইতে নানা প্রকারের বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। দুর্গ-প্রাকার হইতে মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হইয়া দিক সকল নিনাদিত করিল ; অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রতাপ অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণসভায় গমন করিলেন। তথায় বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলী একত্র সমবেত ; প্রতাপ ইহাদিগের মর্যাদা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া, যে সকল কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতি আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া বিশেষরূপে সম্মানিত করেন। যে সকল জন্মভূমি-ভক্ত বীরগণ বঙ্গের নানা স্থান হইতে আগমন করিয়া ধূমঘাটে একত্র হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রতাপের জন্য ধন, জন ও জীবন বিসর্জন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; প্রতাপও সকলকে ভ্রাতার ন্যায় সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এইরূপে সকলে একপ্রাণে সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া আপন আপন সৈন্যবল বৃদ্ধি এবং সেই শুভ-দিবসের অপেক্ষায় দিবস যাপন করিতে লাগিলেন।[৭]

রাজ্যাভিষেক-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর প্রতাপের গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। গৃহবিবাদই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। ভারতের উৎকর্ষদর্শন যেন ভগবানের অভিপ্রেত নহে। ভারতের যে স্থানে একটু উন্নতির পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেই স্থানেই গৃহবিবাদ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া যুগান্তরের জন্য উন্নতির আশা সমূলে ধ্বংস করিতেছে। বঙ্গের স্বাধীনতা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। যাহাতে বঙ্গীয়গণ চিরস্বাধীনতা প্রাপ্ত না হন, সে জন্য তিনি তাহার বীজ রোপণ করিলেন। স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণ যত দিন না পরস্পর সমবেদনা-প্রকাশ শিক্ষা, স্বীয় প্রাধান্য-আশা পরিত্যাগ করিয়া অধীনভাবে কার্য করিতে অভ্যস্ত না হইতেছেন, ততদিন পরমেশ্বর ইহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

দূরদর্শী বিক্রমাদিত্য তাহার মৃত্যুর পর রাজ্য মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন বা গৃহবিবাদ না হয় সে জন্য সমস্ত রাজ্য বিভক্ত করিয়া প্রতাপাদিত্যকে দশ আনা এবং বসন্ত রায়কে ছয় আনা অংশ প্রদান করেন। বিক্রমের মৃত্যুর পর উভয়ে মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে রাজ্য-বিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিল। একদিকে প্রতাপের দুর্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা, অপর দিকে বসন্ত রায়ের স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট প্রশান্তভাব, এই পরস্পর বিরোধী বৃত্তি কখন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। প্রতাপের মনোগতভাব বসন্ত রায়ের জ্ঞানগোচর হইতে বিলম্ব রহিল না। যাহাতে প্রতাপ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত না হন, সে বিষয়ে বসন্ত রায় যথোচিত চেষ্টা ও তাহাতে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রতাপও পিতৃব্যকে স্বীয়

মতে আনয়ন করিয়া একত্র মিলিত হইয়া কার্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহা না হইয়া বিপরীত ফল প্রসূত হইল। যে সময় রাজ্যবিভাগ হয়, সে সময় প্রতাপ পিতৃব্যের নিকট হইতে যথোচিত-স্থান বিনিময় করিয়া সমুদ্রতটবর্তী চাকশ্রীপুর বা চাকসিরি পরগণা[৮] প্রাপ্তির জন্য সবিশেষ প্রার্থনা করেন। মগ ও ফিরিঙ্গি আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা এবং নৌবলসংস্থাপন বিষয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী ; প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের নিকট বিফল-মনোরথ হইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। এই সময় হইতে যশোহর প্রদেশের প্রজা সকল বহু প্রয়াসে কোন পদার্থ প্রাপ্ত না হইলে মনের আবেগের সহিত কহিয়া থাকেন, "সারা রাত ঘুরে মরি, তবু না পাই চাকসিরি।"[৯]

বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপের বাল্যকালের ধারণা সকল যুগবৎ স্মৃতিপথে উদয় হইল। প্রতাপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি পৃথিবীর সকলের নিকট মূর্তিমান ধর্ম বলিয়া কথিত হইলেও কিন্তু তিনি জ্ঞাতির নিকট অত্যন্ত স্বার্থপর ; সকলের কাছে তিনি প্রিয়বাদী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও কিন্তু অপ্রিয় বাক্যে জ্ঞাতির হৃদয়বিদারণে সর্বদা তৎপর ; অন্য লোকের নিকট দাতা ও বিনয়ী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও জ্ঞাতিবর্গের দারিদ্র্য দূর করিবার সময় তিনি দরিদ্র এবং আপন বিভব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের কাছে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রতাপ চাকসিরি পরগণা-লাভে অকৃতকার্য হইলে, পূর্ববঙ্গের আধিপত্য আপনার পক্ষীয় লোকের অধীনে রাখিবার জন্য বসুবংশপাবন মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীর বিবাহকার্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করান।[১০] কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ। এই বীরবর হোসেনপুরে মুসলমানগণকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এ প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বাসুরিকাটি, মাধবপাশা, ক্ষুদ্রকাটি নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।[১১] রামচন্দ্র উত্তরকালে পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং বহুল-সৈন্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র বঙ্গের একজন প্রধান বীরপুরুষ; ইনি বহুসংখ্যক যুদ্ধে ফিরিঙ্গি ও মগগণকে পরাস্ত করেন। ইনি একবার ভুলুয়ার অধিপতি প্রবল-প্রতাপ লক্ষ্মণমাণিক্যকে সমরাঙ্গণে পরাস্ত ও বন্দি করিয়া আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রতাপ এরূপ অসাধারণ জামাতা প্রাপ্ত হইয়াও কিন্তু সুখী হন নাই। কেহ কেহ কহেন, প্রতাপাদিত্য স্বীয় জামাতাকে নিহত করিয়া তাহার রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত মিলিত করিবার অভিপ্রায়ে রামচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিতে মনন করেন। প্রতাপের কন্যা বিন্দুমতী এই দুরভিসন্ধির কথা অবগত হইয়া স্বীয় স্বামীসমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করেন। রামচন্দ্র এ-কথা অবগত হইয়া শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে প্রতাপের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া পলায়ন করেন।[১২] অপর কেহ কেহ কহেন, বসন্ত রায় ও তাহার পুত্রগণ রামচন্দ্রের মনোমধ্যে এরূপ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করেন যে, রাজ্যলোলুপ প্রতাপ তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন এবং অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বধ করিতে বিলম্ব করিবেন না।

কেহ কেহ কহেন, বিবাহ রাত্রিতেই প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিতে মনস্থ করেন ; রামচন্দ্র উদয়াদিত্যের সাহায্যে বসন্ত রায়ের গৃহে নিমন্ত্রণে গমনকালে পলায়ন করেন। কেহ কেহ কহেন, রামচন্দ্রের সহাগত এক ধূর্ত বিদূষক নাপিত (রমাই ভাঁড়) অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ-মহিষীর সহিত নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, এ জন্য প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে নিহত করিতে সঙ্কল্প করেন।

রামচন্দ্র শ্বশুরের হৃদয় দুর্বাসনা-পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন, রামনারায়ণ নামক রামচন্দ্রের একজন অকুতোভয়, অমিত পরাক্রম ভৃত্য ছিলেন ; তিনি রামচন্দ্রকে শোকসন্তপ্ত অবলোকন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র

সমস্ত বিবরণ আনুপূর্বিক কীর্তন করিলেন। রামনারায়ণ তাহাকে স্কন্ধদেশে আরোপণ করিয়া, যে স্থানে তাহাদিগের নৌকা সকল অবস্থান করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হন। রামচন্দ্র নিরাপদে আপন নৌকাতে উপস্থিত হইলে ষাট জন দাঁড়ীকে নৌকা চালাইতে আজ্ঞা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে তাহার নির্বিঘ্নে গমন-বার্তা জানাইবার জন্য কামানরাজীতে অগ্নি-সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞার সহিত নৌকা সুসজ্জিত ও কামানে অগ্নি প্রদত্ত হইল। নিশীথকালের নিস্তব্ধ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া কামানের গম্ভীর শব্দ দিক্‌সকলকে কম্পিত করিয়া তুলিল। প্রতাপ অকস্মাৎ কামানের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন ; লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্রের গমনকথা তাহাকে নিবেদন করিল। প্রতাপ দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রামচন্দ্র প্রতাপের সহিত সুহৃৎসূত্র ছিন্ন করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

রামচন্দ্রের গমনের পর হইতে প্রতাপ বসন্ত রায়কে এই সকল গৃহ-বিবাদের কারণ বলিয়া অবধারণ করেন। প্রতাপের হৃদয়ে আশৈশবকালের সমস্ত প্রসুপ্ত ঘটনা জাগরিত হইল। তিনি প্রত্যেক ঘটনাতে খুল্লতাতের কুটিলতাই দেখিতে লাগিলেন। তাহাকেই তিনি পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ স্থির করিলেন ; তিনিই চক্রান্ত করিয়া তাহাকে পিতৃ-স্নেহবঞ্চিত এবং দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-বিভাগের সময় উত্তম স্থান সকল গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাহার রাজ্য, ধন ও মিত্র বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ; কিসে তাহার অবনতি ও গৃহ-বিবাদ হয়, বসন্ত রায় সর্বদা পুত্রগণসহ এই সকল চিন্তা করেন—প্রতাপাদিত্য এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। খুল্লতাত বসন্ত রায়ের চক্রান্তে জামাতার সহিত তাহার এইরূপ ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ ধ্রুব-বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

প্রতাপ যৎকালে জননী জন্মভূমির উদ্ধার-সাধনের জন্য পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা চিন্তাক্রান্ত, যখন তিনি জনসাধারণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য-সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়ব্রত, যখন তিনি সর্বভূতের মিত্রতালাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই কঠিন সময়ে তাহার গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হয়।

বসন্ত রায়ও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, প্রতাপের হৃদয় তাহার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ। ইহা তিনি অবগত হইয়াও তাহা ক্ষালনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করাতে তাহা ক্রমশ দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। কিরূপে এই ধর্মাবরণ-আচ্ছাদিত কুটিল ভক্তের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়, প্রতাপ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে উভয়ের মন এরূপ বিভীষিকাগ্রস্ত হইল যে, উভয়েই উভয়ের মৃত্যুকামনায় ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন, এইরূপ ধারণা উভয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

এক সময় বসন্ত রায় পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বীয় গৃহে প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করেন। অত্যন্ত বিরোধ থাকিলেও প্রতাপ পিতৃব্য কর্তৃক আহূত হওয়াতে তিনি পূর্বশত্রুতা বিস্মৃত হইলেন। প্রতাপ যথাসময়ে বিশ্বস্তভাবে কয়েক জন বন্ধু সহ পিতৃব্যগৃহে গমন করেন। গোবিন্দ রায় বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; প্রতাপকে আগমন করিতে দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন ; প্রতাপ বসন্ত রায়ের সমীপবর্তী হইলে, বসন্ত রায় ঘটনাক্রমে গৃহান্তর হইতে তাহার একজন পরিচালককে শীঘ্র "গঙ্গাজল" আনয়ন কর বলিয়া গঙ্গাজল আনিতে আদশ করেন। "গঙ্গাজল" বসন্ত রায়ের প্রিয়তম আয়ুধ, ইহা তাহার জীবনসহচর। প্রতাপ দূর হইতে "গঙ্গাজল" আনয়নের আদেশ শ্রবণ করিয়া, পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ কোথায় আমরা আগমন করিলাম?" এই কথা কহিয়া আপন তরবারি কোষনির্মুক্ত করেন। গোবিন্দ রায়,

পিতার গঙ্গাজল আনয়নের আজ্ঞা দূর হইতে শ্রবণ এবং প্রতাপকে মুক্ত-কৃপাণহস্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া অনতিবিলম্বে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করেন, দৈবক্রমে গোবিন্দ রায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতাপের শরীরে অণুমাত্র বিদ্ধ না হইয়া ব্যর্থ হইল। পদদলিত প্রসুপ্ত সিংহের ন্যায় প্রতাপ এক লম্ফ প্রদান করিয়া গোবিন্দ রায়কে আক্রমণ করিলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে তাহাকে পরাস্ত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করেন। গোবিন্দ রায়কে নিহত করাতে প্রাসাদ মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। বসন্ত রায় ও প্রতাপের পক্ষীয় লোক সকল শস্ত্রপাণি হইয়া পরস্পরের সাহায্যে আগমন করিতে লাগিল ; শান্তিপূর্ণ রাজভবন অকস্মাৎ যুদ্ধস্থলের প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিল।

প্রতাপ গোবিন্দ রায়কে নিহত করিয়া ত্বরিতগতিতে বসন্ত রায়ের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। বসন্ত রায় প্রতাপকে রক্তাক্ত কলেবরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গাজল" অস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বসন্ত রায়ের রক্ষার জন্য প্রহরিগণ দ্রুতবেগে আগমন করিল ; প্রতাপ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষণ তরবারি-প্রহারে বসন্ত রায়কে যম-ভবনে প্রেরণ করিলেন। জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, রামকান্ত, মধুসূদন, মাণিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের পুত্রগণ নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরগণ সংযতভাবে অবস্থান করিয়া অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বসন্ত রায় ও তাহার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তাহার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ আত্মরক্ষার্থে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বসন্তরায়-মহিষী বালক রাঘবের প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কচুবনে লুকাইয়া তাহাকে রাখেন, এই উপায়ে রাঘবের প্রাণ রক্ষিত হয় বলিয়া তিনি 'কাঁচু রায়' নামে অভিহিত হন। এই অল্প সময়ের মধ্যে পুত্রগণসহ বসন্ত রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজালের ন্যায় এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল, আভ্যন্তরিক রহস্য অবগত না হওয়াতে পৃথিবীমধ্যে এইরূপ কত শত কাণ্ড হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি সামান্য কারণে পৃথিবীর মধ্যে কত শত বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? রাজসূয়যজ্ঞকালে জলমগ্ন দুর্যোধনকে দর্শন করিয়া যদ্যপি পাণ্ডবেরা হাস্য না করিতেন, তাহা হইলে লোকক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র-সমর সংঘটিত হইত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যদি বসন্ত রায় সে সময় গঙ্গাজল আনয়ন করিতে না কহিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রতাপাদিত্যকে জ্ঞাতিবধজনিত পাপভাগী হইতে হইত না। এইক্ষণ প্রলয়কর কার্য সম্পন্ন হইলে পর যাহাতে আর না হত্যাকাণ্ড হয়, প্রতাপ তাহার সুব্যবস্থা করিলেন। বসন্ত রায়ের অনুচরবর্গকে নিরস্ত্র করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য তিনি একজন উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। বসন্ত রায়ের মহিষী স্বামী ও পুত্রগণের মৃত্যুশোকে অধীর হইয়া সহমৃতা হন। প্রতাপাদিত্য কচুবন হইতে বালক রাঘবকে আনয়ন করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিবার জন্য মহিষী-হস্তে ন্যস্ত করেন। এই লোমহর্ষণ ঘটনার সময় বসন্ত রায়ের চাঁদ রায় এবং অপর কয়েকটি পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহাতেই তাহারা সে সময় অনিবার্য মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান।

বসন্ত রায় একজন রাজকার্য-নিপুণ প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য যেরূপ অসিবলে স্বীয় প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করেন, বসন্ত রায় সেইরূপ সামাজিক রাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার প্রাধান্যলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি রাজকার্য হইতে অবসর পাইলেই অধিকাংশ সময় বিদ্বান ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব কবিদিগের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রালাপ কিংবা কবিতা-রচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহার সভাস্থল গোবিন্দদাস প্রভৃতি সে সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ কর্তৃক সর্বদা অলঙ্কৃত থাকিত। গোবিন্দদাস-রচিত অনেকগুলি পদে আমরা

বসন্ত রায়ের নাম দেখিতে পাই। বসন্ত রায় একজন সুকবি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; তাহার নামের ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে কতকগুলি পদ এরূপ সুললিত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রেমপূর্ণ যে, তাহা বারংবার পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হওয়া যায় না। বসন্ত রায় বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কালীঘাটের হালদারদিগের পূর্বপুরুষ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কালীঘাটে অবস্থান করিতেন। বসন্ত রায় তাহার অলৌকিক কার্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাহাকে গুরুপদে বরণ করেন। বসন্ত রায় গুরুর আদেশানুসারে ভগবতীর পর্ণকুটীরের পরিবর্তে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

বসন্ত রায় শাক্ত হইয়াও কখন বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না, বরং প্রগাঢ় বৈষ্ণব ছিলেন ; বোধ হয়, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণের সঙ্গগুণে তাহার বৈষ্ণবপ্রীতি বর্ধিত হইয়াছিল। এরূপ কিংবদন্তী আছে, খেতরীর বৈষ্ণবমহোৎসবে বসন্ত রায় গমন করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তনের অতুলনীয় বিমল সুখানুভব করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সময় হইতে তিনি ঠাকুর বসন্ত রায় নামে অভিহিত হন।[১৩]

বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাহার জামাতা রূপরাম বসু এবং তাহার প্রধান কর্মচারিগণ মিলিত হইয়া প্রতাপের এই কার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মন্ত্রণা করেন। সকলে একমত হইয়া বসন্ত রায়ের পরমবন্ধু হিজলি কাঁথির অধীশ্বর প্রবল-পরাক্রান্ত ঈশা খাঁ মছন্দরীর[১৪] নিকট গমন করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে সিদ্ধান্ত করিয়া হিজলী-অভিমুখে গমন করেন। রূপরাম-প্রমুখ বসন্ত রায়ের আত্মীয় ও কর্মচারিগণ মছন্দরীর নিকট উপস্থিত হইয়া শোকোদ্দীপক জ্বলন্ত বাক্যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ বন্ধুর বিপদে বিপন্ন হইয়া কি উপায়ে বন্ধুপুত্রের উদ্ধারসাধন হইতে পারে, কেমন করিয়া প্রতাপের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা যাইতে পারে, সে জন্য তিনি সম্ভ্রান্ত কর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করেন।

এ সময় বঙ্গের প্রায় অধিকাংশ রাজন্যবর্গ প্রতাপের আদেশানুবর্তী, এরূপ অবস্থাতে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে বঙ্গের সমস্ত নৃপতির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে ; সুতরাং বাহুবলে রাঘবের উদ্ধার নিতান্ত সামান্য কথা নহে। এ সমস্যাভঞ্জনে তাহারা অপারগ হইলে ঈশা খাঁর সেনাপতি বলবন্ত মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "রাজন্, আপনি চিন্তাক্রান্ত হইবেন না, এ দাসকে আজ্ঞা করুন, সেবক একাকী শত্রুপুরী মধ্যে গমনপূর্বক রাঘবকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিবে।" ঈশা খাঁ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ বলবন্তের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ উপায়ে একাকী সূর্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি মহাবীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত মৃন্ময়-প্রাকারপরিবেষ্টিত দুর্গ অতিক্রম করিয়া রাঘবের উদ্ধার সাধনে সফলকাম হইবে? তুমি কোন্ মন্ত্রবলে দিবারাত্র প্রহরীর কার্যে তৎপর অসংখ্য প্রহরিগণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং কিরূপেই বা যুদ্ধনিপুণ ফিরিঙ্গি-নৌসেনাগণকে পরাস্ত করিতে পারগ হইবে। আমরা তোমার বাক্যের মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি।" মহাবীর বলবন্ত ঈশা খাঁ কর্তৃক এরূপ অভিহিত হইলে তিনি প্রণতিপূর্বক কহিলেন, "দেব! মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ যুদ্ধবিশারদ, সেইরূপ সত্যবাদী। আমি মনন করিয়াছি যে, একাকী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কিছু গোপনীয় বিষয় বক্তব্য আছে বলিয়া তাহাকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যাইব এবং সুযোগক্রমে তাহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া আমার অধীনস্থ করিব। সেই সময়ে তিনি যদি আমার কোনরূপ অপকার না করিয়া কাঁচু রায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিব, অন্যথা তাহাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ স্বামিকার্যে অর্পণ করিব। আমার দৃঢ় ধারণা যে, এই উপায়ে বিনা রক্তপাতে

আমাদের অভীষ্ট সাধিত হইবে। কাঁচু রায়কে কোনরূপে হস্তগত করিতে পারিলে পর আমাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে গ্রহণ করা প্রতাপাদিত্যের ত দূরের কথা, এমন কি বঙ্গের সমবেত রাজন্যবর্গও পারেন কি না সন্দেহের কথা। আমাদিগের এই দুর্গম প্রদেশ আপনা কর্তৃক সুরক্ষিত হইলে, কাহার সাধ্য ইহাকে আক্রমণ করে?" বলবন্তের এইরূপ বীরবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

বলবন্ত সর্বোপকরণসম্পন্ন একখানি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া যশোহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ষষ্টিজনবাহিতা নৌকা অল্পসময়ের মধ্যে ভয়াল হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল সুন্দরবন অতিক্রমণ করিয়া প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাটে উপস্থিত হইলে, বকুলছায়া সমন্বিত ধূমঘাটের প্রশস্ত পদবী অতিক্রমণ করিয়া বলবন্ত রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হন এবং স্বীয় আগমনবার্তা প্রতাপের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপ যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলবন্তকে গ্রহণ করিয়া ঈশা খাঁর কুশলকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলবন্ত প্রতাপের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া নির্জন স্থলে তাহার কিছু বক্তব্য আছে নিবেদন করেন। অসঙ্কুচিতচিত্ত প্রতাপ বলবন্তকে এক নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলে রাজ্যসম্বন্ধে উভয়ের নানা প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভীমবল বলবন্ত মৃগোপরি পতিত ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপের উপর পতিত হইলেন এবং তাহাকে ভূপাতিত করিয়া কোষমুক্ত শাণিত তরবারির অগ্রভাগ প্রতাপের বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন। প্রতাপ গৃহাগতের ঈদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া বলবন্তকে তাহার এরূপ অন্যায় কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলবন্ত জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে আপনার জীবন ও মরণ আমার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে এই শাণিত তরবারি আপনার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া পৃথিবী স্পর্শ করিবে। আমার প্রভুর পরমমিত্র বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব রায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আপন রাজধানীতে উপস্থিত হই, ততক্ষণ আপনি আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আপনি জীবনলাভ করিতে পারেন, অন্যথা আপনাকে ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিব।"

প্রতাপ বলবন্তের অসীম সাহসে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে তাহার এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বলবন্তের করাল পাশ হইতে মুক্ত হইবার কোন পন্থা না দেখিয়া অগত্যা তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন। প্রতাপ বলবন্তের বাক্যানুসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পুনরায় সভাগৃহে আগমন করিলেন, তিনি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলবন্তকে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়া কাঁচু রায়কে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় করেন। বলবন্ত নির্বিঘ্নে বিনা রক্তপাতে স্বামিকার্য সম্পন্ন করিয়া কাঁচু রায়সহ অচির-কালমধ্যে হিজলিতে উপস্থিত হন। ঈশা খাঁ, রূপরাম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, বলবন্তকে অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ-উৎস প্রবাহিত হইল। তাহারা প্রাণের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সম্মাননা করিলেন। সকলে তাহার অদ্ভুত পরাক্রমের কথা আগ্রহের সহিত বারংবার শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

বলবন্তের সফলতা-জনিত আনন্দোচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হইলে ঈশা খাঁ মছন্দরী প্রতাপের ভুজবল হইতে আপন রাজ্যরক্ষা করিবার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। পদদলিত ভুজঙ্গ যেরূপ অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ প্রতাপাদিত্য এ অবমাননার প্রতিশোধ না লইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিবেন বলিয়া আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব তাহা কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্বে আমাদিগের ঘোরতর সমরসজ্জায় সজ্জিত

হওয়া উচিত। এই বলিয়া মহাবল ঈশা খাঁ আশু ঘোরতর সমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে দুর্গ সকল অধিকতর দুর্গম করা হইল, আগ্নেয় অস্ত্র সকল সুসজ্জিত করিয়া প্রাকারোপরি স্থাপিত হইল ; অবরুদ্ধ হইলে যাহাতে সৈন্যগণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পতিত না হয়, সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ধান্য সংগৃহীত হইল, পরমোৎসাহের সহিত বলবন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রতাপ বলবন্ত কর্তৃক নির্জিত হইয়া, কতক্ষণে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, কতক্ষণে সৈন্যসহ ঈশা খাঁকে রণস্থলে পরাস্ত করিবেন, কতক্ষণে পুনরায় কাঁচু রায়কে হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন, সেই সকল চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রিগণকে বলবন্তের আচরণ জ্ঞাপন করিয়া, কতক্ষণে হিজলিনগর পদদলিত করিবেন, কতক্ষণে বিপক্ষগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন, কতক্ষণে হিজলির রাজকোষ স্বীয় কোষাগারে আনীত হইবে, মন্ত্রিগণসহ তিনি এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, সূর্যকান্ত, রুডা[১৫] প্রভৃতি বীরগণ অল্পসময়ের মধ্যে হিজলী নগরী ধূলিসাৎ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন এবং হিজলী-অভিযান জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রুডা প্রমুখ ফিরিঙ্গি নৌ-সেনা-নায়কগণ যুদ্ধপোত সকল রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন ; পূর্বদেশীয় পার্বত্যসেনাপতি মহাবল রঘু আপন সৈন্যগণকে ঘোরতর যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; ঢালী সেনা-নায়ক মদনমল এবং অশ্বারোহী চমূপতি প্রতাপসিংহদত্ত আপন অধীনস্থ সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপে যশোহর অকস্মাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে কোন্ দেশ পরাজয় করিবেন, কেহই এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পুরনারীগণ আপন আপন পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি যুদ্ধস্থলে গম্যমান স্বজনবর্গের বিজয়-কামনায় যশোহরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নানাপ্রকারে পূজা করিতে লাগিলেন। কি স্ত্রী, কি বালক, সকলেই অতীত যুদ্ধে আপন আপন স্বজনবর্গ কিরূপে ভৈরব বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুপক্ষীয়গণকে যুদ্ধস্থলে বন্দি করিয়াছিলেন, কিরূপে অকাতরে শত্রুপ্রহার সহন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, এই সকল অতীত বিষয় লইয়া পরস্পর স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। যথাসময়ে সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহার সিদ্ধিদাত্রী ভগবতী যশোরেশ্বরীর মহাসমারোহের সহিত পূজনাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জাহাজঘাটাতে[১৬] রণপোতে আরোহণ করত হিজলি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রণপোত সকল অল্পদিনের মধ্যে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে হিজলির সমীপবর্তী হইয়া চতুর্দিক হইতে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। পদাতিক ও অশ্বারোহিগণ রণতরী হইতে অবতরণ করিয়া স্থলপথ রোধ এবং শত্রু-পক্ষের সংবাদপ্রাপ্তির দ্বার রুদ্ধ করেন। ঈশা খাঁ মছন্দরী জলে ও স্থলে প্রতাপসৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া ঘোরতর বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের অবসরপ্রাপ্ত হওয়াতে, বীরবর বলবন্ত মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর হিত-সাধনের জন্য ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন নৌসেনার অগ্রবর্তী হইয়া অসীম বুদ্ধিমত্তা ও শূরতার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কখন বা পদাতিক অথবা অশ্বারোহী সৈন্য-পরিচালনা করিয়া বিপক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধের অবতারণা করিতেছেন। অমিতবিক্রম বলবন্তের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশা খাঁর সৈন্যগণ প্রাণপণ করিয়া ভৈরব-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে প্রতাপাদিত্য যুদ্ধনিপুণ অক্লিষ্টকর্মা সেনাপতিগণসহ ঈশা খাঁর সৈন্যগণের উপর অবিরত অগ্নিময় গোলকরাজী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, সূর্যকান্ত, রঘু, মদন প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রতাপের সন্তোষ-সম্পাদনের জন্য জলপথে ও স্থলপথে স্বীয় স্বীয় বাহিনী পরিচালনা করিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় শত্রুসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ফেরঙ্গকুলোদ্ভব কূটযুদ্ধনিপুণ রুডা নানাস্থান হইতে হিজলির উপর লোকক্ষয়কর ভীষণ গোলক সকল নিক্ষেপ করত সমূহ অনিষ্ট-সম্পাদন করিয়া হিজলিবাসিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই ঘোরতর সংগ্রামের অষ্টাদশ দিবসে হিজলিপতি ঈশা খাঁ মছন্দরী যুদ্ধ করিবার সময় গোলকাঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করেন। ঈশা খাঁর পতনে তাহার সৈন্যসকল হতবীর্য হইয়া পড়ে, এই সুযোগে প্রতাপের সৈন্যসকল দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মথিত, দলিত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহে পাদপদল যেরূপ দশা প্রাপ্ত হয়, ঈশা খাঁর সৈন্যগণও প্রতাপ-সৈন্য কর্তৃক সেই দশা প্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ বিপক্ষ-প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিল। মহাবীর বলবন্ত তাহাদিগকে কোনরূপে সংযত করিতে না পারিয়া স্বয়ং কতিপয় সৈনিকসহ প্রতাপের সৈন্য-সমুদ্রে অবগাহন করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অল্পক্ষণমধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়া বীর-লোক প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গদেশে যৎকালে মুসলমানগণ রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন, তাহারা তাহাদিগের সেই সৌভাগ্যের দিনে হিন্দুর সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুরাও আবার মুসলমান-স্বামী বা বন্ধুর স্বার্থ-সংরক্ষণ জন্য প্রাণপণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাহারা জানিতেন, উভয়ের স্বার্থ উভয়ের সহিত জড়িত, এজন্য তাহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করিতেন। আবার যদি কখন হিন্দু মুসলমান একপ্রাণে মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তখন ইহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য উদয়ের বিলম্ব থাকিবে না।

প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করিয়া রূপরাম ও কাঁচু রায়কে ধরিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। রূপরাম ঈশা খাঁর পতনের আর বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া ইতিপূর্বেই কাঁচু রায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতাপ কাঁচু রায়কে হস্তগত করিতে না পারাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন। প্রতাপাদিত্য হিজলি-বিজয় করিয়া প্রচুর-পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হন। তিনি অনতিবিলম্ব হিজলি রাজ্যের শাসন ও রাজস্ববিষয়ক সুব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ ও তথাকার দুই জন প্রধান হিন্দু কর্মচারীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

প্রতাপ হিজলি-অধিপতি ঈশা খাঁকে নিহত ও তাহার সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করত বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। নগরবাসীরা প্রতাপের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ সকল নির্মাণ এবং আপন আপন গৃহ সুশোভিত করিয়া বীরপ্রবর প্রতাপের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রতাপের আগমনে যশোহর সজীব হইয়া উঠিল। প্রশস্ত রাজপথ, গৃহে ছাদ ও গবাক্ষ সকল লোকপরিপূর্ণ হইল, আনন্দরোলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রতাপ যশোহরে পদার্পণ করিয়া সর্বপ্রথমে ভগবতী যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া নানাবিধ উপচারে জগজ্জননীর পূজা, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং সৈন্যগণকে নানা প্রকার দ্রব্যে পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া তাহাদিগের গুণানুসারে সকলকে বহুবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে সময় হিজলি-অধিপতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন, সেই সময় তাহার রাজ্যের পূর্বপ্রদেশে বিক্রমপুরের অধীশ্বর কেদার রায়, চাঁদ রায় নামক বীরদ্বয় সুযোগ বুঝিয়া প্রতাপের সহিত মিত্রতা-সূত্র ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজ্যশাসন করিবার জন্য বহুল সৈন্য সংগ্রহ করেন। চারচক্ষু প্রতাপ কেদার রায়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে কিয়দংশ সৈন্য বিক্রমপুরাভিমুখে প্রেরণ করিয়া, যশোহর হইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে বিক্রমপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অবিরত দিবারাত্র গমন করিয়া প্রধান সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া কিরূপ প্রণালীতে যুদ্ধক্রিয়া পরিচালনা করিবেন, সে বিষয়

সেনানীগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। যুগপৎ চতুর্দিক হইতে অকস্মাৎ কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিমোহিত করিতে সকলেই অভিমত প্রকাশ করিলেন। এতদনুসারে শঙ্কর, সূর্যকান্ত, প্রতাপ সিংহ, মদন, রঘু প্রভৃতি সেনানীগণ কেদার রায়ের রাজধানী চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। ব্যাধগণ মৃগয়াকালে অরণ্যের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রতাপসৈন্য চতুর্দিকে অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেদার রায় প্রতাপকে আগমন করিতে দেখিয়া, গতিরোধ করিবার জন্য ঘোরতর-বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। শত্রুপক্ষের কেহই প্রতাপের সেনাজাল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুপুরীর উপর প্রতাপ-সৈন্য অবিরত অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেদার রায়, মধু রায় প্রভৃতি বীরগণ প্রতাপ কর্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়াতে পূর্বেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন ; সুতরাং এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতায় কোনরূপে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া কেদার রায় ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্মচারিগণসহ প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার চরণতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন। প্রতাপ কেদার রায়ের দুষ্টাচরণ জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। আর কখন এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, জননী জন্মভূমির শত্রুগণকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সকলের সহিত মিলিত হইবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে সকল মহাপ্রাণ মুসলমান বা হিন্দুগণ একপ্রাণে কার্য করিতেছেন, তাহাদিগকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিবেন, প্রতাপ কেদার রায়কে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। মহাবীর প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহানল নির্বাণ করিয়া কেদার রায়কে তাহার পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার তাহাকে সম্মানিত করিলেন।

১৫৮৬ খ্রিঃ রালফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক জনৈক ইংরাজ আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, শ্রীপুরের (বিক্রমপুরের অন্তর্গত) অধীশ্বর চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলে একত্র মিলিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এ দেশ নদ, নদী ও দ্বীপবহুল হওয়াতে মোঘলসৈন্য তাহাদিগের বড় কিছু করিতে পারিত না, বেগতিক দেখিলে বাঙালিরা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। ফিচের কথায় অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায় ও চাঁদ রায় বীরযুগল প্রতাপের সহিত ১৫৮৬—৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মিলিত হইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাঠকের কৌতূহল-তৃপ্তির জন্য আমরা ফিচের লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—From Bacola I went to Serrepore which standeth upon the river of Ganges, the king is called Chondery (চাঁদ রায়)। They be all hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar : for here so many rivers and Islands, that they flee from one to another whereby his horsemen connot prevail against them[১৭] ১৫৮৯ খ্রিঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ফিচ এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া সিংহলাভিমুখে গমন করেন ; সুতরাং ইহার পূর্বেই প্রতাপ প্রভৃতি বীরগণ আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করেন, ইহা আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি।

প্রতাপের সময় ভৌমিক রাজন্যবর্গ ব্যতীত আমাদের দেশে ছোট-বড় অনেকগুলি জমিদার ছিলেন। তাহাদিগের অবস্থা অনুসারে সকলেরই কমবেশি কিছু না কিছু পদাতিক বা পায়িক সৈন্যও থাকিত। এই সকল পদাতিক সৈন্য, দেশের সকল প্রকার লোক দ্বারা গঠিত হইত। ইহাদিগকে পরিচালন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তি নায়করূপে নিযুক্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ আদি উচ্চবর্ণ জন্মতঃই জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহারা যদি সেনানায়কগুণে বিভূষিত হন, তাহা হইলে তাহাদের সেনাদল যুদ্ধস্থলে অজেয় হইয়া থাকে। কেন না, ব্রাহ্মণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে, ঘোরতর বিপদে তাহার শরীররক্ষা এবং তাহার সহিত অনুগমন করিতে হিন্দু-হৃদয় যেরূপ স্বভাবত সুশিক্ষিত,

সেরূপ আর কোন জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় না। এরূপ স্থলে গো-ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য, দেশের গৌরব-বিবর্ধন জন্য হিন্দুগণ ব্রাহ্মণনেতৃগণ কর্তৃক আহূত হইলে তাহারা আত্মীয়-স্বজনের মায়ামমতা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-বিজয়-বৈজয়ন্তীর নিম্নদেশে আগমন করিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতঃ মুসলমান হিন্দুগণকে নির্জিত করিলেও তাহারা পুনঃ পুনঃ হিন্দুভুজবলের দারুণ প্রহারে বিব্রত হইয়াছিলেন। প্রতাপের রাজ্যের ভিতর অনেকগুলি সামন্ত জমিদার ছিলেন। প্রতাপ তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত সম্মিলিত করেন নাই। প্রতাপ তাহাদিগকে তাহার অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন মাত্র। সে সময় বাংলার জমিদারবর্গের প্রায় সকলেই তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রতাপ নামের প্রতাপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রতাপ বিনা রক্তপাতে স্বদেশীয় জমিদারদিগকে করদ করিতে পারিলে, কখন তরবারি কোষ-নির্মুক্ত করিতেন না। এ বিষয় একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রতাপের সময় রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ নামক একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। এই বংশ ইছাপুরের হড়চৌধুরী নামে খ্যাতিলাভ করে। হড়চৌধুরীরা কান্যকুব্জাগত দক্ষের সন্তান কাশ্যপগোত্রীয়। প্রতাপ সিদ্ধান্তবাগীশকে করদ করিবার জন্য বিপুল সৈন্যসহ যশোহর হইতে বহির্গত হন। প্রতাপ সৈন্যসহ বর্তমান গোবরডাঙ্গার সন্নিকট (বনগাঁ মহকুমাতে) শিবির-সংস্থাপন করিয়া ভাবী যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশও সহজে অবনত হইবার পাত্র নহেন, তিনিও সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এরূপ কথিত হয় যে, রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ স্বদেশীয়ের শোণিত-ধারায় ধরণী আরক্ত করা অপেক্ষা প্রবল-প্রতাপ প্রতাপের করদ হইতে ইচ্ছা করেন, এজন্য তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে অতি প্রত্যুষে প্রহরী-পরিবেষ্টিত শিবির সকল অতিক্রমণ করিয়া প্রতাপের শয়নকক্ষে উপস্থিত হন। গুণগ্রাহী ও ব্রাহ্মণভক্ত প্রতাপ রাজর্ষিকল্প ব্রাহ্মণকে শিবিরে উপস্থিত দেখিয়া যথাবিহিত পূজা করিয়া তাহার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। এইরূপে আসন্ন দারুণ যুদ্ধের পরিবর্তে উভয়ে পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই উপলক্ষে নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না। সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপকে স্বীয় শিবিরে ভোজন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। প্রতাপ বিনয় সহকারে ব্রাহ্মণ-শিবিরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত হন।[১৮] প্রতাপ যে স্থলে শিবির সন্নিবেশ করেন, সেই সময় হইতে সেই স্থানে প্রতাপপুর নাম ধারণ করিয়া অতীত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রতাপ পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া পর্তুগিজ জলদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করেন। এই সকল মনুষ্যত্ববিহীন বৈদেশিক জলদস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গোপসাগরকূলপ্রদেশে প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন এবং বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ভেদ না করিয়া বন্দি করত স্থানান্তরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহাদিগের অত্যাচার এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, প্রজাগণ ইহাদিগের আগমনকথা শ্রবণ করিলে বজ্রাহতের ন্যায় ব্যামোহিত হইয়া পড়িত এবং আত্মরক্ষার্থ স্ত্রীপুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহারা মগগণ অপেক্ষা প্রজাগণকে অধিকতররূপে প্রপীড়ন করিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইহাদিগের অমানুষিক অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য আরাকানাধিপতি মঙ্গরাজাজীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

মগরাজ বঙ্গদেশ কখন আক্রমণ করিবেন না, উভয়েই পরস্পরের শত্রুকে শত্রুজ্ঞান করিবেন, উভয়েই ফিরিঙ্গি দস্যুগণকে কখনই আশ্রয় প্রদান করিবেন না এবং তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্য, আরাকান-অধিপতি মঙ্গরাজাজী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, সকলে সমবেত হইয়া ফিরিঙ্গিগণের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া

ফিরিঙ্গিগণকে বঙ্গোপসাগর-কূল হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এইরূপে ফিরিঙ্গি-আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করিয়া মগাধিপের সহিত দৃঢ়প্রণয়ে আবদ্ধ হন।

১. জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্।
আসমুদ্রকরগ্রাহী বভুব নৃপশার্দ্দুলঃ।। —ঘটকগ্রন্থ।

২. জগদ্দলগ্রামের কিয়দংশ রাজমহল নামে খ্যাত আছে। প্রতাপখনিত "রাজ-পুষ্করিণী" এখনও তাহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৩. সালিখাদুর্গের অস্তিত্বও কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪. বর্তমানকালে ধূমঘাট হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে এখনও বহুসংখ্যক ভগ্ন অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তৃত পুষ্করিণী এবং বকুল-বৃক্ষের ছায়াযুক্ত প্রশস্ত রাজপথ এখনও ধূমঘাটের পূর্ব-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৫. কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন একজন অসাধারণ বিদ্বান ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য ইহার সাত্ত্বিক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে গুরু এবং ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পুরোহিতপদে নিযুক্ত করেন। এরূপ কিংবদন্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্ধি-বিগ্রহাদি গুরুতর কার্যসকল গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সম্পন্ন করিতেন। ইনি কাশ্যপগোত্রে চট্টোপাধ্যায়বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. রামরাম বসু।

৭. মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। লেখক উক্ত মুদ্রা দেখিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সিদ্ধকাম হন নাই। উক্ত মুদ্রা যাহারা দেখিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট মুদ্রাঙ্কিত শব্দ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

সম্মুখভাগ। শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতি
শ্রীমন্মহারাজপ্রতাপাদিত্যরায়স্য।
পশ্চাদ্ভাগ। বজৎছিক্কাবছিমো জরবে
বাঙ্গাল মহারাজ প্রতাপাদিত্য জব্দাল।

৮. চাকসিরি বা চাকশ্রীপুর পরগণা বর্তমান বাকরগঞ্জ ও বরিশালের মধ্যে।

৯. উপরি উক্ত প্রবাদবাক্যটি কাহারও মুখে, "সাত রাত ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চাকসিরি" এরূপ পাঠান্তর শুনিতে পাওয়া যায়।

১০. ১৫১১ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে ফনসিকা (Fonseca) নামক জনৈক ইউরোপীয় পাদরি যশোহর নগরে উপস্থিত হন। যশোহরে আসিবার অল্পকাল পূর্বে ইনি বাকলাতে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে সময় রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম আট বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। পর্যটক আরও বলেন যে, বালক অল্পবয়স্ক হইলেও কিন্তু তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ ছিল। এ সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা হইতেছিল। সম্ভবত ইহার অল্পকাল পরেই রামচন্দ্রের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

১১. বাকলা-অধিপতি কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে রালফ ফিচ নামক জনৈক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ১৫৮৬ খ্রিঃ অব্দে বাকলায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলেন—'শ্রীপুর হইতে আমি বাকলাতে উপস্থিত হই। এ স্থানের রাজা হিন্দু, তিনি সৎপ্রকৃতির লোক, বন্দুক ছুঁড়িতে তিনি বড় ভালবাসেন। ইহার রাজ্য বৃহৎ ও উর্বরা, এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল, তুলা ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ স্থানের গৃহ সকল সুন্দর ও উন্নত, রাস্তা সকল প্রশস্ত, অধিবাসীরা নগ্নপ্রায়, কেবলমাত্র কটিদেশ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত রাখে। এ দেশের স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য রক্ষিত হইয়া থাকে; তাহারা গলায়, হাতে ও পায়ে রৌপ্য এবং তাম্র ও হস্তিদন্ত-নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৈদেশিক মানচিত্রে বাকলার নাম বড় অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

১২. প্রতাপের দৌহিত্র, রামচন্দ্রের পুত্র কীর্তিনারায়ণ সম্বন্ধে কায়স্থ-কারিকা গ্রন্থকার কহিয়াছেন ঃ—

"কীর্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ।।

মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গসৈন্যকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ।।
জাহাঙ্গিরপুরাধীশো নবাবযবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ।।"

১৩. প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামরাম বসু ইহাকে ঠাকুর বসন্ত রায় নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৪. মহারাজ বসন্ত রায় ঈশা খাঁর সহিত এক সময় পাগড়ি বদল করেন, তদবধি উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন। কেহ কেহ সোনারগাঁর ঈশা খাঁকে হিজলিপতির সহিত ভ্রম করিয়া থাকেন।

১৫. ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বহুসংখ্যক পর্তুগিজ ভারতীয় নৃপতিগণের অধীনে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের ভাগ্যচক্র পরিবর্তন করিতেন। এই সকল অক্লিষ্টকর্মা অধ্যবসায়ী পুরুষগণ বঙ্গোপসাগরকূলে কখন দস্যুবৃত্তি, কখন বণিকবৃত্তি, কখন বা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে সিবাস্তিন গঞ্জেলিস্ টিবো নামক একজন অজ্ঞাতকুলোদ্ভব অসমসাহসিক বীরপুরুষ কিছুদিন সন্দ্বীপে দোর্দণ্ডপ্রতাপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

Pyrard De Lavel নামক জনৈক ফরাসি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বহুসংখ্যক পর্তুগিজ বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং জীন গারী (Jean Garec) নামক এক দলপতি দশ সহস্রেরও অধিক সংখ্যক লোক লইয়া বাংলা দেশের রাজার অধীনে কর্ম করিতেন। এই বাংলার অধিপতিই কি আমাদের প্রতাপ? পায়রাড বলেন ঃ—

A large number of portuguese dwell in freedom at the ports on this coast of Bengal ; they are also very free in their lives being like exiles. They do only traffic, without any fort, order, or police, and live like natives of the country ; they durst not return to India, for certain misdeeds they have committed, and they have no clergy among them. There is one of them named Jean Garie, who is greatly obeyed by the rest ; he commands more than ten-thousand men for the king of Bengal—The Voyage of Pyrard De Laval. P. 334. vol I.

পাইরাড ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হন এবং কয়েক মাস অবস্থান করিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যান। ভবানন্দ মজুমদারের সনন্দের তারিখ অনুসারে প্রতাপ এই সময়ের কিছু আগে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন।

১৬. বর্তমানকালেও এ স্থানে প্রাচীন গৌরবের অণুমাত্র অবশেষ পতিত আছে। ইহা দেখিলে প্রাচীনকালে ইহা কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। পূর্বে এ স্থানে যমুনা নদী প্রবলরূপে প্রবাহিতা হইত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারও ঘোরতর পরিবর্তন হইয়াছে। এ স্থানের বিপরীত পারে দুধলে নামক স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জাহাজ সকল নির্মিত হইত। এখন প্রায় সার্ধশত স্থান, যেখানে জাহাজ সকল প্রস্তুত হইত, তাহার চিহ্ন-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭. Travels of Ralph Fitch by J. Horton Ryley, p p 118-19.

১৮. "বঙ্গীয় সমাজ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী B. L, মহাশয় বলেন যে, প্রতাপের পরাজয়ের পর রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মোঘল সেনানী মানসিংহের সভায় সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তাহার রচিত শ্লোকার্দ্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

সংখ্যাবান্ সাংখ্যতর্কাগম-নিগম-বিচারেষু বিশ্বপ্রকাশি।
সুশ্রীমান্ মানসিংহ প্রভৃতিনৃপতিভিঃ সৎকৃতোঽহয়ং সভায়াম্।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বীর-হৃদয়ের ধর্ম নহে। উদার-চরিত্র পুরুষগণ দাসত্ব প্রথার পরম শত্রু। মনুষ্যমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই, এই পরম পবিত্র মহামন্ত্র তাহারা প্রচার করিয়া থাকেন।[১]

মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপন করিয়া, এক্ষণে কিরূপে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা লাভ করে, কেমন করিয়া জননী জন্মভূমি মোঘলদিগের পাশব-অত্যাচার-বিমুক্ত হয়, কেমন করিয়া সমধর্মাবলম্বী বঙ্গীয়গণ আপন আপন পুত্রকলত্র, ধন, ধান্য বৈদেশিকদিগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে আপন আপন ধর্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, এই সকল বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর-হৃদয় প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি তাহার পরম গোপনীয় চিন্তার ভাগগ্রাহী বন্ধুগণের নিকট হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইতে পারে? কি প্রকারে পশুপ্রায় মোঘলগণকে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা যাইতে পারে? কেমনে আবার হিন্দু-বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র বঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উড্ডীন হইতে পারে? প্রতাপ অবসন্ন হৃদয়ে পুনরায় কহিলেন, "এই সকল দুর্বহ চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আমার হৃদয়-কন্দরে বৃশ্চিকদংশনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রদান করিতেছে। মুসলমানগণ গো-ব্রাহ্মণের প্রতি দারুণ পীড়া প্রদান করিতেছে ; কত শত লোক ক্ষুধার্ত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছে ; যখন এ সকল কথা স্মরণ করি, তখন আমি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না। এই রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ্য দ্রব্য সকল তখন আমার হলাহলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তি স্বজাতির দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হন, তিনি কি মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারেন? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের কি অলসভাবে অবস্থান করা উচিত? এ বিষয়ে আমাদিগের কি করা কর্তব্য, তাহার সদ্‌যুক্তি প্রদান করুন।"

প্রতাপ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীর ন্যায় এই সকল প্রশ্ন করিয়া নীরব হইলে, বাগ্মিবর শঙ্কর চক্রবর্তী কহিলেন, "রাজন্! যে সকল প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিলেন, তাহা আপনারই হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আপনার প্রশ্ন-অনুরূপ বিষয় সকল কার্যে পরিণত করা যে কত দূর ক্লেশসাধ্য, তাহা কল্পনা করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই মাতৃপূজনরূপ ঘোরতর উৎকট তপস্যায় ব্রতী হইতে হইলে, আমাদিগকে অসাধারণ দারিদ্র্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। এই অতুল ধনসম্পত্তি, ভোগবাসনা আপনাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে সমগ্র বঙ্গের দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মানবগণের মনোবৃত্তি একীভূত করিয়া সকলকে স্বাধীনতার জন্য উদ্‌বোধিত করিতে হইবে। রাজন্! ইতিপূর্বে সুলতান দাউদ মোঘলদিগের বিকট গ্রাস হইতে বঙ্গের স্বাধীনতারক্ষার জন্য ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াও কেবল স্বদেশবাসী জনসাধারণের সমবেদনা না পাওয়াতে এরূপ অকৃতকার্য হইয়াছেন। মোঘলগণ এক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত, উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ নৃপতিবর্গ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। দিন দিন উহাদিগের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় উহাদিগের পরাজয়-কল্পনা করিবার পূর্বে আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়-

রাজ্যের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিতে হইবে ; প্রজাশক্তির সহায়তা ব্যতীত আমরা শত চেষ্টা করিলেও উহাদিগকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইব না। বঙ্গদেশে এক্ষণে অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান। উড়িষ্যা প্রদেশে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিবর্গ পাঠানগণের সহিত মিলিত হইয়া অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন ; গোরক্ষপুর প্রদেশে শঙ্কররাম প্রভৃতি বীরপুরুষগণও ভৈরব বিক্রমে আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছেন ; বিহার প্রদেশে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত মোসম খাঁ-ই-কাবুলী প্রমুখ বীরগণ মোঘল সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া এখনও স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য বিপুল প্রযত্ন করিতেছেন। কোচবিহারাধিপতি মোঘলভীত লক্ষ্মীনারায়ণ মোঘলগণের সহিত মিলিত হইলেও, তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলগণের সহিত নিপুণতা পূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন। রাজন্! আপনার যদি বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে মোঘলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, এবং যাহারা আমাদিগের সহিত পূর্ব হইতে মিলিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে উদাসীনভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অস্ত্রধারণ করাইতে হইবে, আর যে সকল ব্যক্তি মোঘলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগকে উদাসীনভাব ধারণ করাইতে হইবে।" শঙ্কর এইরূপ নানা প্রকার যুক্তিপূর্ণ বাক্য কহিয়া নিরস্ত হইলে পর, প্রতাপ তাহার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য যদি আমাকে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ অথবা ঘোরতর নরক মধ্যে চিরকাল প্রবাস করিতে হয়, তাহাও আমি আহ্লাদ সহকারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। সে নরক নহে, সে আমার স্বর্গ! এই জগৎ ক্ষণ-বিধ্বংসী, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কত কোটি মনুষ্য এই পৃথিবী মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত কালসাগরে লীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগকেও ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব যে কয়েক দিবস এই পৃথিবীতে অবস্থান করা যায়, সে কয়েক দিবস কেন কাপুরুষসম পদদলিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করি? স্বাধীনতার জন্য নরনারীগণকে প্রবোধিত এবং প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাও আমি জীবনের প্রধান কর্তব্য বোধ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নশীল হইব। রঘুনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ যেমন জগতের চিন্তা-রাজ্যের উপর বঙ্গীয় মস্তিষ্কের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন ; যেমন পরম দয়াল চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপ্রভুগণ ধর্মজগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিয়া যুগ-যুগান্তরের জন্য বঙ্গীয়গণের মুখের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন, জয়দেব প্রভৃতি অমর কবিগণ যেমন সুললিত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, সেইরূপ আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় বাহুবলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জগৎসমক্ষে উদঘাটিত করি। যে মস্তিষ্ক জগতের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, সেই মস্তিষ্ক কি আত্মরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে অক্ষম হইবে? কখনই নহে। আসুন, আমরা সকলকে জাগরিত করিয়া আত্মবত্তা বুঝাইয়া দি—পুরাকালে ঋষিগণ যেরূপ কোন বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে হইলে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, সেইরূপ কি উপায়ে আমরা স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে পুরুষগণকে প্রেরণ করি। পর প্রেরিত হইলে কার্য সাধিত হইবে না। অতএব যুবকগণের হৃদয়ে এরূপ কর্তব্যনিষ্ঠা বপন করুন, যাহাতে তাহারা স্বয়ং ইহা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয়।"

প্রতাপ, শঙ্কর প্রভৃতি বন্ধুগণ এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনের পর স্বর্গ হইতে প্রিয়তর জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য মোঘলদিগের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বালিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প

করিলেন। এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্কর সুবা বঙ্গের প্রত্যেক স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট গমন করিয়া সকলকে দেশের অবস্থা বিশেষরূপে বুঝাইতে লাগিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর শঙ্করের অপ্রতিহত ক্ষমতা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি কখন উড়িষ্যার রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতে পরামর্শ দিয়া কতলু খাঁ, ওসমান খাঁ প্রভৃতি পাঠান-সেনা-নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া কেমন করিয়া মুসলমানগণ হিন্দুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই সকল প্রশ্নের তত্ত্ব-নির্ণয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন। আবার কখন বিদ্রোহী সেনানায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সুযোগপ্রাপ্ত হইলেই সকলকে ভাবী ঘোরতর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেন। এই পরিবর্তনের ফলাফল বঙ্গের জনসাধারণের উপর ন্যস্ত আছে। তাহারা মনে করিলে চিরকালের জন্য স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এবং ইহাতে হতাদর করিলে তাহাদিগকে অনন্তকালের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে, ইহা সকলকে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করান। শঙ্করকে এই সকল কার্যসাধনের জন্য কিছু দিবস ত্রিহুতপ্রদেশে অবস্থান করিতে হয়। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মৈথিলীগণের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। তিনি এ প্রদেশে অবস্থানকালে গণ্ডকীর তটে জগজ্জননী ভগবতীর একখানি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২] ইহার প্রতিষ্ঠাকালে তিনি অকাতরে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের বিশেষরূপে শ্রদ্ধার পাত্র হন।

শঙ্করের গমনের পর হইতে প্রতাপ, সূর্যকান্ত, ভবানীদাস, মদন, প্রতাপ সিংহ, সুন্দর, রুডা প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্মচারিগণকে বিভিন্ন কার্যের ভার প্রদান করেন। তাহারা প্রাণপণে তাহা অত্যুৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ দুর্গ নির্মাণের ভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বা নানা প্রকার যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র সকল প্রস্তুত এবং বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রভূত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানের দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা সকল প্রকার কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কেহ বা নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া সেনাদল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কেহ বা নানাপ্রকার যুদ্ধতরী নির্মাণ করিয়া নৌবল পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। কেহ বা গুপ্তরূপ ধারণ করিয়া মোঘল কর্মচারিগণের স্বভাবচরিত্র, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কার্য করাতে যে কার্যে যে ব্যক্তি কখন ব্রতী হয় নাই, সে কার্যে সে ব্যক্তিও বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল। প্রতাপ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যেক বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ই তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির বহির্ভূত হইত না, অতি ক্ষুদ্রতম কার্যেও তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিষ্পন্ন করাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। ধূমঘাট সমরপ্রিয়তার কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল। এ প্রদেশে আগমন করিলে মন যেন স্বতঃই যুদ্ধ করিবার জন্য নৃত্য করিয়া উঠে; কোন স্থানে বহুবিদ আয়ুধসম্পন্ন সৈন্যগণ নানাপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোমহর্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে। ইহা দর্শন এবং বীররসোদ্দীপক রণবাদ্য শ্রবণ করিলে কাপুরুষ-হৃদয়েও শোণিত উষ্ণ হইয়া প্রবাহিত হইত। কোন স্থানে শত শত ব্যক্তি যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে। কোন স্থানে অদ্ভুতদর্শন মৃন্ময় দুর্গ অধ্যবসায়-সহকারে নির্মিত হইতেছে। এই সকল সজীবভাব দর্শন করিলে মৃত ব্যক্তিরও কার্য করিবার বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হইয়া থাকে। জীবন্মৃত বঙ্গীয়গণের নিকট আজকাল এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস্যযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি

আপনাদিগের হৃদয়ের দুর্বলতার সহিত স্বর্গগত মহাপুরুষগণকেও তুলনা করেন, আমরা সেই সকল বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণকে একবার সুন্দরবনপ্রদেশে গমন করিয়া কথাবশেষ প্রাপ্ত স্মৃতিচিহ্ন-শেষ সকল দর্শন করিতে অনুরোধ করি। এ সকল স্থান দেখিলে এখনও আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করিয়া থাকে, এখনও বিষাদ ও আনন্দে হৃদয়কে উচ্ছলিত করিয়া তোলে। যদি বঙ্গের কোন প্রধান তীর্থস্থান থাকে, তাহা হইলে ইহাই সেই স্থল, এই স্থানেই সর্বপ্রথমে স্বাধীনতা-সংস্থাপনের জন্য বিজয়-পতাকা সংরোপিত হয়। এই স্থান হইতে বীরগণ নানা স্থানে গমন করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন এবং অবশেষে এই স্থানেই বঙ্গীয় বীরগণ স্বাধীনতার জন্য ভৈরববিক্রমে শোণিত-নদী প্রবাহিত করিয়া অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হন।

মহাভাগ প্রতাপ যে সময় ভাবী যুদ্ধের বিরাট আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত, সে সময় বীরবর শঙ্কর কোন কার্য উপলক্ষে রাজমহলে উপস্থিত হন। এই সময় জনৈক মুসলমান-প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হন। পূর্ব হইতে নীচপ্রকৃতির মুসলমান-কর্মচারিগণ শঙ্করের অসাধারণ বাগ্মিতা, সরলতা, কার্যতৎপরতায় মুগ্ধ হইলেও তাঁহার জাতীয় ভাব, উচিত বক্তৃতা ও অত্যাচারী মুসলমান-বিদ্বেষ জন্য তাহারা তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। দুষ্ট-প্রকৃতির রাজপুরুষগণ তাহাকে দমন করিবার জন্য সর্বদা ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেন। সের খাঁ নামক জনৈক মুসলমান-কর্মচারী এ সময় রাজমহলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। অপরাধী, শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছে, অবগত হইয়া ইনি শঙ্করকে ভর্ৎসনা করিয়া শীঘ্র অপরাধী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে শঙ্কর অতি বিনীতভাবে সের খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, "এ ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এ যাহা ক্ষতি করিয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া দিব, এবার ইহাকে অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করুন।" এ কথায় সের খাঁ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। শঙ্করকে দণ্ড প্রদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান-কর্মচারিগণ রাজকার্যে ব্যাঘাত করা অপরাধে শঙ্করকে বন্দি করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। শঙ্করের কারাবাসের কথা বিদ্যুদ্‌বেগে সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কি শত্রু, কি মিত্র, সকলেই তাহার কারাবাসে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ; এ সময় সকলে নিরাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিয়াছিল ঃ—

শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলো বাঘে,
আর মানুষ কোথায় লাগে?[৩]

যখন শঙ্কর চক্রবর্তীর ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির এরূপ দশা, তখন অন্য লোকের মান, সম্ভ্রম, ধন, ধর্ম যে বিলয়োন্মুখ, তাহার আর আশ্চর্য কি?

শঙ্কর মুসলমানদিগের কূটজালে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হইবার পাত্র নহেন। যখন তিনি শুনিলেন, দেশের জনসাধারণ ব্যক্তিগত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া সকলেই একপ্রাণে তাহার প্রতি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে, নূতন রাজস্ব-নিয়মে সকলেই বিরক্ত, মুসলমান কর্মচারিগণের অত্যাচারে সকলেই অত্যন্ত প্রপীড়িত, সকলেই যখন একটা পরিবর্তন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, তখন বুঝিলেন, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলে সকলেই এই পরম পবিত্র কার্যে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিবে, ইত্যাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ শঙ্করবিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। যিনি জন্মভূমির স্বাধীনতাসংস্থাপন জন্য সুখভোগ-বাসনায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিয়াছেন, যিনি ঘোরতর দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করত সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে স্বাধীনতা দেবীর পরম কমনীয় মূর্তি অঙ্কিত করিয়া সকলকে তাহার পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি অসাধারণ বাগ্মিতায় প্রাণিমাত্রকে মুগ্ধ করিয়া আপনার

আজ্ঞানুবর্তী করেন, সেই মহাতেজস্বী শঙ্করকে কি প্রকারে মুসলমান-জাল হইতে বহির্গত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সূর্যকান্ত, ভবানী দাস প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কের পর প্রতাপ স্থির করিলেন যে, কারাগারের প্রহরিগণ অধিকাংশ হিন্দু, একজন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতাপ একজন কর্মচারীকে রাজমহলাভিমুখে প্রেরণ করেন। প্রতাপ-প্রেরিত লোক রাজমহলে উপস্থিত হইয়া প্রহরিগণকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করেন। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রতাপ-প্রেরিত লোক শঙ্করকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া দ্রুতগামী নৌকাযোগে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শঙ্করের পলায়নকথা সের খাঁর কর্ণগোচর হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কারাগার-রক্ষককে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শঙ্করের অনুসন্ধান জন্য চতুর্দিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নগরমধ্যেও প্রত্যেক স্থল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও শঙ্করের তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, ক্রমে ক্রমে প্রহরিগণও অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিল। সের খাঁ শঙ্করের গমনের পর চতুর্দিকে দূরতর প্রদেশে তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করেন। যশোহর প্রদেশ হইতে লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া শঙ্করের তথায় অবস্থান এবং যুদ্ধের জন্য প্রতাপাদিত্যের বিপুল আয়োজনের বিষয় সের খাঁর নিকট নিবেদন করে। সের খাঁ প্রতাপের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন ও একদল সৈন্য লইয়া ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

শঙ্কর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, প্রতাপ-প্রেরিত লোকের সহিত মিলিত হইয়া পূর্বরক্ষিত নৌকাযোগে যশোহরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অবিরাম দিবারাত্র নৌকা বাহিত হওয়াতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে শঙ্কর জাহাজঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের আগমনকথা শ্রবণ করিয়া প্রতাপ, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া সমারোহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। যশোহর নগর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে পিতা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের সমাগমে লোকে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, যশোহরবাসী জনসাধারণ শঙ্করের দর্শনে সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। শঙ্কর বন্ধুবান্ধবসহ মিলন-সুখ উপভোগ করিয়া আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শঙ্করের উপর মোঘলগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা কখনই তাহা নীরবে সহন করিবেন না, বৈরনির্যাতনের জন্য তাহারা সমুচিত চেষ্টা করিবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রতাপ দুর্গ ও সৈন্য সকলকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন।

সের খাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য স্বয়ং পরিচালনা করিয়া শঙ্করকে বন্দি ও প্রতাপকে দমন করিবার জন্য যশোহরাভিমুখে আগমন করেন। প্রতাপের গুপ্তচর সের খাঁর আগমন-বার্তা নিবেদন করিলে, প্রতাপ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে সের খাঁর প্রতুদ্‌গমনের জন্য বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সের খাঁর সৈন্য সমীপবর্তী হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রতাপ স্বীয় সৈন্যকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ সেনাপতি-নায়ক শঙ্করের অধীনে প্রদান করিয়া সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সহ তিনি অপর ভাগ গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর প্রথমত সৈন্যগণকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া ভৈরব বিক্রমে মোঘলদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের বীরগণ বিজয়লাভ-বাসনায় জীবন-আশা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন, কামান সমুহের ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির-প্রায় হইয়া উঠিল, অশ্ব ও সৈন্যদিগের পদবিক্ষেপ-জনিত ধূলি এবং বারুদের ধূমে আকাশমণ্ডল ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, শঙ্করসৈন্য মোঘলব্যূহ ভেদ করিয়া অস্ত্রাঘাতে শত্রুগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। মোঘল-

সেনাপতি তাহার পশ্চাৎ রক্ষিত সৈন্য সকল আনয়ন করিয়া নূতন বলের সহিত শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কর এই সময় পূর্ব ইঙ্গিত অনুসারে প্রতীয়মান পরাজিতের ন্যায় নিকটস্থ জলাভূমি অভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-সেনাপতি শঙ্করকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া সমস্ত সৈন্যকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। মুসলমান-সৈন্যগণ সেনাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিজয়োল্লাসে দ্রুতবেগে আক্রমণ করিল। মহাবীর শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে অকস্মাৎ সংযত করিয়া মোঘলগণকে আক্রমণ করিলেন, ইহাতে বিশৃঙ্খল মোঘল-সৈন্য অধিকতর বিশৃঙ্খল হইল ; ইত্যবসরে পশ্চাদভাগে লুক্কায়িত প্রতাপ নবীন-প্রতাপে ঘোরতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন। একে শঙ্করের অকস্মাৎ আক্রমণে মোঘল-সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আবার প্রতাপ পশ্চাদভাগ হইতে ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় ভীষণবেগে আক্রমণ করাতে মোগলেরা বজ্রাহতের ন্যায় বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িল। শুষ্ক তৃণক্ষেত্রে অগ্নি প্রযুক্ত হইলে তাহা যেমন বায়ুসহযোগে ধীরে ধীরে বর্ধিতাকার ধারণ করে, সেইরূপ বিজয়-মদোন্মত্ত সূর্যকান্ত, প্রতাপসিংহ, মদন প্রভৃতি বীর-পরিচালিত সৈন্যগণ মোঘলগণকে প্রতিপদে পরাজয় করাতে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল, যে সকল মোঘল-অশ্বারোহী সৈন্য শঙ্কর-সৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ কর্দম-নিমগ্ন হওয়াতে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। সের খাঁ স্বীয় সৈন্যগণকে পরাজিত এবং বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করেন। এই ঘোরতর যুদ্ধে প্রতাপ মুসলমান পরিত্যক্ত যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হন। অদ্য হইতে বঙ্গের ইতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ প্রারম্ভ হইল, অদ্য পরম পবিত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষিত হইল। বঙ্গীয় ভুজবলের নিকট আজ দুর্ধর্ষ মোঘলবীর্য প্রতিহত হইল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য মোঘলগণকে পরাজয় করিয়া, যে সকল রাজন্যবর্গ যুদ্ধ ঘোষিত হইলে তাহার সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহাদিগের নিকট মোঘলসৈন্য-পরাজয়বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাহারা সকলে প্রতাপের বিজয়লাভে পরম আহ্লাদিত হইয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে মন ও ধনের সহিত অন্যান্য পার্থিব বিষয় সকল প্রতাপের অধীনে ন্যস্ত করিলেন। প্রতাপের যুদ্ধের সহিত বঙ্গের নানা স্থানে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে মোঘল-সম্রাটের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করিল না। কেহ বা দিল্লিগামী মোঘল রাজকোষ লুণ্ঠন, কেহ বা মোঘল-সৈনিক-নিবাসে অগ্নি-প্রদান, কেহ বা সুযোগক্রমে অল্পসংখ্যক মোঘল সৈন্যদল আক্রমণ, কেহ বা রাস্তা, ঘাট, সেতু প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট-সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের জনসাধারণ একপ্রাণে প্রতাপের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হইল। প্রতাপও তাহাদিগের স্বত্ব-সংরক্ষণ, তাহাদিগকে মোঘল অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ এবং আবশ্যকানুসারে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিক্রমপুরপতি প্রবলপরাক্রান্ত কেদার রায়, মধু রায় প্রভৃতি বীরগণ জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য ঘোরতর বিক্রমে মোঘলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। সুযোগক্রমে তাহারা মোঘলদিগের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। তখন বাঙালিরা ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া একপ্রাণে মোঘলদিগের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিক্রমপুরবাসিগণ সুযোগ বুঝিয়া কখন তাহারা মোঘলদিগকে আক্রমণ, কখন বা পলায়ন করিয়া কার্য সাধন করিতেন।

১. এই দাস-প্রথা পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য ইংলণ্ড বহু ধন অকাতরে ব্যয় আর ক্ষুদ্রশক্তির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অজস্র শোণিতধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। সেই সকল পুণ্যফলে আজ ইংরাজ পৃথিবীমধ্যে গৌরবমণ্ডিত পদলাভ করিয়াছেন।
২. এরূপ কিংবদন্তী, দ্বারভাঙা প্রদেশের অন্তর্গত হায়াঘাটে শঙ্কর-স্থাপিত মূর্তি এখনও বর্তমান আছে।
৩. এই বাক্যটি প্রবাদবাক্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, যখন কোন কার্য করিতে সুচতুর ব্যক্তি অকৃতকার্য হন, তখন ইহা কথিত হইয়া থাকে। প্রবাদস্থ বাঘ শব্দ সের খাঁ-বোধক। পারস্য ভাষায় সের ব্যাঘ্র-জ্ঞাপক। ‘সঞ্জীবনী’র “বঙ্গের শেষবীর” প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে ; লেখকও অনেক স্থলে উক্ত কিংবদন্তী শ্রুত হইয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিজলিপতি ঈশা খাঁ মছন্দরী প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে পরাজিত ও নিহত হইলে পর বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু বঙ্গদেশে আশ্রয়-স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে কাঁচু রায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। বঙ্গদেশে এ সময় প্রতাপাদিত্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা ; কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত না। বিশেষত প্রবল-পরাক্রম ঈশা খাঁর পতনের পর হইতে সকলে তাহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনার পর আবার তিনি মোঘলদিগকে অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাতে এ ধারণা সকলের হৃদয়ে অধিকতর বদ্ধমূল হয়। মহাভারত-যুদ্ধে ভূতভাবন ভবানীপতি যেরূপ অর্জুনের অগ্রবর্তী হইয়া শত্রুকুল নির্মূল করিতেন, সেইরূপ দৈত্যনাশিনী মহাকালী প্রতাপের বিজয় জন্য স্বয়ং অসি-ধারণ করিয়া সেনাপতির কার্য করেন, সকলে এইরূপ ধারণা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপ যে যুদ্ধে বর্তমান থাকিতেন, সে যুদ্ধে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও কোনরূপে বিজয়লাভে সমর্থ হইতেন না। প্রতাপের নামের বৈদ্যুতিক শক্তি সকলকে যেন অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। জনসাধারণের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করা সাধারণ সাধনার কথা নহে।

বসন্ত রায়ের কর্মচারী রূপরাম বসু কাঁচু রায়কে সঙ্গে লইয়া নানা প্রকার পথিক্লেশ অতিক্রমণপূর্বক মোঘল-রাজধানীতে উপস্থিত হন। রূপরাম কোনরূপে দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান, বসন্ত রায়ের মৃত্যু, কচু রায়ের উদ্ধার এবং ঈশা খাঁর যুদ্ধ ও পতনের আনুপূর্বিক সমস্ত কথা সম্রাটসমীপে নিবেদন করিলেন। ইত্যবসরে বঙ্গদেশ হইতে একজন কর্মচারী আগমন করিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত সের খাঁর ঘোরতর যুদ্ধ ও পরাজয়কথা নিবেদন করেন। সম্রাট এ কথা শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিম খাঁর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।[১]

ইব্রাহিম খাঁ নানা প্রকার উপকরণ-সম্পন্ন বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি যথাসময়ে রাজমহলে উপস্থিত হন। এ স্থানে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া পথিক্লেশ দূর হইলে পুনরায় তিনি কতকগুলি নূতন সৈন্য লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম সপ্তগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে যশোহর গমন করিতে সঙ্কল্প করেন। এ জন্য বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ পূর্বক তাহাতে বহুল পরিমাণে খাদ্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য পূর্ণ করিয়া অভিজ্ঞ নাবিকগণসহ যাত্রা করেন।

চারচক্ষু প্রতাপ বহু সৈন্য-পরিবৃত ইব্রাহিমের আগমন-কথা অবগত হইয়া রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গ সকল সুদৃঢ়, আহার্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ বিচক্ষণ কর্মনিপুণ গুপ্তচর সকল মোঘলরাজ্যের চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ সকল অবগত হইতে লাগিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, ইব্রাহিম খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতেছেন, তখন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মাতলা-দুর্গে সৈন্য সকল প্রেরণ করিয়া তাহা সুদৃঢ় করেন। কলিকাতার দক্ষিণ রায়গড় দুর্গের নিকট ইব্রাহিম সৈন্যের সহিত একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়।[২] মোঘল সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশত বঙ্গীয় সৈন্য

তাহাদিগের বিশেষ কিছু অপকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইব্রাহিম রায়গড় অবরোধ করিয়া অনবরত ভীষণ অগ্নিময় গোলকসমূহ তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় সৈন্যগণ স্বাধীনতারক্ষা করিবার জন্য ঘোরতর বিক্রমে অবিরাম মুসলমান-সৈন্যগণের উপর গোলক-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ রায়গড় অবরোধ করিয়াছে, প্রতাপ এ কথা অবগত হইয়া কমল খোজা, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণকে মুসলমানদিগের পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। সূর্যকান্ত কতকগুলি কর্মনিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, অসমসাহসী সৈন্য নির্বাচন করিয়া রাত্রিযোগে দ্রুতগামী নৌকা করিয়া নিরুদ্বিগ্ন মোঘলসৈন্যের শিবিরের পশ্চাদভাগে উপস্থিত হন। নৌকা সকল সাঙ্কেতিক স্থানে রক্ষা করিয়া সকলে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় মোঘল শিবির আক্রমণ করেন। অসতর্ক মোঘলগণ বঙ্গীয়গণের অকস্মাৎ আক্রমণে বিমোহিত হইয়া কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। বঙ্গীয় বীরগণ বহুসংখ্যক মোঘল সৈন্য নিহত করিয়া শত্রুশিবিরে অগ্নি প্রদান করেন। অল্পকালমধ্যে প্রবল বায়ু সহযোগে অগ্নি অত্যন্ত বর্ধিত হয় ; এই আলোক-সাহায্যে বঙ্গীয়গণ মোঘলগণকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করেন। সূর্যকান্ত দেখিলেন, তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, শত্রুসৈন্যের হৃদয়ে ঘোরতর বিভীষিকা বদ্ধমূল হইয়াছে, আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিলে স্বীয় পক্ষীয় লোক বৃথা নিহত হইবে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া সকলে পূর্বসঙ্কেতানুসারে নৌকায় গমন করিয়া মাতলায় উপস্থিত হইলেন।

সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ মোঘল সৈন্য মথিত করিয়া নির্বিঘ্নে গমন করার পর, ইব্রাহিম খাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া রায়গড় অবরোধ করা অকর্তব্য বিবেচনা করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে কিয়দংশ সৈন্য রায়গড় অবরোধের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মাতলা অভিমুখে গমন করেন। প্রতাপ ইব্রাহিমের আগমনের পূর্ব হইতে রুডাকে নৌসেনা এবং সূর্যকান্ত, শঙ্কর, মদনমল্ল, সুখা, সুন্দর, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি বীরগণ মধ্যে কাহাকে পদাতিক, কাহাকে অশ্বারোহী বা গজারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ বিপুলবাহিনী পরিচালনা করিয়া মাতলাদুর্গের সন্নিকটবর্তী হইলে, অকস্মাৎ দুর্গাভ্যন্তর হইতে মোঘলসৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ হইল, ইহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্কেত ; এই সঙ্কেত-শব্দ শ্রবণ করিয়া রুডা নৌসেনা লইয়া মোঘলদিগকে আক্রমণ করিলেন। যে সকল মোঘলসৈন্য স্থলপথে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সূর্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি সেনানীগণ ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, শোণিতপ্রবাহে নদী আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। কামান সমূহের মুহুর্মুহু ভয়ঙ্কর শব্দ, সৈন্যগণের কোলাহল এবং রণমত্ততাজনক বাদ্যধ্বনিতে সুন্দরবন-প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া অরণ্যচর পশুপক্ষিগণকেও আকুলিত করিতে লাগিল। প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যে স্থলে অতি ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতেছে, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া শত্রুপক্ষদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতিগণ কর্তৃক প্রোৎসাহিত বঙ্গীয় সৈন্য প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় মোঘল সৈন্যমধ্যে প্রবাহিত হইল, ইহাতে মোঘলসৈন্য বিচলিত হইয়া পড়িল, ইব্রাহিম বহু চেষ্টাতেও সৈন্যগণকে সংযত করিতে পারিলেন না ; বঙ্গীয়গণের মুহুর্মুহু ভীষণ আক্রমণে মোঘলসৈন্য হতবীর্য হইয়া পড়িল। জয়লাভ দূরের কথা, কোনরূপে আত্মরক্ষা করা যথেষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া, সকলে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রুডা প্রভৃতি নিপুণতা সহকারে শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে লাগিলেন।

মোঘল সেনানী ইব্রাহিম প্রতাপের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপন্ন করিবার জন্য রায়গড় হইতে বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মোঘল সৈন্য প্রজাসকলের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মোঘল সৈন্যের অত্যাচারের কথা অবগত হইবামাত্র উপযুক্ত সেনানীর অধীনে যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যদল প্রদান করিয়া মোঘল-মথনে প্রেরণ করেন। ক্রোধ প্রজ্বলিত বঙ্গীয়গণ আপনাদিগের জন্মভূমি-রক্ষার জন্য প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর বিক্রমে মোঘলগণকে আক্রমণ করেন। একদল মোঘল আপনাদিগের স্ত্রীপুত্র সংরক্ষণ, অপর দল প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মোঘলেরা ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও বঙ্গীয় বাহুর প্রবল পীড়নে পরাভূত হইয়া রণভূমি হইতে তাহারা অতি অল্পসংখ্যকমাত্রই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য যে স্থানে এই দারুণ যুদ্ধ অভিনীত হইয়াছিল, সেই স্থল বর্তমানকালেও সংগ্রামপুর নাম ধারণ করিয়া অতীত যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।[৩]

বঙ্গ-ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিবসে ইব্রাহিমের প্রায় সমস্ত সৈন্য বঙ্গীয় বীরগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বাঙালিরা যেরূপ রণ-নিপুণতা, অধ্যবসায় ও নির্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—ইহারা যদি উপযুক্ত সেনাধিপতি কর্তৃক পরিচালিত হন, তাহা হইলে ইহারা পৃথিবীর সর্বপ্রধান সমরনিপুণ জাতির সহিতও যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাহারা ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন বা যাহারা ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া জগতীমধ্যে ঘোষণা করেন, তাহারা যে কাপুরুষ, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ; ইহাদিগের শান্তিপ্রিয়তা কাপুরুষতা নহে ; ইহারা উত্তেজিত হইলে সর্বস্ব পণ করিয়া অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহারা অহরহ পদদলিত হইয়াও শীঘ্র উত্তেজিত হন না, ইহাই ইহাদিগের প্রধান দোষ। নদীর গতি একদিক বন্ধ হইলে তাহা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হইয়া, অন্যদিক দিয়া অন্য আকারে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ বাঙালির সমরপ্রিয়তার উপর খড়্গাঘাত করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মবীর এবং চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ[৪] তাহার স্থলে শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি রোপণ করিয়া তাহা সযত্নে বর্ধিত করিয়াছেন। যদি ভগবান চৈতন্যদেব সৌম্যরূপে অবতীর্ণ না হইয়া, প্রচণ্ডরূপে শাণিত কৃপাণ হস্তে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইতেন, অথবা বঙ্গীয় কবিগণ যদি প্রেমপূরিত শ্রুতিমধুর গীত সকল সুমধুর স্বরে বীণাযোগে গান না করিয়া তাহার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে উত্তেজনা-পরিপূর্ণ শ্রবণভৈরব স্বাধীনতা-গীতি শিঙ্গা সহযোগে গান করিতেন, তাহা হইলে আজ বঙ্গের দশা অন্যরূপে দর্শিত হইত।

প্রতাপ মোঘলসৈন্যকে মাতলা-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া রায়গড়ের অবরুদ্ধ সৈন্যের সাহায্য করিবার জন্য সূর্যকান্ত প্রভৃতি সেনাগণকে প্রেরণ করিলেন। মোঘলগণ ইতিপূর্বেই ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ পরাজয়কথা শ্রবণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় অল্প সৈন্য লইয়া শত্রুদেশে অবস্থান করা হিতজনক নহে বিবেচনা করিয়া তাহারা গমনের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, এরূপ সময়ে হতাবশিষ্ট ইব্রাহিম-সৈন্য পলায়ন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হন। রুডা, সূর্যকান্ত, কমল খোজা প্রভৃতি সেনানায়কগণ এখানেও তাহাদিগকে ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করেন। ইহারা পদে পদে পরাজিত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ মোঘলগণকে বিতাড়িত করিয়া বহুল পরিমাণে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ পদার্থ লইয়া রাজধানী যশোহর নগরে প্রত্যাগমন করেন। ইহার আগমনে আনন্দের সীমা রহিল না। যাহার করুণা-কটাক্ষে প্রতাপ সমরবিজয়ী, সেই জগজ্জননী মহামায়ার অতি সমারোহের সহিত পূজা হইল। ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে পূজিত হইয়া নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দীন-দরিদ্রগণ মধ্যেও অকাতরে ধন বিতরণ হইতে লাগিল।

প্রতাপ মোঘলগণের উপর অসামান্য বিজয়লাভ করিয়া মোঘলরাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পর-রাজ্য আক্রমণের পূর্বে মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা

বিধিবদ্ধ করেন। তাহার অনুপস্থিতিতে যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়, সে জন্য তিনি আত্মীয় ভবানীদাস[৫] এবং লক্ষ্মীকান্ত[৬] নামক একজন বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে রাজস্ব ও শাসন-বিষয়ক প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত করেন। ভবানীদাস ও লক্ষ্মীকান্ত অত্যন্ত নিপুণতার সহিত প্রতাপের অনুপস্থিতিকালে রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রতাপের প্রীতিভাজন হন।

প্রতাপ কালবিলম্ব না করিয়া মোঘলরাজ্য আক্রমণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে নৌবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। নদীপ্রধান বঙ্গদেশে স্থলপথ অপেক্ষা নৌকাপথ অধিকতর সুবিধাজনক, বিশেষত যুদ্ধকালে বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া স্থলপথে গমনাগমন অত্যন্ত ক্লেশকর ও সময়সাপেক্ষ ; সময়ই যুদ্ধের প্রাণ, যে সেনানী যুদ্ধকালে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই সেনাপতিপদের উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রতাপ বহুসংখ্যক সুদৃঢ় রণতরী একত্র করিয়া তাহাতে সকল প্রকার দ্রব্য পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। রণপোত সকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যপূর্ণ হইলে প্রতাপ শুভদিবসে বিপুলবাহিনী লইয়া মোঘল-রাজ্য আক্রমণে বহির্গত হন। মৃতপ্রায় নিস্তব্ধভাবে নৌকা সকল অনুকূল বায়ুভরে সুন্দরবনের হিংস্র-জন্তুপূর্ণ বিজন প্রদেশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীগর্ভে পতিত হইল। এ সময় হইতে তাহারা অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শত্রু-আক্রমণ নিবারণ এবং তাহাদিগের অবস্থানের বিষয় সংবাদ দিবার জন্য, কয়েকখানি দ্রুতগামী রণপোত-অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিতে আদিষ্ট হইল ; প্রতাপ এই প্রকারে বিপুলবাহিনী সঙ্গে লইয়া একদিন অকস্মাৎ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন। মোঘলগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করাই প্রতাপের মোঘলরাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য ; সুতরাং যাহাতে প্রজাগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সেই জন্য তিনি সৈন্যগণ মধ্যে কঠোর আদেশ প্রদান করেন। মোঘলগণ প্রতাপসৈন্য কর্তৃক চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারা অল্পসংখ্যক হওয়াতে যুদ্ধে পরাজিত হইল। প্রতাপ সপ্তগ্রামস্থ যাবতীয় রাজকীয় ধন লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় নাবিকগণকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

প্রতাপের মোঘল-রাজ্যাক্রমণকথা অবগত হইয়া উড়িষ্যার হিন্দুরাজন্যবর্গ ও পাঠান সেনানায়কগণ চতুর্দিক হইতে দলে দলে মোঘল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাদিগের পদভরে বঙ্গদেশ কম্পিতপ্রায় হইয়া উঠিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ মোঘল সেনানীগণকে আক্রমণ করাতে ইহারা মোঘলদিগের বিজাতীয় ভীতিপ্রদ হইয়া উঠেন। সেই সময় হইতে আমাদিগের দেশে কোন ভীষণ যুদ্ধের সহিত তুলনা দিতে হইলে, মোঘল-পাঠানের যুদ্ধ বলিয়া উদাহরণ দেওয়া হয়।

প্রতাপ গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী মোঘলনগর সকল আক্রমণ করিতে করিতে রাজমহলের সমীপবর্তী হন। পাঠান-সেনানায়কগণ প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া জল ও স্থলপথে চতুর্দিক হইতে রাজমহল আক্রমণ করিলেন। কয়েক দিবস ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল, ইহাতে কোন পক্ষের জয়-পরাজয় হইল না, ইহাতে প্রতাপ অতি নিপুণতা সহকারে কামান সকল দুর্গের চতুর্দিকে সংস্থাপন করিয়া অনবরত লোক-সংহারক অগ্নিময় ভীষণ গোলক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মোঘলগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল, আহার্যসামগ্রীও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, দুর্গপ্রাচীরও স্থানে স্থানে ভূমিসাৎ হইল ; এইরূপ ঘোরতর সঙ্কটাবস্থায় মোঘলগণ আত্মসমর্পণ করিলেন ; প্রতাপ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ইহার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বিজয়লব্ধ দ্রব্য সহ পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল ; প্রতাপের আদেশ-ক্রমে মোঘলদিগের যুদ্ধতরী সকল ধৃত হইল। শত্রুপক্ষের হস্তে যাহাতে নৌকা সকল পতিত না হয়, সে জন্য তিনি অনেকগুলি মোঘল-

রণতরী ধ্বংস করিয়া ফেলেন। প্রতাপ মোঘলদিগকে পরাজয় করিতে করিতে পাটনা নগরের সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বেই বিহার প্রদেশের জমিদারগণ মোঘলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহারা সুযোগক্রমে মোঘলগণকে আক্রমণ করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রতাপকে বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহারা সকলে পতঙ্গপালের ন্যায় তাহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রতাপ, শঙ্কর প্রভৃতি বীরপুরুষগণ বহুদিন হইতে ইহাদিগের নিকট সুপরিচিত। পূর্বে তাহারা ইহাদিগকে সৌম্যবেশে দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ভৈরব-বেশে দেখিতে পাইলেন। বেশের পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন হয় নাই। পূর্বের ন্যায় পূর্ব-সম্ভাষণ, সকল বিষয়ের তত্ত্বান্বেষণ অথবা সস্নেহ ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতাপ ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পাটনা নগর আক্রণ করিলেন। পাটনা বিহার প্রদেশের রাজধানী। এ প্রদেশের মধ্যে ইহা মোঘলদিগের প্রধান সেনানিবেশস্থান। শঙ্কর, সূর্যকান্ত, রঘু, সুখা, রুডা, মদন প্রভৃতি মহাবীরগণের সহিত প্রতাপ মোঘলগণকে ভৈরববিক্রমে আক্রমণ করিলেন। মোঘলগণ পূর্ব-পরাক্রম স্মরণ করিয়া প্রাণপণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্বলিত হইল। এই যুদ্ধে এক পক্ষের বীরগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গকে মোঘলগণের বিকট গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার জন্য, পরমপবিত্র দেবমন্দির সকল পাষণ্ডগণের পদদলন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্যপক্ষে মোঘল বীরগণ, তাহাদিগের প্রভুত্বের খর্ব হওয়াতে তাহাদিগের ভোগবিলাসদ্রব্যের হ্রাস হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দু-সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া সিংহবিক্রমে মোঘলব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাণিত তরবারি প্রহারে শত্রুসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দিক হইতে হিন্দুবীরগণ মোঘলসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। মোঘলগণ হিন্দুবীর্য কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার্থ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে হিন্দুবীরগণ যেরূপ অসীমসাহস, ক্লেশসহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং যুদ্ধনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বীরত্বের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। জয়মদোন্মত্ত বীরগণ আবার ঘোরতব পরাক্রমের সহিত দুর্গ অবরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, পর্তুগিজ সকলেই যেন নিজের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বন্ধুভাবে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া অসীম শৌর্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কামান সকল অনবরত ভীষণ শব্দ করিয়া গোলক উদ্‌গিরণ করাতে যেন প্রলয়কাল সমীপবর্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কয়েক দিবস এইরূপ সমভাবে আক্রমণ করাতে দুর্গপ্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে। হিন্দু-বীরগণ, এই অবকাশে শাণিত-কৃপাণহস্তে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্করবেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ প্রারম্ভ হইল। পর্বতের নিকট প্রবল প্রভঞ্জন যেরূপ প্রতিহত হয়, সেইরূপ মোঘলসেনা হিন্দুসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। প্রতাপ পাটনা-দুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হন ; প্রতাপ কিছুদিনের জন্য সুবে বাংলা হইতে মোঘলদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামীর অধীনে শাসনভার প্রদান করিলেন। তাহারা ন্যায় অনুসারে রাজ্যপালন এবং যুদ্ধকালে ক্ষমতানুসারে সৈন্য-সাহায্য করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ নিয়মাবদ্ধ হন।

প্রতাপ এইরূপ শাসনব্যবস্থা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গমনের পূর্বে প্রতাপ এক দিবস যে সকল বীর যুদ্ধকালে সহায়তা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা পূর্বক কহিলেন, "বীরগণ! স্বাধীনতা

সংস্থাপন জন্য আপনারা যে এই অপর্যাপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করিলেন, ইহার জন্য আপনাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে। দেবতা সকল আপনাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন। আপনারা দেশের গৌরব বলিয়া অভিহিত হইবেন। আপনারা অসীম অধ্যবসায় সহকারে যে ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, ইহা যে কেবল বর্তমানকালে লোক-হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া আমাদিগের পুষ্টিসাধন করিবে, এরূপ নহে। ভবিষ্যৎকালেও আমাদিগের সন্ততিগণকে ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যে এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতে থাকিবে। যে সকল স্বদেশবাসী আমাদিগের এই পরমপবিত্র স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে সহায়তা না করিয়া উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা ঘোরতর নরকে নিমগ্ন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে সকল কুলাঙ্গার স্বদেশদ্রোহী ক্ষণিক স্বার্থের জন্য মোঘলদিগের সহায়তা করিয়াছে, তাহারা অনন্তকাল রৌরব নরকে অনন্ত দুঃখভোগ করিবে এবং তাহাদিগের সন্ততিগণ ধনবান, গুণবান, বিদ্বান হইলেও পুরুষানুক্রমে তাহারা ধিক্কৃত, ভর্ৎসিত এবং অপমানিত হইবে। জনসাধারণ তাহাদের সম্মুখে তাহাদের পূর্বপুরুষের অপকীর্তির কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইলেও পশ্চাৎ হইতে সকলে অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্বক কহিবে, উহাদের কুলাঙ্গার পূর্বপুরুষ স্বর্গাদপি গরিয়সি জন্মভূমিকে শত্রু করে বিক্রয় করিয়াছিল, ঐ পাপাত্মাদের ধনজন-সম্পত্তিকে ধিক্!" মহাবীর প্রতাপ সমাগত বীরগণকে এইরূপে উৎসাহিত করিয়া তাহাদিগের পদমর্যাদা ও যোগ্যতানুসারে সকলকে যথেষ্ট ধনাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। মহারাজ প্রতাপ পাটনা পর্যন্ত অধিকার করিয়া প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিজয়লাভ করিয়া গমন করিলেও প্রতাপের সৈন্যমধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার লেশমাত্র নাই, পূর্বের ন্যায় নিয়মানুসারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইতেছে। রণতরী সকল কখন বা অনুকূল বায়ুভরে, কখন বা গুণযোগে চালিত হইতে লাগিল। এই সকল পোতসমূহ যখন তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে পালভরে গমন করিত, যখন উল্লসিতমনে নাবিক ও সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর সঙ্গীত গান করিয়া দিকসকল প্রতিধ্বনিত করিত, তখন নদীতীরে এই অপূর্ব নৌকানগরী দেখিবার জন্য শত শত লোক একত্র হইয়া অনিমেষ নয়নে যতক্ষণ না ইহা অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ চাহিয়া থাকিত।

প্রতাপ কিছুদিনের মধ্যে আবার যশোহরনগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। যশোহর যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। লোক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়স্বজনসহ মিলিত হইবার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য জাহাজঘাটায় অবতরণ করিলেন, অবতরণের সহিত বুরুজপোতা[৭] হইতে অনবরত তোপধ্বনি হইয়া মহারাজের আগমনবার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিল। মহারাজ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সর্বপ্রথমে যশোহরেশ্বরীর চরণতলে শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বিজয়লব্ধ অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা মহামায়ার পূজা করিলেন। জগজ্জননীর পূজা সম্পন্ন করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে ধনদান করিয়া ধূমঘাট-ভবনে গমন করেন।

সম্রাট আকবর বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান এবং স্বীয় সৈন্যগণের পরাজয়বার্তা অবগত হইয়া আজিম খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বহুল পরিমাণে রণনিপুণ সৈন্য প্রদান করিয়া প্রতাপ বিজয় জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। আজিম খাঁ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন সৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হন এবং শীঘ্রগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোঘল সৈন্য অনবরত গমন করিয়া পাটনার সমীপবর্তী হইল। প্রতাপ আজিমের দিল্লি হইতে বহির্গমন কথা অবগত হইয়া, পাটনা রাজমহল প্রভৃতি স্থানের কর্মচারিগণকে মোঘল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে এবং বিনা বাধায় বঙ্গের

অভ্যন্তর প্রদেশে আগমনের পথ প্রদান করিতে উপদেশ দিয়া পাঠান। পাটনার রাজকর্মচারিগণ প্রতাপের উপদেশানুসারে আজিমের সহিত মিলিত হইলেন, আজিম প্রতীয়মান বিজয়লাভে গর্বিত হইয়া দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পূর্বোক্ত আদেশানুসারে রাজমহল প্রভৃতি নগরের কর্মচারিগণও আজিমের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে যে সকল স্থলের তৃণগণও মোঘলদিগকে বাধা দিবার জন্য যেন বজ্রশক্তি ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় সকল বিষয়ই মোঘল সৈন্যের অনুকূল রূপ ধারণ করিল। বিনা রক্তপাতে বঙ্গদেশ করতলস্থ হইতেছে, ইহাতে আজিমের উচ্চাভিলাষ, আহ্লাদ ও গর্বের সীমা রহিল না। নদী যেমন সমুদ্রের যত সন্নিকটবর্তী হয়, তাহার প্রশস্ততাও যেরূপ তত বর্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে কিন্তু তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় প্রশস্ততা ও অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাইয়া থাকে। আজিমের গতি নদীর গতিকে যথার্থরূপে অনুকরণ করিল। আজিম প্রতাপের যত সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন, তাহার স্ফীতিও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি প্রতাপ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়াছিলেন।

প্রতাপ যখন শ্রবণ করিলেন, আজিম বর্তমান কলিকাতার সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন, তখন তিনি একদিন নিশীথরাত্রে সমস্ত সৈন্যের সহিত মোঘল-শিবির আক্রমণ করেন, প্রতাপসৈন্য চতুর্দিক হইতে যুগপৎ ভৈরব বিক্রমে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল, প্রসুপ্ত মোঘল-সৈন্য অকস্মাৎ প্রলয়কালীন গভীর গর্জন শ্রবণ পূর্বক শয্যাত্যাগ করিয়া ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যেমন শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইবে, অমনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গীয় সৈন্যের শাণিত কৃপাণাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। শিবিরের চতুর্দিকে মার মার, কাট কাট, রক্ষা কর ইত্যাদি শব্দে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতাপসৈন্য মহাকালের ন্যায় রুদ্ররূপে সমস্ত রাত্রি ভীষণরূপে মোঘল-সৈন্য সংহার করেন। অনন্তর প্রাতঃকালে হতাবশিষ্ট পলায়নোদ্যত মোঘলগণকে বন্দি করিলেন।[৮] ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোঘল সৈন্য নিহত ও বন্দি হয়। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী পদার্থে ও নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়। এই অদ্ভুত বিজয়বার্তা তড়িগতিতে সমস্ত বঙ্গে প্রচারিত হইয়া আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে প্রতাপের মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পর প্রতাপ যুদ্ধ-নিহত মুসলমান-শবের সৎকারের আদেশ দিয়া তিনি যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন। পরাজিতের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন হিন্দুগণের অস্থি-মজ্জাগত, প্রতাপ এই দেবদুর্লভ গুণবিহীন ছিলেন না। যে সকল মোঘল সেনাপতি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি অতি সমারোহের সহিত সমাহিত করিতেন। বর্তমান কালেও যশোহরে ও ইহার নিকটবর্তী স্থানে এই সকল আমীরগণের কবর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দিল্লিশ্বর মহাপ্রাজ্ঞ আকবর, সেনানী আজিম খাঁ সহ সমস্ত সৈন্যের বিনাশ-কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। কেমন করিয়া ভারতের এই সর্বোৎকৃষ্ট প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়, কেমন করিয়া দিন দিন বর্ধিতপ্রায় বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়, কেমন করিয়া নদীসঙ্কুল দুর্গম সুন্দরবনপ্রদেশ ধ্বংস করিয়া বিদ্রোহি প্রধান প্রতাপকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য দ্বাবিংশতি আমীরকে আহ্বান করেন। সম্রাট বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কহেন, "আপনাদিগের মধ্যে কোন্ বীরপুরুষ নানাপ্রকার বিপৎসঙ্কুল দুর্গম বঙ্গদেশে গমন করিয়া বিদ্রোহিগণকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ? কোন্ ব্যক্তি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিতে মোঘলবিজয়-বৈজয়ন্তী দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মোঘল-শোণিত-প্রবাহের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মোঘল-নামের বিজাতীয় বিভীষিকা বঙ্গীয় হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ?" সম্রাটের কথা

শুনিয়া দ্বাবিংশতি আমীর সকলেই বঙ্গদেশে গমন করিয়া মোঘল-অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট ইহাদিগের অধীনে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

আমীরগণ যথাসময়ে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেবমন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান সকল চূর্ণিত, পদদলিত ও দূষিত হইল। গৃহ সকল অগ্নিসাৎ করিয়া তাহারা নিরীহ প্রজাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নিপুণতার সহিত ধ্বংস হইতে লাগিল। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে করিতে মোঘলসৈন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপের রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতাপ তাহাদিগের আগমন কথা অবগত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে উহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্যাধ যেরূপ জাল মধ্যে আগত জন্তুকে আগমনমাত্রেই ধরিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে স্বয়ং আবদ্ধ হইবার সময় প্রদান করে, সেইরূপ প্রতাপ নদীজালবেষ্টিত প্রদেশে মোঘল-সৈন্যের আগমনের কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না।

দ্বাবিংশতি আমীর শত্রুরাজ্য মধ্যেও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবী যুদ্ধের কোনরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইল না, সমস্তই শান্তিপূর্ণ, একমাত্র প্রতাপ নিহত বা ধৃত হইলেই সমস্ত ক্লেশ সমাপ্ত হইবে। গর্বিত আমীরগণ ইহা স্থির করিয়া, প্রতাপের নিকট অসি ও শৃঙ্খল সহ একজন দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আমীরগণের আদেশ অনুসারে তরবারি ও বন্ধনশৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া প্রতাপ-সমীপে উপনীত হন এবং যথাবিহিত অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, "রাজন্! আপনার পিতৃদ্রোহ এবং রাজদ্রোহের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইতে আর বাকি নাই। এত দিবস যে আপনি আপনার এই কুৎসিত কার্যের ফল প্রাপ্ত হন নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, কাল প্রাপ্ত না হইলে কেহ ফলভোগ করে না। এক্ষণে আপনার নিয়ন্তা দ্বাবিংশতি আমীর বহুসৈন্য-পরিবৃত হইয়া আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা এই শাণিত অসি ও পাশ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহা গ্রহণ করুন।" ইহা কহিয়া দূত মৌনাবলম্বন করিলে পর প্রতাপের ইঙ্গিতানুসারে কেশব ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, "দেখ যবন! তুমি দূতরূপে আগমন করিয়াছ বলিয়া আজ এই শাণিত তরবারির করাল দংষ্ট্রা হইতে রক্ষা পাইলে। দূত! তুমি শীঘ্র তোমার প্রভু-সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, ঐ যে অদূরে নীলকান্তমণিপ্রভ যমুনাজল প্রবাহিত হইতেছে দেখিতেছ, যদি তুমি ভাগ্যক্রমে যুদ্ধস্থলে বন্দি হও, তাহা হইলে পুনরায় দেখিবে, ইহা যবনরক্তে আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মোঘল-সৈন্য ও সেনাপতিগণ যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদিগকেও সে দশা পাইতে আর বিলম্ব নাই। অতএব তুমি গমন করিয়া তোমার প্রভুগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে কহ।" কেশব ভট্ট ইত্যাদি কহিয়া দূতের নিকট হইতে অসি গ্রহণ করেন এবং তাহা চুম্বন করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পদতলে রাখিয়া দেন।

প্রতাপ মন্ত্রিবর শঙ্কর, গুহকুলগৌরব প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্ত, অগাধবুদ্ধি ভবানীদাস এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া কি প্রণালীতে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদিগের সৈন্যক্ষয় না হইয়া শত্রুপক্ষ সমূলে নির্মূল হয়, এতদ্বিষয়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাবীর শঙ্কর প্রতাপের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্, শত্রুগণ বিপুল বাহিনীসহ আমাদিগের রাজ্য মধ্যে অবস্থান করিতেছে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের আর নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা উচিত নহে। শত্রুগণ এক্ষণে জলাভূমি ও নদীজালপরিবেষ্টিত হইয়াছে। উহাদিগকে রাজধানীর সমীপবর্তী হইতে দেওয়া আমি

যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। আমার বিবেচনায় শত্রুপক্ষীয় নৌকাসকল সর্বাগ্রে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হউক, তদনন্তর যাহাতে না তাহারা পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ প্রারম্ভ হউক। সম্মুখে বর্ষা সমীপবর্তী, যে পর্যন্ত না বর্ষাকাল উত্তমরূপে আগমন করে, সে সময় পর্যন্ত ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তারপর বর্ষাকাল আগমন করিলে, সমস্ত পৃথিবী ইহাদিগের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হইলেও কেহই ইহাদিগকে যমের করাল দংষ্ট্রা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বভাবতই আমাদের দেশের বর্ষাকাল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক, তাহাতে আবার উহারা বিদেশি, সুতরাং শত্রুপক্ষীয় শিবিরসমূহ অচিরে রোগিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সে সময় আমরা অল্প প্রয়াসে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব।" শঙ্কর এইরূপ নানাপ্রকার হিতগর্ভ বাক্য কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে, সকলেই তাহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া তাহার বাক্যানুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতাপ সেনাপতিগণকে আহ্বানপূর্বক যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন, "স্বাধীনতা-সংস্থাপন-যুদ্ধে প্রত্যেক স্বদেশবাসীর সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। যদি এই ধর্মযুদ্ধে কোন ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছেদন পূর্বক পথরোধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে এক মুহূর্তের জন্য রোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে এক সময় এইরূপ সামান্য ঘটনায় দেশের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইতে পারে। তাই বলি, বীরগণ, আমাদিগের এই যুদ্ধের সহিত দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে একহৃদয়ে শত্রুগণকে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়েও যেন আপনারা দৃষ্টি প্রদান করেন। আপনারা এক্ষণে বিভক্ত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হউন। কোন দল রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি গমনপথ সকল রোধ করুন। কোন দল শত্রুগণ যাহাতে বাহিরের সংবাদ প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করুন। কোন দল শত্রুসৈন্যের খাদ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করুন। কোন দল শত্রুসৈন্যের গতিবিধি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করুন। প্রত্যেক দল বিভিন্ন হইলেও যেন পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করেন। আবশ্যক হইলে তাহারা যেন একপ্রাণে মিলিত ও বিযুক্ত হন। শত্রুগণ আমাদিগের হৃদয়ের উপর অবস্থান করিয়া শোণিত-শোষণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় সকলে ধীরভাবে প্রাণপণে কার্য করিতে অগ্রসর হউন।" এইরূপ সাধারণ উপদেশ প্রধান করিয়া প্রতাপ অক্লিষ্টকর্মা মহাবীর রুডাকে নৌসেনা পরিচালনা করিয়া শত্রুনৌকা সকল আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রঘু ও সুখাকে যথাক্রমে গমনাগমনপথে এবং খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহে বাধা প্রদান করিতে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। কখন বা বঙ্গীয় সেনাগণ মোঘলগণকে পরাজয়, কখন বা মোঘলগণ বঙ্গীয়গণকে পরাজয় করিতে লাগিল। মোঘলদিগের অধিকাংশ নৌকা ও খাদ্যদ্রব্য বঙ্গীয়দিগের হস্তে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ কিছুদিন ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহাতে জয়-পরাজয় কোন পক্ষেই নির্ণীত হইল না। ক্রমে বর্ষাও ঘোর-ঘনঘটা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ষা আগমনের সহিত আমীরগণের পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শীঘ্রই স্থান পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। অপর পক্ষ দুই চার দিবসের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হইবে, অতএব কয়েক দিবসের জন্য আমাদিগের এত ক্লেশ ও পরিশ্রম, এত জয় সমস্তই কি বৃথা হইবে? ইহা কখনই হইতে পারিবে না বলিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। অনবরত কয়েক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উন্নত প্রদেশ সকল দ্বীপাকার ধারণ করিয়া স্থলচর প্রাণীর একমাত্র আবাসভূমি হইল। নানাপ্রকার বিষাক্ত সর্প, কীট, মশক, জলৌকা প্রভৃতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। জ্বরও মোঘল-শিবির মধ্যে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া ভৈরবমূর্তি ধারণ করিল। দুর্ভিক্ষও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন। মোগলেরা এখন আর অগ্রসর হইতে বা পশ্চাদগমন করিতে পারিলেন না। প্রতাপ

মোঘল-শিবিরের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া একদিন সমস্ত সৈন্য সহ মোঘলগণকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করেন। এই লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ যুদ্ধকালে একদিক হইতে নির্ভয়চিত্ত রুডা রণতরী হইতে মোঘলগণের উপর অশনিসম অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কোন দিক হইতে গজারূঢ় সৈনিকগণ কালান্তক যমের ন্যায় মহাপরাক্রমে মোঘলব্যূহ ভেদ করিল। কোন দিক হইতে পদাতিকগণ শাণিত তরবারি বিঘূর্ণন করত শত্রুগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। এইরূপে চতুর্দিকে ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। হিন্দুগণের 'কালী কালী' ধ্বনির সহিত মুসলমানগণের 'দীন দীন' ধ্বনি মিলিত হওয়াতে দিক সকল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। শত্রু করতলস্থ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে পদদলিত করিতে পারিলেই বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে হস্তগতা হন, এই আশায় উৎসাহিত হইয়া হিন্দুগণ ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কয়েক দিবস দিবারাত্র ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হওয়াতে কয়েকজন মোঘল সেনাপতি নিহত হন। ইহাতে তাহারা বিজয় বিষয়ে হতাশ হইয়া হতবীর্য হইয়া পড়েন। সেনাপতি নিহত হওয়াতে মোঘল নিরুৎসাহ হইয়াছে অবগত হইয়া প্রতাপ ঘোরতর পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মোঘলগণ কোনরূপেই বাঙালিদিগের বেগ রোধ করিতে পারিলেন না। বঙ্গীয় বীরগণ অনন্যসাধারণ বীরত্বের সহিত প্রতিপদে মোঘলগণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। মোঘলগণ জয়-আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু মোঘলগণের চতুর্দিকেই বঙ্গীয় সেনা অবরোধ করাতে কেহই পলায়ন করিতে পারিল না, সুতরাং হতাবশিষ্ট সকলেই বন্দি হইল। এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরগণ জীবন-আশা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,[১] সেরূপ ঘটনা যদি অন্য কোন বীরদেশে সংঘটিত হইত, তাহা হইলে সেই বীরজাতি এই ঘোরতর যুদ্ধের কত স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন, কত শত লেখক ইহার পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা হইত না। যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াছিলেন, যত দিন পর্যন্ত আমরা সেই সকল দেবোপম ব্যক্তির পূজা এবং তাহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও দারিদ্রব্রত অনুকরণ না করিতে শিখিব, ততদিন পর্যন্ত আমরা কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইব না।

যুদ্ধ বিজয়ের পর প্রতাপ মোঘল-বন্দিগণের পদমর্যাদানুসারে তাহাদিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর প্রতাপ বন্ধুগণসহ বহুল পরিমাণে বিজয়লব্ধ দ্রব্য সহ যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন। মোঘলগণের পরাজয় কথা সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল। বঙ্গদেশ এতদিনে মুসলমানদিগের অত্যাচারমুক্ত হইল। আবার হিন্দুগণ নির্ভয়ে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। হিন্দুগণ পুনরায় মোঘলদিগের উপর বিজয় লাভ করিয়া প্রাণের সহিত প্রতাপ, শঙ্কর প্রভৃতি বীরপুরুষগণের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

---

১. The first general sent was Abram Khan, whose army was nearly annihilated near the fort Mutlar (Mutlah now Port Canning). Twenty-five other generals are stated to have been defeated in succession. Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, for December 1868.

২. প্রতাপের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি রায়গড় দেখিতে পাওয়া যায় ; উপরিউক্ত রায়গড় বেহালা বঁড়িশার সন্নিকট।

৩. সংগ্রামপুর, উত্তরপাড়ার জনপ্রিয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারির অন্তর্গত।

৪. তাহাদিগের সংখ্যা সার্ধশতেরও অধিক ; বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় হৃদয়ের উপর তাহারা অসীম ক্ষমতা এক সময় বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের বিকৃতমনা বৈদেশিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট তাহাদিগের কবিতার সমাদর না থাকিলেও শিক্ষিতমধ্যে এখনও আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

৫. ইনি টাকীর রায়চৌধুরী মহাশয়দের আদিপুরুষ।

৬. হুগলি জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় একজন সংসার-বিরক্ত ঈশ্বরানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনাতিবাহিত করিতে বাল্যকাল হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। কালক্রমে কামদেবের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রাণাধিক পত্নী সন্তান প্রসব করিয়া জীবনলীলা সংবরণ করেন। কামদেব এই নবীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পত্নী বিয়োগে জর্জরিত হওয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ ছিন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কামদেব যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় দৈববশাৎ গৃহের উপরিভাগ হইতে একটি জ্যেষ্ঠীর ডিম্ব তাহার সম্মুখে পতিত হইয়া ভাঙিয়া যায়। ডিম্বের ভিতর হইতে ছানাটি বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহা লালাতে আবৃত থাকায় নিস্পন্দ হইয়া রহিল। ইত্যবসরে একটি মক্ষিকা আসিয়া ঐ লালা ভক্ষণ করাতে ছানাটি পাশমুক্ত হইল এবং সেই মক্ষিকা ধরিয়া ভক্ষণ করিল। কামদেব ঐ ঘটনাটি মনোযোগের সহিত দর্শন করিতেছিলেন ; যখন তিনি দেখিলেন, সদ্যপ্রসূত শাবক জন্মগ্রহণ করিয়াই আহার প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার অপসারিত হইয়া তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি নবকুমার লক্ষ্মীকান্তকে ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কালক্রমে এই লক্ষ্মীকান্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করিয়া সামান্য কর্মে নিযুক্ত এবং স্বীয় প্রতিভাবলে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীপদে নিযুক্ত হন। প্রতাপের পতনের পর কামদেব জন্মভূমি দর্শনের জন্য একবার বঙ্গদেশে আগমন করেন, সে সময় কামদেবের সহিত মানসিংহের সাক্ষাৎ হয় ; মানসিংহ কামদেবকে সাধক বলিয়া ইতিপূর্ব হইতে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। মানসিংহ কামদেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকান্তের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা সাম্রাজ্যান্তর্গত না করিয়া তাহাকেই প্রদান করেন। এই মহাপুরুষ বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের আদিপুরুষ।

৭. ইহার উপর কামান স্থাপিত হইত, বর্তমানকালেও ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৮.

আজিমাগমনং বার্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন স্বসৈন্যপরিবেষ্টিতঃ।।
নির্জ্জগাম তদা তূর্ণমাজিমো হি স্থিতো যথা।
নিঃশব্দং ঘোরষ্যামিন্যামাক্রম্য তদ্‌বলং বলাৎ।।
প্রগৃহ্য বিবিধানস্ত্রান সব ববর্ষ মুহুর্মুহুঃ।
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃত্বাসৌ শমনোপমঃ।।
বিংশসহস্রসৈন্যানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন-ভূতলে।।

(প্রাচীন ঘটককারিকা)

৯. কেহ কেহ বলেন, মহকুমা বসিরহাটের অপরপারে ইছামতীতটে এই লোকক্ষয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সংগ্রামের স্মরণার্থ সেই সময় হইতে এই সমর ক্ষেত্র সংগ্রামপুর নামে অভিহিত হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়

মোঘলকুলগৌরব মহাভাগ আকবর যে সময় আগ্রা রাজধানীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যে সময় কুমার খসরু স্বীয় মাতুল মহাবীর মানসিংহ এবং শ্বশুর মন্ত্রিপ্রবর আজিম খাঁর[১] সাহায্যে রাজ্যের শাসনদণ্ড অধিকার করিবার জন্য পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, সেই সময় সুদূর বঙ্গদেশে মোঘল-সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং দ্বাবিংশ আমীরের নিধন-সংবাদ আগ্রা রাজধানীতে নীত হয়। এ সময় সম্রাটের মৃত্যু আসন্নবর্তী এবং পিতা-পুত্র আপন আপন ভুজবলে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াতে রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের পূর্ব লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছিল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কে কিরূপভাবে অভিনয় করিবেন, সেই সকল চিন্তায় তাহারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের কোন্ নিভৃত স্থানে মোঘল সৈন্যের জয় বা পরাজয় হইল, সে সকল ক্ষুদ্র চিন্তা এ সময় তাহাদিগের মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না।

কালক্রমে দেবচরিত্র আকবর মানবলীলা সংবরণ করিলেন।[২] মানসিংহ, আজিম খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। কুমার সেলিম পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, এই সকল অন্তর্বিপ্লব কিরূপে নিবারিত হয়, কিরূপে প্রবল পরাক্রান্ত মানসিংহকে হস্তগত করা যায়, কিরূপে আজিম খাঁ প্রভৃতি প্রধান কর্মচারিগণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা অবলম্বন করেন, এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন। সম্রাট, কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধের বশবর্তী না হইয়া, শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় পুত্র এবং মানসিংহ প্রভৃতি কর্মচারিগণকে তাহাদিগের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্মে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। মানসিংহ প্রভৃতি বীরগণ খসরুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার জাহাঙ্গীরের নিকট আগমন করিলেন। মানসিংহের অধীনে এ সময় প্রায় বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজপুতজাতির উপর ইহার অপ্রতিহত ক্ষমতা। তিনি মনে করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় তাহাকে রাজধানীতে রাখা কোনরূপে মঙ্গলকর নহে বিবেচনা করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর শ্যালককে বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন, ইহাতে গৃহের ও বাহিরের উভয় শত্রু প্রশমিত হইবে। যদি ঘটনাক্রমে মানসিংহ এই যুদ্ধে নিহত হন, তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহণের প্রধান শত্রু বিনা প্রয়াসে ইহলোক হইতে অপসারিত হইবে। আর যদি প্রতাপাদিত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেও রাজ্যের একজন প্রধান শত্রুর হ্রাস হইবে। সম্রাট জাহাঙ্গীর উভয়দিকে ইষ্টসিদ্ধি হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মানসিংহকে বহুবিধ মধুর বাক্যে সম্মানিত করিয়া তাহাকে বঙ্গের শাসনকর্তৃপদে নিয়োগ করেন। মানসিংহ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত সৈন্য ব্যতীত আরও অনেক সৈন্য লইয়া বঙ্গে শান্তি-সংস্থাপনের নিমিত্ত আগ্রা হইতে বহির্গত হন।

আমীরগণের পরাজয়ের পর হইতে প্রতাপ তাহার উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন। এই সময় হইতে তিনি রাজ্যশাসনব্যবস্থা এবং বঙ্গের স্বাধীনতা যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়াছিলেন। যাহাতে বঙ্গীয় নৃপতি ও জমিদারবৃন্দ পরস্পর হিংসাদ্বেষ

পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন, যাহাতে পরস্পরের সুখে, দুঃখে পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করেন, সে জন্য তিনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের কতকগুলা কুলাঙ্গারের নিকট প্রতাপের এই অতুল ক্ষমতা ভাল লাগিল না। একজন কায়স্থ যুবক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে, এ দৃশ্য তাহাদিগের চক্ষে শূলস্বরূপ বিদ্ধ হইতে লাগিল। কেমন করিয়া এই কায়স্থ যুবকের সর্বনাশ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহারা মস্তিষ্ককে আলোড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাপী লিপ্ত ছিল, তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার সর্বপ্রধান।[৩] প্রতাপের অন্নে প্রতিপালিত বঙ্গের এই সকল অকালকুষ্মাণ্ড জননী জন্মভূমির গলদেশে কঠোর দাসত্ব-পাশ পরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

মহাবীর মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনকালে রূপরাম সহ কাঁচু রায় তাহার সহিত মিলিত হন। প্রতাপের গৃহচ্ছিদ্র ও দুর্বলতা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন বলিয়া মহাবল মানসিংহ কাঁচু রায় প্রভৃতিকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গীয় প্রজাগণ মোঘল সৈন্যগণের আগমনবার্তা অবগত হইয়া গৃহ দ্বার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য দূরতর প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল।[৪] জমিদার ও প্রজাগণের পলায়ন জন্য মানসিংহকে সময় সময় অন্নের জন্য বিশেষ রূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মানসিংহ মানব-বিহীন প্রদেশ বহু ক্লেশে অতিক্রমণ করিয়া, রাজমহলের সন্নিকটে বর্তমান পাকুড় রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত মিলিত হন। ইনি স্বীয় দলবল সহ মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের রাস্তা অধিকতর সুগম করিয়া দেন। মানসিংহ তাহার ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া উত্তরকালে ইহাকে যে জমিদারি প্রদান করেন, তাহা স্বীয় রাজধানী আম্বের নামে অভিহিত করিতে তাহাকে আদেশ দিয়া বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তদবধি ইহা আম্বের পরগণা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মহাবল মানসিংহ রাজমহল, বীরভূম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হন। বহু সৈন্য সহিত মানসিংহ আগমন করিতেছেন শুনিয়া প্রতাপ তাহার রণদুর্জয় ফিরিঙ্গি সেনাপতিকে ভাগীরথীর উভয় তট রক্ষা ও মানসিংহের গতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ফেরঙ্গবীর রুডা সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী প্রদেশ সুরক্ষিত করিয়া যাহাতে শত্রুগণ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে না পারে, সে জন্য নিকটের নৌকা সকল নদীগর্ভে নিমগ্ন করিয়া দেন। মানসিংহ চর-মুখে প্রতাপের সৈন্য বিন্যাসের কথা অবগত হইয়া বর্ধমান হইতে দ্রুতগতিতে গঙ্গা অভিমুখে গমন করেন। অবশেষে চাপড়া গ্রামে সমীপবর্তী নদীতটে সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বেই এ প্রদেশের আপামর জনসাধারণ মোঘলবাহিনীর আগমন কথা অবগত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; নৌকা সকল পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয়, এ জন্য তারা নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত এবং জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। মানসিংহ যে সময় নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় উদ্ভাবনে চিন্তাক্রান্ত, সেই সময় কুলাঙ্গার ভবানন্দ অতি গোপনভাবে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হন। ভবানন্দ, মানসিংহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাহার নিকট জননী জন্মভূমির হৃদয়দেশে কুঠারাঘাত করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং নৌকা ও দ্রব্য সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় নারকীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করেন। মানসিংহ ভবানন্দের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইলে পর সপ্তাহ-কাল-ব্যাপী ভয়ঙ্কর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিতে সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হইল। মোঘল-সৈন্যের দুর্দশার সীমা রহিল না, জ্বর ও বৃষ্টির দারুণ প্রকোপে শত শত মোঘল সৈন্য মানবলীলা সংবরণ করিতে লাগিল। এই মহাবিপদের উপর দারুণ অন্নাভাব মোঘল সৈন্যকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কুটিল ভবানন্দ মানসিংহের আগমনবার্তা অবগত হইয়া গোবিন্দদেব প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ভাণ করিয়া ইতিপূর্বে বহুল পরিমাণে ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

তিনি স্বীয় ভাগ্যচক্র পরিবর্তনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেই সকল দ্রব্য মানসিংহের আতিথ্যে বিনিয়োগ করিয়া তাহার কৃপা ক্রয় করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ নৌবলে অত্যন্ত প্রবল। বিশেষত জলযুদ্ধ-নিপুণ পর্তুগিজগণ অসামান্য বুদ্ধিবলে তাহার নৌবলচালনা করিয়া সতর্কতার সহিত রাজ্যরক্ষা করিতেছে। পূর্বের মোঘল সেনাপতিগণ জলপথে গমন করিয়া সকলেই নিহত হইয়াছেন। মানসিংহ এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া নৌকাপথে গমন-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে যশোহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।[৫]

সপ্তাহকালব্যাপী ঝড়-বৃষ্টিতে প্রতাপেরও ক্ষতির সীমা রহিল না। এই দারুণ দৈব-দুর্বিপাকে বঙ্গের আশা-ভরসার স্থল—সকল প্রকার উপকরণসম্পন্ন রণপোত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রতাপ বিপদের উপর এই অভাবনীয় বিপদাগমে কিছুমাত্র ব্যাকুলিত না হইয়া যশোহররক্ষার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি পর্তুগিজ নৌসেনা এবং স্বদেশীয় সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া মোঘল সৈন্য পরাজয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বঙ্গের দুরদৃষ্টক্রমে ভবানন্দ প্রভৃতি পুরুষগণ মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত হওয়াতে প্রতাপের নীতিজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। মানসিংহ বঙ্গের কুলাঙ্গারদিগের নিকট হইতে প্রতাপের গতিবিধি অবগত হইয়া তাহার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ উপযুক্ত স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া, প্রতাপের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত অসি ও শৃঙ্খল সহ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় গমন করিয়া বিনয় সহকারে অভিবাদন পূর্বক মানসিংহ-প্রেরিত পত্র, অসি ও শৃঙ্খল সভামধ্যে প্রদান করিয়া স্বীয় আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। দূত উপবিষ্ট হইলে পর, কেশব ভট্ট প্রতাপের আদেশক্রমে জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "দূত! তোমার প্রভু-সমীপে কহিবে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংরক্ষণ জন্য প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার হস্তপদাদি দেশের কল্যাণকর কার্য হইতে বিরত থাকিবে না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ অন্যান্য আমীরগণকে যমভবনে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দুকুল-কুলাঙ্গার মানসিংহকে সমরে নিহত করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন। দুর্বৃত্ত বিহারীমল মানসিংহের পিতামহ, রাজপুতদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে জন্মভূমি বিক্রয়ের উদাহরণ প্রদর্শন এবং সম্রাট আকবরের নিকট আগমন করিয়া স্বীয় কন্যা প্রদান করেন ; এই দুরাচারীরা অমরকীর্তি রাজপুতদিগের পবিত্র বংশে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করেন। তাহার পুত্র এবং তোমার প্রভুর পিতা ভগবানদাস স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া কুমার সেলিমের চিত্ত-বিনোদন করেন, তোমার প্রভুর পূর্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে মুসলমানগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা বিধ্বংস করিয়া আসিতেছেন। এই মোঘলক্রীতশরীর পিশাচের অগণিত পুত্রগণ[৬] যেরূপ আমাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইরূপ ইহাকেও আমরা যম-সদনে প্রেরণ করিয়া ইহাদিগের দুষ্কর্মের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। ভারতের বাহিরের শত্রুগণ ভারতের যে সকল অনিষ্ট করিতে সমর্থ না হইয়াছে, এই সকল ক্রুরকর্মা স্বদেশবাসী পাপিষ্ঠগণ তুচ্ছ সুখ, পদ ও উপাধির জন্য তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য ঘোরতর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন এই সকল স্বদেশদ্রোহী স্বাধীনতার জাতশত্রুগণকে সমূলে নির্মূল করিতে ক্ষণ-বিলম্ব করিব না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।" বাগ্মিবর কেশব ভট্ট এই সকল উদ্দীপনাপূর্ণ কথা কহিয়া অসি চুম্বন করত প্রতাপের পাদদেশে স্থাপন করেন। মানসিংহ-প্রেরিত দূত প্রতাপসভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যথাযথ সমস্ত কথা প্রভু-সমীপে নিবেদন করিলেন।

প্রতাপের পতন হইলে বঙ্গের অন্যান্য রাজারা হতবীর্য হইয়া পড়িবে, এ জন্য মানসিংহ

স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে কতকগুলি নির্বাচিত সৈন্য দিয়া তিনি কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুরাভিমুখে প্রেরণ করেন। কেদার রায়, মধু রায় প্রমুখ বীরগণ-পরিচালিত বঙ্গীয় সৈন্যের শূরতা ও ধীরতার কাছে মোঘল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। দেশের জনসাধারণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে কার্য করিয়াছিলেন, তাই অতুল সমৃদ্ধিশালী মোঘলগণও তাহাদিগের কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। মানসিংহ স্থলপথে বিক্রমপুরপতির কিছুই করিতে না পারিয়া জলযুদ্ধে বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে এক শত যুদ্ধ-জাহাজ মোঘল সৈন্য পরিপূর্ণ হইয়া কেদার রায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইল।

কেদার রায় নিশ্চিন্ত থাকিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার পাত্র নহেন। স্বদেশের স্বাধীনতা যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য কেদার রায়, মধু রায় (বৈদেশিকদিগের কাছে Manadaray নামে অভিহিত হইতেন) প্রমুখ বীরগণ যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও ভৈরববিক্রমে কার্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মানসিংহ-প্রেরিত অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা-পরিশোভিত এক শত রণতরী কেদার রায়কে সমূলে নির্মূল করিবার জন্য মেঘনা অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে মেঘনার উপকূলে মোঘল ও বাঙালি বাহুবলের পরীক্ষা হইল। এই ঘোরতর পরীক্ষার দিনে বাঙালিরা জলযুদ্ধনিপুণতার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকল দেশের পক্ষেই গৌরবজনক। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মোঘলদিগের সমস্ত নৌবল মেঘনা-গর্ভে নিমজ্জিত হইল। লোহিত্য আজ মোঘলরক্তে লোহিতবরণ ধারণ করিয়া জীবগণকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিতে লাগিল। সেই ঘোরতর যুদ্ধে বীরবর মধু রায় মহাশয় স্বদেশরক্ষার জন্য মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বঙ্গের নৌযুদ্ধের ইতিহাসে সেরূপ নৌযুদ্ধের কথা আর আমরা পাঠ করি নাই। এই ঘোরতর যুদ্ধে যে সময়ে বাঙালিরা মোঘল-রণতরী চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ডুবাইতেছিল, সেই সময় মহাবীর মধু রায় বিপক্ষ-প্রেরিত গোলকাঘাতে বীরলীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।[৭] এই ঘোরতর যুদ্ধে ডমিনিক কার্ভালহো শরবিদ্ধ হইয়াও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।[৮]

মানসিংহ কাঁচু রায় এবং প্রধান প্রধান কর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহের আদেশ শ্রবণ করিয়া বৈরনির্যাতনাকাঙ্ক্ষী কাঁচু রায় বিনীতভাবে কহিলেন, "রাজন্! বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের সহিত একটু বিশেষ বিবেচনার সহিত যুদ্ধ করিবেন। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, আমীরবিজয়ে উদ্দীপ্ত এবং অবসরজ্ঞ। সত্য বটে, আপনি কাবুলাদি নানাস্থানে অনন্যসাধারণ জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি বিবেচনা করি, ইহার ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন কুত্রাপিও হন নাই। ইনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অসাধারণ ভুজবলে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহাতে ইহার অভিজ্ঞতাই প্রকটিত হয়। ইনি এক্ষণে বঙ্গদেশের একমাত্র নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি যে সকল বিশ্বস্ত, প্রভুকার্যতৎপর কর্মচারিগণে পরিবেষ্টিত আছেন, তাহারা সকলেই অমিতসাহসী, অক্লিষ্টকর্মা, যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ এবং জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণ প্রদানেও কুণ্ঠিত নহে। দৈবানুগৃহীত প্রতাপ মহামায়ার বরপুত্র বলিয়া সকলের নিকট অভিহিত হন। জনসাধারণের হৃদয়ের উপর ইহার অসীম ক্ষমতা ; অতএব আমার বিনীত নিবেদন, আপনি একটু বিশেষ নিপুণতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। অদূরবর্তী যশোহরপুরী লঙ্কার ন্যায় সুরক্ষিত, ইহার চতুর্দিকে দুর্গ ও দুস্তর যমুনাবেষ্টিত হওয়াতে শত্রুগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছে। দুর্গপ্রাকার কামানশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হওয়াতে ইহাকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে। রাজন্! ঐ যে পূর্বদিকে সুবিস্তৃত রণক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি দেখিতে পাইতেছেন, উহার নিম্নপ্রদেশে

সুড়ঙ্গ করিয়া প্রচুর পরিমাণে বারুদ রক্ষিত হইয়াছে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে এ স্থানে উপস্থিত হইলেই সে সসৈন্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এইরূপ ইহার উত্তরদিকে ক্রোশপরিমিত ভূমির নিম্নদেশের স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ রক্ষিত হইয়াছে ; দুর্গের দক্ষিণদিকে আমাংসাহারী দুর্জয় পার্বত্যসৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে। কূটযুদ্ধপ্রিয় ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ অহরহ সতর্কতার সহিত যশোহর রক্ষা করিতেছে। ইহার পশ্চিম-দ্বারে গজারোহী সৈন্য, উত্তর-দ্বারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, দক্ষিণদিকে বঙ্গীয় বীরগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নানাপ্রকার আয়ুধসম্পন্ন হইয়া সর্বদা যুদ্ধসজ্জায় অবস্থান করিতেছে।" মানসিংহ কচু রায়ের নিকট যশোহর দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অবগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মহাবীর মানসিংহ নিপুণতা সহকারে ব্যূহ রচনা করিয়া দক্ষিণদিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, বামদিকে গোলন্দাজগণ, সম্মুখে গজারোহী সৈন্য সংস্থাপন করিলেন, পশ্চাদভাগে আমীরগণ-পরিবেষ্টিত বহুসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিয়া স্বয়ং সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মানসিংহের সৈন্যগণ যুদ্ধকালে কখন মানসিংহের জয়, কখন দিল্লিশ্বরের জয় শব্দে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

মহাবীর প্রতাপ মহাশক্তির উদ্বোধন পূর্বক জনগণ-হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়া, শত্রু-বিজয়ের জন্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজয়লক্ষ্মী তাহাদিগের অঙ্কগতা হয়, কি উপায়ে জ্ঞাতিসহ মানসিংহকে পরাভব করা যাইতে পারে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন—"এবার আমাদিগকে অন্যপ্রকার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কাঁচু রায় প্রভৃতি আপনার জ্ঞাতিবর্গ মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে আগমন করিয়াছে। শুনিতেছি, ইহার সহিত আরও কয়েক ব্যক্তি মিলিত হইয়াছে। নদী-তটে মানসিংহ যৎকালে খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিলেন, যখন ঘোরতর বৃষ্টির সময় প্রাণিকুল আকুলিত হইয়াছিল, সেই বিপৎসময়ে শুনিতেছি, ভবানন্দ খাদ্যদ্রব্য, নৌকা ও আশ্রয় প্রদান করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যখন বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী স্বদেশবাসিগণ পরাধীন হইবার জন্য শত্রুদিগকে সাহায্য করিতেছে, যখন আপনার কুলাঙ্গার কর্মচারিগণ মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া শত্রুপদতলে জননী জন্মভূমিকে বলিদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তখন আমাদিগকে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর-বিক্রমে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। আমাদিগকে এক্ষণে গৃহ ও বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কার্য করিতে হইবে।"

শঙ্কর প্রমুখ বীরগণ এই সকল কথা কহিলে পর প্রতাপ সেনাপতিগণকে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ প্রতাপের আদেশানুসারে মহাবীর শঙ্কর, সেনাপতি সূর্যকান্ত, পূর্বদেশীয় সেনাধিপতি রঘু, ফেরঙ্গপতি রুডা, গুপ্ত-সেনাপতি সুখা, ঢালীপতি মদন, রাজকুমার উদয়াদিত্য, যুদ্ধপ্রিয় প্রতাপসিংহ প্রভৃতি বীরগণ বহুল-সৈন্য-পরিচালনা করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন, উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বঙ্গীয় বীরগণ চতুর্দিক হইতে মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষের বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বিজয়-লাভের জন্য পরস্পরের উপর শাণিত তরবারি প্রহার করিতে লাগিল। শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিল হইয়া উঠিল। এইরূপ কয়েক দিবস উভয়পক্ষ ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইহাতে পর্তুগিজ সেনাপতি রুডা লোমহর্ষক যুদ্ধকালে মানসিংহের দশ জন আমীরকে নিহত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য বধ করেন, উভয়পক্ষই বিজিগীষু হইয়া অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; জয়-পরাজয় কোনপক্ষেই নির্ধারিত হইল না। এইরূপ কয়েক দিবস যুদ্ধ হইলে মহাবীর প্রতাপাদিত্য ভক্তিভাবে ভগবতীর পূজা

করিয়া, অতি প্রত্যুষে সেনাপতিগণ সহ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাগ্মিবর শঙ্কর যুযুৎসু সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বীরগণ, আমরা এক্ষণে জয়-পরাজয় নামক দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। একদিকের রাস্তায় শত্রুসৈন্য বিমর্দন করিয়া স্বাধীনতার শান্তিনিকেতনে উপনীত হওয়া যায়। অন্যদিকের রাস্তায় গমন করিলে শত্রু কর্তৃক বিমর্দিত হইয়া পরাধীনতার চিরদুঃখভবনে উপস্থিত হইতে হয়। এক্ষণে আপনারা কোন রাস্তায় গমন করিবেন? যদি আপনারা পুত্রকলত্রের চিরসুখের জন্য জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন। ইহাতে আপনারা ইহলোক ও পরলোকে বিমল কীর্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। আর যদি আপনারা কাতরতা পূর্বক যুদ্ধবিমুখ হন, তাহা হইলে আপনারা শত্রু কর্তৃক পশুর ন্যায় নিহত হইবেন এবং আপনাদিগের বহুক্লেশে সম্পাদিত কীর্তি সকল চিরকালের জন্য ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে। বীরগণ! আপনারা যে বহুদিন হইতে বহুক্লেশে মোঘলগণকে যুদ্ধস্থলে মথিত, ব্যথিত ও নিহত করিয়া স্বাধীনতা-সংস্থাপন করিলেন, তাহা কি আমাদিগের একদিনের ভীরুতার জন্য বিফল হইবে? কখনই নহে, ঐ দেখুন, ভগবতী আমাদিগের সহায়তার জন্য কৃতান্তের ন্যায় অসি নিষ্কাশিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনারা একবার প্রাণপণে যুদ্ধ করুন, অদ্যই আমরা শত্রুগণের উপর চিরস্মরণীয় বিজয়লাভে সমর্থ হইব।" এই বলিয়া শঙ্কর সৈন্যগণসহ শত্রুসৈন্যের মধ্যে বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্করবেগে ভৈরবনাদ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ সূর্যকান্ত, রঘু, মদন, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সেনানায়কগণ সকলেই আপন আপন সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া অদ্ভুত-বিক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। কামানরাজীর অবিরাম অগ্নিবর্ণ গোলকোদিগরণে রণস্থল ভয়ঙ্কর এবং ঘোরতর ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আগ্নেয় অস্ত্রসমূহের শ্রবণ-ভৈরব গর্জন, রণবাদ্য এবং যোদ্ধৃগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণিগণের বিভীষিকা উৎপন্ন করিতে লাগিল। গজাশ্ব প্রভৃতির অজস্র শোণিতপাতে মেদিনী কর্দমাক্ত হইল। এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যোদ্ধৃগণের ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়ে। শঙ্কর প্রভৃতি বীরগণ অবিচলিতচিত্তে অতি নিপুণতার সহিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, মানসিংহের দুর্বল পক্ষ আক্রমণ এবং স্বীয় পক্ষের অসংযত সৈন্যগণকে সংযত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমস্ত দিবা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বেলা অবসানের সময় কতকগুলি নূতন সৈন্য লইয়া ভীষণ পরাক্রমে সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কর সমবেত সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বীরগণ, ঐ দেখ আমাদিগের যুদ্ধসহচরগণ কিরূপ ভৈরব-বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন ; সমুদ্রের ভীষণ আলোড়নে দৃঢ়কায় পোত সকল যেরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ উহাদিগের প্রবল পরাক্রমে মোঘল-সৈন্য বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে। বীরগণ! এই অবকাশে মোঘলগণকে আক্রমণ করিলে প্রবল প্রভঞ্জনের নিকট যেরূপ জলদ-জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ শত্রুগণ প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। অতএব বীরগণ, এরূপ সুযোগ বৃথা কাটাইবার সময় নহে।" এই বলিয়া শঙ্কর প্রভৃতি সেনানীগণ মহারুদ্রের ন্যায় মোঘলসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে সকল সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মানসিংহের সৈন্যগণ সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার নতুন সৈন্যের আক্রমণে একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রবল বায়ু বৃক্ষাদিকে যেরূপ সমূলে উৎপাদিত করে, সেইরূপ প্রতাপ-সৈন্য মোঘল সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলয়সম যুদ্ধে মানসিংহের সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মানসিংহ সৈন্যগণকে শত্রু-পদদলিত দেখিয়া জীবন ও জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া

অসামান্য নিপুণতা সহকারে পরাজিত সৈন্যগণকে কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবসের যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ পশ্চাৎ হইতে বারংবার প্রতাপসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিল। একে সে সময় রাত্রিকাল, তাহাতে ঘোরতর অন্ধকারযুক্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অধিকতর ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। মানসিংহ পাঁচ ক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া সৈন্যগণসহ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ সৈন্যগণসহ মানসিংহকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। আবার রণবাদ্য ও কামান-গর্জন চতুর্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। মানসিংহ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বদিবস অপেক্ষা অদ্যকার যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত হইল। এই ঘোরতর যুদ্ধে মহাবীর রঘু, মামুদ আদি সেনাপতিগণ সহ বহুসংখ্যক সৈন্যকে নিহত করিয়া বীরলোক প্রাপ্ত হন।

মানসিংহ দিন দিন তাহার সৈন্যসকল নিহত হইতেছে এবং প্রতাপকে পরাজয় সহজ কার্য নহে বুঝিতে পারিয়া প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং রাঘব রায়, ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি স্বদেশ-শত্রুর নরপিশাচগণকে আহ্বান করিয়া কহেন, "আমি কাবুল আদি অনেক দেশ জয় করিয়াছি, কিন্তু কোথাও এরূপভাবে পরাজিত হই নাই। আমার পরাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখিয়া কম্পিত হইতে হইয়াছে। সম্রাট আমার মৃত্যুর জন্য আমাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, এ দেশ হইতে পরাজিত হইয়া সম্রাট-সমীপে গমন করিলে কখনই তাহার ক্রোধানল হইতে মুক্তি পাইব না। উদারধী মহাত্মা আবুল ফজল যেরূপ ঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছেন, মহাবীর সের খাঁকে যেরূপ নৃশংসতা সহকারে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা ভুবন-বিদিত ; এরূপ কঠোর অবস্থায় কি প্রকার কার্য করিলে উভয়দিকেই হিত সাধিত হয়, আমাকে সেইরূপ পরামর্শ প্রদান করুন।" স্বদেশদ্রোহী কাঁচু রায় সর্বাগ্রে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "মহাভাগ! বিজয় আপনার অঙ্কগতপ্রায়, এরূপ সময়ে যদি আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইহার ফলভোগ না করেন, তাহা হইলে বুঝিলাম, বীরধর্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতাপের উপর বিমুখ হইয়াছেন, ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে ভগবতীর উদ্বোধন করিয়া বানর-চমূ মধ্যে যেরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও মহামায়ার পূজা করিয়া সৈন্যগণ হৃদয়ে বল প্রদান করুন। ইহাতে দেখিবেন, অচিরকালমধ্যে আপনার অভীষ্ট সাধিত হইবে। রাজন! আপনি যদি এই দুর্বৃত্ত পিতৃহন্তার সমুচিত দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবে?" ইত্যাদি নানা প্রকার কথা কহিলে কেহ কেহ তাহার বাক্য অনুমোদন করিলেন। মানসিংহ, কচু রায়ের উপদেশানুসারে অতি সমারোহের সহিত ভগবতীর অর্চনা করিয়া সৈন্য মধ্যে এরূপ জনরব প্রচার করিলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবতী তাহার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া প্রতাপের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, ইত্যাদি নানা প্রকার কথা প্রচার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মানসিংহ সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ মানসিংহের সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেনাপতিগণকে চতুর্দিক হইতে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সূর্যকান্ত, মদন, সুখা, রুডা এবং অজাতশ্মশ্রু বীরবর কুমার উদয়াদিত্য আপন আপন সৈন্যগণকে পরমোৎসাহিত করিয়া বিজয়লাভের জন্য শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যুভয়-বিরহিত মানসিংহ সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অদ্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অভিনয় হইবে, শত্রুপক্ষ পরাজয় না করিয়া আমি রণস্থল কদাচ পরিত্যাগ করিব না, অদ্যকার ভীষণ পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হই, তাহা

হইলে এই নানা রত্ন-পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ আমাদিগের পদদলি ত হইবে ; অতএব বীরগণ, তোমরা যে প্রকার শূরতা পূর্বক আফগানগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেইরূপ বীর্যবলে বঙ্গীয়গণকে পরাজয় কর।" এই বলিয়া মানসিংহ কুঞ্চিতকেশ হাবসী, উন্নতশরীর রাজপুত এবং অতিকায় মোঘলগণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্বলিত হইল, উভয়পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূর্ব ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে আগ্নেয় অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল ; যুদ্ধমদোদ্ধত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সূর্যকান্ত অনন্যসাধারণ বীরত্বের সহিত মানসিংহের ব্যূহ ভেদ করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন, দলিত, মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সমীরণ যেরূপ ভৈরব-মূর্তি ধারণ করিয়া বারিধি-বারি আলোড়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্যকান্ত মানসিংহের সৈন্যগণকে আকুলিত করিতে লাগিলেন। উত্তাল তলঙ্গাকুলিত সমুদ্র ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য যেরূপ গভীর গর্জন করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ মানসিংহ সৈন্যগণসহ বঙ্গীয় সৈন্যগণকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহের সৈন্যগণের সহিত সূর্যকান্তের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোঘল সৈন্যগণ সূর্যকান্তের চতুর্দিক আচ্ছাদিত করিল, সূর্যকান্ত আপনাকে মোঘল-পরিবেষ্টিত দেখিয়া অলৌকিক বীর্য প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবল দাবানল ইন্ধন-বিহীন হইয়া যেরূপ নিস্তেজ হইয়া আইসে, সেইরূপ সূর্যকান্তের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল ; মহাবীর উদয়াদিত্য সেনাপতি সূর্যকান্তকে বিপৎসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সৈন্যগণসহ তাহার সাহায্যের জন্য গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর মানসিংহ উদয়াদিত্যকে সূর্যকান্তের সাহায্যের জন্য আগমন করিতে দেখিয়া, কতকগুলি সৈন্যকে তাহার অবরোধের জন্য প্রেরণ করিয়া সূর্যকান্তের নিধন জন্য অপর কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ-প্রেরিত সৈন্যগণ বিপুল পরাক্রমে সূর্যকান্তকে আক্রমণ করিল, সূর্যকান্ত ইহাদিগকে কোনরূপে রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি মহারুদ্রের ন্যায় রণস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন।

মহাবীর উদয়াদিত্য সূর্যকান্তের পতনে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দ্রুতবেগে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। বঙ্গীয় সৈন্যগণ সূর্যকান্তের পতনে ভয়বিহ্বল না হইয়া সেনাপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য উগ্ররূপ ধারণ করিয়া ভৈরববিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঊনবিংশবর্ষীয় উদয়াদিত্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া পূর্বাহ্নের আদিত্যের ন্যায় তীক্ষ্ণবীর্য প্রকাশ করিয়া শত্রুমথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহ সূর্যকান্তকে বিনাশ করিয়া সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া কহিতে লাগিলেন— "বীরগণ, ঐ দেখ, শত্রুগণের সেনাপতি তোমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছে, এক্ষণে তোমরা তোমাদিগের পূর্ব-বীর্য স্মরণ করিয়া, ঐ যে যুবক কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় আমাদিগের সৈন্যসমূহ সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, উহাকে আক্রমণ কর। ঐ যুবক প্রতাপাদিত্যের পুত্র, ইহাকে নিহত বা বন্দি করিতে পারিলে আমরা শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব।" এই কথা কহিয়া মানসিংহ কতকগুলি মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত ও হাবসী সৈন্য উদয়াদিত্যাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অলৌকিক বীর্যসম্পন্ন উদয়াদিত্য শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে বিপক্ষ সৈন্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিলেন। যে সময় মহাবীর উদয়াদিত্য প্রলয়কালীন মহারুদ্রের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিপক্ষপক্ষনিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক তাহার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া তাহাকে অমরধামে প্রেরণ করে। বঙ্গের গৌরবরবি কায়স্থকুলভূষণ মহাবীর উদয়াদিত্য যৌবনের প্রারম্ভে যেরূপ শৌর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা

বীর-ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। বীরজগতে সূর্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে।

সেনাপতি সূর্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের পতনে বীরগণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মহাবীর রুডা সৈন্যগণকে বিমোহিত ও বিশৃঙ্খল দেখিয়া ফিরিঙ্গি সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ভ্রাতৃগণ, আমরা জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ ও অনন্ত বারিধি-বারি অতিক্রম করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনতায় পরম সুখে বাস করিতেছি। ইহার সস্নেহ ব্যবহারে আমরা জন্মভূমি-বিয়োগজনিত দুঃখও অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছি। ইনি আমাদিগের সুখের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি আমাদিগের ধর্মকার্যের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার নিকট আমরা সর্বতোভাবে ঋণগ্রস্ত। এক্ষণে আমাদিগের সেই পূর্ব-ঋণ পরিশোধ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহার জয়-পরাজয়ের সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; অতএব ভ্রাতৃগণ, আমাদিগের জন্মভূমিকল্প বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত ; এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারিলে এ দেশে আমাদিগের অক্ষয় কীর্তি চির-স্থাপিত হইবে।" মহাবীর রুডা সৈন্যগণকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিয়া সিংহবিক্রমে মোঘলগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রবল প্রভঞ্জন যেরূপ অবলীলাক্রমে বৃক্ষ সমূহকে সমূলে উন্মুলিত করে, সেইরূপ ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ বঙ্গদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য মোঘলদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বিধাতা যখন প্রতিকূল হন, তখন সকল উপায়ই বিফল হয়, আবার যখন অনুকূল হন, তখন বিপদও সম্পদে পরিণত হয়। বিধাতা, সারমেয়-বৃত্তিপ্রিয় স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণের অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদিগের স্বাধীনতার জন্য উদারধী ইউরোপীয় বীরগণও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মহাবীর রুডা অসাধারণ শূরতা-সহকারে যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। বঙ্গীয় ও ফিরিঙ্গি সৈন্যগণ উপর্যুপরি সেনাপতিগণকে নিহত দেখিয়া অবসন্ন হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। স্বজাতিদ্রোহী বিজয়গর্বিত মানসিংহের সৈন্যগণ ঘোরতর-বিক্রমে বঙ্গীয় বীরগণকে আক্রমণ করিল।

এইরূপে বঙ্গীয় সৈন্যের সহিত মোঘল-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কোন পক্ষই বিজয়লাভে সমর্থ হইল না। উভয় পক্ষই বিজয়লাভের আশায় অধিকতর পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ যশোহর-দুর্গ অবরোধ করিলে অবরুদ্ধ নগর মধ্যে ধীরে ধীরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। প্রতাপের কতিপয় আত্মীয়, বঙ্গীয় সেনানীগণের নিধনে ভয়বিহ্বল হইয়া শ্লেনরূপে প্রাণরক্ষার জন্য গোপনে মানসিংহের সহিত মিলিত হন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ বাঙালিদিগের কাছে মানসিংহ যশোহর-দুর্গের সমস্ত কথা অবগত হইয়া, ইহা হস্তগত করিবার জন্য ঘোরতর বিক্রমে প্রতাপকে আক্রমণ করেন। প্রতাপ এরূপ সঙ্কটকালে যশোহর-দুর্গে অবস্থান করা শ্রেয়স্কর নহে বিবেচনা করিয়া ধূমঘাট-দূর্গে গমন করিলেন। প্রতাপ ধূমঘাট-দুর্গে গমন করিলেও যশোহর-দুর্গ হস্তগত করিতে মানসিংহকে বড় সামান্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। প্রতিপদে বঙ্গীয় সেনানীগণ অসাধারণ শূরতা ও ধীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া মানসিংহের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বাঙালিদের দূরদৃষ্টক্রমে বাঙালির সমস্ত বীরত্ব, অধ্যবসায় ধূলায় মিলিত হইয়া গেল। বিশ্বাসঘাতক বাঙালিগণ মানসিংহকে প্রতাপের দুর্গের দুর্বল স্থান নির্দেশ করিয়া তথায় আক্রমণ করিতে কহিল। এইরূপে মানসিংহ মোঘলবাহিনী পরিচালনা করিয়া যশোহর-দুর্গ আক্রমণ এবং লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া দুর্গ হস্তগত করেন।

মানসিংহ যশোহর হস্তগত করিয়া এই লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিরাম-বাসনায় সন্ধির জন্য প্রতাপের কাছে একজন লোক প্রেরণ করেন। প্রতাপ মানসিংহের প্রস্তাব অবজ্ঞার সহিত

উপেক্ষা করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের কোন কোন বন্ধু তাহাকে মানসিংহের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতাপ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহেন, "আমার আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশীয়গণ পরাধীন হইবার জন্য অম্লান-বদনে শত্রুপাদুকা মস্তকে বহন করিয়া যখন আমার উচ্ছেদসাধনের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতেছে, তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের জীবনব্রত উদ্‌যাপন হওয়া সুকঠিন। যখন আমার অন্নে প্রতিপালিত, আমার কৃপায় পরিবর্ধিত, বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যগণ আমার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে মিলিত হইয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি যে, আমাদের আশা পরিপূর্ণ হওয়া সুকঠিন। যখন আমার সামান্য পরাজয়ে বঙ্গীয় জনসাধারণ স্বর্গাদপি প্রিয়তর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়াই শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিয়াছি যে, আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ অবস্থায় যদি আমি বুঝিতাম যে, বর্তমান কালে সন্ধি করিয়া আবার সুযোগক্রমে অধিকতর পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলে এই পতিত দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাই বিবেচ্য বিষয় হইত ; কিন্তু যিনি বাঙালি-চরিত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি কখনই এরূপ আশা পোষণ করিতে পারিবেন না। সত্য বটে, সকল দেশেই স্বদেশদ্রোহী নরপিশাচ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা, এমন কি, তাহাদিগের বংশধরগণও অন্যান্য দেশে বিশেষ ঘৃণার সহিত দর্শিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই হতভাগা দেশে তাহার বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। তাই বলিতেছি, যখন আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা ঘোরতর তমসাবৃত, তখন যে সকল যুদ্ধসহচর বন্ধুগণ সংগ্রামস্থলে নিপতিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি জীবনধারণ করিতে কখনই সম্মত নহি। অতএব, এরূপ অবস্থায় বীরের ন্যায় জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য অসিহস্তে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নিহত হওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি।" দৈব-বিড়ম্বিত প্রতাপ ভগ্নহৃদয়ে এইরূপ কথা কহিলে আর কেহই তাহার কাছে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা-রক্ষার শেষ চেষ্টা দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর প্রতাপ ও শঙ্কর বহুসংখ্যক সৈন্য পরিচালনা করিয়া মোঘল-সৈন্যের পশ্চাদভাগে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই দুই মহাপুরুষ প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় ইহারা শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অলৌকিক শূরতা সহকারে শত্রুগণকে সংহার করিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মোঘলসৈন্যগণকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। ইহারা যে সময় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রু-সৈন্য ভস্মীভূত করিতেছিলেন, যে সময় মোঘলসৈন্য ইহাদিগের যুদ্ধ-নিপুণতায় পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছিল, যে সময় বঙ্গীয় সৈন্যগণ জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া মোঘলগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই আনন্দের সময় বঙ্গীয় সৈন্যগণ মধ্যে প্রতাপের মৃত্যুকথা প্রচারিত হয়। বঙ্গীয়গণ প্রতাপের মৃত্যুতে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য তাহার বিজয়ী সৈন্যের কিয়দংশ প্রতাপসিংহ দত্তের অধীনে প্রদান করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় বঙ্গীয় সেনার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ যে সময় বিজয়বাহিনী লইয়া বঙ্গীয় সৈন্যের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন, সে সময় শত্রুর অস্ত্রে নিহত হইয়া তিনি মরজগতে অমরকীর্তি রাখিয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। বঙ্গীয় সৈন্যগণ সেনাপতি বিহনে বিশৃঙ্খলা হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইতেছে, এরূপ সময়ে যখন তাহারা শ্রবণ করিল, মহাবীর প্রতাপাদিত্য পশ্চাদভাগের শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া তাহাদিগের সহায়তার জন্য বিজয়বাহিনী লইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন তাহারা মন্ত্র-মোহিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। ইত্যবসরে প্রতাপ আগমন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং আত্মরক্ষায় বিমুখ হইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত করিয়া ভর্ৎসনা পূর্বক সকলকে কহিলেন—"বীরগণ, এই কি তোমাদিগের অবসন্ন হইবার সময়? তোমাদিগের প্রিয়তম সেনাপতিগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া কিরূপে তোমরা জড়পিণ্ড পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছ? ইহা যুদ্ধক্ষেত্র, এ স্থানে কি অলসভাবে অবস্থান করিতে হয়। পূর্ববীর্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে বিজয়লাভে সমর্থ হইবে।" মহাবীর শঙ্কর সৈন্যগণকে সংযত করিয়া পুনরায় প্রতাপাদিত্যের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ শঙ্করসহ মিলিত হইয়া মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মহাবেগে অরাতিকুল সংহার করিতে করিতে মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ কতকগুলি সৈন্য, প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তথাপিও যুদ্ধের বিরাম নাই, বীরগণ আত্মরক্ষায় বিস্মৃত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মানসিংহ যে সকল সৈন্যকে প্রতাপ-সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা ঘোরতর-বিক্রমে বঙ্গীয় সৈন্য ভেদ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিল। প্রতাপ স্বীয় সৈন্য হইতে বিভক্ত হইয়া মানসিংহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। রজনীর বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ এবং অন্ধকার বর্ধিত হইতে লাগিল। মানসিংহের সৈন্যগণ, প্রতাপ পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, এরূপ শব্দ করিয়া বঙ্গীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। "প্রতাপের মৃত্যু" এই শব্দ বঙ্গীয় সৈন্যগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে তাহারা দশদিক অন্ধকার দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মানসিংহ সৈন্য-পরিবেষ্টিত প্রতাপ কোনরূপেই শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না, সমস্ত দিবসের ভীষণ পরিশ্রম ও ক্ষত হইতে অজস্র শোণিত প্রবাহিত হওয়াতে পূর্ব হইতেই প্রতাপের শরীর অবসন্ন, এক্ষণে আবার শত্রু-প্রহারে জর্জরিত হওয়াতে তিনি যুদ্ধস্থলে অচৈতন্য হইয়া পতিত হন। এই অবকাশে মানসিংহ প্রতাপের পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। বঙ্গীয় সৈন্যগণ মহারাজের শরীররক্ষা করিবার জন্য অচলের ন্যায় অটল হইয়া তাহাদিগকে রোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষুভিত মহাসমুদ্র পর্বতের পাদদেশে আহত হইয়া যেরূপ পুনরায় পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ মানসিংহের সৈন্য উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর অঙ্গুলিপরিগণিত বঙ্গীয় সৈন্যগণ মানসিংহের অগণিত সৈন্যের হস্তে বীরলীলা সংবরণ করে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরীররক্ষায় নিযুক্ত একমাত্র অবশিষ্ট মহাপ্রাণ শঙ্কর যুগপৎ চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়াতে আহত ও মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হন। মানসিংহ স্বয়ং ইহাদিগের নিকট আগমনপূর্বক বন্দি করিয়া শিবিরমধ্যে প্রেরণ করেন।

বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য মহাভাগ প্রতাপাদিত্য ও শঙ্করের পতনের সহিত চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। অদ্য হইতে বঙ্গীয়গণ চির দাসত্ব-পাশে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানসিংহ বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া সৈন্যগণকে ধূমঘাট এবং যশোরনগর নির্দয়তা সহকারে লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। এরূপ কিংবদন্তী, মানসিংহ যশোহর-বিজয়ে বহুল পরিমাণে বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্য-মহিষী, মহারাজের পরাজয়-বার্তা শ্রবণ করিয়া মুসলমান হস্তে পতিত হইবার ভয়ে যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জন করেন। মহারাণী যে স্থলে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বর্তমানকালেও পথিকগণ সেস্থল দিয়া গমনকালে মহারাণীর অদ্ভুত বীরত্ব কীর্তন করিয়া সেই স্থল নির্দেশ করিয়া থাকে।

বিজয়লাভের পর মানসিংহ যশোহর নগরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপ যাহার কৃপায় সমর-দুর্জয় হইয়াছিলেন, যাহার কৃপায় তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সমরপ্রিয়া অসুরমর্দিনী মহামায়ার পূজা করিতে গমন করেন। মানসিংহ ভগবতীর অলৌকিক রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া তাহাকে স্বদেশে লইয়া যান।[৯]

স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য চিতোরের মহারাণা মহাপ্রাণ প্রতাপসিংহ এবং আমাদের বঙ্গীয় বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য যেরূপ ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা বীরত্বের ইতিহাসে নিতান্ত সুলভ নহে। উভয়েই মুসলমান সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, উভয়েই অবশেষে রাজপুত-কুলাঙ্গার স্বদেশদ্রোহী স্বদেশবাসী মানসিংহের প্রতিকূলতায় পরাজিত হন। পরাজিত হইলেও মহারাণা কিন্তু পরাজিত হন নাই। তাহার স্বদেশবাসীরা বীরমন্ত্রের উপাসক, তাই তাহারা তাহাকে দেবতা মনে করিয়া উপাসনা করেন, চারণ ভাট কবিগণ তাহাদিগের যশোগীতি গান করিয়া দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন।

প্রতাপের অদৃষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যদি অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার নাম তাহার স্বদেশবাসীর কাছে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইত এবং প্রতি গৃহে আরাধ্য দেবতার ন্যায় তাহার মূর্তি পূজিত হইত। অকৃতজ্ঞ বঙ্গীয়গণ যতদিন না স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পূজা ও তাহাদিগের সদ্‌গুণ সকল অনুসরণ করিতে শিখিবেন, ততদিন বঙ্গদেশের উন্নতি-আশা বিড়ম্বনামাত্র।

বঙ্গদেশ জয় করিয়া কাঁচু রায়, ভবানন্দ প্রভৃতির সহিত মানসিংহের দিল্লি গমনকালে বন্দি প্রতাপ পথিমধ্যে বারাণসীক্ষেত্রে মানবলীলা সংরবরণ করেন। "মানসিংহ পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বাদশার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্ত করিয়া দেন। যাহার প্রতাপে দিল্লির সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল, যাহার ক্ষমতায় মুসলমান শাসনকর্তারা ভর্ৎসিত বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, যাহার বুদ্ধিবলে সমস্ত বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কার্য করিয়াছিল, আজ তিনি কালচক্রের আবর্তনে বিষবিহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ। মহাভাগ শঙ্কর স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাবাস উপলক্ষে গঙ্গার নিকটবর্তী বারাসত গ্রামে সপুত্রে আসিয়া বাস করেন।"[১০]

যশোহর জয় করিয়া মহাবীর মানসিংহ কেদার রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণকে জয় করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্য প্রেরণ করেন। কেদার রায় প্রভৃতির সহিত মোঘল সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এখানেও বিশ্বাসঘাতক বাঙালি মোঘলদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাংলার সর্বনাশ করে। কেদার রায় প্রভৃতি বীরগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপের মৃত্যুর পর কাঁচু রায়, ভবানন্দ প্রভৃতি কুলাঙ্গারগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে স্বজাতি-দ্রোহিতার পুরস্কারস্বরূপ প্রথমোক্ত ব্যক্তি 'যশোরজিৎ' উপাধি ও শেষোক্ত ব্যক্তি কিছু জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।[১১]

রামচন্দ্রের যশোহর পরিত্যাগের পর প্রতাপদুহিতা বিন্দুমতী "কাশীযাত্রাচ্ছলে বহুসংখ্যক রক্ষী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি আপন হইতে রাজাকে আপনার আগমনবৃত্তান্ত না জানাইয়া, রাজবাটীর কিঞ্চিৎ দূরে নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাহার এরূপ অভিপ্রায় ও বাসনা ছিল যে, রাজা আপনা হইতে তাহার আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পূর্বক স্বভবনে লইয়া যাইবেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার তীরোপরি প্রতি

সপ্তাহে দুইবার এক হাট বসিতে আরম্ভ হইল। এখন সে স্থানে হাট নাই, কিন্তু সেই স্থানটিই 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে বিল্ববাটী গ্রামের উত্তরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তথায় কিছুদিন ছিলেন। সেই গ্রামে তিনি এক বৃহৎ দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্বদা নৌকাতে থাকিতেন, কখন কখন তীরে তাম্বু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন। তাহার এই সকল কীর্তির বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু তিনি কে? রাজা তাহার পরিচয় না পাইয়া তাহার বিষয়ে কোন মনোযোগ করিলেন না। পরে রাজার অন্তঃপুরে তাহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইল। রাজমাতা বধূর আগমনবৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাহাকে স্বভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাহার নৌকাতে আগমন করিলেন। তাহাতে রাজপত্নী এক থাল মোহর দিয়া শাশুড়িকে প্রণাম করেন। পরে তিনি সমারোহ পূর্বক বধূকে স্বভবনে লইয়া গেলেন।"[১২] কেহ কেহ কহেন, রাজকন্যা বিন্দুমতী চন্দ্রদ্বীপে কিছুদিবস অবস্থান করিয়া কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য-কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে মহাবল রামচন্দ্রের কীর্তিনারায়ণ নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রতাপ-দৌহিত্র কীর্তিনারায়ণ নৌযুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি মেঘনা নদের উপকূলে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পর্তুগিজদিগকে সে প্রদেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ঢাকা নগরীর মুসলমান শাসনকর্তা কীর্তিনারায়ণের বীর্যবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

১. আজিম খাঁ, ইনি আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

২. আকবরের মৃত্যু সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসক মেনুসী একটি অপূর্ব উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মেনুসী আরাঞ্জেবের রাজত্বকালে সম্রাট পরিবারবর্গের চিকিৎসকরূপে ৪৮ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সম্রাট এক দিবস বনমধ্যে মৃগয়ার জন্য গমন করেন। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে অবস্থানকালে দেখিতে পাইলেন, একটি অগ্নিবর্ণ কীট তাহার নিকট আগমন করিতেছে। সম্রাট হস্তস্থিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কীটটা মারিয়া ফেলেন। ইত্যবসরে একটি হরিণ সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হয়। সম্রাট সেই তীব দ্বারা হরিণটিকে বিদ্ধ করেন। শর মর্মস্থানে বিদ্ধ না হইলেও হরিণ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব লাভ করে। ইহার মাংস প্রস্তুতকালে দেখা গেল, সমস্ত মাংস অত্যন্ত দূষিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সকল কুকুর ইহার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, তাহারা তথায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সম্রাট এই কথা অবগত হইয়া সেই বিষাক্ত কীট সংগ্রহ করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করেন। মেনসী বলেন, এই সময় হইতে মোঘল সম্রাট তাহার বিদ্বেষী আমীর বা রাজাদিগকে গুপ্তভাবে বিষ প্রদান করিয়া নিহত করিবার জন্য এই নারকীয় পন্থার উদ্ভাবন করেন। আকবর তাহার পান খাইবার স্বর্ণকৌটার তিন বিভাগের মধ্যে এক ভাগে পান আর একভাগে বিষাক্ত কীটচূর্ণের বটিকা এবং অন্য ভাগে পানের সহিত খাইবার এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করিয়া সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন। কথিত হয়, তিনি ভ্রমক্রমে এই বিষাক্ত বটিকা সেবন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আম্বেরের রাসাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাট আকবর মানসিংহকে গুপ্তভাবে নিহত করিবার জন্য বিষমিশ্রিত মাজন প্রদান করেন, কিন্তু মানসিংহের পরিবর্তে তিনি স্বয়ংই তাহা ভক্ষণ করিয়া পঞ্চত্বলাভ করেন। (ফউৎ-ই আকবরশা ১৪১৪ খ্রিঃ)

Terryও তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এইরূপ কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩. যশোহর প্রদেশে এরূপ কিংবদন্তী যে, রামচন্দ্র ও তাহার পুত্র ভবানন্দ কর্মোপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ হইতে যশোহরে আগমন করেন। যশোহর তখন উদীয়মান জনপদ, দিন দিন তাহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সুচতুর ভবানন্দ কোনরূপে রাজসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপরিবারের প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টা করেন। অনেকে বলেন, রামচন্দ্র ও ভবানন্দ অল্পসময়ের মধ্যে তাহাদিগের অনুগ্রহপাত্র হন। অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তাহারা ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এ স্থলে আমরা নবদ্বীপের

অধিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'Hindu Castes and Sects' নামক বিচিত্র গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"For a time Pratapaditya defied the great Akbar, and the conquest of his Kingdom was ultimately effected by Raja Man Sing chiefly through the treachery of Bhavananda Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Brahman boy." 183 p.

কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্তের মধ্যে এই স্থানটি অত্যন্ত রহস্যময়। কার্তিকেয় বাবু উপরিউক্ত কথা আদৌ স্বীকার করেন না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাহার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কাশীনাথের অনাথিনী পত্নী,—একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস ও একটি দাসী এবং দুই সহস্র সুবর্ণমুদ্রা সহিত আন্দুলিয়ানিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লইলেন, এবং তথায় সম্মান ও সমাদরপূর্বক গৃহীতা হইলেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি এই কামিনীকে অতি সুশীলা দেখিয়া দুহিতৃনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। হরেকৃষ্ণ নবকুমারের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন, এবং যথাকালে তাহার উপনয়ন ও বিবাহ দিলেন। পরিশেষে তাহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী করিলেন এবং স্ববংশের সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন।" রাজবংশ লেখক কার্তিকের বাবু রামচন্দ্রের এইরূপে সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পাঠকগণের হস্তে উভয় বর্ণনা ন্যস্ত করিলাম, তাহারা ইহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটি প্রবল জনরব উল্লেখ করা উচিত। চাঁচড়ার রাজাদিগের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে মোঘল ও প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য করিতেন। দিল্লিশ্বরের বিরুদ্ধে যখন প্রতাপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সেই সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ মোঘল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, চাঁচড়ার রাজারা এ কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

৪. তাতো মানসিংহো মহাপ্রাসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম। নির্গত্য চ যত্র যত্রোবাস, তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়নং চক্রিরে, রাজ্ঞা চ প্রায়শো ন সাক্ষাদ্‌বভুব। বার্লিনের মুদ্রিত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ১৩ পৃষ্ঠা।

৫. বর্তমান কালেও এই সুপ্রশস্ত রাস্তার ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক সুন্দরবনপ্রদেশে গমনকালে এই রাস্তার উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। এখনও ইহা গৌড়বঙ্গ জাঙ্গাল বলিয়া বিখ্যাত।

৬. মহাবল মানসিংহের পঞ্চদশ শত স্ত্রী ছিল। প্রত্যেকের গর্ভে ইহার দুই তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের অধিকাংশ বঙ্গদেশে নিহত হন। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে ইনি পঞ্চত্বলাভ করেন। সে সময় তাহার সহিত ৬০ জন স্ত্রী সহমৃতা হয়। একমাত্র জীবিত পুত্র ভাওসিংহ বর্তমান ছিলেন।

৭. Du, Jarric, Histoire des Indes Orientales Livera V1, 861 p.

Kedaray, Lord of the place (Sripur) where he was suddenly assaulted with one hundred Coses, sent by Mansinga Governor under the Mogul, who having subjected that tract to his master, sent forth this Nave against Cedaray, Mandaray, man famous in these parts, being Admiral ; where after a fight Mandaray was slain. Book V. Chap, VI. P. 523, pt, vi. Purchase His Pilgrimage

৮. ডমিনিক কারভালহো, কেদার রায়ের এক জন সেনানী ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরাকানপতির রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মঙ্গরাজা-জী (Meng-Ra-dza-gije) বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বাকলা প্রভৃতি স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত করিতে মনন করেন। মহারাজ প্রতাপাদির্ত্য দেখিলেন, কারভালহোকে আশ্রয় দেওয়াতে আরাকানপতির সহিত তাহাদের মনোমালিন্য হইয়াছে। ইহা শ্কালনের জন্য মহারাজা যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। কারভালহোর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ছিন্ন সুহৃৎসূত্র গ্রথিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় মহারাজ প্রতাপাদিত্য কারভালহোকে বধদণ্ড প্রদান করিয়া বাকলা প্রভৃতি রাজ্য আরাকানপতির

গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কারভালহোর ৩ খানা জাহাজ, ৬ খানা কাতুর (Caturs) এবং ৫০ খানা গ্যালী বাজেয়াপ্ত করিলেন। যে কয়েক জন তাহার সঙ্গী বন্দি হইয়াছিল, তাহারা ৩ হাজার মুদ্রা (Pardao) প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

৯. মানসিংহ যশোহর বিজয় করিয়া যে প্রতিমা লইয়া যান, তাহা এক্ষণে জয়পুরের নিকটবর্তী আম্বের নামক স্থানে স্থাপিত আছে। ইনি এ প্রদেশে সল্লাদেবী (যাহার নিকট পরামর্শ করা হয়) নামে অভিহিত হন। ভগবতীর পূজার জন্য অনেকগুলি বাঙালি ব্রাহ্মণও মানসিংহের সহিত গমন করেন। এই সকল বাঙালি এক্ষণে হিন্দুস্থানীরূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যাধর নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান জয়পুর নগর নির্মাণ করেন। মানসিংহ যে যে রাজ্য হইতে যে যে দেবতা আনয়ন করেন, সে সম্বন্ধে জয়পুরে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলতি আছে—

'সাংলিকা সাংলিবাবা জয়পুরকা হনমান।
আম্বের কা "সল্লা দেবী" তিন লে আয়ে রাজা মান।।'

১০. সঞ্জীবনী।

১১. ১৬০৬ খ্রিঃ বা ১০১৫ হিজরিতে ভবানন্দ দিল্লিশ্বরের নিকট ফরমান ও জমিদারি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে চাঁচড়ার রাজারা "যশোহরের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন।

১২. শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ।

অষ্টম অধ্যায়

উপন্যাসপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপনাদের রুচি অনুসারে প্রতাপের চরিত্র যেরূপ বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার চরিত্র অনুশীলন করিলে বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ দূষিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। প্রতাপের দোর্দণ্ড প্রতাপ শান্তিপ্রিয় বঙ্গীয় প্রকৃতির নিকট বিসদৃশ হওয়াতে তাহারা তাহাকে মূর্তিমান ক্রোধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এ স্থলে তাহারা মহারাজ বসন্ত রায়ের মৃত্যু এবং রামচন্দ্রের সহিত তাহার অসদ্ব্যবহারবিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতাপ-চরিত্রে যদি কিছু মহাপাপ থাকে, তাহা হইলে পিতৃব্যহত্যাই সেই মহাপাপ, কিন্তু এই মহাপাতকে তিনি কতদূর দোষী, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে এরূপ ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে আচ্ছন্ন হইতে হয় যে, সেই গাঢ় অন্ধকার দূর করা দূরের কথা, আমাদিগের সামান্য বিচারশক্তিও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। প্রতাপ ও বসন্ত রায় উভয়েই উভয়ের উপর কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন, এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরস্পরের শত্রুপক্ষীয়ের কথায় তাহাদিগের এই ভ্রম-বিশ্বাস ক্রমশ বর্ধিত হইয়া অবশেষে এই লোমহর্ষণ ঘটনায় সমাপ্ত হয়। আগ্রা হইতে প্রতাপের প্রত্যাগমনের পর উভয়ের মধ্যে বেশ ভালবাসা স্থাপিত হয়। প্রতাপ উৎকল হইতে উৎকলেশ্বর গোবিন্দদেব প্রভৃতি দেবতা আনয়ন করিয়া পিতৃব্যের চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন। ইহার পর হইতে প্রতাপ যখন বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য সর্বদা পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত এবং ভাবী মহাসমরের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন, সেই সময় হইতে বৃদ্ধ, বৈষ্ণবপ্রিয়, বৈষ্ণব বসন্ত রায়ের চক্ষে প্রতাপাদিত্যের কার্যকলাপ দূষিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বসন্ত রায় প্রতাপের এরূপ দুঃসাহসিক কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব বসন্ত রায় নির্ব্বিবাদে সকলের দাসভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষপাতী। সুতরাং যে পুরুষ আপনার অসি-বলে দেশের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য এই নশ্বর শরীর বিসর্জন করিতে বদ্ধপরিকর, যে পুরুষ অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য ভৈরবমূর্তি ধারণ করিয়া স্বর্গকে ধরাতলে আনয়নের উদ্যোগ করিয়া থাকেন, এরূপ চরিত্রের লোকের সহিত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। বসন্ত রায় প্রতাপের জীবনব্রত উদ্‌যাপনে বাধা দেওয়াতে ক্রমশ এই শত্রুতা ঘনীভূত হইয়া অবশেষে উক্ত শোচনীয় ঘটনায় সমাপ্ত হয়। সংসার মধ্যে যে পুরুষ পরম পবিত্র, বিনয়ী ও মধুরভাষী বলিয়া কীর্তিত হন, অনেক সময় সেই পুরুষকে জ্ঞাতিগণ মধ্যে অবিনয়ী, রূঢ়ভাষী, অসদাচরণ-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্ত রায় বা প্রতাপাদিত্য জগতের নিকট মহাপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু পরস্পর জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন পরম শত্রুতায় আবদ্ধ হইয়া ঐরূপ পৈশাচিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া থাকিবেন, ইহা নিতান্ত বিচিত্র ব্যাপার নহে।

প্রতাপের সহিত রামচন্দ্রের বিবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম—নবম বৎসর বয়স্ক পিতৃবিহীন বালক রামচন্দ্র যশোহরনগরে বিবাহ করিতে আগমন করিলে সুপ্রসিদ্ধ বিদূষক রমাই ভাঁড় স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং প্রতাপ-মহিষীর সহিত নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিরাপদে প্রত্যাগমন করেন। প্রতাপ এ কথা অবগত হইয়া রমাই সহ জামাতাকে নিহত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। এ

জনরব কতদূর স্বাভাবিক, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয়, রামচন্দ্র বিবাহ করিতে আগমন করিলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাতাকে নিহত করিয়া কন্যার পক্ষ হইয়া তাহার রাজ্যাধিকার করিতে পরামর্শ করেন, এ কথা তাহার সপ্তম বা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা অবগত হইয়া, বাসরঘরে পতিকে প্রবোধিত করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কহেন। দ্বাদশবর্ষীয় উদয়াদিত্য ভগিনী বা ভগ্নিপতির নিকট এই বিপৎকথা অবগত হইয়া, রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া, তাহাকে মশালধারীর পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের বাটীতে ঐ রাত্রেই সঙ্গীত শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মশালধারিরূপে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া নির্বিঘ্নে স্বীয় নৌকাতে আরোহণ করেন। রামচন্দ্র প্রতাপের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, নিরাপদে নৌকারোহণ-বার্তা প্রতাপের কর্ণগোচর করিবার জন্য বন্দুকধারিগণকে মুহুর্মুহু শব্দ করিতে আজ্ঞা দিয়া দ্রুতবেগে নৌকা চালাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এ কিংবদন্তী কতদূর সত্য, তাহা পাঠকগণের বিচারসাপেক্ষ। রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এ কথা সত্য ; কিন্তু কি জন্য এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তিন শত বৎসর পরে তাহার কারণ নির্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন-বাসনা প্রতাপাদিত্যের এত দূর প্রবলা ছিল যে, তিনি কোনপ্রকার বাধাকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক শ্রেণীর মনুষ্য আছেন, যাহারা যখন কোন সৎ বা অসৎ কার্য করিতে দৃঢ়ব্রত হন, তখন তাহার প্রতিকূলে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র বোধ হয়, বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্বশুরের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, তাই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা বদ্ধমূল হয়।

প্রতাপ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সহ কিরূপ উদারতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা এক্ষণে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। তিনি অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন, এতদ্বিষয়ক বহুসংখ্যক কিংবদন্তী প্রাচীন যশোহরের সমীপবর্তী প্রদেশের নর-নারীর মুখে এখনও আগ্রহের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্য তাহার দুই একটি উল্লেখ করিব। প্রতাপাদিত্য যে সময় অভিষিক্ত হইয়া সস্ত্রীক সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হইয়া মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহারাজ মহিষীকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে মহিষী ব্রাহ্মণকে সেই স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হস্ত প্রসারণ করেন, দৈবক্রমে সেই মুদ্রা ব্রাহ্মণ-হস্তে পতিত না হইয়া নিম্নস্থ সুবর্ণমুদ্রাভরিত পাত্রে পতিত হয়, মহারাণী তাহার মধ্য হইতে তাহার দেয় মুদ্রা উত্তোলন করিয়া প্রদানকালে প্রতাপ মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে মুদ্রা তোমার হস্তচ্যুত হইয়াছে, "তুমি কি সেই মুদ্রাই দিতেছ, না তাহার পরিবর্তে অন্য মুদ্রা দিতেছ?" প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী কহিলেন, "অন্যমুদ্রা দিতেছি।" প্রতাপ রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া সেই মুদ্রাপরিপূরিত পাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহাতে তাহার ব্রাহ্মণভক্তি ও দানশীলতা উভয়ই লক্ষিত হয়। একসময় প্রতাপাদিত্য কল্পতরু হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাহাদিগের প্রার্থনা অনুসারে দ্রব্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। একজন ব্রাহ্মণ মহারাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্ঞীকে প্রার্থনা করেন। মহারাজ অবিচলিতচিত্তে অম্লানবদনে মহিষীকে তাহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ মহারাজের দানে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন ঃ—

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকি পাতালে।
প্রতাপ-আদিত্য দাতা[১] অবনী মণ্ডলে।।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী-গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রতাপ

প্রদত্ত পদার্থ পুনর্গ্রহণে কোনরূপে স্বীকৃত না হইলে, তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে রাজ্ঞী পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা রাণীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করত স্ত্রী গ্রহণ করেন।

প্রতাপ জাতিবিচার না করিয়া গুণবান ব্যক্তির আদর করিতেন। মুসলমান কমল খোজাকে সেনাধিকার প্রদান করা ইহার উত্তম উদাহরণ। একদা রাজবাটিতে ব্রাহ্মণভোজনকালে বিতত চন্দ্রাতপের বংশস্তম্ভ কোনরূপে উৎপাটিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মস্তকোপরি পতিত হইবার উপক্রম হয়। ইহা দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ ইতস্তত পলায়ন করিতে উদ্যোগ করে। ইত্যবসরে একজন অমিতবলসম্পন্ন অজ্ঞাত পুরুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভীমবলে বংশস্তম্ভ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাণরক্ষা করেন। প্রতাপাদিত্য যুবকের অমিত-পরাক্রমে ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে একটা প্রধান কর্মে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ঐ যুবক প্রতাপের একজন বিশ্বাসপাত্র হন। ঐ ব্যক্তিই নলতার জমিদার ভঞ্জমহাশয়দিগের আদিপুরুষ।

মজিলপুরের দত্তমহাশয়দিগের পূর্বপুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত নামক এক ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাবলে প্রতাপাদিত্যের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিলেন। প্রতাপ তাহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাহাকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ সে কালের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতাপের কাছে পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।[২]

প্রতাপ শক্তি-উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ একাগ্রতা-সহকারে ভগবতীর অর্চনা করিতেন যে, জনসাধারণ তাহাকে দেবীর পরমানুগৃহীত ও বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহার ঈশ্বরনির্ভরতা অসাধারণ, কি ঘোরতর যুদ্ধস্থল অথবা নানাপ্রকার ভোগ্য-পরিপূর্ণ বিলাস-ভবন, কোন স্থলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন না, সকল সময়েই তাহার ঈশ্বরনির্ভরতা প্রকটিত হইত। তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। ধর্ম বিষয়ে তাহার অসীম উদারতা ছিল। তিনি মুসলমান প্রজাদিগের জন্য আপন রাজ্যের স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমানকালে স্থানে স্থানে এই সকল মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।[৩]

প্রতাপ উদারপ্রকৃতির হিন্দুর ন্যায় কোন ধর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। হিন্দুর সাধু-সন্ন্যাসী, মুসলমানের পীর-ফকির তাহার কাছে যে যেরূপ ভাবে পূজিত হইতেন, খ্রিস্টধর্মপ্রচারক যেসুইট পাদরীগণও সেইরূপ তাহার আদর-অভ্যর্থনায় বঞ্চিত হইতেন না। প্রতাপ তাহাদিগকে আপনার সভায় আনয়ন করিয়া ধর্মবিষয়ক আলাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। সেকালে বহুসংখ্যক পর্তুগিজ ব্যবসা-বাণিজ্য ও আহার্যদ্রব্যের সুলভতার জন্য এ দেশে বসবাস করিয়াছিল। সেই সকল ফিরিঙ্গিদের মধ্যে কেহ বা স্বদেশে দুষ্কর্ম করিয়া, কেহ বা অল্পসময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জনবাসনায় এ দেশে আগমন করিত। সেই সকল ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্মানুশীলন খুব কমই ছিল। তাহারা নামে মাত্র খ্রিস্টান, তাহাদের ধর্মভাবের উদ্দীপনার জন্য সময় সময় গোয়া হইতে পাদরিরা বঙ্গদেশে আগমন করিতেন। ১৫৯৮ খ্রিঃ অব্দে দক্ষিণ ভারত হইতে কয়েকজন পাদরি গুলোতে[৪] আগমন করেন। ইহাদিগের মধ্যে ডমিনিক সোজা নামক একজন পাদরি বেশ বাংলা জানিতেন। পাদরিদের গুলোতে অবস্থানকালে বাঙালি ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম আলোচনার তরঙ্গ উত্থিত হয়। পাদরিরা জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় গুলোতে একটি রুগ্ননিবাস-সংস্থাপন করেন। সেই হাসপাতালে একজন ফিরিঙ্গি ও আর একজন এদেশি চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইহারা সমাগত রোগিগণকে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া অনেককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। চারচক্ষু প্রতাপের কর্ণে ইউরোপীয় পাদরিদের মহানুভাবুকতার কথা পৌঁছিতে বিলম্ব রহিল না। তিনি তাহাদিগকে আপন রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ-হস্তে পত্র দিয়া হুগলিতে প্রেরণ করেন। প্রতাপ-প্রেরিত লোক হুগলিতে উপস্থিত হইয়া পাদরিগণকে যশোরে যাইবার

জন্য অনুরোধ করিলেন। হুগলির কার্য সম্পূর্ণ করিয়া ফারনাণ্ডিজ (Fernandez) প্রমুখ পাদরিগণ ব্রাহ্মণ সহ যশোর-রাজধানীতে উপস্থিত হইলে প্রতাপ তাহাদিগকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন।

প্রতাপ পাদরিদের অবস্থানের স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের দেশের রীতি অনুসারে তাহাদের আহারের জন্য সিধা প্রেরণ করেন। প্রচুর পরিমাণে চাউল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য সহ কতকগুলি ছাগলও সেই সিধার সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। পাদরিরা এই সকল ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে একটি ছাগল ও যৎসামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আর সমস্ত জিনিস ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করেন।

পাদরিদের ভ্রমণজনিত ক্লেশের অবসান হইলে প্রতাপ তাহাদিগকে দরবারে সঙ্গে আনিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। জনগণপূর্ণ দরবারে পাদরিদের বসিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ-পরিচালিত পাদরিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে প্রতাপ অতি সমাদরের সহিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। পাদরিরা প্রতাপকে বেরিনগাঁর (Beringan) কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট কমলালেবু উপহার প্রদান করেন। প্রতাপ পাদরিদের সহিত হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মবিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া সেদিন বিদায় প্রদান করেন। অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই প্রতাপ পাদরিদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। পাদরিদের সরলতা ও পাণ্ডিত্যে প্রতাপ মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যশোহর মধ্যে গির্জা নির্মাণের স্থান নির্বাচন করিতে আদেশ করেন। প্রতাপ পাদরিদের এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গির্জা নির্মাণ করাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। প্রতাপের আজ্ঞানুসারে পাদরিরা অতি উত্তম স্থান নির্বাচন করিয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ তাহাদের উপর প্রীত হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য পাদরিদিগকে গির্জা নির্মাণ করিয়া দিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না ; ধর্মপ্রচার ও গির্জার ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য তিনি তাহাদিগকে ছয় শত স্বর্ণমুদ্রা আয়ের লবণ ও মোম প্রদান করিতেন।[৫]

গির্জা নির্মাণ হইলে পাদরিরা ভাল দিন দেখিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই উপলক্ষে পর্তুগিজেরা অতি সুচারুরূপে গির্জা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার দিন মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার উপস্থিতির সহিত ফিরিঙ্গিগণ তাহার অভ্যর্থনার জন্য বহুসংখ্যক তোপের শব্দে দিক সকল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অভূতপূর্ব উৎসবব্যাপার দেখিবার জন্য যশোহর-নগরবাসিগণ দলে দলে যমুনার তটে আগমন করিয়াছিল। পরদিবস কুমার উদয়াদিত্য গির্জা দেখিতে গমন করেন, তিনিও অতি সমাদরের সহিত পাদরিগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন।[৬]

পাদরিরা প্রতাপের অনুকম্পায় সবিশেষ আশান্বিত হন। তাহারা মনে করেন, এ রাজ্যের লোকেরা যেরূপ ভদ্রপ্রকৃতির, তাহাতে তাহারা অচিরকাল মধ্যে রাজ্যের সমস্ত লোককে খ্রিস্টান করিতে সমর্থ হইবেন। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন যে, দুই মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত লোককে দীক্ষিত করেন। যাহারা এই ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে পাদরিরা কিছু কিছু উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৯৯ খ্রিঃ অব্দে পর্তুগিজেরা যে সময় বঙ্গের প্রবলপরাক্রান্ত নরপতির রাজধানীতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার জন্য উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করেন, ঠিক সেই সময় লণ্ডন নগরে কতকগুলি ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানি সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার আয়োজন করেন। কালচক্রের প্রবল আবর্তনের সহিত পর্তুগিজগণ ও যাহাদের কাছে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নাম বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

অক্লিষ্টকর্মা ইংরাজ এ দেশবাসীর হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বুদ্ধি ও চরিত্রবলে এক

বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্যের তুলনা নাই। সদ্‌গুণসম্পন্ন না হইলে কে কোথায় উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে?

প্রতাপের রাজ্যবিস্তৃতি কত দূর ছিল, তাহা বর্তমানকালে যথাযথ নির্ণয় করা বড় সাধারণ কথা নহে। রামরাম বসুর মতানুসারে ব্রহ্মপুত্রের তট হইতে গঙ্গার তট পর্যন্ত ভূভাগ প্রতাপের রাজ্যান্তর্গত ছিল। কায়স্থকারিকার গ্রন্থকার বলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাঢ় ও বঙ্গ (বাঙ্গালা) দেশের অধীশ্বরগণকে পরাজয় করিয়া আসমুদ্র ভূভাগের কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোম্যান ক্যাথলিক পাদরিরা প্রতাপের রাজ্য-বিস্তৃতি কথনকালে কহিয়াছেন যে, বিংশতি দিবস জলপথে গমন করিলে প্রতাপের রাজ্যের সীমা হইতে সীমান্তরে গমন করা যাইত।[৭] ব্যাফিন (Baffin) ব্যতীত বৈদেশিকদিগের পুরাকালের কোন মানচিত্রে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী চাণ্ডীখাঁনের নামাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাফিন তাহার মানচিত্রে বঙ্গদেশের এ অঞ্চলের মধ্যে সপ্তগ্রাম, হিজলি ও চাণ্ডীখাঁনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম আগে সার টমাস রোর সহিত ব্যাফিন ভারতে আগমন করেন।

বর্তমানকালে সুন্দরবন প্রদেশে একটি বিষয় ব্যতীত ফিরিঙ্গিদের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পর্তুগিজরা যশোহর রক্ষার জন্য যে স্থানে অবস্থান করিতেন, বর্তমানকালেও সেই প্রদেশের একটি স্থান ফিরিঙ্গি-ফাঁড়ি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহানুভব প্রতাপাদিত্য যেরূপ ধর্মশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন, সেইরূপ তিনি অবকাশক্রমে সাহিত্যচর্চা করিতেও বিরত থাকিতেন না। ভগবান চৈতন্যদেবের পরবর্তী কবিগণের শীর্ষস্থানীয় কবিবর কবিরাজ গোবিন্দদাসকে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত সম্মান ও ধনাদি প্রদান করিয়া পূজা করিতেন। গোবিন্দদাস অনেক সময় যশোহর নগরে অবস্থান এবং কৃষ্ণবিষয়ক নানা প্রকার পদ রচনা করিয়া প্রতাপাদিত্যের চিত্তবিনোদন করিতেন।

শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহে জ্বর জ্বর কনক মাঝরি রহক রূপের ছাই।।
আওয়ে মধু ঋতু মধুর যামিনী কামিনী-চিত-চকোর।
কুসুম-শায়ক জীবন-নায়ক তুহুঁসে মধুপুরে ভোর।।
সে অঙ্গ ছটফটি কৈসে মিটির তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন-লোরে ঝরু ঝরু লোচন লোরে মহী করু পঙ্ক।।
এতহি বিরহে আপহি মুরছই শুন শুন নাগর [illegible]।
প্রতাপ আদিত এ রসে ভাষিত দাস গোবিন্দ [illegible]।।

ইত্যাদি পদ দেখিয়া বোধ হয় যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য অবকাশক্রমে গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের কবিতারসমাধুরী আস্বাদনে বিরত থাকিতেন না। গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্যান্য অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত [illegible]

প্রতাপের কিঞ্চিৎ পূর্বে ও সমকালে বঙ্গদেশে যে সকল [illegible]শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা চিরকাল মানবগণের উচ্চ আসনে আসীন হইয়া থাকিবেন। বঙ্গের ইতিহাসে ইহা বসন্তকাল। বসন্তের সমাগমে বৃক্ষ সকল যেরূপ পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেরূপ বঙ্গের সেই মধুর সময়ে ব্রাহ্মণ আদি জাতি-চতুষ্টয় একত্র সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের সর্বতোভাবে উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কি শাস্ত্র আলোচনা, কি শস্ত্রচালনা উভয় বিদ্যাতেই জাতিচতুষ্টয় যেরূপ অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ তীক্ষ্ণ মেধা ও বীর্যসম্পন্ন পুরুষ বঙ্গে আর উৎপন্ন হন নাই। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে এই বসন্তকাল মেঘ-নির্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় অলৌকিক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া অচিরকাল মধ্যে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

গোবিন্দদাস প্রতাপাদিত্যের সভার একটি প্রধান রত্ন, ইনি বৈদ্যকুলের কর্মলস্বরূপ। ইহার ভ্রাতা সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামচন্দ্র কবিরাজ। ইহারা প্রথমত শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন, রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া আগমনকালে পথিমধ্যে ধার্মিকপ্রবর শ্রীনিবাস আচার্যের প্রাণস্পর্শী সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হন। ক্রমশ এই ভাব তাহার এত দূর প্রবল হয় যে, তিনি বিবাহের দুই চারি দিবস পরেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণাপন্ন হন। রামচন্দ্রের গমনের পর হইতে গোবিন্দদাসের ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে এক ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। গোবিন্দ গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সহোদরকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গোবিন্দের গৃহে অতিথি হন। গোবিন্দ অতিথির ধর্মমত জিজ্ঞাসা না করিয়া ভগবতী মুক্তকেশী কালীর মন্দিরে তাহার পূজা করিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ভগবতীর পূজা না করিয়া নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি শালগ্রামে অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণের পূজার পর দেবীর পুরোহিত আগমন করিয়া উৎসর্গ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করেন। ভগবতী স্বপ্নযোগে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন—

গোবিন্দ মূল তত্ত্ব নাহি জান।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মান।।
পরম ঈশ্বর সেই পরাৎপর হরি।। —ভক্তমাল।

তিনি ইহ-জগতে একমাত্র নিয়ন্তা ও জীবমাত্রের শরণ্য ইত্যাদি কহিয়া অন্তর্হিতা হন। নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে গোবিন্দের অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহার কিছু দিবস পরে গোবিন্দ গ্রহণীরোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলে, "গোবিন্দ শরণ কর হইবে নিস্তার" এইরূপ এক আকাশবাণীতে গোবিন্দের চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইবার জন্য ভগবতী তাহাকে পুনরায় আদেশ করেন। অনুতপ্ত গোবিন্দ সেই মুহূর্তে অত্যন্ত কাতরতা পূর্বক স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া সহোদর রামচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্র সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য সহ বুধরীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গোবিন্দের পার্শ্বে উপস্থিত হন। উত্থানশক্তিরহিত গোবিন্দ, রামচন্দ্র সহ শ্রীনিবাস আচার্যকে দর্শন করিয়া গলদশ্রুনয়নে করজোড়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ধর্মপ্রাণ শ্রীনিবাস গোবিন্দকে সেই অবস্থাতেই হরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ রোগ-মুক্ত হইয়া অসাধারণ কবিত্ব লাভ করেন এবং নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়া শ্রীনিবাস আচার্যকে শ্রবণ করান। ইহাই তাহার সর্বপ্রথম পদরচনা।

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন-অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ জনম সতসঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধু রে।।
শীত আতপ বাত বরিখনে এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, কিবা আছে ইথে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল, ভুজহুঁ হরিপদ নিত রে।।
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে।।

শ্রীনিবাস আচার্য ইহার পদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে ঠাকুর উপাধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে ইনি আজীবন বৈষ্ণবধর্মচর্চা এবং পদরচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দদাস, "সংগীতমাধব" ও "গীতামৃত" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয়, ইহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্তমানকালের বিকৃত ভাবাপন্ন শঠিত ও চর্বিতচর্বণ-ভোজী বাঙালিদিগের নিকট ইহাদিগের মর্মস্পর্শী স্বাভাবিক কবিতাসকল বড় একটা স্থান প্রাপ্ত হয়

না। এই যুগে গোবিন্দদাস, রায় বসন্ত (প্রতাপের খুল্লতাত), জ্ঞানদাস, যদুনন্দন চক্রবর্তী, শিবরামদাস, কবিচন্দ্র, নরোত্তমদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা-বিষয়ক অসংখ্য পদ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিবর্ধন করিয়াছেন, বর্তমান কালের মার্জিতরুচির কবিগণ তাহার ষোড়শাংশের এক অংশও করিতে পারেন নাই।

সে কালে বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা নিতান্ত অল্প ছিল না। রূপসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ এই সময় সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এ সময় রঘুনাথ ও তাহার শিষ্যগণ মিথিলার অধীনতা দলিত করিয়া কল্পনারাজ্যের উপর একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি মনীষিগণ অবিরাম লেখনী সঞ্চালন করিয়া নব্যন্যায়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন। রঘুনাথ যেরূপ কল্পনারাজ্যের স্বাধীন রাজা, সেইরূপ রঘুনন্দন, মৈথিলী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্মৃতি-সংগ্রহকারগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বঙ্গের জন্য তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

বঙ্গদেশে এ সময় ইন্দ্রজাল-বিদ্যার যথেষ্ট পরিমাণে চর্চা ছিল এবং ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। জাহাঙ্গীরের দরবারে সাতজন বাঙালি যেরূপ অদ্ভুত ইন্দ্রজাল-বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানকালেও বিস্ময়জনক।

পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের রচিত আত্মজীবনী হইতে কয়েকটি ক্রীড়া উদ্ধৃত হইল। "একদিন ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন নিশীথ রজনীতে বাঙালি ঐন্দ্রজালিকেরা অত্যুজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় আলোকে সে প্রদেশ আলোকিত করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয় যে, ১০ দিনের দূরবর্তী প্রদেশের লোকেরাও এই আলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

"তাহারা পুষ্করিণীর ন্যায় গর্ত করিয়া তাহা জলপরিপূর্ণ করে। তদনন্তর সেই জল কিয়ৎক্ষণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। কাপড় উঠাইয়া লইবার পর দেখা গেল, পুষ্করিণী বরফে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের কথা অনুসারে সেই বরফের উপর দিয়া হাতি লইয়া গেল, ইহাতে বরফের কোন স্থান ভাঙিল না। কাপড় ঢাকা দিবার পর খুলিয়া দেখা গেল, তথায় না আছে বরফ, না আছে জল, এমনকি, একটু আর্দ্র বলিয়াও বোধ হইল না।

'বাঙালি সাত জন সামনাসামনি দুটা তাঁবু পুতিয়া বলিল, 'দেখুন, ইহার ভিতর কোন জীবজন্তু নাই। কিন্তু আপনারা যে জন্তুর লড়াই দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাহাই ইহার ভিতর হইতে বাহির করিয়া তাদের লড়াই দেখাইব।' তাহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া খাঁনজাহান অস্ট্রীচ পাখির লড়াই দেখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তাহারা দুটি অতি সুন্দর অস্ট্রীচ পাখি আনিয়া তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ দেখাইতে লাগিল। সম্রাট-পুত্র খুরম বলেন. 'নীলগাই এর যুদ্ধ দেখাও।' তাহার কথায় দুইটি নীলগাইয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সকলেই দেখিয়া অবাক হইলেন, কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

"ঐন্দ্রজালিকেরা দুই মুখ খোলা একটা থোলে আনিয়া তাহার একদিক দিয়া একটা তরমুজ প্রবেশ করাইয়া অপর মুখ দিয়া কুমড়া বাহির করিল। কুমড়া দিয়া উৎকৃষ্ট আঙ্গুর, আঙ্গুর দিয়া ন্যাসপাতি, এইরূপ অসংখ্য প্রকার ফল তাহারা সেই থলি দিয়া বাহির করিতে লাগিল। ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ ক্রীড়া দেখাইয়া বাঙালি সাতজন সভাসদসহ সম্রাটকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"[৮]

টেরীর গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একজন বাঙালি একটি অপূর্ব বানর জাহাঙ্গীরের দরবারে লইয়া যায়। বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদিগের নাম এক এক টুকরা কাগজে লিখিয়া বানরের হস্তে প্রদান করা হয়, বানর না কি প্রত্যেকবারে খ্রিস্টের নাম লেখা কাগজ উঠাইয়া দর্শকগণকে মোহিত করিয়াছিল।[৯]

প্রতাপের সময় বঙ্গীয়গণ ধর্মচর্চায় যেরূপ সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ব্যতীত পৃথিবীর কোন জাতি সেরূপ কঠোরতা অবলম্বন, সেরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ এবং প্রাণিমাত্রের প্রতি সদয় ভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। এই পবিত্র সম্প্রদায়ের নেতা মহাপ্রভু চৈতন্য অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় চরিত্রবলে বঙ্গদেশকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিয়াছিলেন। এই ঘোরতর আলোড়নে বহুসংখ্যক ধর্মবীর উৎপন্ন হইয়া তাহার কর্মের সহায়তা সম্পাদন করেন। এই সকল ধর্মবীর বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবধর্মের বিজয়পতাকা স্কন্ধে লইয়া পঞ্চনদ প্রদেশ, মালব, রাজপুতনা, গুর্জর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় মণ্ডলে বৈষ্ণবধর্মের পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্তনে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন।[১০] এই সকল মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণ যেরূপ তন্ময় হইয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোন প্রদেশের ধর্মপ্রচারকেরা তাহার সহস্রাংশের এক অংশও তন্ময়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।[১১]

উত্তর-ভারতবর্ষে যে সকল বঙ্গীয় মহাপুরুষগণ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন, বৃন্দাবন তাহাদিগের প্রধান কার্যক্ষেত্র এবং সনাতন গোস্বামী প্রধান নেতা। ইহাদিগের প্রচারের বিস্তৃতির সহিত অন্য দেশিয় ব্যক্তিগণও ইহাদিগের সহিত প্রচারকার্যে যোগদান করেন।

বৈষ্ণবধর্মের প্রবল প্রচার হইলেও সে সময় শাক্তগণের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না ; ভগবতীর পূজাকালে মদ্যের প্রবাহ প্রবাহিত এবং অগণিত পশুবলি প্রদত্ত হইত। শাক্তগণই প্রচণ্ড অসিবলে যবনগণের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর শাক্তগণ যখন বিষাদগ্রস্ত ও রাজনিগৃহীত হন, সেই সময় বৈষ্ণবগণও শাক্তদিগের উপর বিজয়লাভ করেন। এই বিজয়ে অনেক চাটুয্যে মুখুয্যে বাড়ুয্যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন ও রাজস্ব প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।[১২] সে সময়ের শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ বর্তমানকালের সুবিধাবাদীদিগের[১৩] ন্যায় বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব বা শাক্তের কাছে শাক্ত হইতেন না। যতদিন তাহারা যে মত অবলম্বন করিতেন, ততদিন সেই মতে অচল বিশ্বাস স্থাপন করিতেন।

প্রতাপের জন্মগ্রহণের প্রায় শতবৎসর পূর্বে খানজা আলি নামে একজন ঈশ্বরপরায়ণ মুসলমান বাগেরহাট মহকুমায় অবস্থান করিতেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয় জাতির উপর তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাহার অসাধারণ চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাহার নিকট মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খানজা আলি মহম্মদ তাহীরের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মনিপুণতাতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করেন। খানজাঁ আলির মৃত্যুর পর মহম্মদ তাহীর পির আলি নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানধর্ম মিলিত করিয়া একটি অভিনব ধর্ম প্রচার করেন, এই নূতন ধর্মাবলম্বিগণ পিরালি নামে অভিহিত হন। পিরালি মতাবলম্বিগণ প্রথমত হিন্দুদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেন, কালক্রমে ইহারা স্বীয় ধর্মমত বিস্মৃত হইয়া মাতৃধর্মের বিশাল উদরে প্রবেশ করেন।[১৪]

সে সময় প্রজাদিগের অবস্থা বর্তমানকালের জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল প্রজাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম ছিল। তাহারা দুই বেলা যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিতে পাইত, শস্যের পরিবর্তে সুবর্ণ ও রজত-মুদ্রা দ্বারা তাহারা রাজস্ব প্রদান করিত, সে কালে দেবতা-মন্দির, রাজভবন ইষ্টকনির্মিত হইত,[১৫] অন্যান্য সকলে বংশ-নির্মিত গৃহে অবস্থান করিত, এইরূপ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ নির্মাণ করিতে পঞ্চ সহস্রেরও অধিক মুদ্রা ব্যয় হইত, এরূপ গৃহের কাষ্ঠস্তম্ভে নানা প্রকার মূর্তি ক্ষোদিত হইত, বেতের ছাল দিয়া অতি নিপুণতার সহিত বুনান এবং অভ্র দিয়া মণ্ডিত হইত। বঙ্গের জলবায়ু গৃহাদির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল, এই জন্যই এ প্রদেশে অতি প্রাচীন গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

সে কালের বাঙালিরা স্বীয় স্বীয় জাতি অনুসারে বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, এবং জাতীয় বিদ্যায় প্রধান স্থান অধিকারের জন্য সকলেই সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। এ হিসাবে মূর্খের সংখ্যা সে কালে আমাদের দেশে খুব কমই ছিল। ব্রাহ্মণগণ আপনার পর্ণকুটিরে বসিয়া শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। তাহাদের অতি অল্প অভাব দূর করিবার জন্য ধনী নির্ধন সকলেই আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেন। তাহারা এরূপ বিষয়-বাসনা-শূন্য ছিলেন যে, সাংসারিক অভাবও তাহারা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেন না। ধর্মচর্চা ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া তাহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। নিরীহভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত হইলেও তাহারা স্বধর্ম-রক্ষার জন্য সময়ক্রমে অস্ত্রপাণি হইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ বিষয়ের উদাহরণ সে কালের ও প্রাচীনকালের ইতিহাসে নিতান্ত দুর্লভ নহে।[১৬]

কায়স্থগণ আমাদের সে কালের বাংলায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গোব্রাহ্মণরক্ষায় অগ্রগণ্য ছিলেন। অপর জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কায়স্থের জাতিগত ব্যবসা চাকরি, এ জন্য তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানার সংখ্যা বেশি ছিল।

আমাদের দেশ অতি প্রাচীনকাল হইতে পণ্যদ্রব্যের জন্য যেমন বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ এ দেশের বণিকেরা অত্যন্ত ধনবান বলিয়া বৈদেশিকদিগের নিকট পরিগণিত হইতেন।[১৭] সে কালের বণিকেরা বাল্যকাল হইতেই বাণিজ্য-শিক্ষায় দীক্ষিত হইত। ধন উপার্জনই তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এ জন্য তাহারা কি জলপথ, কি স্থলপথ, তাহাদের গন্তব্য পথের কোন ক্লেশকেই অতিক্রমণ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। আমাদের বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে দূরতর প্রদেশে গমনাগমন করিত, এ জন্য তাহারা পরিচ্ছদের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি প্রদান করিতে বাধ্য হইত। একজন পরিব্রাজক, বাঙালি বণিকদিগের পরিচ্ছদের সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন।[১৮] সাধারণত সে কালের লোকে ধুতি চাদর ব্যবহার করিত, বিশেষ স্থানে যাইতে হইলে "রামজামা" ও চটিজুতা ব্যবহৃত হইত। শীতকালে র‍্যাজাই-বালাপোষে তাহাদের শীত নিবারণ করিত।

সে কালে মামলা-মোকদ্দমা কাহাকে কহে, তাহা তাহারা জানিত না। অনুযোগের কোন কারণ উপস্থিত হইলে গ্রামের বয়ঃস্থ ব্যক্তিরা তাহা মিটমাট করিয়া দিতেন, ইহাতে কোন পক্ষেরই মনস্তাপ বা অর্থব্যয় হইত না। উচ্ছৃঙ্খল ধনবানকেও সে কালে সমাজ-ভয়ে ভীত থাকিতে হইত। সে কালের গ্রামগুলি যেন এক একটি ক্ষুদ্র আদর্শ সাধারণতন্ত্র রাজ্য। দরিদ্রের তত্ত্বাবধান ধনবান করিতেছেন, ধনবানের উৎসব ও ব্যসনে দরিদ্র প্রাণ দিয়া কার্য করিতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই পরস্পর খুড়া দাদা প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। গ্রামের যাহা কিছু অভাব, গ্রামেই তাহা পূরণ হইত। বর্তমানকালেও কোন প্রাচীন গ্রামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন, সেই সাধারণতন্ত্র রাজ্য বিধ্বংস হইয়া কণাবশেষ প্রাপ্ত হইলেও এখনও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বৈদ্য গ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তন্তুবায় গ্রামবাসীর জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কর্মকার প্রভৃতি শিল্পীগণ আপন আপন কর্মে নিযুক্ত ; গ্রামপ্রান্তে চর্মকার পাদুকা নির্মাণ করিতেছে, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজগণ সমাজের সেবার জন্য কেহ চুপড়ি, কেহ ধামা, কেহ কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ-কামনায় নিযুক্ত, কনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে সঙ্কুচিত ; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সর্বোতোভাবে হিতসাধনের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন।

বর্তমানকালের লোকদিগের ন্যায় সে সময়ের লোকেরা বিলাসপ্রিয় ছিলেন না, তাহারা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, কিন্তু সৎকর্মে যথাসর্বস্ব দান করিতেন। আজকাল আমাদের দেশের সাহেবীভাবাপন্ন ধনবানেরা অতিথিসেবার যেরূপ কিছু ধার ধারেন না, সেকালে কিন্তু

মুসলমান-সংসর্গদুষ্ট ধনবানেরাও অতিথিসেবার পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতেন, প্রয়োজনানুসারে তাহারা স্বয়ং অতিথির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন।

সেকালের লোকেরা সাধারণত কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা ও সৈনিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতেন। বাঙালির সৈনিকবৃত্তি, এ কথা পাঠ করিয়া বোধ হয় অনেকেরই সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। বর্তমানকালে সমগ্র ভারতবর্ষের সৈনিকবল অপেক্ষা একমাত্র বঙ্গদেশের সৈনিকবল নিতান্ত কম ছিল না। আবুল ফজেল আইন-আকবরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গের সৈন্য-সংখ্যা পরিগণনাকালে ৩২৩৮৭০ পদাতিক সৈন্য উল্লেখ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ ভৌমিক রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য জমিদারদিগের নিকটও স্বল্প-বিস্তর ত্রিপুরারাজের অধীনে তৎকালে দুই লক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র হস্তী, কোচবিহাররাজের একলক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বর্তমান ছিল। এ সকল ব্যতীত কামরূপরাজ ও আসামের রাজারা প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এ সকল দেখিয়া বোধ হয়, সে কালে যুদ্ধাদি পৌরুষ জনক কার্যকে "গোঁয়ারতমি" আখ্যা প্রদান করা হইত না। কালের কি ঘোরতর পরিবর্তন! তিন শত বৎসর পূর্বে যে জাতির বীরদর্পে মেদিনী কম্পিত হইত, যাহাদিগের অসির ঝঞ্চনা শব্দে দিক সকল পূরিত হইত, আজ তাহাদিগের সন্ততিগণের হৃদয়ে বীরত্বের লেশমাত্র নাই। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে সময় প্রত্যেক প্রদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ বর্তমান ছিল। কালস্রোতে সেই সকল দুর্গকর্তা বীরপুরুষদিগের নামের সহিত এই সকল বীরকীর্তি বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।[১৯] যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া আসা অন্যান্য বীরদেশে যেরূপ ঘৃণার কথা, বঙ্গদেশেও সে সময় ইহা ঘৃণার চক্ষে দর্শিত হইত। যাহাতে কেহ রণে ভঙ্গ দিয়া, দেশের স্বার্থ পদদলিত করিয়া পলাইয়া না আসে, সে জন্য তৎকালের কবিগণও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেন না। এ বিষয়ে একজন গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের মহিমা-কীর্তনকালে লিখিয়াছেন—

সত্যের পাঁচালী লিখি যেবা রাখে ঘরে।
বিষম বিপদে সেই অনায়াসে তরে।।
যেবা পড়ে যেবা ভণে যে করে শ্রবণ।
রণে ভঙ্গ নাহি তার অকাল-মরণ।।[২০]

রাজসেবা। —সেকালের বাঙালিরা মুসলমাননৃপতিগণের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য বেতনের কেরানি বা পাইকের কর্মে জীবিকা উপার্জন করিতেন, রাজ-দরবারে তাহাদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল।

রাজস্ব। —সেকালে বঙ্গীয় প্রজাগণ সুবর্ণমুদ্রায় রাজস্ব প্রদান করিতেন। রাজা স্বদেশবাসী অথবা বিদেশবাসী হউক না কেন, বঙ্গীয় প্রজাসাধারণ রাজকর দিতে প্রথম হইতেই আপত্তি করিত না। সে কালে এ দেশে দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে কড়ি ব্যবহৃত হইত। সে সময়কার প্রজারা করভারে বিশেষরূপে প্রপীড়িত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা রাজদ্বারে গমন করিয়া আট কিস্তিতে রাজস্ব প্রদান করিত।[২১]

বাণিজ্য। —বাণিজ্যের জন্য বঙ্গদেশ চিরপ্রসিদ্ধ। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময় বৈদেশিকগণের মধ্যে পর্তুগিজেরা আমাদিগের দেশে বহির্বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করেন, ইহারা ব্যতীত দিনেমার, ভিনিসিয়ান, ফ্রেঞ্চ, আরব প্রভৃতি জাতিরাও সময় সময় বাণিজ্যের জন্য আগমন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। সে সময় আমাদের দেশ হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র প্রেরিত হইত। বঙ্গের অন্নে অনেক দেশের লোক জীবনধারণ করিত। পৃথিবীর ধনবানেরা বঙ্গের হীরকে অলঙ্কৃত হইবার জন্য বঙ্গদেশগামী বণিকগণকে তাহা আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বঙ্গদেশে তখন পৃথিবীর মধ্যে

সর্বোৎকৃষ্ট হীরক উৎপন্ন হইত। অদৃষ্ট-পরিবর্তনের সহিত বঙ্গদেশ হীরকের পরিবর্তে এক্ষণে অঙ্গার প্রসব করিয়া থাকেন। আমাদের স্বর্ণপ্রসবিনী জন্মভূমি তখন সুবর্ণরেখা, দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর বালুকাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ প্রদান করিতেন। বঙ্গের সোরা বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরিত হইত।[২২] বঙ্গে লৌহ তখন নিতান্ত কম উৎপন্ন হইত না। বর্ধমানে "তেগা" নামক এক প্রকার তরবার প্রস্তুত হইত, অসিজীবী ব্যক্তিগণের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গৃহীত হইত। এখনও উত্তরপশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অতিবৃদ্ধ অসির মর্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহার অনেক প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট চর্ম প্রস্তুত হইত, সেরূপ ঢাল ভারতের কোন স্থলে নির্মাণ হইত না। ইহা যেমন লঘু তেমনি দুর্ভেদ্য, এ জন্য ইহা ক্রয় করিবার জন্য সকলেই আগ্রহ করিতেন।

বঙ্গদেশ সে সময় অর্ণবপোত, যুদ্ধতরী প্রভৃতি নির্মাণের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তুরস্কের সুলতানের জন্য এ দেশ হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ প্রত্যেক বৎসর প্রেরিত হইত। আলেকজেন্দ্রিয়ার জাহাজ অপেক্ষা ইহা সুলভ অথচ সুদৃঢ় হওয়াতে তাহারা ইহার অত্যন্ত সমাদর করিতেন।[২৩] এ প্রদেশে সে সময় দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য এরূপ আকারে একপ্রকার নৌকা নির্মিত হইত যে, তাহা নদীতটস্থ দুর্গের সহিত সংলগ্ন হইলে নৌকার উপর হইতে অবলীলাক্রমে দুর্গ মধ্যে অবতরণ করা যাইত। বর্তমানকালে এ সকল বিষয় বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। পর্তুগিজরা সময় সময় লবণের ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জন করিতেন। সন্দ্বীপ তাহাদিগের লবণ-বাণিজ্যের প্রধান স্থল ছিল। সে সময় হুগলি, সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বঙ্গের প্রধান বন্দর ছিল।

সে কালে আমাদের দেশে সুন্দর মৃন্ময় দ্রব্য নির্মিত হইত। যখন অদৃষ্ট ভাল থাকে, তখন ধূলা স্বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে, তাই তখন আমাদের মাটির বদলে বিদেশ হইতে সুবর্ণ মুদ্রা আসিত। সে কালে আমাদের দেশ হইতে অনেক টাকার মাটির জিনিস বিদেশে নীত হইত। গারগোলেটা নামক বর্তমান গাড়ুর ন্যায় একপ্রকার মাটির গাড়ু দেশে প্রস্তুত হইত। পর্তুগিজরা তাহা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিত। ইহা ব্যতীত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের নানা প্রকার মাটির সুন্দর বাসন, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।[২৪]

আমাদের দেশের সে কালের সূত্রধরেরা আপনাদের ব্যবসায়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল না। তাহাদের নানাপ্রকার কারুকার্য বিদেশীদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত।[২৫] বাঙালি মিস্ত্রিরা এরূপ নিপুণতার সহিত দ্রব্য সকল নির্মাণ করিত যে, তাহা চীনে মিস্ত্রির বলিয়া সন্দেহ হইত। ভারতের অপর প্রান্তরে সূত্রধরেরাও আপনাদিগের বিদ্যায় সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। একজন ফরাসি পরিব্রাজক বলেন যে, চেউলবাসীরা কাষ্ঠের যেরূপ অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্মাণ করে, সেরূপ সুন্দর কাষ্ঠের জিনিস পৃথিবীর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।[২৬]

সেকালে আমাদের দেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল।[২৭] আমাদের অন্নে বিদেশিরা জীবন ধারণ করিত, আর বিদেশির ধনে আমাদের দেশ পরিপুষ্ট হইত। বিদেশিরা আমাদের দেশের ধন-পরিপূর্ণতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, নদ-নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর সকল দেশের ধন ভারতাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে।

বর্তমানকালে যেরূপ সুন্দরবনপ্রদেশ হইতে মধু ও মধুপুথ সংগৃহীত হয়, সেইরূপ পুরাকালেও প্রচুর পরিমাণে মোম এ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। সমস্ত ভারতের মোমের খরচ প্রতাপের রাজ্যের মোম হইতে নির্বাহিত হইত।[২৮]

ইটালির পরিব্রাজিক ভারথিমা বলেন, সকল দেশ অপেক্ষা আমাদের বঙ্গদেশে ধান্য, তুলা, শর্করা, আর্দ্রক প্রভৃতি দ্রব্য সকল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত। মাংসপ্রিয় ব্যক্তিগণ

বঙ্গদেশে ছাগাদির প্রচুর সুলভতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এ দেশ হইতে জলপথে প্রতিবৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ বস্ত্রে পরিপূরিত হইয়া পারস্য, তুরস্ক, আরব, সিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত।[২৯]

আমাদের দেশে বস্ত্র যেরূপ অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত, সেইরূপ উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধেও পৃথিবী-মধ্যে ইহা অতুলনীয় ছিল। সে কালে বস্ত্রের উপর রেশমের লতা-পাতা, পাখি প্রভৃতি বুনানের কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এই সকল বস্ত্র বৈদেশিক বণিকগণ বহুমূল্য প্রদান করিয়া ক্রয় করিত। একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন যে, এই সকল বস্ত্র এরূপ নিপুণতার সহিত প্রস্তুত হইত যে, তাহা ছিঁড়িয়া গেলে রিপু করিবার লোক ইউরোপে পাওয়া দুরূহ হইত।[৩০]

কৃষি। —বঙ্গদেশে পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, প্রতাপের জন্মের পূর্বে ইবনে বাবুটা নামক একজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন।[৩১] তিনি বঙ্গদেশের ন্যায় শস্যসুলভ দেশ কোথাও দর্শন করেন নাই। এখানে আট দরহাম হইলেই একটি পরিবারে এক বৎসরের আহার্যদ্রব্য সংগ্রহ হইত।[৩২] প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসর পরে নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত।

বঙ্গের আম্র চির প্রসিদ্ধ, আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল সপ্তগ্রামের দাড়িম্বের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

১. 'দাতা' স্থানে কেহ কেহ 'রায়' শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

২. ২৩ শ্রাবণ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের (?) "সংবাদ প্রভাকর" দ্রষ্টব্য।

৩. মৌতলি ও মুকুন্দপুরের নিকট পরবেজপুরে প্রতাপাদিত্যের নির্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত স্থানের মসজিদের কারুকার্য সকল ক্লেশ করিয়া দেখিবারও উপযুক্ত বিষয়।

৪. পাদরিরা বলেন, গুলো গঙ্গার মুখ হইতে ৫০ লিগ দূরে ব্যবস্থিত। গঙ্গার মুখে একটা ছোট বন্দর হইতে তাহারা ৮ দিনে গুলোতে উপস্থিত হন। বর্তমান হুগলি পাদরিদের গুলো হইবে।

৫. Pimenta নামক জনৈক ইউরোপীয় পরিব্রাজক বলেন—
The King of Candecan (which lyeth at the mouth of the Ganges) caused a Jesuite to rehearse the Decalougue, who when he reprowed the Indians for their polythsism worshipping so many pagodes. He said that they observed them but as, among them, their Saints were worshipped to whom how sauvory the Jesuites distinction of Douleia and Latreia was for his satisfaction ; I leave to the Reders Judgement.

৬. ১৫৯৯ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদিগকে গির্জা প্রস্তুত করিবার সনন্দ প্রদান করেন। উক্ত সনন্দে দ্বাদশবর্ষীয় উদয়াদিত্যও স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

৭. Pirre du Jaric. Histoire des Indes Orientales pat 1st 23 Chap 609 P এবং Pimenta (Nicolaus) Nova Relatio Historica de Rebus in India Orientali গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে।

৮. Autobiography of Emperor Jahangir. P P. 65 to 104.

৯. Tarry, Voyage to East Indies, 385 P,

১০.
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া।।
* * * ১৫ পৃঃ ভক্তমাল।
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তারে।
পশ্চিম দেশেতে কর শক্তি সঞ্চারে।।

পাঞ্জাব লাহোর আর মল্লার আদি করি।
শাসন করহ কৃষ্ণ-ভক্তিদান করি।।
অদ্বৈত প্রভু শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ধাম।।
প্রভুর প্রেরিত গেল পশ্চিম দেশেতে।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।।
গুজরাত গেলেন ———।
পাঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ।।
হিন্দু ত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল।।
তার পর পাঞ্জাব মল্লার গুজরাত।
সুরাতাদি দেশ প্রভু চৈতন্য ভকত।।
ক্রমে ক্রমে দিলা সব চৈতন্যের দায়।।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান সবে হয়।
কতক পণ্ডিত গোস্বামী পরিবার।।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয় বহুতর।
উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সবার করিল নিস্তার। —নরোত্তমবিলাস

১১. বর্তমান লেখক যে সময় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থান করেন, সেই সময় সমুদ্র-তরঙ্গপরিধৌত কোকন প্রদেশের অন্তর্গত পেশোয়াদিগের বাসস্থান শ্রীবর্ধন নামক জনপদে গমন করিয়াছিলেন। প্রায় সার্ধত্রিংশৎ (ত্রিশত?) বৎসর পূর্বে অবধৌত স্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামক একজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক এ দেশে আগমন ও অবস্থান করিয়া এ দেশবাসীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এবং মহারাষ্ট্রীয়গণকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করেন। এ দেশের লোকেরা এখনও তাহার নাম ভক্তিপূর্বক উচ্চারণ এবং মঠ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। ইনিই এ প্রদেশে সঙ্কীর্তনপ্রথা প্রচারিত করেন।

১২. প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হইতে শিষ্টশান্ত স্বভাব হইল।

১৩. ইহারা যখন যে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সুবিধা পান, তখন সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহারা কখন হিন্দু, কখন বৌদ্ধ, কখন খ্রিস্ট, কখন মুসলমান, কখন তিলকধারী, কখন কুক্কুটাহারী হইয়া অনন্ত লীলা প্রকাশ করেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুবিধাবাদীদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪. যশোহর জেলার পিরালিদিগের আচারব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু আচার মিশ্রিত। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা শিবপূজা ও অন্যান্য হিন্দুব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, পুরুষেরা কুক্কুটভক্ষণ প্রভৃতি মুসলমানদিগের আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকেন। এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ পিরালি, কায়স্থ পিরালি, নাপিত পিরালি আদি নানা জাতীয় পিরালি দেখিতে পাওয়া যায়। কলকাতা অঞ্চলের গঙ্গাজলপূত পিরালি সঙ্গদুষ্ট পিরালি।

পিরালিদের হীনতার কথা লেখায় কেহ কেহ আমাদের উপর কটাক্ষপাত করেন, তাহাদের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে গভর্নমেন্ট রেগুলেশন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। হিন্দু সমাজে তাহারা কোন স্থান অধিকার করেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইবে।

Fourth class, or punjtirthees comprehending the following descriptions of persons of law who are not permitted to enter the temple of Jagannath.

(1) Lolee or Kusbee, (2) Cullal or soonree, (3) Machnoowa, (4) Numosooder or chandal, (5) Chooskee, (6) Gagur, (7) Bagdee, (8) Joogee or noorbauns, (9) Kahar bawry and doolia, (10) Rujbunsee, (11) Peerlay, (12) Chamar, (13) Dhoor, (14) Poun, (15) Teor, (16) Bhooimmalee, (17) Haddee—Regulation iv passed by the Governor General in Council on the 28th April, 1809.

১৫. প্রতাপ-নির্মিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ নিম্নোক্ত স্থানে বর্তমানকালেও দেখিতে পাওয়া যায়। জয়নগরের মন্দির, পাঁচফুলের মন্দির, মৌতলীর মসজিদ, গোপালপুরের মন্দির, মুস্তাফাপুরের নবরত্ন, ঈশ্বরীপুরের বারদ্বারী, হাপসীখানা, বার ওমরার গোর ইত্যাদি। A list of objects of Antiqueian interest in the Lower Province of Bengal নখুদে।

১৬. In short, those Indian SAGES instead of courting this victorious Prince (আলেকজেণ্ডার) or endeavouring to gain his favour by persuading the people to submit to him exerted all their eloquence, and all their inflence, to incite their countrymen to behave with courage and firmness in the Defence of their Liberties ; and this it was exposed them so much to Resentment.

Harris Voyages—Book 1. chap. II 392 P.

১৭. And here (Bengala) there are the richest merchants I ever met with. 212 P. Travels of Ludovico di Verthema.

১৮. Embassy to the Emperor of Japen, 484, P.

১৯. পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য বঙ্গের লুপ্তপ্রায় দুর্গের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাতে বুঝিতে ক্লেশ হইবে না, আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা দুর্গের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। যদি কেহ সমস্ত বঙ্গের দুর্গের তালিকার সহিত তাহার যাহা কিছু ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হইবে। ময়ূরভঞ্জের মহারাজের ১৮টা দুর্গ এবং তাহার ১২ জন সামন্ত রাজার ২৪টা কেল্লা ছিল। বিষ্ণুপুরাধিপতির ১৫টা এবং মহিষাদলাধিপতি আদি তাহার ১১ জন সামন্ত রাজার ১৪টা কেল্লা ছিল। ফতুয়াবাদাধিপের ২টা এবং নাড়াজোল, ঘাটশিলা আদি তাহার ছয় জন সামন্ত রাজার ১৫টা কেল্লা ছিল। নরসিংহগড়াধিপের ৪টা, তাহার ৫ জন সামন্ত রাজার ১৩টা কেল্লা ছিল। কর্ণগড়াধিপের ২টা এবং তাহার অধীন ৫ জন সামন্ত রাজার ছয়টা কেল্লা ছিল।

তামলুকগড়, ময়নাগড়, দাউদপুরাগড়, কোলন্দগড়, দারমাগড়, জারগাঁওগড়, নারায়ণগড়, নরসিংহগড়, করিমগড়, রাজগড়, রামজীবনপুরগড়, মোঙ্গলপোতাগড়, নারফিনগড়, বাউড়েগড়, তান্নাগড়, রাজগড়, বেতা (গড়বেতা), জালিকাগড়, দিগলগড়, মঙ্গলকোট্‌গড়, সেনপাহাড়িগড়, বিষ্ণুপুরগড়, নিয়াগড়, পাঁচোটগড়, বরহামপুরগড়, সারহাটগড়, করঙ্গগড়, জগদ্দলগড়, কেল্লাবাড়িগড়, মহম্মদপুর (সীতারামের দুর্গ), নৌকাটিগড়, রাবণবাদ নদীর সঙ্গমে (বাকরগঞ্জ) একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণগড়, অসুরগড়, শ্যামসুন্দরগড়, গড়মান্দারম, খিলারগড়, গগনেশ্বরগড়, বিটুরগড়, কুলিন গাঁর কাছে গড়, ভাস্তারগড়, ইন্দেশগড়, শান্তিপুরগড়, জঙ্গিপুরগড়, দেবগ্রামগড়, বামনপুকুরগড়, বানগড়, একডালা মোঘলাই কোর্ট, গড় পিগুলাই, পীরগঞ্জগড়, বিরাটগড়, সাতপাড়াগড়, ধর্মপালগড়, পৃথুরাজগড়, মৌথানা কোর্ট, কামাটাপুরগড়, মালানগাগড় ইত্যাদি Renals Atlas, Maps of the Surveyor General office, Asiatic Researches প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইল।

২০. দ্বিজ বিশ্বেশ্বর কৃত সত্যনারায়ণের কথা।

২১. আইন-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আকবরের সময় বঙ্গদেশ ২৪ সরকারে বিভক্ত ছিল এবং ২৫ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩১৯ দাম এই দেশ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত। হফৎ ইকলিম অনুসারে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) বঙ্গদেশ ২২ তুমান বা সরকারে বিভক্ত ছিল। এ দেশ হইতে ২৩ কোটি ৯ লক্ষ ২ হাজার ৮ শত দাম রাজস্ব আদায় হইত। খুলসাৎ-উল-তয়ারিখ অনুসারে (আরঙ্গজেবের শাসনকালে) বঙ্গদেশ ২৭ সরকারে বিভক্ত হইয়াছিল, ৪৬ কোটি ২৯ লক্ষ দাম রাজস্ব এ দেশ হইতে আদায় হইত। এ স্থানে ইহাও পাঠক মনে রাখিবেন যে, আকবর যে সকল স্থল অধিকার করিতে পারেন নাই, তাহাও আবুল ফজল আইন-আকবরীতে তালিকাভুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

২২. বঙ্গে হীরক উৎপন্ন হইত, স্বদেশবাসীর মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষকে আমরা নিম্নোক্ত পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি—Economic Geology of India, 25—39 P. P. Travernier's Travels in India. Vol II. Appendix III. Edited by V. Ball বঙ্গে হীরকের খনির বিষয় আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতেও উল্লেখ করিয়াছেন।

২৩. A matter of great consequence, where they might have all matters for shipping (which caused the Great Turk once to provide here, at an easier charge carried from hence to Sues* then from Alexandria) and here they might both build their Fleet.

*Sues in the bottom of the Red Sea. Chap. vi. Book v. p 513 pt. IV. Purchase.

২৪. In this country is made a large quantity of small black and red pottery, like the finest and most delicate terre sigele, in this they do a great trade, chiefly in gargoulattes and drinking vessels, and other utensils. 329, P, Pyrard

২৫. Many other kinds of work such as furniture and vessels are constructed with extraordinary delicacy, which, if brought here, would be said to come from China.

Voyage of Pyrard de Laval. Vol. I. Chap. XXIV.

২৬. Arrived at Chaoul, a small Town. There are made the finest cabinets in the world, being not to be matched by any of GERMANY, or of CHINA. They are Gentiles, and Great, Traffickers.—P. 23. Exact survey of the East Indies by Monsiere de Monsart. 1915, London.

চেউল বোম্বাইয়ের দক্ষিণ।

২৭. As all rivers run to the sea, so many silver streams into this monerchy, and there stay ; the people of any nation being there very welcome, and bring in there bullion, and carry away the other merchandise ; but it is looked on as a crime that is not easily answerd, to transport any quantity of silver thence. 112 P, Terry's Voyage to East India, 1777.

All the silver of Mexico, and all the gold of Peru, M, Bernier says after having circulated for a time in Europe and in Asia, find there way to the dominions of the Mogul, and never afterwards leave the country.

২৮. See, Histoire Des Indes Orientales. Part I

২৯ This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, also of ginger, and of great abundance of cotton, than any country in the world, and here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are loaden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these that is to say bairam, namone lizati, cinntar doozar and sinabaff. These same stuffs go through all Tarky, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethopia and through all India. There are also here very great merchant in jewels, which come from other countries. P. 212 The travels of Ludovico de Varthema.

৩০. They do most cunningly stitch their coverlits, pavilions, pillowers, carpets and mantles, there in to Christen children, as women in childbed with as use to do, and make them with flowers and branches, personages, that it is wonderful to see, and so finely done with cunning workman-shippe, that it cannot be mended throughout Europe—Voyage of Van Linchoten to the East Indies, P. 69 Vol. I. পাইরাডডি ল্যাভেলও এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Linschoten প্রতাপের সমকালে ভারতে আগমন করে।

৩১. I sailed for Bengal, which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. I there saw one of the religions of the west who told me that he had brought provisions for himself and his family for a whole year with eight dirhems. 1904, P, Travels of Iben-Batuta.

৩২. দরহাম বিভিন্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা। একটি দরহাম চারি আনার সমতুল্য।

পরিশিষ্ট

বসন্ত রায়ের মৃত্যুর সময় রমানাথ নামক তাহার এক পুত্র পূর্বদেশে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। কচু রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পর তিনি যশোহর আগমন করিলে পৈতৃকবিষয়, রাজা উপাধি, এমন কি গুরুপুরোহিত পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। রমানাথ যশোহর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমত ফতুল্লাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে তথায় অবস্থান করেন। ইহার সন্ততিগণ পরে পুঁড়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামভদ্র বসু মহাশয়ের যত্নে পুঁড়া গ্রামে বাস করেন। রমানাথের সন্ততিগণ এক্ষণে পুঁড়া ও খোড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছে।

বসন্ত রায়ের বাসুদেব রায় নামে অপর এক পুত্র বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মধুদিয়া নামক পরগণার মধ্যবর্তী উৎকুল গ্রামে বাস করেন, তিনিও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। বাসুদেবের বংশধরগণ বর্তমানকালেও উক্ত স্থানে আছেন।

নিঃসন্তান কচু রায়ের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখর বা চাঁদরায় সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। ইহার সন্ততিগণ এখনও রাজা উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহারা এক্ষণে খোড়গাছি, মানিকপুর, নুননগর, কাঠুনিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বন্দি হইলে দুর্দান্ত মুসলমানগণ তাহার কয়েকটি পুত্রকে বলপূর্বক মুসলমান করে। মুকুটমণি নামক অপর এক পুত্র পূর্বদেশে পলায়ন করিয়া ধর্মরক্ষা করেন, এক্ষণে তাহার বংশে কেহই নাই।

বংশতালিকা

প্রতাপাদিত্যের বংশবৃক্ষ

বিরাট গুহ
|
নারায়ণ
|
দশরথ
|
ভরত
|
পীতাম্বর
|
শাঁঠ্রি
|
তপন
|
শঙ্কর
|
আঁশ
|
গজপতি
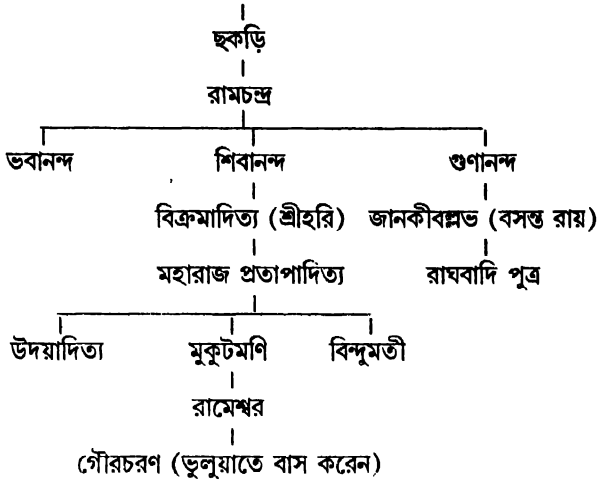
শঙ্করের বংশবৃক্ষ

১ দক্ষ, ২ সুলোচন, ৩ বাসুদেব, ৪ মহাদেব, ৫ মহানন্দ, ৬ সামন্ত, ৭ লৌলিক, ৮ অরবিন্দ, ৯ আইত, ১০ দ্বাকর, ১১ ধন, ১২ রঘুপতি, ১৩ সিধু, ১৪ সর্বানন্দ, ১৫ দেবীবর, ১৬ ভবানী,
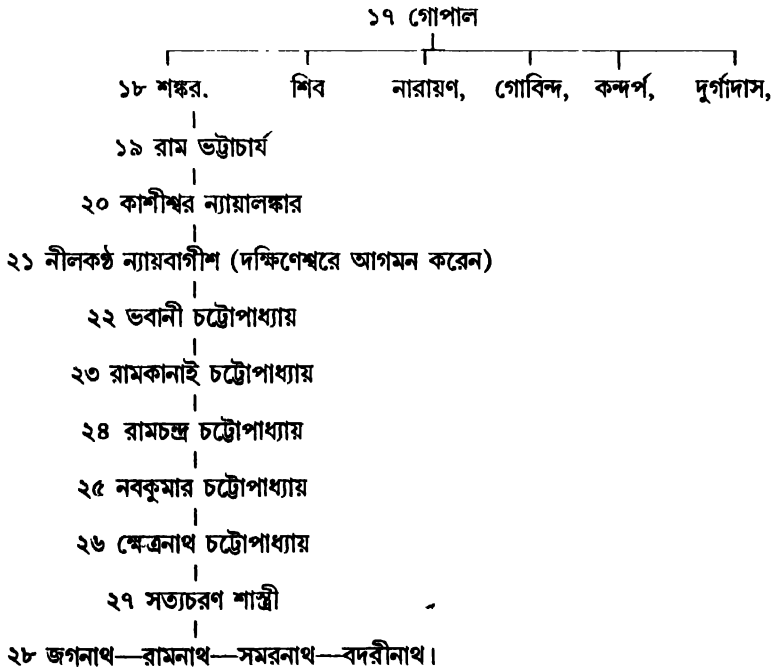
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-নীতি[১]

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে বৈশাখী পূর্ণিমার ন্যায় পবিত্র দিন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন শত বৎসর পূর্বে এই শুভ তিথিতে বাঙালি নিজ ভুজবলের প্রভাব দেখাইয়াছিলেন—প্রবল পরাক্রান্ত ভারত সম্রাট আকবরের অতুলশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বাঙালিরা এই শুভ তিথিতে বঙ্গের স্বাধীনতা-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, বাঙালির পক্ষে এমন পবিত্র দিন আর নাই। এই পবিত্র দিনের পুণ্যস্মৃতি বাঙালি-মাত্রের—ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ ভেদ না করিয়া গৃহে আলোচিত হউক। বীরচরিত আলোচনায় বন্ধনযুক্ত মানুষ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য কেমন করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট আকবরের মুখবিবর হইতে এই শস্য-শ্যামলা জন্মভূমিকে কাড়িয়া লন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার। তাহাতে তাহার অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ—আকবরের রাজনীতির মূল সূত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় মোঘল কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য ভারতবাসীকে পদতলে দলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদের প্রতাপ তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া সম্রাট আকবর এই বিশাল ভারতবর্ষ অধীনতায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকলের মধ্যে দূরতার ব্যবধান দূর করিয়া দেওয়াই তাহার একটি প্রধান নীতি ছিল। দূরতর সীমান্ত প্রদেশে কোথায় কি একটি সামান্য ঘটনা সংঘটিত হইল—অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাহা সম্রাটের কর্ণগোচর হইত। আগ্রা হইতে আমেদাবাদ প্রায় পাঁচ শত মাইল দূর। ৪।৫ দিনের মধ্যে তথা হইতে রাজধানীতে পত্র বাহিত হইত। ১৪ শত মাইল দূরের সংবাদ ৯।১০ দিনের মধ্যে আগ্রায় নীত হইত। এই কার্যের জন্য সম্রাটের চারি হাজার ডাক-পিয়াদা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিল। আবশ্যক হইলে আরও অধিক লোক নিযুক্ত করা হইত। বর্তমানকালে রেলহীন দেশে এত শীঘ্রগতিতে পত্র বাহিত হয় কি না সন্দেহ।

দেশের জনসংখ্যার তুলনায় আকবরের সৈন্যসংখ্যা খুব কম ছিল। কম থাকিলে হইবে কি? সীমা হইতে সীমান্তরে অল্পসময়ের মধ্যে সৈন্য সকল চালিত হইত—এক সৈন্য যেন বহুরূপ ধারণ করিয়া সর্বত্র বর্তমান থাকিত। কাজেই জনসাধারণ সম্রাট-সৈন্যদল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইত। কিন্তু প্রতাপ ৭।৮ দিনের রাস্তাকে ৭।৮ মাসের রাস্তায় পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় বঙ্গের স্বাধীনতা-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে সীমান্ত প্রদেশে নদী, পর্বত অথবা মরুভূমি বিদ্যমান আছে, সেই দেশ ক্লেশে জয় করা যায়। আমাদের বঙ্গদেশ নদনদীবহুল হওয়ায় বিপক্ষের পক্ষে ইহা জয় করা বড় সহজসাধ্য নহে, আর যে সেনাদল অম্লানবদনে সকল প্রকার অভাব ও ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সেরূপ সেনাদল জয় করা বড় সাধারণ কথা নহে। প্রথমকালে প্রতাপের সেনাদল সম্মুখ-যুদ্ধে অভ্যস্ত না হইলেও ক্লেশ ও অভাব সহনে বিশেষরূপে পটুতা লাভ করিয়াছিল। সে কালে তীর, ধনুক, ঢাল, তরবার, বর্শা, কামান প্রভৃতি অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। লাঠি, তরবার, তীরচালনায় সে কালের বাঙালিরা বিশেষ প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন— ইহাতে ছোট বড় ভেদ ছিল না—গোড়গোয়ালা, বাগ্‌দী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

প্রতাপ প্রথম প্রথম মোঘলদিগকে রাত্রিকালে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিতেন। এইরূপে তাহার সেনাদল মোঘল আক্রমণে অভ্যস্ত হইলে—যুদ্ধবিদ্যায় পটুতা লাভ করিলে,

তিনি সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। শৃঙ্খলার সহিত জীবন বিসর্জন করাকে যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। যে সেনারা এইরূপভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, তাহাদের কীর্তি দিগন্তবিস্তৃত হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা অসাধারণ কার্য সাধিত হইয়া থাকে। প্রতাপ পর্তুগিজদিগের সাহায্যে ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের নিকট ভাল বন্দুক, কামান ও বারুদ সংগ্রহ করিয়া তিনি মোঘলদিগের অজেয় হইয়াছিলেন। মোঘলগণ বিভক্ত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সৈন্য সকল একত্র করিয়া শত্রু আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া শত্রুর অপর সেনাদলে সংবাদ যাইবার পূর্বেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অপূর্ব বিজয়শ্রী লাভ করিতেন। প্রতাপ বিভক্ত হইয়া মোঘল-সৈন্যকে আক্রমণকালে স্বীয় অপর সৈন্যদল হইতে বিশেষরূপে বিচ্ছিন্ন থাকিতেন না। আবশ্যক হইলে তাহার সেনাদলের সহিত একত্র বা বিচ্ছিন্ন হইতে বিলম্ব হইত না। তিনি সেনাদলের সহিত এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু আক্রমণ জন্য গমন করিতেন যে, তাহা কল্পনা করা যায় না। মোঘলদিগের গতি প্রতাপের শীঘ্রগতির কাছে পরাজিত হইয়াছিল। ক্ষিপ্রগতি যুদ্ধে জয়লাভের একটি মূল উপায়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে সেনানী পলায়মান শত্রুসেনাকে বিপর্যস্ত করিতে না পারেন, তাহার জয় অর্ধজয় মাত্র। প্রতাপ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাহার যুদ্ধপ্রণালীও তাঁহার সহিত অন্তর্হিত হইলেও তাহার এই ক্ষিপ্রগতি বাঙালি ভুলে নাই। ১৫।২০ ক্রোশ দূরে গমন করিয়া বাঙালি ডাকাতি ও লুঠ করিয়া সেই রাত্রেই নিজের ঘরে শয়ন করিয়া থাকে। আর কিছুদিন পরে ইহা অসম্ভব অসত্য বলিয়া উপেক্ষিত হইবে।

প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে, গৃহাগত মোঘলগণকে শীঘ্র পরাজিত করিতে না পারিলে শত্রু কর্তৃক দেশ উৎসাহিত হইবে, রাজকোষ অর্থশূন্য হইবে—বিশ্বাসঘাতকের দল প্রবল হইবে, সেনা সকল বিশৃঙ্খল হইবে। তাই তিনি চিরকারিতা পদত্যাগ করিয়া শব্দ হইবার পূর্বেই বজ্রের ন্যায় শত্রুশিরে আপতিত হইতেন। এই নীতি অবলম্বন করায় তিনি অল্পসময়ের মধ্যে মোঘলগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নীতি অবলম্বন করাতে তিনি মোঘলদিগের যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রতাপের সৈন্যসকল সর্বদা যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। দিবারাত্র কোন সময়েই তাহারা অসতর্ক থাকিত না। তিনি যেরূপ অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া শত্রুজয় করিতেন, সেইরূপ তাহাকে কেহ যাহাতে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাহার বড়ই কঠোর দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধকালে সেনানীদের মধ্যে যাহাতে মতভেদ না হয়, সে জন্য একজনের আজ্ঞা মানিয়া সকলকে চলিতে হইত। একজন সৈন্য বিপন্ন হইলে তাহার সহায়তার জন্য অপর সৈন্য ধাবিত হইত। প্রাণের ভয়—চামড়ার সুখ-দুঃখ সেকালের লোকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অম্লানবদনে তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। কোন দুঃসাধ্য কার্যের জন্য আহ্বান হইলে দশের স্থানে শত আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। সকলেই তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেন।

অধ্যবসায়ের অবতার প্রতাপের কাছে যুদ্ধকালে "কিন্তু" ছিল না। যুদ্ধের পূর্বে যাহা স্থির করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি জানিতেন, যুদ্ধকালে যে সেনানী "কিন্তু" করেন, তাহার পরাজয় ধ্রুব। তিনি জানিতেন, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নকালে বেশি সৈন্য নিহত হয়—সৈন্য সকল হতবীর্য হইয়া পড়ে। তাই তিনি প্রাণপণে জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ করিয়া ঘোর সঙ্কটেও বিজয় লাভ করিয়াছেন।

পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ক্ষিপ্রগতি অনেক সময় বিজয়লাভের মূল কারণ। কিন্তু যে সেনানী

উদ্দেশ্যহীন হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার সেনা সকল শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়ে। তাই বীরবর প্রতাপ বকের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে কর্তব্য স্থির করিয়া সিংহ-বিক্রমে পথশ্রান্ত রুগ্ন হতবীর্য মোঘল সেনার উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া দিতেন। প্রতাপ-চরিত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি কখন বজ্রগতিতে অকস্মাৎ শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতেন, আবার কখন নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়া শত্রুগণকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেন।

যুদ্ধশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ প্রতাপের পদাতি-সৈন্যগণ "ঢালী" সৈন্য নামে অভিহিত হইত। এই ঢালী সৈন্যের সহায়তার জন্য "অযুত তুরঙ্গসাতি" এবং "ষোড়শ হলকাহাতী" ছিল। পদাতিক—অশ্বারোহী এবং তোপখানা, এই ত্রিতয়সংযোগে উত্তম বাহিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পদাতিককে রক্ষা এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষে অশ্বারোহী বিশেষ কার্যকর হইয়া থাকে। যুদ্ধের প্রাক্কালে, যুদ্ধের মধ্যসময়ে অথবা যুদ্ধের অবসান সময়ে অশ্বারোহীর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ হইয়া থাকে। অপরপক্ষে পরাজয়ের পর প্রত্যাগমনকালে শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ হইতে সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার পক্ষে অশ্বারোহী সৈন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। তাই বীরকুল-চূড়ামণি মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গীয় সৈন্যকে অজেয় করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের তোপখানা হস্তীর দ্বারা বাহিত হইত। কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্র বলেন, প্রতাপের "ষোড়শ হলকাহাতী" ছিল। ১৫টা হাতিতে একটি হলকা হইয়া থাকে। ২৪০টা হাতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তোপখানা এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইত।

এই সকল ব্যতীত আমাদের আর একটি জিনিস ছিল। তাহার সাহায্যে আমরা মোঘলদিগের কাছে বড়ই দুর্ধর্ষ হইয়াছিলাম। সে কালে আমাদের দেশে অতি সুন্দর সুন্দর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত। প্রতাপ পর্তুগিজদিগের সাহায্যে জাহাজ সকল অধিকতর সুন্দররূপে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল রণতরী বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে উভয়দিকে অনায়াসে পালভরে গমনাগমন করিত। আমাদের এই নদনদীবহুল বঙ্গদেশে প্রতাপ এই সকল রণতরী ও সৈন্য লইয়া যখন মোঘলদিগকে রাত্রিকালে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতেন, তখন কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে? প্রতাপ এই সকল রণতরীর সাহায্যে কেবলমাত্র যে মোঘলদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়া বঙ্গীয় বাহুবল ও যুদ্ধবিষয়ক প্রতিভার বিশেষরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাই কবি বলিয়াছেন—

ফেরঙ্গমগবীর্যঞ্চ যবনস্য বলং তথা।
খর্বং চকার শূরোঽসৌ—।।

ভবানীর বরপুত্র মহারাজ আমাদের যে যুদ্ধে গমন করিতেন, সেই যুদ্ধেই বিজয়শ্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন—লোলরসনা মহাকালী যেন তাহার সেনাপতি হইয়া শত্রুকুল নির্মূল করিতেন। প্রতাপের অলৌকিক বীরত্বে আমাদের দেশের কতকগুলি মহাপ্রাণ ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহারা তাহার বিজয়-বাহিনী পরিচালনা করিয়া অত্যন্ত দুষ্কর কার্য সকল অনায়াসে অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া সৈন্যগণকে জয়যুক্ত করিতেন। মহারাজ প্রতাপ বা তাহার সেনানীগণ যুদ্ধবিদ্যায় এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, জয় বা পরাজয় কোন সময়েই তাহাদিগের মুখশ্রীর পরিবর্তন হইত না। ঘোরতর যুদ্ধস্থলে নির্বিকারচিত্তে সৈনিকগণকে পরিচালনা করিতেন; শত্রুর অবস্থা ও অবস্থানচিত্র যথার্থরূপে অঙ্কন করিতেন, ছোট বিষয়কে বড় বা বড় বিষয়কে ছোট করিয়া তাহারা প্রতারিত হইতেন না। ভীরুকে উৎসাহিত করিতেন, অবসন্নকে বল প্রদান করিতেন,

পশ্চাদ্‌গামীকে অগ্রগামী করিতেন, বিশৃঙ্খলকে শৃঙ্খলিত করিয়া শত্রুসেনার দুর্বল স্থলে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে হতবীর্য করিতেন, স্বদেশগৌরববৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতাপের সেনানীরা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সেনানায়কগণ এই সকল গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন বলিয়াই তাহারা অল্পসময়ের মধ্যে মোঘলদিগের উপর লোকোত্তর বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপের সৈন্যগণ তীর, ধনুক, বন্দুক, তরবারি ব্যতীত আরও দুইটি জিনিস ব্যবহার করিতেন। ইহার সাহায্যে অনেক সময় তাহারা মোঘলদিগের কাছে অজেয় হইয়াছিলেন। কুঠার ও কোদাল প্রত্যেক পদাতিককে সঙ্গে লইতে হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে এই কুঠার কুটীরনির্মাণ ও কাষ্ঠসংগ্রহ প্রভৃতির পক্ষে সহায়তা করিত। আত্মরক্ষা করিয়া সুযোগক্রমে বিজয়ী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের এই সকল বেলদার সৈন্য সময় সময় এরূপ ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য করিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে মোহিত হইতে হয়। সময় সময় তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে নদীনালা খনন করিয়া সে প্রান্তরের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন করিয়া শত্রুসৈন্যের পক্ষে দুর্গম করিয়াছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাহার সেনানীগণ যেথায় জয় ধ্রুব সিদ্ধান্ত করিতেন, তথায় তাহারা বিপুলপরাক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দলিত ও মথিত করিতেন। যেথায় তাহারা দেখিতেন, অবরুদ্ধভাবে অবস্থান করিলে শত্রুসৈন্য অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে, তথায় তাহারা যুদ্ধের জন্য সমরাঙ্গনে অবতরণ করিতেন। যখন তাহারা যুদ্ধের জন্য সমরাঙ্গনে অবতরণ করিতেন। যখন তাহারা দেখিতেন, শত্রুসৈন্যের সাহায্যের জন্য নূতন সেনাদল আগমন করিতেছে, তখন তাহারা শত্রুসৈন্যর মিলন হইবার পূর্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। অবরুদ্ধ সৈন্যকে সাহায্য করিবার জন্য দেশকাল বিবেচনা করিয়া তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। স্থান-বিশেষ অধিকার জন্য তাহারা অপেক্ষা না করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেন। শত্রু সেনানীগণ পরস্পর মতগত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাহার সেনানীগণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন অথবা শত্রু-সেনানী মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইলে তাহাদিগকে ভ্রমশোধনের অবকাশ প্রদান না করিয়া আমাদের বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপ ও তাহার সহচর সেনানীগণ শত্রুগণকে আক্রমণ করিতেন। তাহারা হঠকারিতার সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। এই সকল গুণমণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই প্রতাপ যুদ্ধবিদ্যায় অনভ্যস্ত বাঙালিকে সমরনিপুণ, ক্লেশসহিষ্ণু, মৃত্যুভয়বিরহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপ জানিতেন যে, সৈন্যগণ সর্বোপকরণসম্পন্ন হইলেও যদি হতবীর্য ও স্ফূর্তিহীন হয়, তাহা হইলে সে সৈন্য জয় করা বড় ক্লেশের কথা নহে। তাই ভবানীর বরপুত্র প্রতাপ সৈন্যগণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে নিবীর্য, ছত্রভঙ্গ, মৃতপ্রায় সৈন্যগণ বীর্যবান ও একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত ; কেহই পশ্চাৎপদ হইত না। প্রতাপের প্রতিভার উপর সৈন্যগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাই তাহারা যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের অজেয় হইয়াছিল। যুদ্ধশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ প্রতাপ প্রথম প্রথম নিজের সৈন্যের অল্পতাজনিত অভাব ক্ষিপ্রগতি দ্বারা দূর করিতেন। ব্যূহরচনার দ্বারা তোপখানার এবং স্থাননির্বাচন করিয়া অশ্বারোহীর অভাব মোচন করিতেন। তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে শত্রুদের দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। গুপ্তচরনিয়োগ জয়লাভের একটি প্রধান কারণ। মোঘলদিগের সময় গুপ্তচর সকল রাজ্যের দূরতর প্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থান করিয়া সমস্ত সংবাদ সম্রাট-সমীপে প্রেরণ করিত, আমাদের প্রতাপের গুপ্তচরসকল ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সমস্ত কথা তাহার কাছে প্রেরণ করিত। এই সকল কার্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইত।

অবকাশ না পাইলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কখন বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, মহারাজ প্রতাপাদিত্য

প্রভৃতি মনীষিগণ স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন জন্য যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের প্রচণ্ড রণবিষয়িণী প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিরীহ-প্রকৃতির বাঙালিগণকে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের ন্যায় যুদ্ধকার্যে সুপটু করিয়া মোঘলদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিলেন। এই শুভ পূর্ণিমায় বাংলার স্বাধীনতা বিঘোষিত হয়, এই শুভতিথিতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য অভিষিক্ত হইয়া বাংলার ধনধান্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। তাই এই তিথি বাঙালির কাছে পরম পবিত্র, পরম শুভজনক। আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায় এই পাপনাশিনী শুভতিথি স্মরণ করিয়া বাঙালি পাপমুক্ত হউন।

---

১. বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল।

বারভুঞা

বা

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস

শ্রীআনন্দনাথ রায়

প্রণীত

কলিকাতা

১৬নং সাগর ধরের লেন,

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১৮ সাল

মূল্য ১৷০ বাঁধাই ১॥০ টাকা মাত্র

সাথী প্রেস
২১/১, পটুয়াটোলা লেন
শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—
২০১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।
২০, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, মজুমদার লাইব্রেরী।
লায়েল স্ট্রিট, ঢাকা আশুতোষ লাইব্রেরী।
৩৯, হ্যারিসন রোড, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়
নগর পোঃ উপসী, জেলা ফরিদপুর,
শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট।

উৎসর্গ

স্বসমাজ স্বদেশপ্রতিষ্ঠ

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব

ঁহরনাথ রায় মহাশয়ের

ও

পুণ্যবতী মাতৃঠাকুরাণী

স্বর্গীয়া

মহামায়া দেবীর

শ্রীচরণে

ভক্তি-সহকারে

তাঁহাদের দীন-সন্তানকর্তৃক

এই

ইতিহাসখানা

উৎসর্গীকৃত হইল

ভূমিকা

দূরবর্তী প্রদেশের বিবরণ বাঙালি যতটা পরিজ্ঞাত, অদ্যাপি স্বদেশকে তাহারা ততটা চিনিয়া লইতে পারে নাই ; কারণ কত স্তুপের নিম্নে, কত স্রোতস্বতীর অতলগর্ভে যে, উহার অত্যুজ্জ্বল রত্ননিচয়ের সমাধিপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কয়জনে লইয়া থাকেন? একমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীর সহিত যেটুকু জড়িত হইয়া রহিয়াছে, আমরা উত্তরাধিকারীসূত্রে তাহারই অধিকারী হইয়া রহিয়াছি। মূল মালমসল্লা নাই বলিতে কিছুই নাই। বর্তমানে দেশিয় কতিপয় মাননীয় তত্ত্ববিৎ এতদুদ্দেশ্যে বিস্তর গবেষণা করিতেছেন বটে, কিন্তু এই রত্নরাজির যথার্থ উদ্ধারণ কতদিনে সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন।

বারভুঞার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় কিন্তু ততটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। তথাপি উহার উপর এমন একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছে যে, মাজিয়া ঘসিয়া উহাকে প্রকৃত উজ্জলতায় উপনীত করিতে আরও কতকটা সময়সাপেক্ষ। নানাকথার অসামঞ্জস্য এখনও রহিয়া গিয়াছে, উহার মীমাংসা সংসাধন ক্রমে হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

দেশের অবস্থানুসারে কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে মনে স্বতই একটা আশঙ্কার উদ্রেক হয়, কারণ ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচনার অধিকারী। অথচ স্বদেশের প্রকৃত তথ্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত, কতজনে কতদূর অবগত আছেন, তাহা অদ্যাপি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। তথাপি সুখের কথা এই যে, বঙ্গদেশীয় সমালোচক মাত্রেরই একাধারে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি সমালোচনা করিবার যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছে, পৃথিবীর উন্নতসমাজেও সেইরূপ লোক বর্তমান আছে কি না সন্দেহ। শুনিয়াছি ঐ সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকগণ দ্বারা ঐরূপ পৃথক পৃথক বিষয় সমূহের সমালোচনা কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কথায় আছে, "যিনি অগ্রে গমন করেন, তাঁহারই ব্যাঘ্রের ভয়," যশঃ নাই, অযশঃ আছে ; তাহা বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে তো কোন কার্য কখনই হইয়া উঠিতে পারে না। সমালোচনার ফলে ও বাদ প্রতিবাদে সময়ক্রমে সত্য অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িবে, তখন উহা মানিয়া লওয়াও সুসঙ্গত।[১]

বর্তমান গ্রন্থমধ্যে অনেক অভিজ্ঞ লোকের লেখার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা বলিয়া লেখক যদি মনে করেন, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অবিজ্ঞ তবে তৎসদৃশ অব্যবস্থিতচিত্ত আর কেহই হইতে পারে না। তাহার মন্তব্য দোষযুক্ত প্রতিপন্ন হইলে, বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে। কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক নানারূপ অগ্নি-পরীক্ষা মস্তকে ধারণ করিয়াই লেখককে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইল।

বারভুঞা বা দ্বাদশ মণ্ডলের প্রথা ভারতের নানা অংশে বিশেষতঃ আসাম প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় বারভুঞাদের মধ্যে প্রধানগণ কায়স্থবংশীয় ছিলেন। অতএব এই ইতিহাস ঐ যুগের কীর্তির এক প্রধান উপাদান ; অন্য হিসাবে বাঙ্গালীর অক্ষয় গৌরবাত্মক নিদর্শন। জাতিনির্বিশেষে সকলেই যে সেইকালে রণনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসাময়িক বিবরণ পাঠে তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

বারভুঞার মত একখানা প্রাচীন ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিব বলিয়া কোন কালেও মনে

স্থানপ্রদান করি নাই। ভূতপূর্ব নির্মাল্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত পত্রিকায় বারভুঞা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিত আমাকে অনুরোধ করেন, আমি কিন্তু এই কার্যে প্রথমত হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই ; কিন্তু তাঁহার নির্বন্ধাতিশয় ঔৎসুক্য আমি কোনমতে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইলাম না। ১৩০৭ সনের বৈশাখের নির্মাল্যে সর্বপ্রথমে এই প্রবন্ধের অবতারণা হয়। সমালোচনা-ক্ষেত্রে সাহিত্য, এডুকেশন গেজেট ও বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় এই প্রবন্ধটির সমালোচনা আমার নিকটে নিতান্ত উৎসাহের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয়ও উহার অন্যতম কারণ। কিছুদিন পরে নির্মাল্য বৃন্তচ্যুত হইয়া অন্তর্হিত হইলে, এই প্রবন্ধ ক্রমশ নব্যভারত পত্রিকায় ১৩১০ সন পর্যন্ত বাহির হয়। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রবন্ধের আরম্ভ ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের উৎসাহে অনেকদূর পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হয় ; এইজন্য ইহারা উভয়েই ধন্যবাদার্হ।

সাধারণভাবে বারভুঞার বিবরণ লিখিত হইলে পর, উহা শুধু গল্পের ন্যায় কল্পিত বিবেচিত হইয়া পড়ে, এইজন্য পূর্ব লেখার ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত করিবার জন্য, নূতনভাবে গঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইলিয়ট লিখিত আকবরনামার অনুবাদই প্রধানত আমার অবলম্বনীয় হইয়াছে; তৎপরে স্থলবিশেষে পারস্যভাষায় লিখিত আকবরনামার অনুবাদ করাইয়াও ইহার সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৮৭৩ খ্রিঃ অব্দে জেমস ওয়াইজ এশিয়াটিক জার্ণেলে বারভুঞা সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তৎপরে প্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভারতী-পত্রিকাতে ঐ সকল প্রবন্ধের আলোচনা করেন। তাঁহারা সমুদয় ভুঞাগণের বিবরণ পরিসমাপ্ত না করিয়াই, প্রবন্ধ প্রকাশে ক্ষান্ত হয়েন ; তৎপরে এতদালোচনায় আর কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই।

প্রায় আমার আলোচনার সমকালেই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এ, বি-এল, কর্তৃক "বঙ্গীয় সমাজ" নামে একখানা পুস্তক প্রণীত হয় ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় মহারাজ "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় বহু তথ্য এই উভয় গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইবার সুবিধা ঘটে। অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ঐতিহাসিক চিত্রে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধেও অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করেন ; তাহা হইতে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তক হইতেও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের অনেক তথ্য পাইবার সুযোগ ঘটে। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিখিলবাবুর নিকটে আমি নানারূপে উপকৃত, এমন কি তদীয় প্রবন্ধ হইতে আমি অনেক স্থান অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। প্রকারান্তরে পরস্বাপহারী হওয়া অপেক্ষা প্রকাশ্যভাবেই এইরূপ উদ্ধৃত করা আমি শ্লাঘ্য বিবেচনা করিলাম। বারভুঞা সঙ্কলন ব্যাপারে আমি উক্ত মহোদয়গণের নিকট যথার্থই ঋণী, তবে প্রয়োজনারোধে, স্থলবিশেষে তাঁহাদের কথার প্রতিবাদও করিতে হইয়াছে, ভরসা করি, আমি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছি, এইরূপ প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে উহা অবশ্যই সংশোধিত হইবে।

ছয় বৎসর পূর্বে এই পুস্তক অন্তঃপুর প্রেসে মুদ্রণ জন্য দেওয়া হয়, তিন ফরমা মুদ্রিত হইলে পরে ঐ প্রেস উঠিয়া যায়, বিবিধ কারণে আমাকেও মুদ্রণকার্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। জন্মভূমি কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইলে নানাবিধ দৈবদুর্ঘটনায় পতিত হওয়াই উহার প্রধান কারণ। পুনরায় পুস্তক মুদ্রিত আরম্ভ করিতেই আবার যুগপৎ দুইটি বিপদ উপস্থিত হইয়া আমরা হৃৎ-তন্ত্রীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উহার প্রথমটি পিতৃহীন একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু, আর দ্বিতীয়টি জ্যেষ্ঠ জামাতাটির অকস্মাৎ পরলোক গমন। এই দুই শোকাবহ ঘটনায় আমি উপযুক্তরূপে পুস্তকের যত্ন লইতে পারি নাই, কাজেই স্থানে স্থানে ভুল ও অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। পাঠক মহোদয়গণের হস্তে উহা পড়িলে দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন, পরবর্তী মুদ্রণকালে তৎসমুদয় সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন,

কবিরত্ন বি.এ. ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় প্রুফ দেখার পক্ষে সাহায্য করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

নোয়াখালি অবস্থানকালে, তত্রত্য প্রাচীন উকিল দক্ষিণবিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের নিকটে কেদার রায় ও মানসিংহের মধ্যে যে পত্রবিনিময় সাধন হয়, তাহা অবগত হইয়া শ্লোক দুইটি সংগ্রহ করি, ইতঃপূর্বে আর কেহ উহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হুদা ভুলুয়ার ভূতপূর্ব নায়েব চন্দ্রমোহন নাগ মহাশয়ের নিকট লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধীয় একখানা হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ ছিল, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয় উহা আমাকে প্রদান করায় আমি উহা হইতে অনেক নতুন তথ্য অবগত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হই। শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস হইতেও অনেক বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি। রায় মহাশয়ের লেখাতেও চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে সুবর্ণগ্রামের দনুজমাধবের বংশ বলিয়া অনুমিত হয় না। গোসাঞি ভট্টাচার্য সম্বন্ধীয় প্রাচীন কিংবদন্তী তদীয় বংশধরগণের নিকট হইতে প্রাপ্তির সুবিধা ঘটে, উহা সর্বজন বিদিত। চাঁদ ও কেদার রায়ের অমাত্যগণের নাম ও পরিচয় ইতঃপূর্বে আর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। অন্যান্য ভুঞাগণের বিবরণও অনেকটা স্বচেষ্টাতেই সংগ্রহ করিয়াছি, কেবল বারেন্দ্র রাজগণের তথ্যাবলী শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনেকটা সংগ্রহের সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু সান্যাল মহাশয় কোথা হইতে কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট না লেখায় অনেক কথাই সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

মূল আকবরনামা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হইয়া কতকটা অনুবাদ করান হয়, কতকটা বসুমতী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আইন-ই-আকবরি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইতিহাসের সহিত যে সকল স্থানের সম্বন্ধ আছে, উহার পরিচয় অনবগত থাকায় পাঠকের পক্ষে পাঠোপভোগ প্রীতিপ্রদ হয় না, এইজন্য পরিশিষ্টভাগে ঐ সকল স্থানগুলির নির্দেশ সম্বন্ধীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। উহা নানাভাবে গৃহীত হইয়াছে, তবে ব্লকম্যান এশিয়াটিক জার্ণেলে বাঙ্গালার প্রায় ঐতিহাসিক স্থানগুলিরই পরিচয় প্রদান করিতে যত্নপর হইয়াছেন, অতএব ঐ জার্ণেলের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আংশিক বিবরণ ব্যতীত ঐ সকল সঙ্কলিত বিবরণের সম্যক ব্লকম্যানের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইবে না। বাস্তবিক আমাদের দেশে ভূগোলের আলোচনা না থাকায়, ইতিহাস পাঠের সম্যক ফলোপভোগ হইয়া উঠে না, ইহা অনুধাবন করিয়া এই নবপ্রথার প্রবর্তনা করিতে বাধ্য হইলাম।

একই নামধারী জনগণ ও এক নামের স্থানসমূহের পরিচয়দানে আমরা অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া থাকি, কিন্তু একই নামে যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থান থাকিতে পারে, উহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। এই কথা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অতঃপর বাংলার ইতিহাস সংগ্রহ ব্যাপারে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে, এই কথাটি যে মূল্যবান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের একমাত্র যশশ্চন্দ্ররূপে ত্রিপুরার রাজবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। সেই বংশপ্রভব স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যকল্পে একশত টাকা দান করিয়াছিলেন, তদীয় অর্থবলেই প্রথম উহার মুদ্রাঙ্কনকার্য আরম্ভ হইয়াছিল, তদুদ্দেশ্যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ দ্বারাও উপকৃত হইয়াছি। এই লেখকের সহায় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নামও এস্থানে উল্লেখ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য জ্ঞান করি। সুহৃদ্বর উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, স্বদেশহিতৈষী মাননীয়

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, প্রাজ্ঞ কবিরাজ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম. এ. মহোদয় প্রভৃতির নিকটে লেখক নানাপ্রকার কৃতজ্ঞতাতে আবদ্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে লেখক কৃতিপুরুষগণের অধম সন্তান। সাধক কবি রামগতি, কবিবর জয়নারায়ণ, রাজনারায়ণ, বিদুষী গঙ্গামণি ও আনন্দময়ী প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় কবিতা-বীণার ঝঙ্কারে একদা যে কানন মুখরিত করিয়াছিলেন, লেখক অধুনা তথায় বায়স-রবের অনুকরণ করিতেছে মাত্র। মনীষাসম্পন্ন সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার অমর গ্রন্থে এই সকল কবিগণের পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য সেন মহাশয় লেখকের নিকটে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।[২] পাঠক মহোদয়গণের নিকটে শোকার্ত লেখকের সহানুভূতি প্রার্থনাই একমাত্র উপায়, ইতি।

শ্রীআনন্দনাথ রায়

জপসা, ছয় হাবেলী,
লালাবাবুর কুটির
২৯শে পৌষ, ১৩১৮

১. দেশের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া প্রতিবেশীদের নিকট কতটা সাহায্য পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা মনের আবেগে ১৭১ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি, এজন্য তৎসম্বন্ধে আর কোন কথা এই স্থানে উল্লেখ করিলাম না। (বর্তমান গ্রন্থের ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

২. আমি যে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইতিহাস চর্চায় রত হইয়াছি তাহা এই পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তি হইতে ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে ; অতএব পুনরোল্লেখ অনাবশ্যক। (বর্তমান গ্রন্থের ৩৯২ পৃষ্ঠা)

কয়েকটি সংশোধিত কথা

সূচনাতে সাতৈর রাজা রামকৃষ্ণকে বারভূঞার অন্তর্গত করা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী লোক, সেই সময়ে গদাধর সান্যাল সাতৈরের রাজা ছিলেন। সূচনাতে যে সংগ্রামসাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাকে ভূষণার সংগ্রাম নির্দেশ করা উচিত হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা দুইজন পৃথক ব্যক্তি। ১২০ পৃষ্ঠায় (বর্তমান গ্রন্থের ৩৪৯ পৃঃ) লেখা হইয়াছে পণ্ডিত কীর্তিবাস দনুজ রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, তৎস্থানে কীর্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা হইবে। ১৪০ পৃষ্ঠায় (বর্তমান গ্রন্থের ৩৫৯ পৃষ্ঠা) সংগ্রামকে সীতারামের পরবর্তী লেখা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংগ্রাম পূর্ববর্তী বটেন। সর্বানন্দ তরঙ্গিনী প্রণেতা বলিয়া সর্বানন্দ ঠাকুরের নাম করা হইয়াছে, তৎস্থানে ঐ ঠাকুরের পুত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য ঠাকুর হইবে। ইহার সমকালে পূর্ণানন্দ গীর কর্তৃক শ্যামারহস্য নামক তান্ত্রিক গ্রন্থ বিরচিত হয়। চণ্ডী প্রণেতা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ এই শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড গীরের প্রকৃত নাম ব্রহ্মানন্দ গীর, এই মহাত্মাও এই সময়ের লোক ছিলেন।

ওসমান খাঁর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই "স্টুয়ার্ট তাহাকে কতুলু খাঁর পুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু 'মখজানে আফগান-ই' গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। কতুলু খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহিনী আফগানের অধিনায়ক হন। নজীর খাঁ, লোদি খাঁ ও জামাল খাঁ নামে কতুলু খাঁর তিন পুত্র ছিল। ঈশা খাঁর খাজে সুলেমান, ওসমান আলি, ইব্রাহিম এই কয় পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে প্রথমত তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান, তৎপরে ওসমান আফগানগণের নেতা হন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধ কালে তদীয় পুত্র হিম্মৎসিংহ সুলেমানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তীরে ইহাদের জায়গীর ছিল।" ওসমানের এই পরিচয় সম্ভবত প্রকৃত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত "সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ।"
প্রতিভা, ১২১৮ সন ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা।

সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাদের জন্মভূমি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া যথার্থই আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদ কথার অনুসরণ করিয়া তিনি চাঁদ ও কেদার রায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধই ঠিক করিয়াছেন, পূর্বে আমার এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আমি বর্তমানে উহাই সমীচীন বোধ করি।

সূচিপত্র

প্রথম পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

তৃতীয় পরিশিষ্ট

সূচনা

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী একমতাবলম্বী হইয়া দিল্লিশ্বরের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণত তাঁহারা বারভুঞা নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভুঞার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহাদের কীর্তির ও কার্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্তমান থাকিয়া অদ্যাপি সেই সেই মহানুভবগণের প্রাচীন লুপ্তস্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ সদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভুঞার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ ; কিন্তু প্রবাদ বাক্যানুসারে তন্মধ্যে জয় কয়েক নির্বিবাদে দখলিসত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পরিচয় এইরূপ জানা যায় ; যথা—১ম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য় চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য় বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ৫ম সাতৈলের রামকৃষ্ণ, ৬ষ্ঠ ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৭ম ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৮ম চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, ৯ম সোনারগাঁর ঈশা খাঁ মসনদাইয়ালি ইহারাই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ দিনাজপুরের, পুঁটিয়ার, তাহেরপুরের রাজবংশীয়দিগকেও ভুঞা সংজ্ঞার মধ্যে ধরিয়া দ্বাদশজন পূর্ণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু শেষ তিনটি সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সিংহরাজবংশ এবং "বঙ্গীয় সমাজ" প্রণেতার মতে ভাওয়ালের ব্রাহ্মণরাজবংশের পূর্বপুরুষও এই বারভূঞার অন্তর্গত ; কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভাওয়াল গাজীবংশের করায়ত্ত ছিল। বর্তমান জয়দেবপুর, পুবাইল, গাছা, বলধার জমিদারের পূর্বপুরুষেরা গাজীদের চাকুরি করিয়া পরে ঐ জমিদারি আত্মসাৎ করেন। ঐ লেখক[১] মহোদয় এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনীলেখক[২] এই উভয়েই বিষ্ণুপুরের বীরহাম্বীরকেও বারভুঞার অন্যতম বলিয়া প্রকাশ করেন ; কিন্তু আমরা জানিতে পাই তিনি মোগলের পক্ষে থাকিয়া, উড়িষ্যার পাঠানদের হস্ত হইতে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে উদ্ধার করেন। অতএব তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না।[৩] রাজা গণেশকেও কেহ কেহ বারভুঞার অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহা একেবারেই অযৌক্তিক কথা, কারণ পাঠান শাসন সময়ে ১৪০৫ খ্রিঃ অব্দে রাজা গণেশ পশ্চিম বাঙ্গালায় একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে মোগল শাসনের সময়ের বারভুঞার তালিকার অন্তর্গত করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

মিঃ বিভারিজ তৎকৃত ইতিহাসের[৪] একস্থানে লিখিয়াছেন, পাদ্রী মিঃ সুইট্‌ ১৫৯৫ খ্রিঃ অব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময় তিনি স্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর মধ্যে নয়জনকে মুসলমান বলিয়া জানিতে পান। তিনি আরও বলেন, তাঁহারা খ্রিস্টয়ানদিগকে আদর করিতেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় খ্রিস্টিয়ানেরা গির্জা নির্মাণ করিয়া নির্বিঘ্নে উপাসনা করিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার কথা সমর্থন করি। কারণ এই সময়ে বহু বিদ্রোহী পাঠানের নামই অবগত হওয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু বাদসাহের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ সমুদয় বঙ্গদেশীয় জনগণ যে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল তাহা নয় ; অধিকাংশ স্থান তখনও বাদসাহের

শাসনান্তর্গত ছিল। আমরা বাদসাহের পক্ষীয় ও বিদ্রোহীদলের দুইটি তালিকা পশ্চাৎ প্রকাশ করিলাম, তদ্দৃষ্টেই পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

বারভুঞা যে কেবল বারজন ভুম্যধিকারীর সমষ্টি ছিল তাহা নয় ; বহুলোকে একত্র হইয়া কার্য করিলে যেমন তাহাকে পঞ্চায়েতের কার্য বা বারইয়ারীর কার্য বলে, উহাও তদ্রূপ ছিল। বিশেষ এইরূপ আধিপত্যশালীর উপর যিনি প্রাধান্য লাভ করিতেন তিনিই নৃপতি বা সম্রাট নামের যোগ্য হইতেন। কবিকঙ্কন চণ্ডী পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ বারভুঞার নাম অবগত হই[৫]। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও বারভুঞার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৬] সামন্ত, মণ্ডল, ভুঞা প্রভৃতি একার্থবোধক। এই ভুম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে, বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ নির্ণয় করা কর্তব্যবোধে আমরা এ স্থানে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ মুসলমান নবাব বা সুবেদারের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্যন্ত সাধারণ প্রজা কিংবা দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই জন্য প্রত্যেক ভুম্যধিকারীর অধীনেই পদাতি, অশ্বারোহী নৌ-সৈন্যের গমনোপযোগী যান সকল সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতি, ১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি কামান, ৪৪০০ যুদ্ধপোত, সর্বদা সম্রাটের জন্য প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট যখন আদেশ প্রদান করিতেন, তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি লইয়া তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র মহীপালগণের মত বলসম্পন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, বর্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ রেসিডেন্ট-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া সময় সময় যেমন ত্রাহি চিৎকারে সুধাধবলিত হর্ম্যবলীকেও বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, তখনকার জমিদারগণ এতদপেক্ষা সুখস্বচ্ছন্দে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। একমাত্র নির্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই তাঁহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারে কার্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। জানি না, কোন যাদুকরের কুহকে আমাদের সেই মাহেন্দ্রযোগ অন্তর্হিত হইয়া শূন্যে পরিণত হইয়াছে।

পাঠানেরা প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন, এই সময় মধ্যে হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের অনেকটা মেশামিশি হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ এই রাজভক্ত জাতি রাজকার্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় তাতারের মোগলেরা তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন কাড়িয়া লন। পাঠানশক্তিসম্পন্নগণ তৎকালে মোগলের বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, এই দেশীয় লোকদিগকে তাঁহাদের পক্ষে না রাখিলে কোন মতেই মোগল অনীকিনীর সম্মুখে তিষ্ঠান যাইতে পারিবে না, তাই হিন্দুদিগকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য হন।

রাজভক্তজাতি রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বড়ই অসম্মত হইয়া দাঁড়াইল ; যদিও অনেকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মোগলের শরণাগত হন, কিন্তু শাসন কর্তাদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরিণামে মর্মাহত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের শাসন কর্তাদের চরিত্র সম্বন্ধে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তদীয় চণ্ডীগ্রন্থে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার কতকটা সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যেব ভৃঙ্গ
গৌড়—বঙ্গ উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে, প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ।।
উজীর হইলা রায় জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়ে দড়া, পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি (খতি)
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।
ডীহীদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।।
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ারে চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী—৫ পৃষ্ঠা।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এইরূপ অত্যাচারের জন্যই তৎকালে বঙ্গবিহারবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। এই বিপ্লবে জমিদার, তালুকদার, প্রজা কাহারও অব্যাহতি ছিল না। তালুকদার গোপীনাথ নন্দী বন্দি হইতে এবং কবিকঙ্কণ জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ঘটনা তৎসময় বহু পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

মিঃ ফার্ণেনডের বিবরণীতে, আরাকান, শ্রীপুর, চণ্ডীখান (যসোহর) এই তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা শ্রীপুর ও চণ্ডীখানের রাজাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতে পারি। রালফফিসের ভ্রমণবিবরণীতে উল্লিখিত তিনটি রাজা ভিন্ন বাক্‌লার রাজার নামও প্রাপ্ত হই। অতএব আমরা তিনজন হিন্দু ভুঞা প্রাপ্ত হইলাম। অতঃপর ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁর মৃত্যুর পর মুকুন্দরাম জমিদার প্রথমে বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরে বিদ্রোহী হন। স্থানান্তরে এতৎ বিষয় বলা হইবে। এই উপলক্ষে চারিজন বিদ্রোহী হিন্দু পূর্ববঙ্গে স্থিরীকৃত হইয়াছেন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের যে পরিচয় পাই, তাহা ততদুর সন্তোষপ্রদ নয় ; তথাপি আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বঙ্গীয় পূর্বোক্ত কায়স্থ তিন রাজার সহিত তদীয় ঘটনাবলীর এত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে যে, আমরা তাঁহাকে এ প্রবন্ধে স্থানদান না করিয়া পারি না। সাতৈলের রামকৃষ্ণের স্ত্রী সর্বাণী নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক, অতএব তাঁহাকে কিরূপে আমরা আকবর বাদসাহের সমকালীন লোক নিরূপণ করিত পারি, লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধেও এইরূপ কষ্টকল্পনা হইয়া পড়ে। তবে আমরা যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যদি ভুল হয় তবে একরূপে গোলযোগের মীমাংসা হইতে পারে। বংশাবলীর প্রতিই সন্দেহ হয়। যাহা হউক আমরা উল্লিখিত হিন্দুদিগকেই বারভুঞার অন্তর্গত বলিয়া, মাত্র তাহাদের বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিব। সংশয় ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাহারও কথা উল্লেখ করিব

না। তবে বর্ধমানের উত্তর কোকরার জমিদার মধুসিংহ ভূমি (ভুঞা) বিষ্ণুপুরের হামীর বা হাম্বীর মল্ল এবং কুতল খাঁর পুত্রের সহিত সুজন নামক একজন হিন্দু বিদ্রোহীর পরিচয় পাই। তাঁহারা সম্ভবত বারভুঞা দলের অন্তর্গত হইবেন। আরাকানের ও ত্রিপুরার রাজা ইহাদের সহায়তা করিতেন। এ কথার প্রমাণ আমরা, মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহা হইতে জানিতে পাই ; যথা—"ত্রিপুর, মঘ বাঙ্গালী, কাক কুলী, কাচিলী" ইত্যাদি।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং উড়িষ্যা, বিদ্রোহী ভুঞাগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র ছিল, গঙ্গার পূর্বোত্তর তট হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্র তীর ধরিয়া উড়িষ্যা পর্যন্ত উহার ব্যাপ্তি ছিল।[৭] তৎকালে বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উহারা মোগলের গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করার আশাটা তত অসম্ভব কার্য বলিয়া মনে করিতেন না ; তবে বিধাতা চিরকাল যাহাদের প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরকাল স্বদেশদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্যন্ত যাহাদের নিয়ত কার্য, সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? ভুঞারা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় তাহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কুল কিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহীরা তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মায়ের সুসন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারিজন ব্যক্তি দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিয়া রাজপুরুষগণের ভয়ে অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া রাজার জয় জয়কার দিতে বসিল।

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে প্রথমত হোসেনকুলী খাঁ, ২য় মুজাফর খাঁ ও ৩য় রাজা তোডরমল্ল বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে প্রাদেশিক গোলযোগ বঙ্গদেশে বড় ছিল না, কেবল পাঠান সর্দারেরা উড়িষ্যায় কেন্দ্রস্থান করিয়া, বাদসাহের প্রতিকূলাচরণ করিতে থাকে। তোডরমল্লের সময় বঙ্গদেশ যে একরূপ নিরুপদ্রব ছিল তাহার কৃতকার্য বন্দোবস্ত দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালীদিগকে অসন্তুষ্ট না করিয়া তুলিলে বিশেষ অর্থঘটিত ব্যাপারে তাহারা পারত পক্ষে কখনও রাজার প্রতিকুলাচরণ করে না, তবে অনর্থক তাহাদিগকে অপমান বা অবহেলা করিতে গেলে, তাহারা মর্মে বড়ই আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

তোডরমল্লের পর আজিজ খাঁ আজম ও তৎপর সাহাবাজ খাঁ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। শেষোক্ত সুবেদার বড়ই দুরন্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী কেন—স্বীয় দলস্থ আমীরদিগকেও অবহেলা করিতেন।[৮]আজিজ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম বদ্‌মেজাজী হইলেও বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। সাহাবাজের উদ্ধত প্রকৃতিতে তদধীন সামন্তেরা পর্যন্ত উত্যক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহ সদনে চলিয়া যায়, বাদসাহ স্থিরবুদ্ধিতে অন্য আমীর ওমরা প্রেরণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই বিবেচনায়, তদুপায়ই অবলম্বন করেন। এই নূতন সহকারী প্রাপ্ত হইয়া সাহাবাজ কতককটা কৃতকার্য হন বটে, কিন্তু তাঁহার বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচালন সত্ত্বেও সম্যক্ বিদ্রোহ নিরাকৃত হয় নাই। উড়িষ্যার কুতল খাঁ ও বাঙ্গালার মাসুম্‌কাবুলী ও ঈশা খাঁ মসনদই আলি তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহারা রণে পরাজিত হইয়াও হার মানে নাই। কতবার বিরক্ত হইয়া সাহাবাজ কার্য পরিত্যাগ করিয়া দিল্লি গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দূরদর্শী বাদসাহ এইরূপ অকৃতকার্যাবস্থায় তাঁহাকে কোনমতেও বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। পরে সাহাবাজ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তৎস্থানে উজির খাঁ নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকমাস মাত্র রাজকার্য সম্পাদন করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহীগণের প্রবল প্রতাপ বাড়িয়া ওঠে, এজন্য বাদসাহ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া

প্রেরণ করেন। মানসিংহ ১৫৮৭ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৬০৬ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকার্য করেন বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল বঙ্গদেশেই অতিবাহিত করেন না, মধ্যে একবার স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। পরে যখন ১৬০১ খ্রিঃ অব্দে উড়িষ্যার ওসমান, বাঙ্গালার মাসুম, ইশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া বিদ্রোহের প্রসার বর্ধিত করিয়া তোলেন, তৎসময় পুনরায় বাদসাহের আদেশে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন।

১৬০৫ খ্রিঃ অব্দে বাদসাহ কুলতিলক জালালউদ্দিন আকবর প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই বৎসর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন বাঙ্গালায় ঘোর বিদ্রোহ দাবানল জ্বলিয়া উঠে। একে তৎসময় পর্যন্ত মোগল শাসন পক্ষে কেহই অনুকূল ছিল না, তৎপর রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াই জাহাঙ্গীর এমন একটি কার্য সম্পাদন করেন, যাহাতে সমুদয় বঙ্গবাসীর চক্ষে তৎসময় তিনি নরপিশাচ বলিয়া প্রদর্শিত হন। তখন তাহার উপর আর কাহারও আস্থা রহিল না।

মহাত্মা আকবরের রাজত্ব সময়ে যদিও বঙ্গদেশ বিদ্রোহীপূর্ণ ছিল, তথাপি অধিকাংশ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া চলিত। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদসাহের সহিত তাহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না। কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য ভূম্যধিকারীরা বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তাহার বিবরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে, তৎকাল পর্যন্ত যদিও মোগল বাদসাহ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানেরা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোক করিত ; এমন কি সময় সময় তাহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ যদি তাঁহারা বুঝিত, মোগলেরা তাহাদের স্বশ্রেণী কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তখন তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। আপনাদের পূর্ববল ও অধিকার মনে ভাবিয়া তাহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভাল মন্দ বিবেচনা তাহাদেব অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও পূর্বাধিকারের পুনরভ্যুদয় তাহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। সের আফগানের পরিণীতা বনিতা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী মেহের-উন্নেসাকে অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করায় বাদসাহের প্রতি আর কাহারও বিশ্বাস বা ভক্তি ছিল না। অথচ এইরূপ রাজার অবিচার সত্ত্বেও একজন মুসলমান ঐতিহাসিক এতৎসম্বন্ধে বাঙ্গালার জমিদারগণকেই দোষী স্থির করিয়া স্বীয় লেখনি পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এইস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জাফর খুলনাৎ উৎ তওয়ারিখ" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে, লখ্নৌ নিবাসী সোর আলিজাফর "আরশ-ই-মহামিন্দ" নামক যে উর্দুগ্রন্থ ১৮০৫ খ্রিঃ অব্দে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে, "বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পূর্বের ন্যায় বাদসাহ সরকারে রাজস্ব দেয় না, উহারা তাহার প্রতিফলও পাইয়াছে।" বলা বাহুল্য উহা ভুঞাদলের পতনের পর— মুসলমান লেখক কর্তৃক বিরচিত হয়। জেতা জিতের উপর যতদূর ঝাল ঝালিতে পারেন, গ্রন্থকর্তাও সেই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। ঐরূপ প্রথা পূর্বেও যেরূপ ছিল, এখনও তদ্রূপ আছে, চিরকাল একইভাবে পরিচালিত হইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদঘাটন করিলে এ প্রহেলিকা ভেদের আর অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। মুসলমান ইতিহাসলেখক হিন্দু ও পাঠান জমিদারগণ সম্বন্ধে, যতই অভদ্র শব্দ প্রয়োগ করুন বা ততোধিক বিশেষণে বিশেষিত করুন না কেন, কিন্তু তৎকালে প্রদেশীয় শাসনকর্তারাই যে, সকল গোলযোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনর্থক জেদ বজায় রাখিতে যাইয়াও অনেক শাসনকর্তা নিরীহ প্রজাগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মোগলগণের প্রথম আগমনে, হিন্দু এবং মুসলমান পাঠান উভয়েই উহার ফল সমানভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য এস্থানে মোগল পক্ষীয় এবং পাঠান ও হিন্দু বিদ্রোহিগণের তালিকা প্রদান করা গেল। ইহা অবগত থাকিলে এই ইতিহাস পাঠে বিশেষ সুবিধা ঘটিবে।

মোগলপক্ষীয় শাসনকর্তা

১) মামুদ সা—বাঙ্গালার শাসনকর্তা, বাদসাহ্ হুমায়ুনের অধীনে ৫৩৬ খ্রিঃ অব্দে।

২) তাজ খাঁ	বাঙ্গালার	শাসনকর্তা	১৫৬৪ খ্রিঃ
৩) মুনেম খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৫ খ্রিঃ
৪) হুসেনকুলী খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৬-১৫৭৮ খ্রিঃ
৫) মুজাফর খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৭৯-৮০ খ্রিঃ
৬) টোডরমল্ল	ঐ	ঐ	১৫৮০-৮২ খ্রিঃ
৭) আজীজ বা খানী আজীম	ঐ	ঐ	১৫৮২-৮৪ খ্রিঃ
৮) সাহাবাজ খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৮৪-৮৭ খ্রিঃ
৯) উজীর খাঁ	ঐ	ঐ	১৫৮৭ খ্রিঃ
১০) মানসিংহ	ঐ	ঐ	১৫৮৭-১৬০৬ খ্রিঃ

প্রথম ব্যতীত আর সকলেই আকবরের রাজত্ব সময়ে নিযুক্ত হন।

মোগলপক্ষীয় সেনাপতি

১) মাণ্ড খাঁ
২) ফায়রৎ খাঁ
৩) সুজাদালী
৪) আরব বাহাদুর
৫) খুদাদ
৬) সুজা সমসুদ্দিন
৭) সাধী খান
৮) সেখ ফরিদ বোখারী
৯) সেখ ইব্রাহীম
১০) টারসিন বা তারসুন খাঁ
১১) ওয়াদের খাঁ
১২) শাকুলী খান
১৩) মহীদালী খান
১৪) সাদেয় হোসেন (ঢাকার থানাদার)
১৫) মীর আদনের পুত্র
১৬) মহম্মদ গজনবী
১৭) সায়েদ খাঁ
১৮) উজীর খাঁর পুত্র
১৯) বাবুই মঙ্গলী
২০) বিহার খাঁ
২১) বাহাদুর
২২) জগৎ সিংহ
২৩) তোলাক খাঁ
২৪) প্রতাপ সিংহ
২৫) বাজবাহাদুর
২৬) সুলতান কুলী খাঁ
২৭) ইব্রাহিম আকরৎ
২৮) বিলমক
২৯) খান্ জাহান

মোগলসহকারী হিন্দু

১) হামীর বা হাম্বীর্ মল্ল (বিঞ্চুপুর)
২) দলপৎ রায়
৩) রঘু দাস
৪) নারায়ণ ভূমি বা কন্দর্প নারায়ণ রায় ভুঞা (বাকলা)
৫) সংগ্রাম (ভূষণা)

মোগলদ্রোহী সুররাজবংশ ও পাঠান সর্দারগণের নাম

১) সের সাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া—বাঙ্গালা ও দিল্লি অধিকার করেন,
২) সালিম সাহ—সেরের পুত্র
৩) সুলেমান কেরানি
৪) কালাপাহাড়
৫) বয়াজিদ
৬) দায়ুদ
৭) বাবুইমঙ্গলী

৮) আদম খাঁ সুলতানী
৯) দড়িয়ার খাঁ
১০) মীর সাহাবুদ্দিন
১১) কুতল খাঁ
১২) মাসুমকাবুলী
১৩) জাবোরিক
১৪) কাজীজেদা
১৫) ঈশা খাঁ
১৬) বাগবাহারী
১৭) খামার খাঁ
১৮) মীরজানজাদ
১৯) ওসমান
২০) গজনবী (ভাওয়াল)
২১) আহাম্মদ (কেদার রায়ের সাহায্যকারী বিদ্রোহী)
২২) জালাল খাঁ লোহিনী

কাকষাল দেশীয় বীরগণের নাম

১) বাবাহাককাকষাল
২) মৃজাবেগ কাকষাল
৩) খালবদ্দী বা খালীদ (বাদসাহের পক্ষে)
৪) মৃজামহম্মদ (কাকষালদের একজন নেতা)
৫) ওয়াজির জলিমকাকষাল
৬) মুরাদ ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা পরে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন।
৭) দস্তান কাকষাল

বিদ্রোহী নেতাগণের পরিচয়
বারভুঞার প্রধান

১) উড়িষ্যার, বায়াজিদ, দায়ুদ, কুতল খাঁ, নসীব খাঁ, ওসমান প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে। ২) মাসুম কাবুলী। ৩) কাজীজেদা। ৪) ঈশা খাঁ। ৫) মৃজামহম্মদ। ৬) গজনবী। ৭) আহম্মদ। ৮) জালাল খাঁ লোহিনী। ৯) বাবুইমঙ্গলী। এই নয়জন মুসলমান পাঠান। ১০) কেদার রায়। ১১) প্রতাপাদিত্য। ১২) মুধুসিংহ ভৌমী। এই তিনজন হিন্দু বারভুঞা।

১. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।
২. শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।
৩. আকবরনামা ভঃ ৫ পৃষ্ঠা ৪৬৫। ইলিয়ট ৮৬/৮৭ পৃষ্ঠা।
৪. বাকরগঞ্জের ইতিহাস।
৫. অভিষেক করাইল বসাইল খাঁটে। আজি হইতে কালকেতু রাজা গুজরাটে।।
নিজ হস্তে নরপতি টীপ দিলা ভালে। যত ভুঞা মিলিয়া খাটায় তার তলে।।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী—১০০ পৃষ্ঠা।
গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজা। আর যত ভুঞা রাজা সবে করে পূজা।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত কবিকঙ্কন চণ্ডী। —১০৩ পৃষ্ঠা।
সামন্তের অধিপতি সামন্তের মামা। সভাঁতে বসিয়া শুনে কোটালের দামা। ঐ ৯৪ পৃষ্ঠা।
৬. মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকং ইতি মেদিনী। সম্রাট যেন রাজসূয়েন ইষ্টং। যে মণ্ডলস্যেশ্বর আজ্ঞায়া রাজ্ঞঃ শাস্তি যঃ, ইত্যমরঃ। রাজসূয়ঃশ্চক্রবর্তি সাধ্যো যাগ বিশেষঃ। তেন যেন ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ। যো মণ্ডলস্য দ্বাদশ রাজমণ্ডলস্য ঈশ্বর ইতি ভরতঃ। শব্দকল্পদ্রুমের মঙ্গল ও সম্রাট শব্দ দেখ।
৭. মিঃ কল ও মিঃ উইলফোর্ড এ সম্বন্ধে যে বিবরণী লিখিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুই নদীর মধ্যগত গঙ্গার 'ব' দ্বীপাকৃতি বিস্তৃত ভূভাগ যাহা বর্তমান আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণ রাজ্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এই কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। বিক্রমপুর, ভাওয়াল, সোনারগাঁ পদ্মার পূর্বে ও মেঘনার পশ্চিম, এতদ্ভিন্ন ভুলুয়া মেঘনারও পূর্বতটে সংস্থাপিত। তবে 'ব' দ্বীপাকৃতি স্থানে মাত্র যশোহর, চন্দ্রদ্বীপ, ভূষণা এই তিনটি পরগণা বিদ্যমান। এশিয়াটিক রিচার্স ভঃ ১৪ পৃষ্ঠা ৪৫১।

প্রথম অধ্যায়
পাঠান রাজত্বকাল

বঙ্গদেশ মুসলমানকরতলগত হইবার পর, পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ে এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের রাজশ্রী পরিবর্তিত হইয়া সোনারগাঁয়ে সংস্থাপিত হয়। প্রবাদ, শেষ হিন্দু রাজা দ্বিতীয় বল্লাল বা পোড়া রাজা বাও আদব নামে একজন মুসলমান সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করেন। পোড়া রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহার রক্ষিত বার্তাবহ কপোত তৎপূর্বেই উড্ডীয়মান হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হয় ; তদ্দৃষ্টে রাজ-পরিজনেরা রাজার পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। পরে রাজা সেই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শোকাকুল চিত্তে স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে যেমন ইউরোপ-খণ্ডের যুদ্ধবার্তাবহনের জন্য কপোত ব্যবহারের প্রথা দেখাঁ যায়, আমাদের দেশে উহা বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এইরূপে শেষ হিন্দু স্বাধীনতা বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে পর সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে পরিণত হয়।

খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশের "ইবনবতুতা" নামক পর্যটক দুর্ভেদ্য দুরাক্রম্য। সোনারগাঁ নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় যাবাদ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্যজাহাজ সকল দর্শন করিতে পান। ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে "সার জন হারবার্ট" সোনারগাঁ, বাক্‌লা, শ্রীপুর ও চাটীগাঁ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরীসকলের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক "রালফফিস্" চাটীগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে "পিটার হেলেন" সোনারগাঁকে একটি দ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করেন। বাস্তবিক ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারীরা যে বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতিকে দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপ্রকৃত নয়। কারণ, এই স্থানগুলির চতুর্দিকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ঐগুলিকে দ্বীপ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

সুপ্রসিদ্ধস্থান গৌড়ের শাসনকর্তা ফিরোজসাহের আদেশে তৎপুত্র বাহাদুরসাহ কর্তৃক ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ আক্রান্ত হয়। পুর্বোক্ত শেষ হিন্দু রাজা এই মুসলমান রাজের অধীনে করদ রাজারূপে সোনারগাঁ ও বিক্রমপুরের শাসন পরিচালন করিতে স্বীকৃত হন। বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিহাবুদ্দিনকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এজন্য সিহাবুদ্দিন দিল্লিতে গিয়াসুদ্দিনের শরণাপন্ন হন। গিয়াস বাহাদুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করায়, ঢাকার নিকটবর্তী আবদুল্লাপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। বাহাদুর ও শেষ হিন্দু করদ রাজা একমতাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া রাজা নিহত এবং বাহাদুর বন্দিকৃত হন। এই সময়েই পূর্ববঙ্গে প্রথম দিল্লিশ্বরের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। ১৩২০ হইতে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দের কোন সময় মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটন হয়।

আজিও পূর্ববঙ্গে গাজীর গীত শ্রুত হওয়া যায় ; তাহাতে পোড়া রাজার পরে গয়েস, তৎপর সিকন্দর, তৎপর বরণগাজি, তৎপর কালুর নাম গ্রথিত আছে। ইহারা প্রায় সকলেই সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালু একজন হিন্দু সন্তান পরে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া স্বদেশের যাবতীয় গোপনীয় সংবাদ মুসলমানদিগকে বলিয়া দেয় ; তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া দেশ

আক্রমণকরতঃ অনায়াসে উহা অধিকার করিতে সমর্থ হ.। মুসলমানেরা ফকির ও ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া এই দেশের যাবতীয় গুপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিত, পরে সুযোগ বুঝিয়া অস্ত্র ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। শ্রীহট্টে ৩৬০ জন ফকিরের সাহায্যে ফকির সাহাজালাল মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এই ফকিরেরাই গাজি নামে বিখ্যাত ছিল।

গাজি পঞ্চকের নাম।—গয়েসদি (বাদসাহ গয়েসউদ্দীন), সমস্‌দি (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তা সামস্‌দ্দীন), সেকন্দর (যাহার দ্বারা দেশে জরিপের প্রথা সৃষ্টি হয়), গাজী (ধর্মযোদ্ধা গাজিসাহ), কালু (হিন্দু কুলাঙ্গার ফকির ও গাজী সাহেব মন্ত্রী)। পিতা সেকন্দরের বর্তমানেই গাজীসাহ মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে ক্রমে পূর্বভাটীরদিক্ অগ্রসর হন। একদিকে ধর্ম অন্যদিকে রাজ্য বিস্তার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি ভাঁটি প্রদেশে এই সময়ে বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য ঐ সকল স্থানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে অত্যধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাঁচ গাজীর পাঁচটী মসজিদ, নেমাজের জন্য সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজগণের রাজ্য বিলোপ হইলে, সমসুদ্দীন ফিরোজসাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রথমতঃ সুবর্ণগ্রামের টাঁকশালে প্রস্তুত হয়।

বাহাদুর পুনর্বার সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। পরে স্বনামে, মুদ্রা প্রচার ও শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করেন। এজন্য দিল্লিপতি তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী "ইবেনবতুতা" বলেন, অকৃতজ্ঞ নরাধম শাসনকর্তাদিগকে সাবধান করিবার জন্য, তাহার চর্ম তৃণপূর্ণ করিয়া, সুবর্ণগ্রামে প্রদর্শন ও গৌড় এবং সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাহাদুর সুবর্ণগ্রাম শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়, সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম এই তিন স্থান তিনজন শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইত।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তদীয় বর্মবাহক তাতার "বহরম খাঁ" উপাধি গ্রহণ করিয়া সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৩৩৮ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপর ফকিরদ্দীন "সুলতান সেকন্দর" উপাধি ধারণ করিয়া ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুবর্ণগ্রাম শাসন করেন। তৎপর ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুজাফরগাজীসাহ সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহ করেন। তদন্তর ইলিয়সখাজেসুলতান সমসদ্দীন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। দিল্লিপতি এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে আগমন করিলে, সমসদ্দীন সোনারগাঁর অন্তর্গত সুদৃঢ় একডালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিল্লিশ্বর সহজে উহা হস্তগত করিতে পারেন না। পরে সন্ধি করিয়া নামে অধীনতা স্বীকার করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

সমসদ্দীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকন্দর সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, দিল্লিপতি পুনর্বার তাহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু বাদসাহ এইবারও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহাকে ৪৮টা হস্তি ও অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইল। সেকেন্দর একডালায় অবস্থান করিতেন। ইহার সময়ে বঙ্গদেশ জরিপ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদবাক্য শ্রুত হওয়া যায় ; যথা—

"আবে লকড়ি, তোম্‌কি পাক্‌ড়ি
তোম্‌কে কেলেয়া, হাম্‌কে সেকন্দর বাদ্‌সা লেয়া
তোম্ ক্যা কর্‌নেকো, হাম জরিপ কর্‌নেকো।"

সেকেন্দরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গয়েসউদ্দীন ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। এতদ্ভিন্ন গিয়াস সম্বন্ধে আর কোন দুর্নাম শ্রুত হওয়া যায় না। এই নবাব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী

ছিলেন। পারসিক কবি হাফেজকে এদেশে আনয়ন জন্য ইনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই শাসনকর্তা অতি সুবিচারক ছিলেন। জাতিগত বিদ্বেষ তাহার কিছুমাত্র ছিল না। একদা তীর-পরিচালনা কালে, নবাব-নিক্ষিপ্ত একটি তীর কোন দরিদ্র বিধবার একটিমাত্র পুত্রের চক্ষে প্রবিষ্ট হয়। ঐ বিধবা এই জন্য নবাবের বিরুদ্ধে কাজির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। কাজি প্রথমত এই বিষয়ে ইতস্তত করিয়া পরে ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া নবাবের নামে শমন বাহির করেন। নির্দিষ্ট সময়ে নবাব বাহাদুর কাজির বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তে কাজি নবাবকে দোষী বলিয়া স্থির করেন। তখন নবাব বাহাদুর সাহ কাজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি তোমার বিচারে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি অন্যায় বিচার করিতে, তবে আমায় এই হস্তস্থিত অস্ত্র তোমার দেহকে নিশ্চয় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিত। তখন ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক কাজিও সদম্ভে বলিলেন, যদি এই ধর্মাধিকরণে নবাব সাহেব আমার এই বিচারের প্রতিকূলতায় কোনরূপ অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তবে আমার হস্তস্থিত এই ন্যায়যষ্টিও নবাব সাহেবের পৃষ্ঠদেশে নিপতিত হইত। বলা বাহুল্য, পরে ঐ বিধবাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া নবাব সাহেব পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, মুসলমান শাসনকালে একেবারে ন্যায় বিচার ছিল না, তাঁহারা একবার এই বিষয়টির উপর মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, তবেই তাহাদের সেই কুবিশ্বাস অনেকটা সংশোধিত হইতে পারিবে।

গিয়াসের পরে তৎপুত্র সইস্‌উদ্দীন আমেদ সা দশ বৎসর এবং পৌত্র সমসুদ্দীন দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে রাজা গণেশ স্বাধীনতাবলম্বন করায় তদ্বংশীয়েরা ৪০ বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তৎপর ইলিয়সসাহী, তদনন্তর হাবসিরা এদেশে কতকাল রাজত্ব করিলে পর, ১৪৯৪ খ্রিঃ অব্দে সৈয়দআলালুদ্দীন হোসেন সাহ সুবর্ণগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫২১ খ্রিঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। পরে লোদীবংশের হস্ত হইতে মোগল বাবর সাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিয়া লন (১৫২৭ খ্রিঃ অব্দে) ১৫৩০ খ্রিঃ অব্দে তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পরে সুরবংশীয় সেরসাহ তাহাকে তাড়াইয়া দিল্লি ও বঙ্গবিহার অধিকার করেন। ১৫৫৫ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত তদ্বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। তৎপর ১৫৫৬ খ্রিঃ অব্দে হুমায়ুন পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আকবর সাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোগল রাজত্বে মুনেম খাঁ, হুসেন কুলী ও মুজাফর খাঁ

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর সাহদিল্লির রাজতক্তে আরোহণ করেন। তৎকাল পর্যন্ত বঙ্গ বিহার বা উড়িষ্যা মোগলকরগত হয় নাই। পাঠানজাতি ঐ সকল প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সের সাহের পর, তৎপুত্র সলিম সাহ্ যখন দিল্লিতে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎসময় মহম্মদ খাপুর বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে বহু বিপ্লবের পর, পাঠান কেরাণীবংশোদ্ভব সুলেমান বাঙ্গালার কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজখাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান গৌড় অধিকার করিয়া তাণ্ডানগরীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করেন (১৫৬৭ খ্রিঃ অব্দ)। কালাপাহাড়ের পূর্ব নাম ছিল "রাজু"। হিন্দু-ব্রাহ্মণকুলে তাহার জন্ম হয়, পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া, কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন। তৎকর্তৃক বহু হিন্দুবিগ্রহ বিনষ্ট এবং তদীয় বাহুবলে কামরূপ প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হয়।

১৫৭২ খ্রিঃ অব্দে সুলেমান কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাহার পুত্র বয়াজিদ বাঙ্গালার স্বাধীন নবাব বলিয়া পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরেই স্বীয় ভ্রাতা দায়ুদ কর্তৃক হত হন। দায়ুদ বাঙ্গালা বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া আপনার প্রাধান্য সর্বত্র প্রচার করেন।

এই সময়ে বঙ্গ বিহারের প্রতি বাদসাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদিও ঐ স্থানীয় শাসনকর্তারা রাজকার্যে বাদসাহের প্রাধান্যই স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্যত তাহাকে মান্য করিতেন না। কর প্রদান করিতে পর্যন্ত সম্মত হইতেন না। খ্রিঃ ১৫৭২ অব্দে ঐ প্রদেশ জয় জন্য বিপুল আয়োজন হয়। আকবর যখন দ্বিতীয়বার গুজরাটে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসময় পাঠানরাজ সুলেমানের মৃত্যু হয়। তৎপর তাহার দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারূঢ় হন। ২য় পুত্র দায়ুদের রাজ্য প্রাপ্তির পর, লোদী বংশীয় একজন আমীর বিদ্রোহী হন। পরে সাহাবাদ প্রদেশে রোটাসগড়ে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। দায়ুদ তাহার সহিত সন্ধি করিয়া পরে চক্রান্ত করিয়া তাহার প্রাণবধ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জৌনপুরের মোগল গভর্নর কর্মনাশা পার হইয়া পাটনায় উপস্থিত হন। দায়ুদ তৎকালে পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, কিন্তু বাদসাহ সংবাদ পাঠান যে,তাহার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যেন, যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয়। বাদসাহ আজমীর হইতে একদল সৈন্য লইয়া জলযানে এলাহাবাদে অগ্রসর হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া তিঁন দিবস তথায় বাস করিয়া পুনরায় গোমতী সঙ্গমে উপস্থিত হন। তথায় কোন সংবাদ না পাইয়া জৌনপুরে উপনীত হন। পরে তথায় স্বীয় পরিবার রক্ষা করিয়া চৌসায় আসিয়া পৌছেন। এই চৌসাতে সেরসাহ হুমায়ুন বাদসাহকে প্রথম পরাস্ত করেন। এই সময় সংবাদ আইসে বিপক্ষেরা পাটনায় আসিয়া মোগল পক্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। আকবর সাহ তৎসাহায্যের জন্য তরী আরোহণে পাটনায় যাত্রা করিয়া সাত দিনে তথায় উপনীত হন।

তৎসময়ে যে পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হয় অগ্রে দুর্গ আক্রমণ না করিয়া পাটনার নিকটবর্তী হাজীপুর আক্রমণ করা কর্তব্য। তাহাই হইল। দায়ুদ ভয়ে সেই

রাত্রিতেই পলায়ন করিল। বাদসাহ প্রচুর প্রমোদ-আহ্লাদে পাটনায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শত্রুর অনুসরণে নিরস্ত থাকা কর্তব্য নয় বিবেচনায়, একজন সেনাপতির উপর নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে দায়ুদের পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বাদসাহ পুন্‌পুন্ নদী পার হইলেন। দায়ুদের অনেক অনুচর ও দুইশত পঁয়ষট্টিটা হস্তী বাদসাহের বন্দি হইল। দড়িয়াপুরে পৌছিয়া, মুনেম খাঁ ও রাজা তোডরমল্লকে দায়ুদের অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না।

পাটনা বিজয়ের সহিত সমুদয় বিহার প্রদেশ বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিল। বাদসাহ তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথাকার সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিলেন, রাজকর অধিক ধার্য হওয়ায় ও জমি ততদূর উর্বরা না হওয়া প্রযুক্ত প্রজারা কর আদায় করিতে পারিতেছে না। এজন্য উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ রাজকর স্বরূপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন। একজন কর্মচারী জমি আবাদের সুবিধার জন্য নিযুক্ত হইল। দায়ুদ অনন্যোপায় হইয়া মোগল বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করে। দুই বৎসর সুখশান্তিতে অতিবাহিত হইলে দায়ুদ পুনরায় বিদ্রোহী হন।

এই বৎসরের একটি প্রধান ঘটনা ফতেপুরসিক্রিতে এক "ইবাইতখানা" নির্মাণ। ইহার বাঙ্গলা অর্থ—পণ্ডিতের অভ্যর্থনা গৃহ। ইমারত নির্মিত হইলে প্রতি শুক্রবার রজনীতে এবং প্রত্যেক পর্বাহের রজনীতে বাদসাহ স্বয়ং তথায় গমন করিয়া সমস্ত রজনী পণ্ডিতগণের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন। পণ্ডিতেরা যোগ্যতানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।

আকবর বাদসাহের শাসনের সপ্তদশ বৎসরে বঙ্গবিজয় জন্য বিপুল আয়োজন হয়। বাদসাহের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি মুনেম খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল স্বসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৫৭৫ খ্রিঃ অব্দে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী "তুকারাম" নামক স্থানে মোগল সৈন্যের সহিত দায়ুদের ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটন হয়, পরে কিন্তু দায়ুদ পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন। মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজিত হইলে সেনাপতি মুনেম খাঁ তাণ্ডাতে উপস্থিত হইয়া গৌড় নগরে রাজধানী পরিবর্তিত করেন। এই বৎসর গৌড় রাজ্যে মহামারী উপস্থিত হইয়া বহু মনুষ্যকে কালসদনে প্রেরণ করে ; সেনাপতি মুনেম খাঁও গতায়ুঃ হন। ইতিপূর্বে বঙ্গবিজয়লব্ধ ৫৪টা হস্তী সহ তোডরমল্ল সম্রাট সদনে চলিয়া যান। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দায়ুদ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করে, কিন্তু বাদসাহ প্রেরিত সুবিখ্যাত সেনানায়ক হুসেন কুলী খাঁর ও খাঁজাহান তোকমান দ্বারা পুনরাক্রান্ত হইয়া পরাস্ত ও হত হন। হুসেন দায়ুদের ছিন্নমস্তক বাদসাহ সদনে প্রেরণ করেন। ৯৮৭ হিঃ অব্দে (১৫৮১ খ্রিঃ অব্দ) খাঁজাহানের মৃত্যু হয়।

বাদসাহের শাসনের বিংশতি বৎসরের (১৫৭৬ খ্রিঃ অব্দে) যে কালে খান্ খানান্ (মুনেম খাঁঃ) দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসময় তাহার সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী প্রভৃতি পাঠান সর্দারগণ কাক্‌ষাল জাতিকে আক্রমণ করে। পাঠানেরা উহাদিগকে তাণ্ডা পর্যন্ত তাড়াইয়া ঘোড়াঘাট প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। পরে মোগল সেনাপতি মাঞ্জু খাঁ পুনরায় ঘোড়াঘাট বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া লন। হুসেন কুলী খাঁ অল্পদিনমাত্র বাঙ্গালার শাসনকার্য নির্বাহ করেন, তৎপর মুজাফর খাঁ বঙ্গদেশের নবাবী পদে নিযুক্ত হন।

মুজাফরের শাসনকালে রোটাস দুর্গ পাঠানদের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই, এজন্য বাদসাহ প্রেরিত সেনাপতি ফারহাৎ খাঁ উহা অধিকার করিতে অগ্রসর হন। তাহার সাহায্য জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্তার উপর অনুমতি প্রদান করা হয়। এই সময় সংবাদ আসিল রোটাসস্থ সমগ্র পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছে। তৎসময় বাদসাহ বলিয়া পাঠাইলেন যদি তোমরা

রোটাসের গোলযোগ সম্পূর্ণ রূপে শীঘ্র নিবারণ করিতে সমর্থ হও, তবে তাহার চেষ্টা দেখিতেই প্রয়াস পাও; অন্যথায় বাঙ্গালার বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হও।

হিজরি ৯৭৬ সনে (১৫৭০ খ্রিঃ অব্দে) আকবর বাদসাহের বঙ্গাধিকারের প্রাক্কালে, মোরাদ খাঁ কাক্‌ষাল সুবেদার দায়ুদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারী (তুকারাম বা তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খ্রিঃ অব্দে)। তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলির খামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীর জানজাদ খাঁ সহজেই মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হুসেন কুলী খাঁর মৃত্যু হইলে পর পাঠান কুতল খাঁ একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। বিশেষত যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল বাদসাহের শরণাগত হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বিস্তারিত ভূষণার মুকুন্দরায় প্রবন্ধে উল্লেখ করা যাইবে।

মুজাফর অতি বিচক্ষণ বীরপুরুষ ছিলেন, তাহার বিবেচনায় অগ্রে বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল ও তদনুসারে তিনি বিহার হইয়া বঙ্গাভিমুখে যাইবার মনন করিলেন।

মুসলমান সেনানায়কগণের পরস্পর অমিলে সময় সময় বহু বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, এস্থলেও তাহাই ঘটিল। অপর মোগল সেনাপতি সুজাদালী খাঁর সহিত তাহার মতান্তর উপস্থিত হইল। একমাত্র সেনাপতি আরব বাহাদুরের সৈন্যের সহায়তা পাইয়া বিদ্রোহী আদাম খাঁ মুলতানীকে ইব্রাহিমপুরে এবং দরিয়াখানকে ঝারখণ্ডে তাড়াইয়া দিলেন।

মুজাফরের কার্যদক্ষতায় ও সুনামের জন্য ক্রমে সমুদয় মোগল সেনাপতিরাই তাহাকে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এমন কী পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে নানা পথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ মুজাফর কিছুতেই ভীত না হইয়া দুইজন অধীনস্থ যোদ্ধার সহিত ঝুন্দ ও সাসিরামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ যোদ্ধাদ্বয়ের একের নাম খুদাদ অপরের নাম সুজাসমসদ্দীন। তাহারা পথি মধ্যে সংবাদ পাইলেন রোটাসের বিপক্ষগণ ঐ দুই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বীরগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সাসিরামে উপস্থিত হইলেন। পরে বহু বীরত্ব প্রদর্শনে বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া ঐ স্থানদ্বয়ের উদ্ধার সাধন করিলেন। এই উভয় স্থান বাদসাহের নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পরে পুনরায় বিহারে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বিদ্রোহীগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই সকল কারণে সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ মুজাফরকে দিল্লির দরবারের এক উচ্চকার্যে নিযুক্ত ও তথায় যাইতে আদেশ প্রদান করিয়া, তৎপদে রাজা তোডরমল্লকে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশের শাসনজন্য প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা তোডরমল্ল

আকবরনামা প্রণেতা বলেন, তুকারোর যুদ্ধের জয়বার্তা লইয়া ও ৫৪টা হস্তী উপহারসহ তোডরমল্ল যেদিন বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই দিন সম্রাট তাহার উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দেওয়ানি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজস্ব বিভাগের ভার অর্পণ করেন।

লেখক আরও বলেন, তোডরমল্ল নিষ্ঠাবান ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কখনও লোভে পড়িয়া কোন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হন নাই। তবে তাহার প্রকৃতি হিংসা ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত ছিল না ; যদি তাহা থাকিত তবে তাহার চরিত্রে যে একটুকু কঠোরতা ছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিত না।

বাদসাহ তাহার গুণবত্তা ও নির্লোভিতার পরিচয় পাইয়া, মুজাফর দিল্লি চলিয়া গেলে পর বাঙ্গালার নবাবীপদে তাহাকেই নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৫৮০ খ্রিঃ অব্দ)।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাহাকে বড় কোন যুদ্ধাদি কার্যে লিপ্ত থাকিতে হয় নাই। এই সুযোগে তিনি বঙ্গদেশের আয় বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ উনিশটি সরকারে বিভক্ত হয়। উহাতে মহালের সংখ্যা ছিল ৬৮২টি। সমগ্র সরকারের আয় হয় ১০৬৮৫৯৫৯৪৪ দাম ; এতদ্ভিন্ন বিহারের ৭টি সরকারের অন্তর্গত ২০০ পরগণার আয় ৫৫৪৭৯৮৪ দাম এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত ৫টি সরকারের অধীন ৯৯ পরগণার আয় দাঁড়ায় ৪২৬৮৩৩ দাম। বিভাগগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সরকার জেন্নেতাবাদ—

৬৩ পরগণায় বিভক্ত ; যথা—১ জেন্নেতাবাদ বা গৌড় ২ জোয়ারামা (২৪ পরগণা) ৩ আজোর ৪ বাজঘোগেরা ৫ বেলীর ৬ হারেন এগরা ৭ দেহনপুর ৮ দেবসড়ক ৯ সীরনুর ১০ সাবালা ১১ সেলেলসেরা ১২ ঘাগটিয়ার ১৩ মদনহাটী ১৪ মুদীহাট ১৫ নাহাট ১৬ হস্তগজপুর ১৭ জোয়াদ্দারস্বর্গ ১৮ মহল ১৯ উজারী কান্দা ২০ ভেটিয়া ২১ ভেল বাড়ি ২২ বসানবাজার ২৩ দরসরক ২৪ রাঁদ্দাবামাটি ২৫ আমদানির রপ্তানির শুল্ক ২৬ সেরপুর ও কাঙ্গালপুর ২৭ সাহরাজপুর ২৮ গিয়াসপুর ২৯ কেমেলা ৩০ ঘটক চাঁপা ৩১ মুদীমহল ৩২ মিনামহল ৩৩ নূতনবাজার সকলের কর ৩৪ জওয়ার ডিহিকোট ৭ মহল যথা (১ বেবারীপিঞ্জর ২ ঠাকুর ৩ ডিহিকোট ৪ দেহেলগাঁ ৫ সাহাজায়পুর ৬ মালীগাঁ ৭ মুদীপুর) ৩৫ রামাতীর নিকটস্থ ৭ মহল ৩৬ বাধতেলী ৩৭ রমতী ৩৮ সিবল গাড়ি ৩৯ সিঙ্গেকোড়া ৪০ সুলতানপুর ৪১ সিংদুয়ার ৪২ জাহ্নিগর ৪৩ সারসাবাদের নিকটস্থ ১০ মহল ৪৪ আকবরপুর ৪৫ পারদুয়ার ৪৬ খিজিরপুর ৪৭ সারসাবাদ ৪৮ কোতদালী ৪৯ গিরামন্দ ৫০ গরহী ৫১ মেকরীণ ৫২ হেতেন্দাও মালিকপুর ৫৩ মালদহের নিকটস্থ এগার মহল (বারবাকপুর, ইউসফবাজার, হাবেলীমালদহ, ধারপুর, সুজাপুর, সরমবিলপুর সেনগুদিয়া, সালীবাড়ি, সাহিনডুবি, তেতাপুর, মৌকদুলপুর)। পূর্ববর্তী ৫২ ও পরবর্তী ১১ মহালের যোগে উহার সংখ্যা ৬৩টি। এই মহাল সমূহের সমগ্র আয় ১৫৭৩১৯৬ দাম। অশ্বারোহীর সংখ্যা ৫০০ শত পদাতিকের সংখ্যা ১৭০০০ সহস্র। এই সরকারে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ আছে।

২। সরকার তাণ্ডা—

মহালের সংখ্যা ৫২ যথা ১ আকমহল ২ অচেলা ৩ দশপাড়া আসরিফথল ৪ ইব্রাহিমপুর ৫ উজলঘাটা ৬ আলগাঙ্গী ৭ বারকঙ্কল ৮ ভাটাল ৯ বাহাদুরপুর ১০ বাহাবয় ১১ ফুলরী ১২ বাহাদুরসাহী ১৩ তাণ্ডে ১৪ তাজপুর ১৫ তালুক ব্রহ্মগড় ১৬ তেনৌলীপুর ১৭ হোসেনাবাদ ১৮ খাপুর ১৯ দাদহ ২০ দেবীপুর ২১ দাবুদমাহী ২২ দরগাছী ২৩ রামপুর ২৪ রুপেশপুর ২৫ স্বরূপসিং ২৬ সুলতানপুর উজাইল ২৭ সুলেমানসাহী ২৮ সলিমোনাবাদ ২৯ সলিমানপুর ৩০ সুমবেলা ৩১ সিরসাহী ৩২ নমস্কানী ৩৩ সেরপুর ৩৪ ফিরোজপুর ৩৫ কুমার প্রতাপ ৩৬ সাংজুক ৩৭ কাটাগড় ৩৮ কেনগারচ ৩৯ কাশীপুর ৪০ কুচলা ৪১ কাফুরদিয়া ৪২ মুগেশ্বর ৪৩ মঙ্গলপুর ৪৪ নওনগর ৪৫ নসীবপুর। এতদ্ভিন্ন সামান্য তালুকদারদের অধীনে ৭ মহাল মোট বায়ান্ন এই মহালের রাজস্ব ২৪০৭৯৩৯৯ দাম।

৩। সরকার ফতেহাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩১ যথা ১ জয়সিয়া চার্জ ২ ফুলচোল ৩ বেলন ৪ ভাগলপুর ৫ বাধাদিয়া ৬ তেলীহাটি ৭ চরণলক্ষ্মী ৮ চরহায়ী ৯ হাবেলী ফতেয়াবাদ ১০ লবণের শুল্ক ১১ হজরতপুর ১২ হাটের খাজনা ১৩ রসুলপুর ১৪ সন্দ্বীপ ১৫ সিরহর গরল ১৬ সিবিসানী ১৭ সিরোহী ১৮ সুদ দেওয়া ১৯ সোয়ামীল (জালালপুর) ২০ সাহাবাজপুর ২১ খড় গহর ২২ কুশ দিয়া ২৩ কত্তসা ২৪ মাকরগঞ্জ ২৫ মসুন দাড় ২৬ মিরণপুর ২৭ ক্ষুদ্র তালুকদার ২৮ নাকতুল্যাসির ২৯ নিয়ামতপুর ৩০ হাজারহাটী ৩১ ইউসফপুর। এই মহালের রাজস্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম; ৯০০ অশ্বারোহী ও ৫০৭০০ পদাতিক সরবরাহ করে।

৪। সরকার মামুদাবাদ—

মহালের ৮৮ যথা ১ অদীনা ২ অনুত্তনপুর ৩ উজ্জ্বলপুর ৪ ইন্দ্রবাণী ৫ খান্দে ৬ বাজুরাস্ত ৭ বাজুকুপ ৮ বিবারী ৯ বিশি ১০ বারীনজুমনা ১১ বেতবাড়িয়া ১২ রাতনান ১৩ বাঁকা ১৪ বানেওয়ালী ১৫ তেন্দেওয়াল ১৬ বাটিকামড়া ১৭ বাবেন করলা ১৮ পরাণপুর ১৯ বর্ণপুর ২০ পাটিকাবাড়ি ২১ পোপবাড়িয়া ২২ বাগুটিয়া ২৩ বুলগাছী ২৪ তারাকোনা ২৫ তিরীঘাটী ২৬ তেরজীল ২৭ চাঁদীয়া ২৮ জিয়ারফী ২৯ জগন্নাথপুর ৩০ জিদিবাড়িয়া ৩১ জিদিয়া ৩২ চৈতন্যবাজু ৩৩ হোসেনউজল ৩৪ হাবেলী ৩৫ খালিসপুর ৩৬ খিজিরখানা ৩৭ করিমপুর ৩৮ দেকারী ৩৯ দুর্লভপুর ৪০ চুলী ৪১ হেদৎ জেলালপুর ৪২ দুম্বিন্যা ৪৩ ধুমারহাট ৪৪ সদকাচালাকোটা ৪৫ সারুটীয়া ৪৬ সিরসিরিয়া ৪৭ শঙ্করদিয়া ৪৮ সেলিমপুর ৪৯ গোকসা ৫০ স্বরূপপুর ৫১ সালিবেড়িয়া ৫২ সাতোর ৫৩ সাহজীন ৫৪ শ্রীপুর বাড়ি ৫৫ শ্রীপুর রথশালী ৫৬ আজমৎপুর ৫৭ গজনীপুর ৫৮ ফরকেৎপুর ৫৯ ফতেপুর নসিকা ৬০ কুতবপুর ৬১ কাজীপুর ৬২ কুন্দলিয়া ৬৩ খেলপাটী ৬৪ কুশ্তীনেউরী ৬৫ ফুলবেড়িয়া ৬৬ কল্যাণপুর ৬৭ কুলীমহাল ৬৮ লন্যান ৬৯ লুনগোহাল ৭০ সেমেনসাহী ৭১ গওদা ৭২ মুখিয়া ৭৩ মামুদসাহী ৭৪ মিরপুর ৭৫ মহেশ্বরপুর ৭৬ মধুতোমা ৭৭ মারূপদিয়া ৭৮ নলদী ৭৯ নসরৎসাহী ৮০ নিকারী হালকুরী ৮১ দিকারবাক ৮২ নসীপুর ৮৩ হম্তনপুর ৮৪ হলদা ৮৫ হাওয়ালঘাটী ৮৬ হেতোগান ৮৭ হুসীপুর ৮৮ দেওরা।

এই মহলের রাজস্ব ১১৬১০২৫৬ দাম ; অশ্বারোহীর সংখ্যা ২০০ ও পদাতিকের সংখ্যা ২০০০ সহস্র।

৫। সরকার খালী ফেতাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩৫ যথা ১ বহল ২ ভালগা ৩ পোগা ৪ জুনগাঁ ৫ বাঘমরো ৬ ফালদা ৭ ভাদিজ ৮ ভাগ্যলা ৯ ফুলনগর ১০ তালুক কাশীনাথ ১১ তালা ১২ তালুক সেরিসিং ১৩ তালুক মহেশ মণ্ডল ১৪ তালুক নর্ম্মেদর ভট্টাচার্য ১৫ সরিপথ কবিরাজ ১৬ যশোহর

(রসুলপুর) ১৭ চেরোলা ১৮ চেবরা ১৯ হাবেলীখলি ফেতাবাদ ২০ খালীশপুর ২১ দান্যা ২২ বানেকদিয়া ২৩ সাহেসপুর ২৪ সলিমোনাবাদ ২৫ সাহস ২৬ শোবনাথ ২৭ সালিসেরী ২৮ আমদপুর ২৯ ঘোগরাল ৩০ কুলকীশ ৩১ তালুক পরমানন্দ ৩২ মুরিগাছ ৩৩ মল্লিকপুর ৩৪ মুদেরিয়া ৩৫ মাঙ্গেবরেহাট ৩৬ মেহরিশা। এই সরকারের রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম ; অশ্বারোহী ১০০ ও পদাতিক ১৫১৫০ জন।

৬। সরকার বাকলা—

মহালের সংখ্যা ৪ ; যথা—১ ইসমাইলপুর (বাকলা) ২ শ্রীরামপুর ৩ ইদিলপুর ৪ সাহাজাদপুর। রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ দাম ; অশ্বারোহী ৩২০ ও পদাতিক ১৫০০০ সহস্র।

৭। সরকার পূর্ণিয়া—

মহালের সংখ্যা ৯ ; যথা—১ আসোনজা ২ জয়রামপুর ৩ হাবেলী পূর্ণিয়া ৪ দানমালপুর ৫ সুলতানপুর ৬ শ্রীপুর ৭ সায়ের হাসিলফিলান (হাবিরকর) ৮ কুষ্টিয়ারী ৯ গদোয়ান। রাজস্ব ৬৪০৯৭৯৩ দাম ও অশ্বারোহী ১০০ ও পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

৮। সরকার তাজপুর—

মহালের সংখ্যা ২৯ ; যথা—১ পানঘাট ২ বুদেখার ৩ ফুলী ৪ বান্দোল ৫ বৌবায়ুরা ৬ ভুবনসেবা ৭ বারগাঁ ৮ বালীগাঁ ৯ বনগাঁ ১০ বাহাদুরপুর ১১ বাহানগর ১২ বাদুল্যা ১৩ তালদেওয়ার ১৪ চাগরতাল ১৫ হাবেলী তাজপুর ১৬ দেনাওরপুর ১৭ দাইহাটা ১৮ সইসেরা ১৯ সাজাপুর ২০ সাহাপুর ২১ গৌরীপুর ২২ কুশারগাঁ ২৩ গোপালনগর ২৪ গোগেরা ২৫ মাসুল ২৬ নীলনগর ২৭ ইউসফপুর ২৮ জেফাওত ২৯ নীলুন। রাজস্ব ৬৪৮৩৮৫৭ দাম ; ১০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক সরবরাহ থাকে।

৯। সরকার ঘোড়াঘাট—

মহালের সংখ্যা ৮৪ ; যথা—১ আধোরে ২ আমড়হর ৩ অগুালগাঁ ৪ আলওযারবান ৫ অনগাঁ ৬ এমধেথুরা ৭ আমেদাবাদ ৮ অম্বিলাগাছী ৯ আনোয়ার মল্লিক ১০ আলহাট ১১ আলহাবাদপুর ১২ বাজুবন্দ জাফরসাহী ১৩ বাজুসোলাদসাহী ১৪ তাকড়েওয়ার ১৫ ফুলরী ১৬ বারবাকপুর ১৭ বামনপুর ১৮ নসরতাবাদসহর ১৯ বারশিলা ২০ বেরিজামকবাল্লা ২১ বেরিঘোড়াঘাট ২২ রায়জিদপুর ২৩ পটলভিহি ২৪ বালকা ২৫ ভুলী ২৬ বাদপুতারী ২৭ বানওয়ার কাটার ২৮ ভাগঘাটী ২৯ বাজারচেটঘাট ৩০ বালাসবাড়ি ৩১ রাজেমট্কা ৩২ তুলসীঘাট ৩৩ তালুক হাসেন ৩৪ তালুক বাললাট ৩৫ তালুক সিউয়ান ৩৬ তালুক কেশী ৩৭ তাকেল ৩৮ তালুক আমেদ খাঁ ৩৯ হামেনা ৪০ খখেরা ৪১ বাদী ৪২ খাসবাড়ি ৪৩ রোকনপুর ৪৪ সুলতানপুর ৪৫ শিখসহর ৪৬ শনহীপুর ৪৭ সারহাটা ৪৮ সুবদী ৪৯ শীতপুর ৫০ সূর্যকুণ্ডী ৫১ সাঘাটা ৫২ সেরপুর গোয়েবাড়ি ৫৩ ফতাপুর ৫৪ কুবীয়ারী ৫৫ বায়াপুর ৫৬ কাবুলপুর ৫৭ গাংশেখমালী ৫৮ কুস্তকেদী ৫৯ গোকুল ৬০ কুঠীওতারি ৬১ খলসী ৬২ গবীবাড়ি ৬৩ কুলীবাজার ৬৪ গোবিন্দপুর খেন্দ ৬৫ গটনালা ৬৬ কালিক সুখের ৬৭ ঘাটনগর ৬৮ কোযাগাছি ৬৯ কাটীবাড়ি ৭০ গাওরা ৭১ গাতগ্রাম ৭২ কাকুল ৭৩ বারহিয়া ৭৪ গোকুলপাড়া ৭৫ মুকুমপুর ৭৬ মহবৎপুর ৭৭ মসজিদ হোসেনসাহী ৭৮ মজিদ আধারখালী ৭৯ মুলীয়োর ৮০ নন্দেরা ৮১ নপাড়া ৮২ নাহিজন বাটোর ৮৩ বেকারীহাজার ৮৪ উয়াটী ও ৮৫ বাবীব। এই সরকারের রাজস্ব ৮৩৮৩০৭২ দাম ; অশ্বারোহী ৯০০ শত, হস্তী ৫০টা এবং ২৬০টি পদাতিক।

১০। সরকার পিঞ্জিরা—

মহালের সংখ্যা ২১; যথা—১ এপোল ২ আমবাড়ি ৩ আনগোছ্ব ৪ বেরেংপুর ৫ বিজানগর ৬ বায়জিদপুর ৭ বাহারনগর ৮ বাড়িঘায়ব ৯ বাদুখাড় ১০ তাকাসী ১১ হালুন ১২ হাবেলী পিঞ্জিরা ১৩ দিঘা ১৪ দেওরা ১৫ শ্রীধরবাড়ি ১৬ শুক্রা ১৭ সুলতানপুর ১৮ শশীবীর

১৯ সলিমনাবাদ ২০ খেতা ২১ কিদাবাড়ি। রাজস্ব ৫৮০৩২৭৫ দাম; অশ্বারোহী ৫০ জন এবং ৭০০০ সহস্র পদাতিক।

১১। সরকার বারকাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩৬ ; যথা—১ ওমরুল ২ হাবকাবাদ সহর ৩ বাসদোল ৪ পোনাহার ৫ বাসতোলা ৬ বারবুড়িয়া ৭ বানগা ৮ বাগটাপুর ৯ জয়রিয়া বাজু ১০ চৌড়া ১১ জাসন চৌগা ১২ চাঁদ লয় ১৩ হায়নাসু ১৪ হাবেলী শিকসেহার ১৫ ধারমেন ১৬ দাউদপুর ১৭ শঙ্করদল (নিজামপুর) ১৮ শীকারপুর ১৯ সেরপুর ও বহরমপুর ২০ তাহিরপুর ২১ কাজিহাটী ২২ করদহ ২৩ গুজারহাট ২৪ খাস ২৫ চকদল ২৬ গোবিন্দপুর ২৭ কালাগাই গৌহাটি ২৮ খারল ২৯ গোদানগর ৩০ কালীজী ৩১ লস্করপুর ৩২ মালাচীপুর ৩৩ মাসদা ৩৪ ননসেমালী ৩৫ মামুদপুর ৩৬ উজীরপুর। রাজস্ব ১৭৪৫১৫৩২ দাম; ৫০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ সহস্র পদাতিক সরবরাহ হয়।

১২। সরকার বাজুহা—

মহালের সংখ্যা ৩৩ ; যথা—১ আলাপাসাহী (আলাপসিং) ২ বাড়বাজু ৩ নসীতসাহী ৪ মেবানে ৫ খাবাল ৬ হেরানা ৭ সেরালী ৮ বেসেরিয়া বাজু ৯ বেহোয়াল বাজু (ভাওয়াল) ১০ প্রতাপবাজু ১১ পুখরিয়াবাজু ১২ হোসেনসাহী ১৩ দশকাহোনীয়া ১৪ দুখাবাজু ১৫ সেলিম প্রতাপ বাজু ১৬ সুলতান প্রতাপবাজু ১৭ চাঁদ প্রতাপ বাজু ১৮ সোণাঘাটী বাজু ১৯ সোণাবাজু ২০ শিল বারস ২১ সায়র জলকর ২২ সাহাজিয়াল বাজু ২৩ জাফরোজিরালবাজু ২৪ কাটার মলবাজু ২৫ কাটাবাজু ২৬ মামুনসাহী (ময়মনসিং) সেরপুর মুরফে ২৭ সেনঘুছিমেন ২৮ মিরহাসেন ২৯ নসরৎসাহী ৩০ সিংলবৎ উজীল ৩১ মোবারক উজাল ৩২ হরিয়ালবাজু ৩৩ উসীসাহী। রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম; ১০ হস্তী, ১৭০০ শত অশ্বারোহী, ৪৫৩০০ পদাতিক সরবরাহ হয়।

১৩। সরকার সোণারগাঁ—

মহালের সংখ্যা ৫১ ; যথা—১ অবতার সাহপুর ২ আলচাপ ৩ অবতার ওসমানপুর ৪ বিক্রমপুর ৫ বেলাজেওয়ার (ভুলুয়া জোয়ার) ৬ বলদাখাল ৭ বোয়ালিয়া ৮ পারচাঁদী ৯ বাটখাড়া ১০ পালাশঘাটী ১১ চরদিয়া ১২ ফুলরী ১৩ পানহাটী ১৪ তাওয়া ১৫ তাজপুর ১৬ তিরকী ১৭ যোগীদিয়া ১৮ জেওয়ার বন্দর ১৯ চোকেন্দরা ২০ চণ্ডীহার ২১ চাঁদপুর ২২ হাবেলী সোণার গাঁ (মরুসহর) ২৩ খিজিরপুব ২৪ দৌহার ২৫ ডালডেরা ২৬ দেখান সাহপুর (দক্ষিণ সাহপুর) ২৭ দেলওয়ারপুর ২৮ দেকান ও সমানপুর ২৯ রায়পুর ৩০ সুখারগঞ্জ ৩১ সুকেরী ৩২ সোলিমপুর সেলিসেরী মায় সায়রজলকর ৩৩ সুকাওশা ৩৪ সুকদিয়া ৩৫ সেবারবল ৩৬ শমসপুর ৩৭ কড়াপুর ৩৮ গরদী ৩৯ কার্তিকপুর ৪০ কাঁদী ৪১ কালহরি ৪২ ঘাটিদুনাই ৪৩ মারকোর ৪৪ মজমপুর ৪৫ মেহার ৪৬ মনোহরপুর ৪৭ মাহীজল ৪৮ নারায়ণপুর ও সায়রজকাত ৪৯ লেহুয়া কোট ৫০ হিমতাবাজু ৫১ হাটঘাটি। রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম। এই সরকার ১৫০০ শত অশ্বারোহী, ২০০ শত হস্তী এবং ৪৬০০০ হাজার পদাতিক সরবরাহ করিত।

১৪। সরকার সিলেট (শ্রীহট্ট)—

মহালের সংখ্যা ৮ ; যথা—১ প্রতাপগড় ২ বায়ানখুণ্ড ৩ বাণ্ডয়া সাহর ৪ চিনতার ৫ হাবেলী সিলেট ৬ সারকুগুল ৭ নদ ৮ কর্ণগড়। এই মহালের রাজস্ব ৬৬৮১৬২০ দাম। অশ্বারোহী ১০০ শত পদাতিক ১৫০০ পনের শত ছিল।

১৫। সরকার চট্টগ্রাম—

মহালের সংখ্যা ৭ ; যথা—১ চাটিগাঁ ২ মালগাঁ ৩ দিউগাঁ ৪ সলিমানপুর (সেকপুর) ৫

মেরাজ নিমকসর (লবণের উপর শুল্ক) ৬ সনহোয়া ৭ নওপাড়া। রাজস্ব ১১৪২৩১০ দাম। অশ্বারোহী ১০০ ও ১৫০০ শত পদাতিক ছিল।

১৬। সরকার সেরিফাবাদ—

মহালের সংখ্যা ২৬ ; যথা—১ বর্ধমান ২ বেরৌর ৩ বারিকশীল ৪ ভরগোদা ৫ আকবরসাহী ৬ বাঘা ৭ ভাতশালা ৮ বাজার ইব্রাহিমপুর ৯ জঙ্গি ১০ কোটমাকুণ্ড ১১ ধল্যান ১২ সালিমানসাহী ১৩ সোনাই ১৪ হাবেলীসেরপুর আজমৎসাহী ১৫ ফতেসিং ১৬ হাসেন উজীল ১৭ কারগাঁ ১৮ কীর্ত্তিপুর ১৯ খন্দ ২০ খুঙ্গরা ২১ কোদেনা ২২ মালেন্দ ২৩ মানোয়ারসাহী ২৪ মজফরসাহী ২৫ নিসাং ২৬ লুবরান। রাজস্ব ২২৪৮৮৭৫০ দাম। অশ্বারোহী ২০০ শত ও পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

১৭। সরকার সলিমনাবাদ—

মহালের সংখ্যা ৩১ ; যথা—১ ইন্দ্রায়ন ২ ইসলামপুর ৩ উনালিয়া ৪ ওউলা ৫ বসুন্দরী ৬ ভোস্ত ৭ পাণ্ডুয়া ৮ রাজমোর ৯ বালীচঙ্গর ১০ ছুটিপুর ১১ জুমা ১২ জয়পুর ১৩ হোসেনপুর ১৪ ধারসা ১৫ রেসাক ১৬ হাবেলী সলিমানাবাদ ১৭ সাতাসহিবা ১৮ সাহসপুর ১৯ সান্দৌলী ২০ সুলতানপুর ২১ ওমারপুর ২২ আলমপুর ২৩ কাবুজপুর ২৪ গোবিন্দ ২৫ ক্ষুদ্র তালুকদারগণ ২৬ মহম্মদপুর ২৭ মুলখড় ২৮ মাকীল ২৯ নায়েক ৩০ পেসাং ৩১ লীলা। রাজস্ব ১৭৬২৯৯৬৪ দাম। অশ্বারোহী ১০০ ও পদাতিক ৫০০০ সহস্র।

১৮। সরকার সাতগাঁ—

মহালের সংখ্যা ৩৭ ; যথা—১ বেনোয়া, কোতোয়ালী ও ফরাসগড় ২ ওকেরা ও আলোয়ারপুর ৪ এরসাদ তোয়ালী ও পুরা ৫ বার মাহিরী ও মালিকহাটি ৬ বিল্বগাঁ ৭ বনিন্দা ৮ বাগোয়ান ও বঙ্গবাড়ি ৯ বললিয়া ১০ পোগলা ১১ বার মুঠাটি ১২ তুরতেরিয়া ১৩ হাবেলী সহর ১৪ হোসেনপুর ১৫ হাজিপুর ও বারবাক্‌পুর ১৬ ধনিয়াপুর ১৭ রাণীহাট ১৮ সাদঘাটী ১৯ সবকোটা ২০ স্বরূল রাজপুর ২১ বন্দর ও হাটবাজারের কর ২২ সাঘাট ও কাটশাল ২৩ ফতেপুর ২৪ কলিকাতা মকুমা ও বারবাকপুর ২৫ খায়ের ২৬ খাঁদালিয়া ২৭ গিনারাওয়া ২৮ মুকৌরা ২৯ মিটারী ৩০ মেদিনীমল ৩১ মোজাফরপুর ৩২ মুড়াগাছা ৩৩ মাহাহাট ২৪ নদীয়া ও সাস্তেলপুর ৩৫ শানকী ৩৩ হাতীকুণ্ড ৩৭ হাইগড়। রাজস্ব ১৬৭২৪৭২০ দাম। অশ্বারোহী ৫০ জন, পদাতিক সংখ্যা ৬০০ শত মাত্র।

১৯। সরকার মাদারন—

মহালের সংখ্যা ১৬ ; যথা—১ আনহাটী ২ বালগুরী ৩ বীরভূম ৪ ভেওয়ালভূম ৫ ছিতোয়া ৬ চুন্দানবারী ৭ হাবেলী মাদারন ৮ সেনভূম ৯ সমর সন্ন্যাস ১০ সেরগর (সুখেরভূম) ১১ সাহপুর ১২ কেইত ১৩ মণ্ডেলঘাট ১৪ নগর ১৫ মীনাবাগ ১৬ হাসৌলী। রাজস্ব ৯৪০৩৪০০ দাম। ১৫০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক।

এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার অন্তর্গত, সরকার জলেশ্বর ; সরকার ভদ্রক ; সরকার কটক ও সরকার কুলেল দণ্ডপাৎ নামে আরও চারিটি সরকার ছিল।

বিহারের অন্তর্গত সরকার বিহার ; সরকার মুঙ্গের ; সরকার চম্পারণ ; সরকার হাজিপুর ; সরকার সারণ ; সরকার ত্রিহুত ; সরকার রোটাস এই সাত ভাগে বিভক্ত ছিল।

তোডরমল্লের অসামান্য পরিশ্রমে এইরূপে রাজস্ব বর্ধিত হইয়া বাদসাহের প্রচুর আয়ের কারণ হয়, এজন্য আকবর সাহ তোডরমল্লকে রাজা উপাধি ও দিল্লির রাজস্ববিভাগের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া তৎপদে আজিজ্ খাঁ বা খানি আজিমকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন (১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে)।

চতুর্থ অধ্যায়

আজিজ খাঁ বা
খানি আজিম মীর্জা কোকা

বাদসাহের শাসনের অষ্টাবিংশ বৎসরে (১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে) খানি আজিম বঙ্গবিহারের নবাবী পদে নিযুক্ত হন। তাহার প্রতি বাদসাহের আদেশ ছিল বিহারের বিদ্রোহ সম্যক নিবারিত হইলে যেন বঙ্গদেশীয় বিদ্রোহীদিগকে বিশেষরূপে নিরস্ত ও শাসন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বিহারের শান্তি স্থাপন করিতে নবাবকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। এই সময় বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমনের জন্য কতককাল অপেক্ষা করিতে হইল।

বর্ষাপনয়নের পর সাধীখান, সেখ ইব্রাহিম, সেখ ফরিদ বুখারি, রাজধানী দিল্লি হইতে প্রেরিত হইলেন। এদিকে সেখ ইব্রাহিমেরও অযোধ্যার এবং বিহারের জায়গিরদারদিগের নিকট সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাদসাহের আজ্ঞা প্রচারিত হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই হাজীপুরে বহু বাদসাহী সৈন্যের সমাবেশ হইল। উৎসাহী সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য বড়ই ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। খানি আজিম স্বয়ং মনোনীত সৈন্যসহ গাড়ীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। অপর সেনানায়ক টারসিন খাঁ ও অপর কয়েকজন সেনাপতি নদী অতিক্রম করিয়া অপর তীর ধরিয়া চলিলেন; কিন্তু বৃক্ষ, পাহাড়, জল, কর্দম অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য বিবেচনায়, তাহারা পুনরায় নদী পার হইয়া মুঙ্গেরের নিকটস্থ রাজকীয় সৈন্যদলসহ যোগ প্রদান করিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীদল কালীগঞ্জের নিকটে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত এই দলস্থ মীর সারবুদ্দীন হোসেন, বাবাসাহকাঙ্কাল এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় মাসুম কাবুলী দলের নেতা নির্দিষ্ট হন। এদিকে কুতুল খাঁ উড়িষ্যার ভারপ্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালার কতকাংশ অধিকার করিয়া লয়। দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর বাদসাহের সহিত সন্ধি সুত্রে কুতুল উড়িষ্যার কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। বাদসাহী সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া মাসুম কাবুলী কুতুল খাঁর সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার উদ্দেশ্য থাকিল এই উপায়ে কুতুলকে সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য করিতে পারিলে, বাদসাহী সৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তাহার আশা সফল হইল ; পরে কুতুলের পরামর্শক্রমে মাসুম ঘোড়াঘাটে যাইয়া জাব্বারিক, মুজাবেগ এবং অন্যান্য কাঙ্কাল জাতিদিগকে নিজদলভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এমনকি, তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বীয় পরিবারবর্গকে কাঙ্কাল (কাঁকষাল) দিগের আশ্রয়ে রাখিয়া দিয়া, উহাদের সহিত একত্রিত হইয়া কালীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাদসাহ সৈন্যের পুরোভাগ বাঙ্গালার দ্বার স্বরূপ "গড়িয়া" ইতিপূর্বেই অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল। এই স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই আমীরদিগের সহিত বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ হয়। কুতুল প্রথম আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কায়, নদীর তীরে গম্বুজ নির্মিত ও রণতরী সকল সুসজ্জিত হইয়া রহিল। চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাদসাহ পক্ষ হইতে উজীর খাঁকে বালকোণার দিকে প্রেরণ করা হইল। কথা থাকিল, এই সকল সৈন্যসহ সেনাপতি শত্রুর গতিবিধির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। উজির রাজকীয় সৈন্যসহ দ্বাদশ ক্রোশ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

প্রথমত তীর ও বন্দুকের পরীক্ষা চলিল। বাদসাহের সৈন্যেরা বিপক্ষের বল অধিক বিবেচনায় কিছু বিচলিত হইয়া, সম্রাটের নিকট আরও অধিক সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। দূরদর্শী বাদসাহ আকবর তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু বলিলেন, "তদীয় সৈন্যদলের আর সাহায্য চাহিবার আবশ্যক ছিল না। আমার স্থির বিশ্বাস, নব সৈন্য পৌছিবার পূর্বেই আমি বিজয় সংবাদ প্রাপ্ত হইব।"

বাদসাহী সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদের মাসকালব্যাপী সমর চলিল। এই সময়ে কাজীজেদা নামে একজন বিদ্রোহীনেতা ফতেয়াবাদ (বর্তমানে ফরিদপুর) হইতে বহু যুদ্ধ জাহাজ, কামান, বন্দুক লইয়া উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীদিগের মধ্যে বড়ই আনন্দের প্রবাহ চলিল। তাহাদের এই সুখের ভাব কিন্তু অধিক দিন রহিল না। কারণ কাজীজেদা বিপক্ষের গোলাঘাতে অচিরাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তৎস্থানে কালাপাহাড় নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদলের মধ্যে বড়ই মতান্তর উপস্থিত হইল। বাঙ্গালার নবাব আজীজ খাঁ এই সময় অনেক বিদ্রোহী নায়ককে নানা উপায়ে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। বিদ্রোহীদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। বিপক্ষ পক্ষ হইতে খালীদ বা খালিদ্দী ও কাক্‌ষাল জাতিরা বাদসাহ পক্ষে যোগ প্রদান করিয়াছিল। অচিরে এই শুভ সংবাদ বাদসাহ সকাশে পৌছিল, বাদসাহের অনুমতিক্রমে যে সকল নতুন সৈন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়া আপনার ভবিষ্যৎবাণীর সফলতার জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

কাক্‌ষাল জাতি পুনরায় বাদসাহের সহিত সম্মিলিত হওয়ায়, যদি তাহাদের দ্বারায় স্বীয় পরিজনের কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে এই আশঙ্কায় মাসুম কাবুলী, কাক্‌ষালদের দেশে উপস্থিত হইল। কাক্‌ষালদের নেতা মৃজা মহম্মদ তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ জাতির সাধারণ লোক সকল ইহাতে উত্যক্ত হইয়া মাসুমকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইল। তখন মাসুম ঘোড়াঘাট লুণ্ঠন করিয়া কাক্‌ষালদেশ আক্রমণ করিল। অচিরে এই সংবাদ নবাব আজীজখাঁর কর্ণগোচর হওয়ায় ; সেনাপতি তারসুন খাঁকে চারি সহস্র সৈন্যসহ কাক্‌ষালদের সাহায্য জন্য প্রেরণ করিলেন। তারসুন বিদ্রোহীনায়ক মাসুমকে ঘোড়াঘাট হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন কাক্‌ষাল জাতির অধিনায়ক মৃজাবেগ খালিদ্দীন ও ওয়াজির জালিম প্রভৃতি পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া নবাব আজিজের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। মাসুমকে পরাস্ত করিয়া কুতুলখাঁর দমন জন্য নবাব আজিজ উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় যশস্বী রণবীর নবাব আজিজ বা খানি আজিম কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপদে সাহাবাজ খাঁ দিল্লি হইতে বঙ্গবিহারের সুবেদারি পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ৯৯০ হিজরি (১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে)।

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবাজ খাঁ কামু

সাহাবাজ খাঁ বড়ই দুর্দিনে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। একদিকে বঙ্গদেশের পাঠান সর্দারগণের বিদ্রোহ, অপরদিকে মগ ও পর্তুগিজদিগের উপদ্রব। এই সময়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও সাহাবাজ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মগ ও পর্তুগিজেরা কতকটা নির্যাতিত হইল বটে, কিন্তু পাঠানেরা কোনমতেও তাহার আয়ত্তাধীন হইল না। আমরা প্রথমে মগ ও পর্তুগিজদিগের বিবরণ বিবৃত করিলাম।

পর্তুগিজেরা ১৫২৯ খ্রিঃ অব্দে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হয়। পরে বহু বিপ্লবের পর নানারূপ কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া তাহারা বাঙ্গালার নবাবের সহিত পরিচিত হয়।

১৫৩৬ খ্রিঃ অব্দে হুমায়ুন বাদসাহের অধীনে যখন মামুদ সা বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন, সেই সময় কতিপয় পর্তুগিজ বন্দি অবস্থায় গৌড় নগরে অবস্থান করিতেছিল। সুরবংশীয় সের সা হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মামুদ তৎসমুদয় অবগত হইয়া বন্দি পর্তুগিজদিগকে এই শর্তে মুক্তি প্রদান করিলেন যে, তাহারা তদীয় পক্ষাবলম্বন করিয়া সের সার বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা করিবে। মামুদ সার সহিত মার্টিন এলফোন্সের এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয়। সেরের সহিত মামুদের "গড়িয়াতে"[১] যুদ্ধ বাধিল। প্রতিজ্ঞামত পর্তুগিজেরা যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া সেরের প্রতিকূলে ভীষণ যুদ্ধ করিল। যদিও এই ব্যাপারে মামুদ পরাস্ত হইলেন, তথাপি পর্তুগিজদিগের প্রতিজ্ঞারক্ষা ও বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি প্রদান করিয়া গোয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কেবল ৫ জন পর্তুগিজ এইজন্য রহিল যে, সের ক্রমশ অগ্রসর হইলে বিমুক্ত পর্তুগিজেরা তাহাদের বল বর্ধিত করিয়া মামুদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবে। পর্তুগিজ "ভাস্কডি পেরেজভি সামসারের" অধীনে নয়খানা যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া মামুদ সার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের আগমনের পূর্বেই মামুদ হত ও বঙ্গদেশ সের সার হস্তগত হয়।[২]

বঙ্গদেশের অন্তর্বিবাদে যখন মোগল পাঠান হিন্দু জায়গিরদার প্রভৃতি সকলেই ব্যস্ত, সেই সুযোগে পর্তুগিজেরা মগরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঐ দেশে নানারূপ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রতীরবর্তী জনস্থান সকল লুণ্ঠিত ও অধিবাসীরা বন্দিকৃত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে রক্ষা করে এমন আর কেহই রহিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু ছিল, তন্মধ্যে চণ্ডভণ্ড জাতি বা চণ্ডালগণ সংখ্যায় অধিক। এই সময় সুন্দরবনের পরিবর্তে তথায় বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্তমান ছিল। হয়ত কোনরূপ সংক্রামক রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আইনই আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপাতে প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতবেগে ভাসিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই ঝড়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।[৩] তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল কবলিত হইয়া

জনহীনতার মাত্রা বর্ধিত করিয়াছিল। মিঃ গ্রান্ট উল্লিখিত কারণগুলি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ঐ সকল কারণে বিশেষত পরিশেষে মগ ও পর্তুগিজদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।[৪]

সাহাবাজ খাঁ সর্বপ্রথম এই আততায়ী দস্যুদলের দমন করিবার সংকল্প করিয়া, মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। যে স্থানে দুর্গ নির্মিত হয়, কালক্রমে এই স্থান সাহাবাজপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া একটি পরগণায় পরিণত হয়।[৫]

এই ব্যাপারে বিদ্রোহীদল বিশেষত বাকলা ও শ্রীপুরের রাজা সাহাবাজ খাঁর প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। অচিরে মগ ও পর্তুগিজেরা পরাস্ত হইয়া সন্দ্বিপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে ১৫৮৫ খ্রিঃ অব্দে মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্রিপুরার রাজা উদয়মাণিক্য তাহাদের গতিরোধ জন্য একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন। তখন আকাশ হইতে উল্কাপাত ও শৃগাল সকল উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে থাকে। এই অশুভ সন্দর্শনেও রাজা ভীত না হইয়া নিশীথে মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হন, তাহার পক্ষের ৩৪০০৩ সহস্র, মুসলমানদের পক্ষে ৫০০০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই সময় মুসলমানেরা ত্রিপুরার অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া লয়।[৬]

সাহাবাজ খাঁর শাসনের প্রথম বৎসর বিখ্যাত ভ্রমণকারী রালফ্‌ফিস বঙ্গদেশে আগমন করেন ; তাহার বর্ণিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবগত হওয়া যায়।

"আমি বঙ্গদেশের চাটীগাঁ হইতে বাকলায় উপস্থিত হইলাম ; তথাকার রাজা একজন জেনটাইল, তিনি অমায়িক ছিলেন এবং বন্দুক সাহায্যে শিকার করিতে ভালবাসিতেন, তাহার রাজ্যটি বৃহৎ এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে ফল, ধান্য, কার্পাস, রেশম উৎপন্ন হয়। গৃহগুলি অতি সুন্দর ও উচ্চ, বড় রাস্তা, অধিবাসীগণ প্রায়ই উলঙ্গ, মাত্র তাহাদের কোমরের ধারে ছোট একখানা কাপড় জড়াইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ঘাড়ে এবং বাহুতে অলঙ্কার পরিধান করে। পদদ্বয়ে, তাম্র, রৌপ্য এবং হস্তীদন্ত নির্মিত রিং ব্যবহার করে ; পরে বাকলা হইতে শ্রীপুরে গমন করিলাম। শ্রীপুর গঙ্গা[৭] নদীর পারে অবস্থিত রাজার নাম চাঁদ রায়, চতুর্দিকেই তাহারা জেলালদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। ইহার এক কারণ এই যে এই স্থানে এত নদী ও দ্বীপ আছে যে তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে পারে কাজেই আকবরের অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। এখানে বিস্তর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীপুর হইতে ৬ লিগদূরে অবস্থিত সোনারগা সহর। এই স্থানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য সমস্ত রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খ্রিস্টানদিগকে যত্ন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উত্তরাংশের ন্যায় এ স্থানের ঘরগুলিও ছোট ছোট খড় দ্বারা আবৃত। দেয়ালের দ্বারা বা হোগলা দ্বারা বেড়ার কার্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ব্যাঘ্র, ভল্লুকের উৎপাত হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ লোকই ধনশালী, অধিবাসীরা মাংস খায় না বা কোনরূপ জীব হিংসা করে না। চাউল, দুগ্ধ, ফল মুলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। সামান্য একটু বস্ত্র কটিতে আবদ্ধ থাকে আর সমুদয় অনাবৃত। অনেক কার্পাস বস্ত্র এই স্থান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় ; এতদ্ভিন্ন ধান্য, চাউল, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে সিংহল, পেগু, মালক্কা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াও সঙ্কুলন হয়।[৮] পরে রালফ্‌ফিস ১৫৮৬ খ্রিঃ অব্দের ২৮ নভেম্বর শ্রীপুর হইতে জাহাজারোহণ করিয়া পেগুতে প্রস্থান করেন। পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন বাকলা বর্তমান বাখরগঞ্জের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ এবং শ্রীপুর বর্তমান বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। পশ্চাৎ এতৎ বিষয় বিষদরূপে বর্ণন করা যাইবে।

মগ ও পর্তুগিজ ত্রিপুরদিগের নির্যাতনের পর সাহাবাজ উড়িষ্যার কুতুল খাঁর বিরুদ্ধে সেখ ফরিদকে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্বে যে সকল আমীরেরা সহজে কুতুলকে পরাজয় করিতে পারিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এখন তাহাদের সেই মোহ বিদূরিত হইল। কুতুল সহজে পরাজিত হইল না। মোগল সৈন্য দামোদর নদী পার হইয়া রণসজ্জায় দুই ক্রোশ স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। কুতুল খাঁ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ; মোগল সৈন্য একটা পাহাড়ের উপর হইতে বিপক্ষের দিকে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে পাঠান বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। তখন জেতৃ মোগল বাহিনী তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দামোদর নদীতটে শিবির সন্নিবেশ করিল।

মুজাবেগ কাকষাল তাজপুর গমন করিয়া তারসুন খাঁর সহিত মিলিত হইল। এই সময় মামুদ খান ভাটিদেশ হইতে একদল বিদ্রোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সেনাপতি ও মুজাবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। মাসুম খাঁ কাবুলী নিকটবর্তী দেশ লুণ্ঠন করিতে থাকিলে তারসুন দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাণ্ডা হইতে সাত ক্রোশ পর্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্রোহীরা বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। এই বিষয় সাহাবাজ খাঁ অবগত হইয়া বিদ্রোহীদল দমন জন্য তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া বিপক্ষেরা যমুনা নদী পার হইয়া পরপারে অবস্থান করিতে লাগিল।

শত্রুদের পলায়নের পর সাহাবাজ উড়িষ্যার শাসনকর্তাপদে প্রতিষ্ঠিত আমীর ওয়াদের খাঁকে তাণ্ডা হইতে লিখিয়া পাঠান—"কুতুল খাঁ আর বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে না। এই সময়ে আপনি কতক সৈন্য আমার নিকট প্রেরণ করুন।" অতঃপর ওয়াদের আসিয়া সাহাবাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সেনাপতি সাহাবাজ গঙ্গানদী পার হইয়া অপর তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর ভাটী হইতে প্রত্যাগত তিন সহস্র সৈন্য আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে। এই সকল সৈন্য ইতঃপূর্বে সাহাবুদ্দিনের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন উহাদিগকে বিভাগ করিয়া টারসুন ও মৃজাবেগ কাকষালের অধীনে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে সংবাদ পাওয়া গেল, সন্তোষ-বন্দরে টারসুন বিদ্রোহিদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্যসহ মহিব আলি খাঁকে টারসুনের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া পরে সাহাবাজ তথায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতে থাকেন। অচিরে বিদ্রোহিদল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাহাদের বহু যুদ্ধোপকরণ বাদসাহ পক্ষের হস্তগত হয়।

মাসুম খাঁ যমুনাতীরে থাকিয়া সাহাবাজের গতিরোধ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সাহাবাজ সহস্র সহস্র তীর ও গোলাগুলির মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে নদী অতিক্রমণ করণানন্তর বিপক্ষের সন্নিহিত হন। বিদ্রোহীরা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে বাদসাহের রণতরী যোগদান করিতে পারে নাই। কেবল নারায়ণ ভৌমিক ও মুরাদের যুদ্ধজাহাজের সহায়তায় এই জয়লাভ সংঘটিত হয়।

পলাতকগণের অনুসরণ করিয়া মোহি আলি খাঁ তাহাদের পশ্চাৎ নিয়াছিলেন। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এইবারও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। তৎপক্ষীয় মাসুম ফারাম্মুদি বন্দি হইলেন। সংগ্রাম ও দলপত রায়, মৃজাবেগ এই যুদ্ধে সাহাবাজের যথেষ্ট সহায়তা করেন। পরে ঘোড়াঘাটে প্রায় দেড় শত পলায়িত সৈন্য বন্দি হয়।

বাদসাহের রাজত্বের ঊনত্রিংশ বৎসরে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাহাবাজ রণতরীর সাহায্যে সোনারগাঁও অভিমুখে অগ্রসর হন। তথা উপনীত হইয়া ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা ঈশা খাঁকে সাক্ষাৎকার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ঈশা খাঁ স্বয়ং তথায় উপনীত না হইয়া জনৈক অমাত্য প্রেরণ করিয়া সাহাবাজ খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।[৯]

১. গঙ্গা যখন প্রথম বঙ্গদেশে যে স্থানে প্রবেশলাভ করিয়াছেন উহার নাম গড়িয়া।
২. কলিকাতা রিভিউ ৫৩ ভলুম চাটীগাঁর ফিরিঙ্গি শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।
৩. বাক্‌লা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত ; এখানকার দুর্গ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে নির্মিত। এখানে সমুদ্র জল শুক্ল প্রতিপদের দিন হইতে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্দশী পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহার পর হইতে চান্দ্র মাসের শেষদিন পর্যন্ত কমিতে থাকে। বর্তমান বাদসাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে, একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রের জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাক্‌লা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাক্‌লার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। রাজপুত্র পরমানন্দ রায় কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সওদাগরগণ যেখানে একটুকু উচ্চভূমি পাইল, সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। সমুদ্রও উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ঘর বাড়ি সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া স্রোতের বেগে, প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবলমাত্র দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন ছিল না। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী জীবন বিসর্জন করিল।
৪. বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস।
৫. বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ভোলা সব ডিভিসন এই পরগণার মধ্যবর্তী। অতি পূর্বকালে মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুর গ্রামের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মাসংমিলিত হইয়াছিল।
৬. ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত।
৭. পদ্মার শাখা কালীগঙ্গাতটে এই নগর সংস্থাপিত ছিল। মিঃ রেনেলের মানচিত্র দেখ।
৮. পারচেজ পিলগ্রিম পার্ট ২য় ৩৬২ পৃষ্ঠা।
৯. "The king of Patanaw was the lord of the greatest part of Bengal[৯], until the Mogul slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Moguls, and still not with-standing Mogul's greatness, great lords, specially he of Siripur and of Chandecan." (Purcha's Pilgrims)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহাবাজ খাঁ, ঈশা খাঁ, মাসুম কাবুলী

ঈশার পিতার নাম কালিদাস গজদানী। ইনি রাজপুতানার বৈশ্য জাতীয়। অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে বঙ্গে আগমন করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে সোনারগাঁওর নিকট কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি অর্জন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। গজদানী প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া রাজকর বন্ধ করিয়া দিতেন, এজন্য ক্রমান্বয়ে সোলিম খাঁ, তাজ খাঁ এবং দুবিয়ার খাঁ তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। পরে এক ভয়ানক যুদ্ধের পর তাহাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর কালিদাস সন্ধি করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান বটে, কিন্তু পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ায় রাজকীয় সেনাপতি তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। কালিদাসের দুই পুত্র—ঈশা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ বণিকদিগের নিকট বিক্রিত হয়।

সেলিম খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাজ খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তখন ঈশার পিতৃব্য কুতব খাঁ বিবিধ সৎকর্মের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়া তাহার প্রিয়পাত্র হন, পরে তদানুকুল্যে বহু চেষ্টায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে তুরাণ দেশ হইতে পুনরায় স্বদেশে আনয়ন করেন। অচিরকাল মধ্যে ঈশা সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় ও সদ্বিবেচনা দ্বারা সর্বসাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়া পিতৃব্য পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বাহ্যিক আচরণ দ্বারা বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু বরাবর স্বাধীনতা লাভ জন্য মানসিক কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ঈশার চরিত্র পর্যালোচনা দ্বারা এই উপলব্ধি হয়, তাহার কমনীয় দেহ যেরূপ একদিকে বীরত্ব-ব্যঞ্জক ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী ছিল, অপরদিকে সেইরূপ কপটতা, মিত্রদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি তাহার অস্থিমজ্জার সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহাতে তাহার মনুষ্যত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়ের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া মিত্রতার মূলে কুঠারাঘাত পূর্বক চাঁদ রায়ের কন্যা সোনামণিকে হস্তগত করেন, তাহা ভাবিতে গেলে ঈশার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া পারে না। অতঃপর কতবার মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আনুগত্য স্বীকার পূর্বক, আবার তাহা উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা ভাবিতে গেলেও তদীয় জম্বুকচাতুর্যের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঈশা খাঁ যে একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও স্বদেশপ্রাণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবার কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বাধিল। সাহাবাজ খাঁ কপট না হইলেও অন্যান্য গুণগ্রামে তদপেক্ষা কোনমতে ন্যূন ছিলেন না।

সাহান সাহ বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মোগল সরকারের হস্তগত হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে বাদসাহের কিছু অর্থক্ষয় ও সৈন্যক্ষয় করিতে হইয়াছিল। তৎকাল পর্যন্ত পাঠান সামন্তগণ একেবারে হীনবল হইয়াছিলেন না। তাহারা বাঙ্গালা ও বিহারে দলবদ্ধ হইয়া মোগল গ্রাস হইতে উভয় দেশ অনেক দিন পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দু ভূম্যধিকারীরাও তাহাদের সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই।

তদ্ধেতু মোগলরাজকে সময়ে সময়ে প্রতিনিধি ও সেনা প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। স্বদেশরক্ষীরা কখন কখন জয়লাভ করিয়া মোগল সৈন্যদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিত। কখন বা পরাজিত হইয়া পর্বত বা অরণ্যময় প্রদেশে আশ্রয়

গ্রহণানন্তর শত্রুপক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বিহারদেশে কতলু লোহিনী বা কতুল খাঁ ও ওসমান খাঁ, বাঙ্গালায় মাসুম কাবুলী এবং সোনারগাঁ অন্তর্গত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদই আলী পাঠান দলের প্রকৃত নেতা ছিলেন।

প্রথম প্রস্তাবেই ঈশাকে পদানত হইতে দেখিয়া সেনাপতির মনে নিতান্ত সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তিনি তাহার চাতুরী বাহির করিবার আশায় ঈশাকে বলিয়া পাঠান যে, বাদসাহের শত্রু মাসুম খাঁ আপনার শাসিত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আপনি তাহাকে অবিলম্বে ধৃত করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করুন। লেখা বাহুল;, তাহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইল না। এই জন্য সাহাবাজ খিজিরপুর অবরোধ করেন।

খিজিরপুরের দুর্গ অচিরে তাহার হস্তগত হইল। পরে "কর্তাভু" নামক স্থানে ঈশার যে অস্ত্রাগার ছিল, তাহা এবং মস্বাদি গ্রামে তাহার যে রসদ ও ভাণ্ডারখানা ছিল উহা সাহাবাজ অধিকার করিয়া লয়েন। এদিকে ঈশা পলাইয়া প্রস্থান করেন। মাসুম অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণান্তর তথায় কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তাহার সঙ্গিগণ উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। ইতিমধ্যে ঈশা খাঁ প্রচুর সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করিয়া মাসুমের সাহায্যার্থ তথায় আসিয়া উপনীত হন। এইবার প্রচুর বল ও খাদ্যসম্ভার প্রাপ্ত হইয়া মাসুম মোগল সৈন্যের গতিরোধ জন্য পুনঃপ্রয়াসী হইয়া উঠিলেন।

বাদসাহী সেনাপতি শত্রুর বলবৃদ্ধি সন্দর্শনে "কুমার সনন্দ" বন্দরের বিপরীতদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রনদ তীরবর্তী "তোটক" নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বিপক্ষের অপেক্ষা করিতে থাকেন। কয়েকটি যুদ্ধ হইল, তাহাতে মোটের উপর বাদসাহ পক্ষেরই জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু বিপক্ষেরও বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

এই সময়ে বজরাপুর নামক স্থানে পাঠানদের এক প্রবল বাহিনী একত্রিত হইবার সংবাদ লইয়া, সাহাবাজ স্বীয় অধীনস্থ সেনাপতি তারসুন খাঁর উপর ঐ বিদ্রোহিগণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটি পথ ছিল ; তারসুন ভাওয়ালের পথে তথায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল, এই পথ সম্ভবত শত্রুশূন্য হইয়া রহিয়াছে। অপর পথটি নদীর তীরবর্তী কিন্তু বিপৎসঙ্কুল। কার্যকালে কিন্তু তাহাতে বিপরীত হইয়া পড়িল। কতক দূর অগ্রসর হইয়া নব সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, বহু পাঠান সৈন্য ঐ রাস্তার অদূরে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহাবাজ খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়া, নিজ সাহায্যার্থ যাহাতে আরও সৈন্য প্রেরিত হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন জন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

যে পথ অবলম্বনে মোগল সৈন্য অগ্রসর হইবার কথা, সেই পথে কতকগুলি লোক আগমন করিতেছে দেখিয়া, তারসুন বিবেচনা করিলেন, সাহাবাজ তাহারই সাহায্যার্থে ঐ সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সাহ্লাদে তাহাদিগকে প্রত্যুদগমন করিয়া আনয়ন জন্য যেমন সম্মুখীন হইলেন, অমনি বুঝিতে পারিলেন যে উহারা তাহার স্বপক্ষীয় দলবল নয়, বিপক্ষের লোকদল।

এই সময়ে তদধীনস্থ সৈন্যেরা তারসুনকে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেই বীরবর শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সুযোগ দিতে কোনমতেই বাধ্য হইলেন না। প্রায় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, মাত্র পঞ্চদশজন বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষ তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না।

এদিকে পাঠানেরা মোগলপক্ষীয় লোক সন্দর্শনে ব্যাঘ্র-বিক্রমে তাহাদের উপর নিপতিত হইল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মোগলদের স্কন্ধ দেহবিচ্যুত হইয়া ধরায় নিপতিত না হইল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা যথাসাধ্য শত্রু নিপাত করিতে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে নাই। এই খণ্ড

যুদ্ধে সমুদয় সহযাত্রিসহ তারসুনের দুই জন নিকট আত্মীয় প্রাণ বিসর্জন করে ; বীরবর তারসুন ধৃত হন।

মাসুম প্রথমত তারসুন খাঁকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু পরে তাহাকে স্বদলভুক্ত হইবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করেন। যতবার তাহার নিকট মোগলদল পরিত্যাগের কথা উত্থাপন করা হয়, ততবারই তিনি উহা ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। তৎপরে পাঠানেরা উত্যক্ত হইয়া সেই যশোধন নবীন বীর তারসুনের প্রাণদণ্ড বিধান করে। পরে পাপিষ্ঠদিগকে এজন্য বিশেষ ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা পনার নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই বৎসর বর্ষার প্রকোপ তত অধিক হইয়াছিল না, কাজেই মোগল সৈন্যেরা নদীর ধারে অবস্থানের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঠানেরা তখন এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মপুত্রনদ হইতে পঞ্চদশটি খাল খনন করাইয়া মোগল ছাউনির দিকে বর্ষার জলস্রোত ঢলাইয়া দিল। প্রবল জলপ্রপাতে তাহাদের তাঁবু জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। রসদ, বারুদ, ও অস্ত্রাদি দূরে থাকুক, মনুষ্যের জীবন বাঁচান দায় হইয়া পড়িল। এই সুযোগে বিপক্ষগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সাহাবাজ আর আত্মরক্ষার উপায় পাইতেছেন না। দৈব ঘটনায় মোগলপক্ষীয় একজন সৈনিকের গোলার আঘাতে বিপক্ষদলের সেনাপতি পঞ্চত্ব লাভ করেন। পাঠান সৈনিকগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া এইরূপে প্রস্থান না করিত, তবে মোগল সেনাগণের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিত কি না সন্দেহ। এই যুদ্ধে মোগলপক্ষের কম ক্ষতি হয় নাই। যদিও ঢাকার থানাদার সায়দ মহম্মদের দল অমিতবিক্রমে বিপক্ষের সহিত রণ করিয়া কোন রূপেও পরাস্ত হইয়াছিল না ; তথাপি সায়দ মহম্মদ বিপক্ষের হস্তে বন্দি হওয়ায় তাহাদের সে গৌরব রহিল না।[১] এদিকে জল কমিতে থাকিল, ঢাকা হইতে কতকগুলি রণতরি আসিয়াও পৌঁছিল। মোগলেরা এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন।

এদিকে ঈশা খাঁ একবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই। এবার বন্দি থানাদার সায়েদ মহম্মদ দ্বারা পুনরায় সন্ধির কথা চালাইয়া তাহাতে কৃতকার্য হন। এই সন্ধিতে এই সকল শর্ত থাকে যে, মাসুম কাবুলী বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় গমন করিবেন। সোনারগাঁও বন্দরে বাদসাহপক্ষীয় একজন থানাদার অবস্থান করিবে। ঈশা নিয়মিতভাবে উপযুক্ত কর প্রদান করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই উপলক্ষে ঈশা মোগলপক্ষীয় আমীরগণকে বহু উপঢৌকন প্রদান করায় তাহাদের অধিকাংশ সোনারগাঁ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এই সন্ধির প্রতি কিন্তু সাহাবাজ খাঁ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ঈশার আচরণ পর্যবেক্ষণ জন্য আরও কিছুকাল তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। যাহা ভাবা, কার্যেও তাহাই ঘটিল। এক বৎসর অতীত হইল, ঈশা শর্তমত কোন কথাও প্রতিপালন করিলেন না, কাজেই পুনরায় যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল।

এদিকে মোগলপক্ষীয় সেনাপতিগণের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহাবাজের নিয়ত যুদ্ধের প্রতি তাহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সম্ভবত তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। কোনমতে কাহারও কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে, তাহা মার্জনা করিতে চাহিতেন না। তাহার ইচ্ছা ছিল যে, পাঠানেরা একেবারে মোগলের পদানত হয়, কিন্তু অন্যান্য আমীরেরা বিবেচনা করিতেন যে, বিপক্ষগণ কোনরূপে বাদসাহের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য। বিদ্রোহী বারভুঞার দল তখন এমন হীনপ্রভ হয় নাই যে, সাহাবাজের ইঙ্গিতেই তাহারা পরিচালিত হইবে। এই সকল কারণে দল মধ্যে মতভেদ হওয়ায় মহীব আলি খাঁ সর্বপ্রথম সাহাবাজকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। প্রায় সকলেই সেই পথের অনুসরণ করেন, একমাত্র সাকুলী খাঁ সেনাপতির সহিত মিলিত হইয়া পাঠানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু তদধীন সৈন্যগণ সাহায্য করে না। এই যুদ্ধে সাকুলী আহত হন ও যুদ্ধস্থল ভাওয়াল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করেন।

এই সকল দলবল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর সাহাবাজ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। অধীনস্থ আমীরগণকে তৎসহ যোগ প্রদান জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। অনন্যোপায় হইয়া সাহাবাজ কতকগুলি যুদ্ধোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া তাণ্ডা অভিমুকে প্রস্থান করেন। এই যুদ্ধে বাদসাহপক্ষীয় মীর আদনের পুত্রগণ ও অন্যান্য বহু লোক বন্দি হয়। সাহ মহম্মদ গজনবী ও অপর কয়েকজন জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। আটদিন পরে সাহাবাজ কতিপয় সঙ্গিসহ সেরপুর পৌঁছিয়া তথায় বিশ্রাম লাভ করেন। এখনও তাহার শত্রুদমনের উপায় চিন্তা নিবারিত হইল না। পুনরায় দলবল যোগাড়ের উপায় দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা আর জুটিয়া উঠিল না। বিদ্রোহিদল দমন করিয়াও হাতে রাখিতে পারিলেন না, এই মনঃক্ষোভে বীর সাহাবাজ খাঁ, বাদসাহসদনে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া বাদসাহ সেই অকৃতকার্য সেনাপতিকে ভর্ৎসনা করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন ও পুনরায় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক সাহাবাজ খাঁর ন্যায় যদি অপর আমীরেরা কষ্টসহিষ্ণু হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন, তবে নিশ্চয় সাহাবাজ কৃতকার্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন।

সাহাবাজ খাঁর সাহায্যার্থ উজীর খাঁ দিল্লি হইতে প্রেরিত হইয়া ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। উভয় সেনাপতির পরাক্রমে বিপক্ষগণ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করে। এই সময়ে সাহাবাজ বাদসাহের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া দিল্লি প্রস্থান করেন। তৎপদে উজির খাঁ নিযুক্ত হন। তিনি কিছুদিন মাত্র এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। পরে তাহার মৃত্যু হওয়ায় অম্বরের সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রথমে বিহারের শাসনকর্তৃত্বপদে বৃত হন। পরে তদুপরি বঙ্গদেশ শাসনের ভারও অর্পিত হইয়াছিল।[২]

---

১. This compelled them to take flight and many of the men were drowend. They were defeated on all sides except in the battery of Saiyad Hussain Thanadar of Dacca, who was taken prisoner.

Elliot's History of India,
Vol. VI. Pages 75, 76.
Akbarnama, Text Vol. III. Page 437.

যাঁহারা মনে করেন, নবাব ইসলাম খাঁব পূর্বে ঢাকার নামকরণ হয় নাই, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, সাহাবাজ খাঁর শাসন সময়ে ঢাকার অস্তিত্ব ও নাম বর্তমান ছিল এবং তথায় একজন থানাদার অবস্থান করিতেন।

২. হোসেন কুলী খাঞ্জাহান ও মির্জা কোকা নামক দুইজন শাসনকর্তা আকবর সাহের অধীনে বঙ্গদেশ শাসন জন্য আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া রিয়াজপ্রণেতা তাহার পুস্তকের দ্বিতীয় উদ্যানের শেষভাগে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাহার মতে রাজা মানসিংহই বাঙ্গালার প্রথম মোগল শাসনকর্তা।

আফগানগণ বঙ্গদেশ হইতে তাড়িত হইলে, মোগল সেনানায়কগণ তাহাদের জায়গীর দখল করেন এবং রাজকোষে রাজস্ব প্রদান না করিয়াই ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল জায়গীর মোগল সেনানায়কগণ নিজ নিজ অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। মজঃফর এই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে মোগল সেনানায়কগণ সম্মিলিত হইয়া তাহাকে হত্যা করেন।

মীরজা আজিজ বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হওয়ায় বাদসাহের আদেশে সাহাবাজ কুম্ব আজিজের সহিত যোগদান করেন। আজিজের পর সাহাবাজ শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে পাঠানদিগের সহিত সন্ধি করায় বাদসাহ তাহাকে দিল্লিতে আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করেন। তৎপরে উজীর খাঁ ও পরে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। রিয়াজ-উস-সালাতিন, ১৫৮।১৫৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

ভাদুড়িয়া, তাহেরপুর, সাতোর ও দিনাজপুর

মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্বে, তদ্দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে, মুনেম খাঁ প্রথম বাঙ্গালার প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন এবং তোডরমল্ল তাহার সহকারী ছিলেন। এই সময়ে ভাদুড়িয়া জমিদারগণ বিপুল জমিদারী ভোগ করিতেন, তাহাদের আয় প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ছিল। হুমায়ুন বাদসাহের সহিত সের সাহের সংঘর্ষণের সময়ে এই জমিদারগণ সেরের পক্ষ সমর্থন করেন বলিয়া মুনেম খাঁ তাহাদের কতক অংশ কাড়িয়া সাতোরের রাজাকে দান করেন। বৃহৎ পরগণা রাম বাজু ভাঙ্গিয়া, কালীগাঁ ও কুশুম্ভী নাম দিয়া, প্রথমটি খাস করিয়া লন, কেবল কুশুম্ভী ও প্রতাপ বাজু পরগণা তৎকালীন রাজা জগৎনারায়ণের হস্তগত থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাদুড়িয়ার জায়গীরের নজরানা এক টাকা স্থলে হাজার এক টাকা ধার্য করেন। তদবধি ভাদুড়িয়ার অবনতি আরম্ভ হয়, তত্রস্থ জমিদারগণের বিষয়-সম্পত্তি হ্রাস হইয়া পড়ে ও সাতোরের রাজসংসারের শ্রীবৃদ্ধি সংবর্ধিত হয়।

রাজা জগৎনারায়ণ এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার কামনায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ খাঁকে বহুতর উপঢৌকনসহ দিল্লিতে প্রেরণ করেন। রাজা তোডরমল্লের কৈফিয়ত তলব হয়। এদিকে আকবরসাহ চন্দ্রনারায়ণের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তৎসহ আপনার এক তনয়ার বিবাহ দিয়া তাহাকে মুলতানের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ও ভাদুড়িয়ার জমিদারীর মালগুজারি ছয় সহস্র টাকা কমাইয়া দেন।

জগৎনারায়ণ রায়ের জীবিত সময়ে, বঙ্গদেশ মোগলদিগের করতলগত হয়। এই সময়েই গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া নগরকে জনহীন করিয়া ফেলে। তোডরমল্ল বাঙ্গালার জরিপ জমাবন্দিও তৎসময়ে সম্পাদন করেন। প্রবাদ ষোড়শ শতাব্দীর এই ভাগেই সর্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন আরম্ভ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কৌলিন্য প্রথার সংস্কার হয়। বলিতে গেলে পাঠানদের হস্ত হইতে বাঙ্গালার শাসন ভার উঠিয়া যাওয়ার পরই এই কয়েকটি নূতন কার্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা কংশনারায়ণ তাহেরপুরের রাজা ছিলেন ও তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজপতিরূপে বিবেচিত হইতেন। রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শানুসারে তিনি সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব কার্য নির্বাহ করেন। তৎপরে ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাসন্তী দুর্গোৎসব কার্য সুসম্পন্ন করেন। তদবধি সাতোরের রাজা ও অন্যান্য হিন্দু বড়লোকেরা এই পূজার দুইটি বা কোন দুইটির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশে এই উভয় পূজার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রবাদ বহুদিন পরে সাহাজান বাদসাহ শারদীয় পূজার ধুমধাম দৃষ্টে মোহিত হইয়া নিজ ব্যয়ে এই মহাপূজা করাইয়া ছিলেন। কংশনারায়ণ, সিন্দুরার জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাতোরের রাজকুমার গদাধর সান্যাল এবং দিনাজপুরের রাজার ভ্রাতা গোপীকান্ত রায় তৎসময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে বড় লোক ছিলেন। বিশেষ কংশনারায়ণ মোগল-পাঠান যুদ্ধের সময়ে মোগলপক্ষের ও ভাদুড়িয়ার জমিদার পাঠানপক্ষের সাহায্য করায় জেতা মোগলগণ ভাদুড়িয়ার[১] জমিদারীর কতকাংশ খাস করিয়া কংশনারায়ণকে প্রদান করেন এবং

মুনেম খাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর দেশশাসনের ভার পর্যন্ত অল্পকালের জন্য তৎকরে ন্যস্ত হয়। তিনি সুবেদারি কার্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুবেদারস্বরূপ নিযুক্ত হন নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে রাজা মানসিংহই প্রথম সুবেদারি পদ লাভ করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন। উড়িষ্যার পাঠানবিদ্রোহ নিবারণ, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ ও কেদার রায় প্রভৃতির দমন, কোচবিহারের রাজার সহিত সন্ধি সংস্থাপন ও বেণী রায় প্রভৃতি দস্যুগণের দমন কার্য তদ্বারাই সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

১. রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চলনবিলের মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ জনপদের নাম ভাদুড়ি চক্র বা ভাদুড়িয়া। উহার জমিদার ছিলেন ভাদুড়ি উপাধিধারী কাশ্যপ গোত্রীয় রাজা গণেশ, সেই বংশে জগৎনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

অষ্টম অধ্যায়
রাজা মানসিংহ ও কুতল খাঁ

রাজা মানসিংহ রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জয়পুর এই রাজ্যের রাজধানী। ঐ রাজবংশ আপনাদিগকে ভগবান রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এ জন্য উহারা কাছোয়া বা কুশাবহ্ বংশ নামে পরিচিত। আকবর বাদসাহ হিন্দুরাজগণসহ আদান প্রদান করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন, স্বয়ং এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, পরে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সাহ সহিত অম্বরের ভগবান দাসের কন্যার পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। ভগবান দাস মানসিংহের পিতা ছিলেন।[১] এই সম্বন্ধ বন্ধনের জন্য, জয়পুর রাজবংশের সহিত মোগলবাদসাহ বংশের বড়ই প্রণয় সম্মিলন ঘটে। প্রায় অধিকাংশ রাজপুত রাজা এইরূপে বাদসাহ ঘরে কন্যাদান করিয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন। কেবল করিলেন না মিবার বা উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপসিংহ। এমন কি মানসিংহ উদয়পুরে উপস্থিত হইলে প্রতাপসিংহ তাহাকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যের আয়োজন করেন বটে কিন্তু যখন ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন, তখন প্রতাপ তাহার সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সূত্রে মানসিংহ আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করায় তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাদসাহকে সমুদয় বিবরণ অবগত করান। বাদসাহ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে ঘোর অভিযান প্রেরণ করেন। মানসিংহ স্বয়ং এই অভিনয়ের নেতা হইয়া দাঁড়ান। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক প্রতাপ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিধর্মীর সহিত কন্যা বিবাহ দেওয়া তো দূরের কথা, করদান বা আনুগত্য স্বীকার করিতে পর্যন্ত সম্মত হন নাই। তবে স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের চেষ্টায় রাণার যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালার বিদ্রোহীগণ প্রবল হইয়া যখন সাহাবাজ খাঁর অবাধ্য হইয়া পড়ে, বহু চেষ্টা দ্বারাও মোগল রাজপ্রতিনিধি সে সময়ে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন দূরদর্শী বাদসাহ কূটযোদ্ধা ও যুদ্ধবিশারদ রাজা মানসিংহকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন জন্য, প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদ প্রদান করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। মানসিংহের প্রথম কার্য উড়িষ্যাবিজয় (১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে)[২]। অতএব উড়িষ্যার পূর্বতন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনায় উহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

খান খানান মনিম খাঁ এবং খাঞ্জুহানের শাসনকর্তৃত্ব সময়ে, উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মোগল শাসনাধীনের অন্তর্গত হয়, কিন্তু পরবর্তী আমীরগণের অক্ষমতা প্রযুক্ত উহা পুনরায় কতুল লোহিনীর হস্তগত হইয়াছিল।

বিহারের বিদ্রোহীগণকে অধীনে আনয়ন করিয়া পরে উড়িষ্যা-বিজয় জন্য মানসিংহ মনোনিবেশ করেন। ঝাড়খণ্ডের (বৈদ্যনাথের) পথ্ অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যা আক্রমণের সঙ্কল্প হয়। ভাগলপুর হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্তা সায়দ খাঁর নিকট এজন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান, কিন্তু বর্ষার প্রবল প্রকোপ বশত বঙ্গদেশ হইতে এই সময়ে তাহার নিকট সৈন্য প্রেরিত হইতে পারে না। পর বৎসর রাজা বর্ধমানের পথে যাত্রা করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে তাহার সাহায্য জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহাদের সহিত তাহার সম্মিলন ঘটে। বঙ্গদেশ হইতে

একমাত্র বিহার খাঁন কতক সৈন্য সহ আগমন করেন। অবশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষায় রাজা জাহানাবাদে অবস্থান করেন। এদিকে কতুল খাঁ নিজ পতাকা উড্ডীন করিয়া বাদসাহী সৈন্যের ২৫ ক্রোশ দূরবর্তী ধরমপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সাহসের সহিত যুদ্ধোদ্যোগ করিতে থাকেন।

বাহাদুরের সহিত বহু সৈন্য কতুল খাঁ পূর্বেই রায়পুর নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ, আপন পুত্র কুমার জগৎসিংহের অধীনে অনেক সৈন্য তথায় পাঠাইয়া দেন। বিদ্রোহিগণ তখন সন্ধির প্রার্থনা করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু উহা ছলনা মাত্র। তাহারা আরও সৈন্য বৃদ্ধির আশায় কেবল কালকর্তন জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

ক্রমে যখন বাহাদুরের দল বৃদ্ধি পাইল, তখন তিনি জগৎসিংহের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। রাজকুমারের এই বিপদ সামাচার, পূর্বেই জমিদার হামীর (হাম্বির) তাহাকে পরিজ্ঞাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। পরে যখন এই আকস্মিক আক্রমণে বিপক্ষগণ কুমারকে ধৃত করিবার উপক্রম করে, তখন হামীরই তাহাকে কোনরূপে উদ্ধার করিয়া নিজ জমিদারী বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।

কুমারের এই বিপদ সমাচার পাইয়া রাজা মানসিংহ এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। তখন অধিকাংশ সেনানায়কগণের মত হয় যে আপাতত যুদ্ধ স্থগিত রাখা কর্তব্য। কিন্তু রাজা যুদ্ধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। এই সময়ে হঠাৎ সংবাদ আসিয়া পৌঁছে যে পাঠান দলাধিপতি কতুল খাঁ অষ্ট দিবস জ্বর ভোগের পর ভবলীলা সংবরণ করিয়া বীরভোগ্য অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।[৩]

এরূপ অবস্থায় বিপন্ন হইয়া পাঠানেরা কতুল খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বয়াজিদকে দলপতি নির্দেশ করিয়া লন। পরে সন্ধির জন্য মোগল সেনাপতির নিকট লোক প্রেরিত হয়। যদিও পূর্বে অন্যান্য সেনানায়কগণের বিরুদ্ধে অভিমত করিয়া মানসিংহ যুদ্ধ জন্য মনন করিয়াছিলেন, তথাপি এখন এই সুযোগে তিনিও সন্ধির পক্ষপাতি হইলেন। বয়াজিদ ১৫০ হস্তী ও অন্যান্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, সন্ধি সমাপ্ত হয়, কিন্তু পাঠানেরা উহাতে কৃত্রিম স্বাক্ষর করিয়াছিল।

এই সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, বাদসাহের নামে মুদ্রা-প্রচার, খোৎবা-পাঠ ও রাজকার্যাদি সম্পন্ন হইবে। প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র জগন্নাথ ও তদধীনস্থ স্থানসমূহ বাদসাহের খাস সম্পত্তি হইবে। রাজভক্ত জমিদারগণের উপর পাঠানেরা কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, পাঠানেরা কিছু সময় লাভ করিবার জন্যই এই সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।[৪]

বহুদিন অতীত হইলেও, পাঠানেরা সন্ধির শর্তানুসারে কার্য করিতে প্রস্তুত হইল না দেখিয়া রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। এবার পাঠানের পক্ষে কতুলের পুত্র নসীর খাঁ ও জামাল খাঁর অধীনে ১৭০০০ হাজার অশ্বারোহী, ১৩০টি হস্তী ও বহু পদাতিক সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। ভয়ানক যুদ্ধের পর পাঠানেরা আর তিষ্ঠিতে পারে নাই। বহু মোগল সেনা নিপাত করিয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হয়। পাঠানদের সহিত পূর্বে সন্ধি করায় মানসিংহ অনেক বিজ্ঞ লোক কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিলেন। এখন উড়িষ্যা হইতে পাঠানদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেন। অতঃপর বিদ্রোহিগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া ঈশা খাঁ মসনদ ই আলি ও মাসুম কাবুলীর সহিত যোগ প্রদান করে।

১. রাজপুতানার ভট্ট ঐতিহাসিকগণ সকলেই মানসিংহকে ভগবানদাসের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে মানসিংহ ভগবানদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকৃতপক্ষে অপুত্রক ভগবান দাস ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২. এই দেশ প্রায় সকল সময়ে স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। এই রাজগণের মধ্যে একজনের নাম প্রতাপ রায়। তাহার পুত্র নরসিংহ কর্তৃক বিষ প্রয়োগে তিনি প্রাণত্যাগ করিলে, ঐ পুত্র রাজা হন। তেলিঙ্গা গ্রামবাসী মুকুন্দ দেব নামে পূর্বরাজার এক ভৃত্য এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া, ছলনাক্রমে নরসিংহের প্রাণ সংহার করিয়া উড়িষ্যার রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বরাজার বহু সঞ্চিত অর্থ দ্বারা নানাবিধ সৎকার্য করিলেও প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

সেকেন্দর উজবেগ বাদসাহের চাকরি পরিত্যাগ করিলে পর সুলেমান করাণীর সহিত তাহার সম্মিলন হয়। সুলেমান তৎপুত্র বায়জিদকে সঙ্গে দিয়া সেকেন্দরকে উড়িষ্যাবিজয় জন্য প্রেরণ করেন। তৎসহ তাহার সেনাপতি কালাপাহাড়ও প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিলে মুকুন্দ ও তাহার সেনাপতি ঈষৎ রায় পরাস্ত ও হত হন। কালাপাহাড় জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া ঐ দেবপ্রতিমা লইয়া চিলকা হ্রদের তীরে অগ্নিদাহ করিতে অনুমতি দেন। পাণ্ডারা বহু অর্থ প্রদান করিতে চাহিলেও প্রতিমূর্তি প্রত্যর্পণ করা হয় না। পরে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথের বিগ্রহ লইয়া একজন পাণ্ডা চিলকা হ্রদে ঝম্পপ্রদানপূর্বক উহা রক্ষা করেন। কালাপাহাড় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া পরে মুসলমান হন। এজন্য হিন্দুদের প্রতি তাহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল! তদবধি উড়িষ্যা পাঠানদের হস্তগত হয়।

৩. পাঠকগণ, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস গ্রন্থে আপনারা যে কতুল খাঁকে একটি নারীর দ্বারা হত হইতে দেখিয়াছেন, এই পাঠান সর্দার কতুল সেই বীরপুরুষ। কতুল সুরাপান করিতেন কি না এবং পরনারীর প্রতি অত্যাচার করিতেন কি না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎকল্পিতা বিমলাই অবগত ছিলেন। ইতিহাসে তদনুকূলে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঔপন্যাসিকের উপাখ্যানে ও কবির কাব্যে প্রায়ই কল্পনাবলে ইতিহাসের যে মর্যাদাহানি ঘটিয়া থাকে, এই স্থানেও তাহাই হইয়াছে।

৪. কতুল খাঁর উকিল ঈশা খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত এই সন্ধি প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বসন্ত রায়ের বন্ধু বলিয়া যে ঈশা খাঁর নাম করিয়াছেন, তিনিই এই উকিল ঈশা খাঁ। তিনি সোনারগাঁ এর, ঈশা খাঁ মসনদ-ই আলি নহেন।

নবম অধ্যায়

মানসিংহ ও ঈশা খাঁ

উড়িষ্যার বিদ্রোহী কতুল খাঁর পুত্র নসীর খাঁ এবং বাঙ্গালার মাসুম কাবুলী ও ঈশা খাঁকে পরাস্ত করিয়া রাজা মানসিংহ পুনরায় আজমীর প্রস্থান করেন। তাহার নামেই সুবার কার্য চলিতে থাকে, কিন্তু বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রাজার মনে বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালায় আর বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই, কার্যত কিন্তু তাহা ঠিক হইল না। উড়িষ্যার পাঠান দলপতি কতুলের অনুচর ওসমান খাঁ[১] ও সুজন প্রভৃতি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলেন। মানসিংহের নিকট এই সমাচার পৌঁছিলে তিনি প্রতাপসিংহ নামক একজন রাজপুত সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালায় উপনীত হন। ভদ্রকের নিকট মোগল পাঠানে এক যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না।

ওসমান দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করায়, মোগল থানাদার বাজবাহাদুর তাহাকে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু কোনরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মানসিংহ ইহা শুনিতে পাইয়া, সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বাজবাহাদুরের সাহত মিলিত হন। পুনরায় মোগলের সহিত ওসমানের যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের অঙ্কশায়িনী হন। পাঠানের অনেক যুদ্ধোপকরণ মোগলপক্ষের হস্তগত হয়। মানসিংহ ঐ স্থানের ভার থানাদারের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন।

অতঃপর ঈশা খাঁকে দমন করাই মানসিংহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। কারণ যতগুলি বিদ্রোহী পরাস্ত হয়, তাহাদের অধিকাংশ এই সময়ে ঈশা খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাহার দল পুষ্ট করিয়া তুলে। মানসিংহ এবার কাল বিলম্ব না করিয়া খিজিরপুরে উপনীত হইয়া ঈশা খাঁর রাজধানী অবরোধ করেন।

দেশীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে মানসিংহের এক জামাতা হত হইলে, তিনি ঈশা খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। বীরবর ঈশা অকুতোভয়ে মানসিংহের সম্মুখীন হন। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের বীরপুরুষগণ এই দ্বৈরথযুদ্ধের ভাবী ফলাফল দর্শন জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তরবারি চালনায় উভয়েই সিদ্ধহস্ত। উভয়ের অসি সংযোগে মল্লভূমি আলোড়িত হইয়া উঠিল—অসিসংঘর্ষজনিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষকারিগণের নয়নে তড়িৎ সদৃশ চমক প্রদান করিতে লাগিল। একে অন্যকে আক্রমণের প্রাক্কালে এই বুঝি আক্রান্ত হত হইল এই ভাবনায় তদ্দলস্থ জনগণ বিষাদিত ও প্রতিপক্ষীয়গণ আশা সঞ্চারে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল যুদ্ধ হইবার পরে মানসিংহের তরবারি ভঙ্গ হইয়া যায় ; তিনি যেই রিক্তহস্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ বীরবর ঈশা, স্বহস্তের অসি মানসিংহের করে সমর্পণ করিয়া, যুদ্ধ-সজ্জাবলি ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরিবর্তে শত্রুর নিকট এইরূপ অযাচিত প্রাণদান পাইয়া, মানসিংহ ঈশা খাঁকে আলিঙ্গন প্রদান ও শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ঈশা মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া, চিরকাল তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মানসিংহ তাহাকে সোনারগাঁর সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিতে ইতস্তত

করিলেন না। অতঃপর যতদিন মসনদ ই আলী জীবিত ছিলেন, ততকাল আর কখনও বাদ্দসাহের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায়[২] তাঁহার উত্তরাধিকারী বিদ্রোহী হন। এদিকে শ্রীপুরের কেদার রায়ও বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। মানসিংহ এই দেশগুলি সর্বতোভাবে অধিকার করিবার সঙ্কল্প করায়, দেশী প্রজারা সকলেই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।

বিদ্রোহিদল মোগল সেনার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নৌ-পোত হইতে বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মানসিংহ মনোনীত একদল সৈন্যকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, পরপারে যেন তাহারা সুবিধামত উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপক্ষের রণতরী হইতে প্রবলবেগে গোলা বর্ষণ হইতে থাকায়, তাহারা হটিয়া যায়। এই সময় মানসিংহ রণস্থলে উপনীত হইয়া অসীম সাহসের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী অতিক্রম করায়, বিদ্রোহিরা ভীত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু এই যুদ্ধে মোগলপক্ষের বহু সৈন্য নষ্ট হয়। রাজসেনা, টীরা ও সাতুরিয়া পর্যন্ত পাঠানদের অনুসরণ করিয়া প্রত্যাগমন করে। ভাওয়ালের বিদ্রোহী জমিদার গাজী বা গজনবী অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা ক্রমাগত চলিয়া বিক্রমপুর (শ্রীপুর) অধিকার করিলেন ও সমস্ত দেশে বিশ্বস্ত সেনা সংস্থাপন করিলেন। আফগানেরা সোনারগাঁয় আশ্রয় স্থাপন করে। রাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ১৬০১।১৬০২ খ্রিঃ অব্দে ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন।

এই বৎসর কুমার সেলিম বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যলাভের জন্য উৎসুক হন। বাদসাহ যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তৎসময়ে সেলিম সৈন্য সামন্ত লইয়া আগ্রায় গমন করেন। কিন্তু তত্রস্থ দুর্গরক্ষক ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় না। তৎপরে এলাহাবাদ গমন করিয়া, উহা হস্তগত করিয়া, অযোধ্যা ও বিহার অধিকার করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, মানসিংহ এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব করিতেছেন, তিনি তাহার সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কার্যকালে তাহা হইল না।

এই সমাচার পাইয়া, বাদসাহ আগ্রায় উপস্থিত হন। তথা হইতে সেলিমকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, "অবাধ্যতা পরিত্যাগ করিয়া যদি তুমি পুনরায় আমার সহিত সম্মিলিত হও, তবে তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ আছে, তাহা চিরদিন সমান থাকিবে।" সেলিম পত্র প্রাপ্ত হইয়া মুখে বাধ্যভাব প্রদর্শন করিলেন। ইটোয়া যাইয়া পিতার বল পরীক্ষা করিবেন, কার্যত ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল।

আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় জানাইলেন, হয় তুমি অল্প অনুচর লইয়া আগ্রায় আগমন কর, অন্যথা এলাহাবাদে ফিরিয়া যাও। কুমার এলাহাবাদেই প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা তাহার জন্য জায়গীর নির্দিষ্ট হওয়ায়, তিনি পিতার আদেশ ও উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু ঐ দেশের বিদ্রোহিরা, বাদসাহ ও তৎপুত্রের অসম্মিলনের কথা অবগত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল।

চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। আমরা অতঃপর পূর্ববঙ্গের অন্যান্য বিদ্রোহিগণের বিবরণ উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১. স্টুয়ার্ট বলেন, উড়িষ্যায় ওসমানের মৃত্যু ঘটে (১৩১ পৃঃ)। কোনও মতে ওসমানের দলস্থ ব্যক্তিরা উড়িষ্যা হইতে তাড়িত হইয়া পরে ঢাকার পূর্বদিকে কতক জমিদারী লাভ করে। বাদসাহ কর্তৃক বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিয়োজিত হইয়া ইসলাম খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাতে ওসমান হত হন (১০২১

হিজরী ৯ মহরম) (কলিকাতা রিবিউ ৫৩ ভলুমে চাটিগাঁর ফিরিঙ্গি শীর্ষক প্রবন্ধ)। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে ওসমান কর্তুল খাঁর পুত্র, কিন্তু ইলিয়টের কৃত আইন ই আকবরীর অনুবাদে জানা যায় যে, কতুল খাঁর পুত্রের নাম বয়াজিদ ও নসীর খাঁ। কতুল ও ওসমানের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে ওসমানকে কতুলের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া জানা যায়। নিখিলবাবু আরও বলেন যে, ভদ্রকের যুদ্ধে মোহনসিংহ ও প্রতাপসিংহ পরাজিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া মানসিংহ পুনরায় বাঙ্গালায় আগমন করেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপসিংহ মানসিংহের সহিত এই সময় প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। মানসিংহ ও প্রতাপসিংহ একত্র সমবেত হইয়া ভদ্রকের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। —Elliot, Vol. VI.

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর, মগ, ত্রিপুর ও শ্রীপুরের রাজগণ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন। ঈশার হিন্দুপত্নী সোনামণি বিশেষ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিয়া বীর-বনিতা ও বীরতনয়া নামের যথার্থ পরিচয় প্রদান করেন। ঈশা খাঁর অন্য স্ত্রীর নাম ফতেমা খাতুন, ইব্রাহিম মালিক উল-উলমার কন্যা ও হোসেনসাহের পৌত্রী।

দশম অধ্যায়
চাঁদ রায় ও কেদার রায়

মিঃ ফারনেণ্ডে, আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর) ও চণ্ডীখান (যশোহর) এই তিনটি রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার বিবরণীতে প্রকাশ যে মোগলদের পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিতেন। বিশেষতঃ চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্বময় কর্তা ছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত মোগলদিগের আধিপত্য সময়ে, যাঁহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? ইউরোপীয় ভ্রমণকারী "রালফ ফিচ্" ১৫৮৩ খ্রিঃ অব্দে চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীপুর, সোনারগাঁ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন,[১] তাহাতেও জানা যায় যে ঐ দেশের রাজগণ জালালউদ্দীন আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তৎসময়ে ঐ সকল প্রদেশ কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহারও আভাস উহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কর্ণাট প্রদেশ হইতে আগত হইয়া মহাত্মা নিমুরায় আকবর বাদসাহের রাজত্বের প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরান্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। খ্যাতনামা চাঁদরায় ও কেদার রায় ঐ রায়ের বংশে উদ্ভুত হন। এই "রায়" উপাধিধারী রাজগণ ঘৃতকৌশিক গোত্র ও "দে" বংশীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বৈদ্যবংশীয় সেনরাজগণের রাজত্বকালে সম্ভবত এই নিমুরায় বিক্রমপুর আগমন করিয়া রাজকার্যে নিযুক্ত হন, পরে সেনরাজগণের পতনের পরে তাহাদের রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুর আত্মসাৎ করেন।[২]

ফুলবাড়িয়া ও শ্রীপুর গ্রামে রায়বংশের বহুবিধ কীর্তি বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদের বিপুল ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য প্রদান করিত। পরে উত্তাল তরঙ্গময়ী কীর্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্তিরাজি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একমাত্র কীর্তিনাশার নামের সহিত উহার যে অর্থ জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই রায়রাজগণের কীর্তির কতকটা আভাস ক্ষণস্থায়ী তড়িৎবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। আমরা চাঁদ ও কেদার রায়ের সম্বন্ধে যতদূর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উল্লেখ করিয়া পরে তাহাদের কীর্তির ও কার্যকলাপের সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাঠান ওসমান খাঁকে পরাস্ত করিয়া রাজা মানসিংহ ক্রমে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরিয়া পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য খিজিরপুর ও শ্রীপুরে উপনীত হন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঢাকাতে চলিয়া যান। তৎপূর্ব হইতেই ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ ও কেদার রায়ের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল।

বারভুঞাদল ক্রমে এইরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে কোনমতে আর বাধ্য রাখিতে পারিল না। ঢাকার থানাদার অতি শঙ্কিতভাবে তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। দূর দূরান্তর হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ বাদসাহের করতল হইতে আবার বারভুঞার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গসন্তানেরা

কিছুকাল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে, পরে তাহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহারা স্বদেশ উদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশদ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণা-জালে পতিত হইয়া তাহারা আত্মহারা হইয়া ছিলেন এবং নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। উহার পরিণামফল এই দাঁড়াইল যে, কেহই আর সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়া মস্তক উন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া মোগল রাজের চরণ চুম্বনে কৃতার্থ হইল। যাঁহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন, তাহাদের মস্তক বিপক্ষের অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ যখন মানবান্তঃকরণে দুর্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বহুদূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোকলোচনের আয়ত্তাধীন রহিল না। প্রতাপাদিত্যের সহিত তদীয় জামাতা রামচন্দ্র রায়ের এবং চাঁদ রায়ের সহিত ঈশা খাঁর মনোমালিন্যই উহার প্রধান কারণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয়।

একটি সামাজিক বিষয় লইয়া কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটিশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত খাঁ উহার প্রতি কূলাচরণ করেন। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পরে তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোককে সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে তাহার রাজশ্রী বিনষ্ট করিবেন, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, যাহা দ্বারা পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইলেন।

কোন সময়ে ঈশা খাঁ মসনদ ই আলী, চাঁদরায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানাবিধ আমোদোৎসবে মাতিয়া উঠে। চাঁদ রায় যথাসাধ্য তাহাকে অভ্যর্থনা ও যত্ন করিলেন, কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে, এই আমোদ আহ্লাদই পরিণামে তাহাদের বন্ধুতাবিচ্ছেদের ও চিরমতান্তরের কারণে পরিণত হয়।

চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোনামণি অসামান্যসুন্দরী ও ষোড়শী যুবতী ছিলেন। ভাগ্যদোষে বাল্যকালেই তাহার পতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থা করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোনক্রমে সেই ললনারত্ন সোনামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতার স্খালনের এক প্রধান অন্তরায় হইয়া মিত্র রাজদ্বয়ের মধ্যে ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে।

ঈশা খাঁ স্বদেশে প্রস্থানানন্তর সোনামণিকে লাভ করিবার আশায় চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূর প্রেরণ করেন। বোধ হয় তাহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে বিশেষত তাহার মত যোগ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে, রায় রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশেষত একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট—স্ত্রী, কন্যা বা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, ফলপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তৎসাময়িক মুসলমান অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে নাই।

দূত প্রমুখাৎ ঈশা খাঁর মনোভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবহকে

দূরীকৃত করেন। পরে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশা খাঁর অধিকৃত কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্যা ও ভগিনী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। এখন যাহাতে উভয় দিক রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদ রায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিতে ছিল। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেই মনোগত ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিতে লাগিল। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্তার পর ঠিক হয় যে, যে কোন উপায়ে হউক, শ্রীমন্ত সোনামণিকে আনিয়া ঈশা খাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্তে খাঁ সাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণানন্তর শ্রীমন্ত সোনামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য বিক্রমপুর প্রস্থান করেন।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্ত শ্রীপুর আসিয়া প্রকাশ করিল যে, রাজা ও কুমার শত্রুহস্তে বন্দি হইয়াছেন। ঈশা খাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোনামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিরূপে রাজধানী ও সোনামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব প্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্যরক্ষার জন্য যতদূর ব্যস্ত না হউন, কন্যা সোনামণির রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া পড়িলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই স্থির হইল যে, সোনামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু রাণীকে কোনরূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে, ধূর্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্তে নৌকা সোনারগাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, সোনামণির সহিত শ্রীমন্ত খাঁ অচিরে সোনারগাঁ পৌঁছিয়া, চাঁদ রায়ের সেই আসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এরূপে সুসম্পন্ন হইল যে, চাঁদ বা কেদার রায় পূর্বে এ বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন কেদার রায়ের হস্তে যুদ্ধভার সমর্পণ করিয়া চাঁদ রায় মনঃক্ষোভে খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।[৩]

চাঁদ রায় রাজধানীতে পৌঁছিয়া, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে, এই অবস্থায় দুই দিবস অহিবাহিত হইলে পর, তদীয় ইষ্টদেবী তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন,—"বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এই অকারণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। তুমি ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদ রায় মনে ভাবিলেন যে, সোনামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ কার যাইতে পারিবে না। বিশেষত বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব

এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্তব্য। ইহা বিবেচনা করিয়া কেদার রায়কে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কেদার রায় খিজিরপুর মথিত ও ঈশার দুর্গগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণীর দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন রাজাদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া, চাঁদরায় অন্তিম-শয্যায় শায়িত হন। মোগলের কর হইতে স্বদেশ উদ্ধারকল্পে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এতকাল স্বধর্ম্মিগণের সহিত একপ্রাণে কার্য করিয়াছিলেন, পরিণামে সেই একতার মধ্যে নানারূপ অন্তরায় সন্দর্শন এবং ভবিষ্যতের আশা-ভরসা তমসাচ্ছন্ন বিবেচনা করিয়া, সেই বীর-পুরুষ, পরিণত নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোটীশ্বরের পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহজগতের সুখ দুঃখের সহিত তাহার আর কোনও সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট, ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে কিন্তু তাহার বংশধরেরা পুনরায় বিক্রমপুর ও সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন।[৪]

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার রায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে ১৬০১ খ্রিঃ অব্দে মানসিংহ একবার তাহাকে পরাস্ত করেন, কিন্তু কোন অনিষ্ট না করিয়া করদানে মাত্র বাধ্য করেন। এই সময়ের একটি ঘটনা আমরা জয়পুর কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।[৫]

"মানসিংহ জাহাজে করিয়া সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হইতে যাইট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রে গেলেন। রাজা পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। আর রাজা পরতাপদীপের অধীনে তেরশত হাতি এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল, সেই সমস্ত জয় করিলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎ সিংহ আহত হয়েন। পশ্চাৎ এখানে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তাঁহাকে লোকে রাজা বলিত। তাহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রতাপে তাহাকে কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাহার বলে এ ব্যক্তি বলবান? তাহার উত্তর করিলেন, এ ব্যক্তির প্রতি শিলামাতার বল আছে। অতএব আপনি মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য হোম প্রভৃতি করান, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইবেন। কেদার রাজার সহিত মাতার এই কথা ছিল যে তুমি যখন রাজা হইয়া বলিবে "তুমি যাও" তখন যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাহার কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী রাজার পূজার আসনে আসিয়া বসিলেন। রাজা আপন কন্যা জানিয়া বলিলেন "তুই যা, আমায় পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপ তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, তোমার ও আমার মধ্যে যে কথা ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন," এই বলিয়া মাতাকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তখন দেবী মানসিংহের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, এখান হইতে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি"। ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদাব রাজাকে হারাইয়া দিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন। দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কেদার তাহাকে কন্যা দিলেন। উভয়ে সন্ধি হইয়া গেল। তখন মানসিংহ কহিলেন, "তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম।" কেদার রাজা সেলাম করিলেন। মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আজ্ঞা করুন, আমি সেই মতো

আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হওয়া চাই, তাহা হইলে তোমার রাজ্য বজায় থাকিবে, আর আমিও থাকিব। যে দিন বলিদান বন্ধ পড়িবে, সে দিন তোমার ও আমার বাক্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন।" তৎপরে মেঘনাদ বাবু বলেন, "কেদার রায় = পরতাপদীপ = প্রতাপাদিত্য, এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।" আমরা তাহার এই কথার অনুমোদন করি না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেন, "কেদার রায়কে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বার-ভুঞার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।" আমরা কেদার রায়ের এই বিবরণটি প্রতাপাদিত্যের সহিত্য সংযোগ করিতে কেন ইচ্ছা করি না তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

শিলাদেবীর অর্চ্চনার জন্য যে ব্রাহ্মণ জয়পুর গমন করেন তাহার নাম রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।[৬] কালক্রমে সার্ব্বভৌমের বংশধরগণ রাজপুতানার ব্রাহ্মণদের সহিত আদান প্রদান করিয়া, অধুনা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাহাদের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও বংশাবলী লিখিত আছে। মেঘনাদবাবু বহু আয়াসে তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তবে প্রতাপাদিত্য এবং কেদার কায়েত একই ব্যক্তি বলিয়া যে অনুমান করিয়াছেন, দেশের ইতিহাস সম্যক্ প্রকাশ না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ, তিনি যদি জানিতে পারিতেন যে, কেদার রায় নামে এক ব্যক্তি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক বঙ্গদেশে বর্তমান ছিলেন, তবে কখনও তাহাকে ঐরূপ ভুল সমন্বয় সাধন করিয়া লইতে হইত না। যে সকল ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদসাহকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতাপাদিত্য এবং কেদার রায় এই দুইজনই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে প্রতাপাদিত্যের নাম বঙ্গদেশে যতটা জাগ্রত, কেদার রায়ের নাম ততটা নয়। আমরা তাহার দুইটি কারণ নির্দেশ করিতে পারি।

প্রথম কারণ— প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ হইলেও তাহার বংশ বিলুপ্ত হয় নাই। তদীয় খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধরগণ ও অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতি সন্তান অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছেন। তাহারা আজ পর্যন্তও সমাজে উচ্চপদস্থ। তাহাদের কথিত বিবরণাবলীতে অদ্যাপিও প্রতাপের বীরকাহিনী ব্রতের কথার ন্যায় কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতাপাদিত্যের কীর্তির বহু ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ— ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ও রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্য চরিত। অমর কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর পাঠ না করিয়াছেন এমন বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট বাঙ্গালী অতি কমই আছেন। ইহার প্রারম্ভেই—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ,
নাহি মানে বাদশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

যাহারা বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়াছেন, তাহারা উক্ত কথা কয়টি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। পরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম উদ্ভবের সহিত ঐ পুস্তক এবং রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত প্রথম মুদ্রিত হয়। ঐ সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের ও মহত্বের বহু বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সকল কারণে প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশে অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ চাঁদ রায় কি কেদার রায় সম্বন্ধে এইরূপ কোন সুযোগই বর্তমান নাই। না আছে তাহাদের বংশের লোক, না আছে তাহাদের রাজধানী বা কীর্তিকলাপের

নিদর্শন। অথবা কোন বাঙ্গালী ও কৃপাপূর্বক তাহাদের গুণগ্রামের পরিচয়সূচক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাগজ কলমে সংযোগ করেন নাই। তবে তাহারা কিরূপে জাগ্রত থাকিবেন? যে দুই এক ঘর আজও চাঁদ রায়ের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে কোন ব্যক্তিই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। পরে চাঁদ রায়ের ও কেদার রায়ের রাজধানী ও কীর্তিকলাপ দুরন্ত পদ্মা কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে "কীর্তির্যস্য স জীবতি" এই শ্লোকপাদের ফল হইতে একেবারে বিদ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দুই চারিটি যাহা বর্তমান আছে তাহা শশাঙ্কের স্থানে খদ্যোৎ মাত্র বলিয়া প্রতীতি হইবার যোগ্য। এই সকল কারণে অনেকেরই বিশ্বাস যে একমাত্র প্রতাপাদিত্যই মোগলবিদ্রোহী দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইতিহাসের পত্র উদঘাটন করিলে কেহই কেদার রায়কে প্রতাপ অপেক্ষা নিম্ন স্থানে আসন দিতে ইচ্ছা করিতেন না।

মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যা ভিন্ন আর একজন বাঙ্গালীর কন্যা বিবাহ করেন।[৭] মানসিংহের মৃত্যুর পর তাহারে সহিত কুড়িজন স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন "মহারাজকী বেটী রাণী বাঙ্গালী পরভাবতী।" এই কারণে আমরা মানসিংহের দুইটি বাঙ্গালী রাণী ছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন মানসিংহ কোচবিহারের এক রাজকন্যারও পাণিগ্রহণ করেন।

আর একটি প্রবাদ বাক্যানুসারেও প্রমাণিত হয় যে, শিলাময়ী দেবী চাঁদ রায়েরই গৃহদেবী ছিলেন। কথাটি এই।

রাজা মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতিকে জয় করিয়া গৃহদেবী শিলাময়ী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। পরে তত্রত্য কর্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্তির অনুরূপ অন্যমূর্তি নির্মাণ জন্য নিয়োগ করিয়া, তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্য সর্বদা রক্ষিগণকে তত্ত্বতালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্মাণ করে। যে দিবস কার্য শেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া বলে "মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্মিত দেবীমূর্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, নির্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্মিত পিতলের মূর্তিটিকে দেবীর আসনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্তিকে মাজিয়া ঘসিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্তি একত্র হইলে কোনটি বা পূর্বনির্মিত এবং কোনটি বা নবনির্মিত কেহই তাহা নির্বাচন করিতে পারিলেন না। পরে কারিকরেরা এই রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া, চাঁদ রায়ের দেবীকে জয়পুর লইয়া যান এবং অপর মূর্তিটি ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্তিই অষ্টধাতু নির্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল কিংবদন্তীর সহিত জয়পুরের প্রাপ্ত ইতিহাসের সমন্বয় সাধন করিলে, শিলাময়ী প্রতাপাদিত্যের না হইয়া কেদার রায়ের হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

"From Bacola I went to Sreepore which standeth upon the river of Ganges. The King is called Chondery. They are all hereabout rebels against the King Zelabdin Echler. For here are so many rivers and islands that they flee from one to another, where by his horsemen cannot prevail against them. Great store of cotton cloth is made here.

Sennergan is a town six leagues from Sreepore, where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India. The chief king of all these countries is called Isa Khan and he is chief of all the other kings ; and is a great friend of all Christians.

The houses here, as they are in the most part of India, are very little and covered with straw and have a few mats round about the walls and the doors to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh or kill no beast. They live upon rice, milk and fruits. They go with a little cloth before them and all the rest of their body is naked. Great store of cotton cloth goes from hence and much rice wherewith they serve all India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra and many other island places.

I went from Sreepore the eight and twentieth of November, 1586 for Pegu in a small ship or foist of one Albert Caranallo and so passing down Ganges and passing by the island of Sundip, Port Sorande or the country of Tipperah, the kingdom of Recon and Mogen, bearing them on one left side with a fair wind at north-west; our course was south and by east which brought us to the Barre of Negrais to Pegu. If any contrary wind had come, we had thrown many of our things overboard : for we were so pestered with people and goods that there were scanty place to lie in. From Bengal to Pegu is ninety leagues. We entered the Barre of Negrais, which is a brave Barre and hath four fathoms water where it hath left. Three days after we came to Cosmir which is a very pretty town and standeth very pleasantly and very well furnished with all things. Here are very great figs, oranges, cococs and other fruits. The land is very high that we fall withal ; but after we entered the Barre, it is very low and full of rivers, for they all go to and fro in boats which they call Paroes and keep their houses with wife and children in them." Purchas Pilgrimage, part II., Pages 1736—37.

২. "The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Ara Phulbaria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as an hereditary one in the family." (James Wise–on the Barah Bhuyas, Asiatic Society's Journal, 1874).

৩. ডাক্তার ওয়াইজের মতানুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যার ৫৪০ পৃষ্ঠায় ভারতীতে লিখিয়াছেন—"ঈশা খাঁ একবার শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সেই বালবিধবা সোনামণিকে অপহরণ পূর্বক লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন।" সিংহ মহাশয় যদি বিক্রমপুরে অনুসন্ধান করিতেন, তবে আর তাহাকে সাহেবের কথায় ভুলিতে হইত না। (বর্তমান সংকলন। পৃঃ ৫৫)

৪. শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্যচরিতে লিখিয়াছিলেন যে প্রতাপাদিত্য বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া কেদার রায়কে বশীভূত করেন। এই উভয় কথার যে কোন মূল্য নাই, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই দুইটি কথা কেহ কি কোন ইতিহাসে প্রাপ্ত হইয়াছেন? না মনগড়া কথা। (বর্তমান সংকলনভুক্ত)

৫. কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের প্রথম যুদ্ধ মেঘনা নদী ও তদুপকূলে সংঘটিত হয়।

৬. সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমপুরবাসীই হইবেন।

৭. রামরাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে, প্রতাপ উপঢৌকনস্বরূপ একটি রূপবতী কন্যারত্নকে মানসিংহের করে সম্প্রদান করেন। সম্ভবতঃ এই বাঙ্গালী কন্যা সেইটিই হইবে।

একাদশ অধ্যায়
সন্দ্বীপে ভীষণ যুদ্ধ

(পর্তুগিজ, মগ, কেদার রায় ও মোগল-সৈন্য)

মগ ও পর্তুগিজদিগের সহিত কেদার রায়ের বহুবার যুদ্ধ-সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা পর্তুগিজদের কিঞ্চিৎ বিবরণ, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী— চিকিৎসক "ফ্রাঙ্কয়েজ্ বর্ণীয়া"র লিখিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত, চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"বহুদিন হইতে রুকন (আরাকান) দেশে পর্তুগিজরা বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের সহিত বহু ক্রীতদাস এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গি গোয়া, সিহল, কোচিন, মালাক্কা এবং পূর্বোপদ্বীপের পর্তুগিজ উপনিবেশ হইতে আসিয়া বাস করিত। উহাদের অধিকাংশই নানারূপ কুক্রিয়াসক্ত ও পাপানুষ্ঠানপরায়ণ হওয়ায় ঐ সকল দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। ইহারা পরস্পর হিংসাপরায়ণ ছিল। বলিতে গেলে যাহারা দস্যু ও বদমায়েস তাহারাই এই স্থানে আসিয়া দলবদ্ধ হইত। ইহারা খ্রিস্টিয়ান নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ঘৃণিত জীবন বহন করিত। এমন কি এই দলস্থ কেহ যদি কাহাও প্রাণসংহার করিত, তথাপি শাস্তিপ্রাপ্ত হইত না।

আরাকানের রাজা মোগলদের ভয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় স্বীয় রাজ্যের সীমান্তে চাটিগাঁ বন্দরে এই দস্যুদলকে বাস করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি উহাদের প্রধান সম্বল ছিল। নৌ-চালনায় দক্ষতা থাকায়, ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া উহারা বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহে এবং কখনও কখনও মেঘনা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে প্রবেশ করিয়া তীরবর্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিয়া দিত। স্ত্রী-পুরুষদিগকে ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, অবশিষ্টদিগকে দাসভাবে রাখিয়া দিত। ইহাদের অত্যাচারে বহু জনপদ ভস্মসাৎ ও লোকহীন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই সমুদয় অত্যাচারী দস্যুদল এক বৎসরে এতদ্দেশীয় যতগুলি লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করিত, ভারতের সমুদয় মিশনারীরা নানারূপ চেষ্টা করিয়াও ততদূর কৃতকার্য হইতেন না। কালে এই সকল জলদস্যুগণ এমন পরাক্রান্ত হইয়া উঠে যে, আরাকানরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য গোয়ার শাসনকর্তাকে আহ্বান করে। কিন্তু পর্তুগিজ শাসনকর্তা এই সকল হিংস্র ও পাপীগণের প্রার্থনা ঘৃণা-সহকারে প্রত্যাহার করেন।

এই সকল পর্তুগিজ দস্যুদলের কথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, তিনি আগ্রার ক্যাথলিক চার্চ ও হুগলির চার্চ ধ্বংস করিয়া খ্রিস্টিয়ানদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য বাঙ্গালার নবাবের উপর বিশেষ অনুজ্ঞা প্রচার করেন। এই জলদস্যুদের সহিত যোগদান করিয়া আরাকানের মগেরাও বঙ্গদেশটাকে ছারখার করিয়া তুলে। বড় বড় নদীর মোহানাই উহাদের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল। পরে কিন্তু আরাকানের রাজাকেও এই পর্তুগিজ দস্যুগণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল।"[১]

পর্তুগিজেরা এই সময়ে সন্দ্বীপে আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া লয়। কিন্তু কেদার রায়ের পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরে কেদার রায়কেই সন্দ্বীপের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে। চাঁদ রায় বিবেচনা করিলেন যে, পর্তুগিজদিগকে বাধ্য রাখিতে না পারিলে, এই আধিপত্য স্থায়ী হইবে না, এ জন্য পর্তুগিজ কার্ভালোর প্রতি উহার শাসনভার সমর্পণ করিলেন।

"সন্দ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু মোগলেরা তাহা অধিকার করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করে। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি এই গুরুতর কার্যের জন্য কার্ভালোকে নিযুক্ত করিলেন। ১৬০২ খ্রিঃ অব্দে কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের হস্ত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া লন। তিনি সন্দ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোগলেরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সন্দ্বীপে কার্ভালোকে অবরোধ করিয়া ফেলে। কার্ভালো অবরুদ্ধ হইবার পূর্বে, চট্টগ্রামের পর্তুগিজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মাটুস চারি শত সেনা লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হন। মোগলগণও তাহাকে বাধা প্রদানের জন্য ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করে। ফিরিঙ্গি ও মোগলের জলযুদ্ধে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মোগলেরা সাহস সহকারে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গির গোলার নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মোগলেরা অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জল হইতে মাটুসের ও স্থল হইতে কার্ভালোর আক্রমণে তাহারা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সন্দ্বীপ কার্ভালো ও মাটুসের হস্তে পতিত হইল। কেদার রায় তাহাদের হস্তেই সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে সন্দ্বীপ আবার কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইল। কার্ভালো তাহার অধীন শাসনকর্তা রহিলেন।

এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের সম্রাট ছিলেন, তিনি সেলিম সা উপাধি গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাহার অধিকারে ছিল। তাহারও অধীনে অনেকগুলি পর্তুগিজ অবস্থিতি করিত। কিন্তু ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করে। উহাদের মধ্যে ফিলিপ ডি ব্রিটো প্রধান। বঙ্গোপসাগরে পর্তুগিজদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া আরাকানরাজ তাহাদের দমনের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঙ্গালা আক্রমণেরও ইচ্ছা ছিল। তিনি কার্ভালোর হস্তে সন্দ্বীপের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে দমন ও সন্দ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তিনি দেড়শতখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামান-সজ্জিত বৃহৎ রণতরী পর্তুগিজদিগের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন! কার্ভালো সেই সংবাদ কেদার রায়ের নিকট পাঠাইলে, তিনি আপনার একশত খানি কামান ও বন্দুক-সজ্জিত 'কোষ' নৌকা তাহার সাহায্যের জন্য শ্রীপুর হইতে সন্দ্বীপে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত সেই নৌকাসমূহ পদ্মা ও সাগর কম্পিত করিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্য পাইয়া কার্ভালো বিপুল বিক্রমে সেলিম সা'র রণতরী সমূহ আক্রমণ করিলেন। বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গির সহিত মগদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বন্দুক ও কামানের ধূমে গগনমণ্ডল আবৃত হইয়া উঠিল। তাহাদের গর্জনে নীল সমুদ্র মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইল। মগেরা অবশেষে পরাজিত হইয়া গেল। তাহাদের ১৪৯ খানি রণতরী কার্ভালোর হস্তে পতিত হইল। সন্দ্বীপ কেদার রায়েরই রাজ্যভুক্ত থাকিল।"

"যে সময়ে কার্ভালোর সহিত সেলিম সা'র সৈন্যগণের জলযুদ্ধ হইতেছিল, ব্রিটো সেই সময়ে কৌশলপূর্বক আরাকানরাজের অধিকারস্থ পেগুর সাইরাম বন্দর অধিকার করিয়া বসে। সেলিম সা পর্তুগিজদিগের এরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্বার সহস্রখানি রণতরী পাঠাইয়া দিলেন। রণতরীসমূহ তোপধ্বনি করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইল। কার্ভালোও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আপনার অধীন পর্তুগিজ সৈন্য ও কেদার রায়ের প্রেরিত বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে আপন আপন রণতরীতে সজ্জিত করিয়া বিপুল উদ্যমে সেই বিরাট নৌশ্রেণীর সহিত অগ্নিক্রীড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের রণকৌশল ও অমানুষিক সাহসে মগদিগের রণতরীসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের কতকগুলি বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি কামান

ও বন্দুকের গোলায় দগ্ধ হইয়া গেল। অবশিষ্টগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ জলযুদ্ধে মগদিগের প্রায় দুই সহস্র সেনা হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালীর অদ্ভুত বীরত্বে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধেও কার্ভালো জয়লাভ করেন এবং তাহার নাম সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সেলিম সা কাপুরুষতার জন্য আপন সেনাপতিদিগকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছিলেন।"

"কার্ভালো এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার রণতরীসমুহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া যায়। তিনি আবার আপনার নৌশ্রেণী গঠনের জন্য সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপুর, বাকলা ও সাগরদ্বীপে তাহার রণতরীসমূহের সংস্কার ও নতুন রণতরীসমূহের নির্মাণ হইতে লাগিল। শ্রীপুরে কার্ভালোর নিকট ৩০ খানি রণতরী অবস্থিত ছিল। কার্ভালো সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে আরাকানরাজ তাহা অধিকার করিয়া বসেন। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর এক ভীষণ শত্রু বিজায়ভেরী বাজাইয়া তাহার রাজ্যে উপস্থিত হয়। যে সময়ে সন্দ্বীপ লইয়া ঘোরতর অগ্নিক্রীড়া চলিতে ছিল, সেই সময়ে, মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য অধিকারের জন্য একশতখানি কোষ নৌকা সহ মন্দারায়কে পাঠাইয়া দেন। মোগলের কামানসজ্জিত কোষ নৌকা পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করিয়া কেদার রায়ের রাজ্যে উপস্থিত হইল ও তোপধ্বনিতে আপনাদের আগমন ঘোষণা করিল। কেদার রায় পূর্ব হইতে সতর্ক না থাকিলেও মোগল সেনাপতির আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি কারিলেন না।"

"কার্ভালোর প্রতি প্রধানতঃ আতিথ্যের ভার প্রদত্ত হইল। কার্ভালো আপনার সেই ৩০ খানি রণতরী ও আর কয়েকখানি কোষ নৌকা সহ আপনার ফিরিঙ্গি ও শিক্ষিত বাঙ্গালী গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মন্দারায়কে আক্রমণ করিলেন। মোগলের দুর্জয় কামান মেঘ ধ্বনির ন্যায় গর্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু ফিরিঙ্গি বীর কার্ভালোকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহারও কামানসমূহ মোগল কামানের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া অগ্নি উদ্গিরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধে পদ্মার তরঙ্গ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। রণপোতগুলি সেই তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নাচিতে লাগিল। মোগলেরা যেমন অত্যদ্ভুত বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালী তদনুরূপই রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। মন্দরায় আপনার অসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কার্ভালোর বিক্রমে তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে তাহার জীবনকে আহুতি দিতে হইল এবং ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালীর কামানের গোলায় তাহার রণপোতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কতকগুলি বা সলিলগর্ভে আশ্রয় লইল, কতকগুলি বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মানসিংহের আর কেদার রায়ের রাজ্য অধিকার করা ঘটিয়া উঠিল না। মোগল সেনাগণ ফেরুপালের ন্যায় বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। এই যুদ্ধে কার্ভালোর বীরত্ব আরও স্ফুটতর হয়। তিনি শ্রীপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য রণতরী সংগ্রহ করেন। পরে মোগলদিগের অধীনে গলিন বা হুগলি বন্দরস্থ দুর্গ অধিকার করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাহার নামে লোকে এইরূপ ভীত হইয়া উঠিত যে, একজন মগসেনানী স্বপ্নযোগে কার্ভালোকে সন্দর্শন করিয়া তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া নদীর জলে ঝম্প প্রদান করেন। পরে এই কথা আরাকানপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ সেনাপতির প্রাণদণ্ড বিধান করেন। পরে কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রতাপ আরাকান রাজার সন্তুষ্টি সাধন জন্য এই বীরপুরুষকে হত করেন।"[২]

আমরা এই ব্যাপারে দেখিতে পাই, মন্দারায় নামে একজন বীরপুরুষ অসীম সাহস

সহকারে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি মানসিংহের অধীনস্থ একজন সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিক্রমপুরের ইতিহাসের লিখনভঙ্গীতে বুঝা যায় যে, মন্দারায় কেদার রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া এই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করেন।[৩] শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের লিখনানুসারে এই যুদ্ধে মন্দারায় কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু বিক্রমপুরে তাহার আর একটি রাজধানী ছিল ইহা শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। চাঁদ ও কেদার রায় বর্তমান থাকা পর্যন্ত বিক্রমপুরে যে অন্য কোনও রাজা ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তৎপর বিক্রমপুরের আধিপত্য নয়পাড়ার চৌধুরিগণের হস্তগত হয়, এই কথা গুপ্ত মহাশয়ও স্বীকার করেন। এইরূপ স্থলে এই সময় মধ্যে মন্দারায় আবার কোন সময়ে তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন বা রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গুপ্ত মহাশয় মন্দারায়ের সহিত সোপাধি মধুমুকুট রায় নামের সমন্বয় করিতে যাইয়া যেন বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাই অনুমিত হয়। আজ কাল এক নামের সহিত অন্য নামের সমন্বয় সাধন করা একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের প্রশস্ত পথ হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে কিন্তু সর্বত্র সামঞ্জস্য থাকে না। বর্ধমানের মুকুট রায় ভিন্ন পূর্ববঙ্গের ফতেজঙ্গপুর পরগণায় কোটালিপাড়াতেও মুকুট রায় নামীয় একজন প্রবল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] বিক্রমপুরের মুকুট রায়ের সহিত তিনজন মুকুটের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্দারায়ের সহিত মধুমুকুট রায়ের সামঞ্জস্য জন্য আরও প্রমাণ উপস্থিত করা কর্তব্য। ডাক্তার ওয়াইজ এ সম্বন্ধে যে নোট উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেও জানা যায় যে মন্দারায় মোগল পক্ষের একজন সেনানায়ক ছিলেন। আমরা ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় পারচেস্ পিল্‌গ্রিম হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, ওয়াইজের উদ্ধৃত অংশে উহাই আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া পাঠ করিলেই উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।[৫]

এই সময়ে রাজমহল হইতে রাজধানীর কতক কার্য ঢাকাতে উঠিয়া যায়।[৬] এজন্য নিকটবর্তী করদ রাজাদের আধিপত্য অনেকটা খর্ব হইবার উপক্রম হওয়ায়, তাহারা আবার একত্রিত হইবার চেষ্টা পান। এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া, আরাকানাধিপতি সেলিম সাহ, বিক্রমপুরের শক্তিশালী রাজা কেদার রায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পুনরায় বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। চাঁদ রায় মগরাজের অর্থ সাহায্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর হইতে বিপুলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

এদিকে মোগল শাসনকর্তা সুলতান কুলীখাঁ সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় সময় শত্রুপক্ষের মধ্যে নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্তও করিতেছিলেন। এমন সময়ে পাঠান বংশীয় আহাম্মদ, মগরাজ ও কেদার রায়ের সহিত যোগ প্রদান করিয়া কুলীখাঁকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। কুলীখাঁ এই বিপদের সমাচার মানসিংহের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি ইব্রাহিম আৎকার, দলপৎ রায় ও রঘুদাসের অধীনে বহু সৈন্য কুলীখাঁর সাহায্য জন্য প্রেরণ করেন। বহুদর্শী মানসিংহ উভয় রাজার সহিত এক সময়ে যুদ্ধ করা সঙ্গত নয় বিবেচনায়, সর্বপ্রথম আরাকান-রাজ সেলিম সার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আরাকানরাজ জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ এই উভয় যুদ্ধেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া, মানসিংহ জল-যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিয়া লন।

এই সময়ে, সেলিম সাহের সহিত কেদার রায়ের বিচ্ছেদ সংঘটন হয়। এই মহাসুযোগে মানসিংহ অনায়াসে সেলিমকে পরাস্ত করিলেন। পরে পুনরায় বিক্রমপুরাধিপতিকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজ্য মানসিংহ সেনাপতি কিলমককে প্রেরণ করিলেন। কিলমক শ্রীপুর অবরুদ্ধ

করিলেন বটে, কিন্তু কেদার রায়ের কামান গর্জনের নিকট আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। প্রচণ্ড গোলার আঘাতে পীড়িত হইয়া কিলমক হটিয়া খয়িয়ার বিলের মধ্যবর্তী ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করেন। কেদার রায় এই সমাচার পাইয়া চতুর্দিকে রণতরী প্রেরণ করিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য পদাতিক সৈন্যও এই কার্যে ব্যাপৃত রহিল। বাঙ্গালী বীরগণের হুঙ্কার ধ্বনিতে দশদিক পরিপূরিত হইয়া পড়িল। রাজপুত ও মোগলবাহিনী এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মানসিংহ স্বয়ং অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। এই ব্যাপারে খরিয়ার বিল ও কালীগঙ্গার শ্যামল অম্বুরাশি রক্তগঙ্গায় পরিণত হইল। বহুদিন যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী, মোগলরাজের অঙ্কশায়িনী হন। প্রচণ্ড গোলার আঘাতে মহাবীর কেদার রায় নিপতিত হইলেন। সেই শূর সূর্য আর উত্থিত হইলেন না। মানসিংহের নিকটে নীত হইবার কিছু পরেই তাহার আয়ু নিঃশেষিত হইয়া যায়।[৭]

বহু বৎসরের বিবিধ চেষ্টায়, যে কেদার রায় মোগল বাদসাহের বশবর্তী হন নাই, সন্দ্বীপের ভয়ানক যুদ্ধে যাঁহার নিকট মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া সভয়ে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কিলমকের পাঁচশত রণতরীর সৈন্যগণ যাঁহার প্রবলবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বীপপ্রায় ফতেজঙ্গপুরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, আজ দৈবক্রমে সেই মহাসাহসী অমিতপরাক্রম কেদার রায়, বিক্রমপুর কেন সমগ্র বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া, অমরভবনে প্রস্থান করিলেন। যতদিন বাঙ্গালার ইতিহাস বর্তমান থাকিবে ততদিন, চাঁদ ও কেদার রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালীর হৃদয়ের অন্তস্তলে নিবদ্ধ থাকিয়া সেই অতীত কথা অবশ্যই স্মরণ করাইয়া দিবে। ফতেজঙ্গপুরের পূর্বনাম শ্রীনগর। পরে এই যুদ্ধের জয় নিদর্শন স্বরূপ মানসিংহ উহার নাম পরিবর্তন করিয়া উহাকে ফতেজঙ্গপুর এই আখ্যা প্রদান করেন। উহার উপকণ্ঠে যে বন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অদ্যাপি নগর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। নগরের কেবল শ্রীটুকু নাই। উহার ফতেজঙ্গপুরের একাংশ মাত্র।[৭]

আমাদিগের বিবেচনায়, বার-ভুঞাদলের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্বপ্রথম আসন প্রদান করা কর্তব্য হয়, তবে তাহা বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়েরই প্রাপ্য। কারণ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলী সর্বপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগলপতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। তৎপরে অধিকাংশই তৎপথাবলম্বী হন। হন নাই মাত্র তিনটি মহাপ্রাণ,—কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দ রায়। আকবর নামাতে কেদার ও মুকুন্দের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জানি না, ঐ গ্রন্থে প্রতাপের বিবরণ কেন বিবৃত হয় নাই। জলযুদ্ধে কেদার রায়ের তুল্য বলশালী আর কেহই ছিলেন না। তিনি নিয়ত মগ ও পর্তুগিজদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া, বহু রণতরীর সাহায্যে তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই সূত্রে তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি স্বাধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, পর-নিপীড়ন বা অন্যায় দৌরাত্ম্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। বার-ভুঞাদল মধ্যে, বীরত্বে ও চরিত্রবলে কেদার সর্বপ্রধান ছিলেন, ইহা বলা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইবে না।

১. কলিকাতা রিভিউ, ৫৩ ভল্যুম, ৩য় প্রবন্ধ, ৬৭ পৃষ্ঠা।
২. শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র।
৩. বিক্রমপুরের ইতিহাস।
৪. চট্টগ্রামেও এক মুকুটরায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।
৫. গুপ্ত মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশ : ... Cadry lord of the place where he was suddenly assaulted

with one hundred cosses, sent by Mansinga, Governor under the Mogal who having subjected that tract to his master sent forth this Navic against Cadry Mondary a man famous in these parts being Admiral, where after a bloudie fight Mondary was slain.

(Purchas's Pilgrims. Part. IV, Book V, page 513)

পারচেজ পিলগ্রিম হইতে ওয়াইজের সংগ্রহ : Finally, Purchas describing Sondip in 1602 gives us some insight into the civil war then waging between different nations at the mouths of the Meghna. When Bengal was conquered by the Mughuls, they took possessions of the island, but Candaray [Kedar Rai of Sripur] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it; but this roused the anger of the king of Arrakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, and Cadaray (Kedar Rai), which, they say, was true Lord of it, sent one hundred Cossi (Koshas) from Sripur to help him. the combined fleet were defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Kedar Rai. Cornalias, the leader of the Portuguese took his disabled vessels to Sripur to right them. Then he was attacked by one hundred Koshas under command of "Mondary, a man famous in these parts." The Mughul fleet was defeated and its Admiral Mondary killed.

৬. বাস্তবিক এই কালে রাজধানী একেবার পরিবর্তিত হইয়া ঢাকাতে আইসে নাই। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁর সময়েই রাজধানী ঢাকাতে সংস্থাপিত হয়।

৭. Raja Mansingh *** turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seign to Kilmak the Imperial Commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally over came the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja.

(Elliot's History of India, Vol. VI. P. 111)

৮. ইলিয়ট্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় কেদার রায় প্রবন্ধে ১৩১৪ সনের ঐতিহাসিক চিত্রে শ্রীনগর বলিয়া যে স্থানের নাম করিয়াছেন তাহা এই নগর ফতেজঙ্গপুর। শ্রীনগর 'শ্রী' হীন হইয়া বহুকাল পর্যন্ত অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে তথায় কতিপয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান বাস সংস্থাপন করে। ফতেজঙ্গপুরের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জ্যোতিবিদ্‌গণ পূর্ববঙ্গ প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের ইতিহাসে ইহাদিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। (বর্তমান গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোসাঞি ভট্টাচার্য ও কেদার রায়ের পরিণাম সম্বন্ধে জনপ্রবাদ

এ পর্যন্ত যতদূর লিখিত হইল, উহা আকবরনামা অবলম্বনে বলিতে হইবে। অতঃপর দেশীয় প্রবাদ বাক্যানুসারে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সারাংশমাত্র উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়কুলোদ্ভব গোসাঞি ভট্টাচার্য নামে এক মহাত্মা বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামভদ্রপুর গ্রামে বাস করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। তৎকালে বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মান্য ছিল। সর্ববিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, বেলপুকুরের ভট্টাচার্য ও অর্ধ-কালী-সন্তানেরা তৎকালে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তৎকালে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ভদ্রসন্তান শক্তির উপাসনায় নিরত ও স্থানীয় রাজারাও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। প্রতাপাদিত্য শাক্ত ছিলেন। "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" এই উক্তি যে তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের, ভুলয়ার ও বিক্রমপুরের অধিপতিরাও সকলেই শাক্ত ছিলেন ও শক্তির উপাসনা করিতেন। শক্তির কৃপাপাত্র হইয়া তাহারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া মায়ের সেবার জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, তৎসময়ে শাক্তগণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া, জনগণকে যথার্থ বিমোহিত করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে গোসাঞি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কয়েকটি ঘটনা এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে ; উহা কেদার রায়ের ইতিহাসের সহিত জড়িত।

একদা কেদার রায় গুরু ভট্টাচার্য মহাশয়কে জানাইলেন,—"গুরুদেব! অশোকাষ্টমী সমাগত প্রায়, তৎকালে আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রনীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি।" তখন ভট্টাচার্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,— "বৎস! তোমার বা আমার লাঙ্গল-বন্ধ[১] যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, লৌহিত্যদেব তোমার রাজধানীর পূর্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ব্রাহ্মপুত্রে স্নান করা হইবে।" তখন রাজা বলিলেন,—আমার রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত দিয়া তো মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিত্য বলিতেছেন?" তদ্বাক্যশ্রবণে ভট্টাচার্য মহাশয় নিজ সম্মুখস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন ও রাজার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,— "তুমি এই লেবুটি ব্রহ্মপুত্রের জলে নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে লৌহিত্যদেব স্বয়ং হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও ততদূর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রনদ প্রবাহিত হইতেছেন! যাও বৎস! আমার কথানুযায়ী কার্য করিয়া উহার যথার্থতা প্রত্যক্ষ কর।" রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় লোকসহ তরণী আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। লেবুটি স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল। তৎপশ্চাৎ রাজার নৌকাও চলিতে লাগিল, কিন্তু লাঙ্গল বন্ধ অতিক্রম করিয়া যখন লেবুটি লক্ষানদীতে পতিত হইল, তখন রাজার মনে একটুকু অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল। ক্রমে যেমন লেবুটি ভাসিয়া চলিল রাজাও তৎপশ্চাৎ স্বীয় নৌকা চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ লেবুটি কার্তিকপুরের পূর্বদিকে প্রবাহিত মেঘনার একটি ঘোর্ণার মধ্যে পড়িয়া আবর্তিত হইতে লাগিল। রাজাও তথায় নঙ্গর করিয়া নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্বে দেশময়

রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার তরণী নদী মধ্যে অবস্থান করায়, চতুর্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথায় সমবেত হইতে লাগিল। পরে যখন মধু শুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহস্র সহস্র মানব দেখিতে পাইল, নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কার-ভূষিত এক মূর্তির আবির্ভাব হওয়ায় ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ লেবুটি নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ দেবপুরুষ জলমধ্যে বিলীন হইয়া গেলেন। দর্শকগণের আর আশ্চর্যের ইয়ত্তা রহিল না। তাহারা মুক্তকণ্ঠে গোসাঞিজীর গুণগান করিতে করিতে ঐ পূত্যতীর্থজলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের ফললাভ করিল। পরে রাজা গুরুপদানত হইয়া তৎকথা পরীক্ষা করার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদবধি উহা কমলাপুর তীর্থ নামে অভিহিত হয়।

যে সময় মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন গোসাঞি ভট্টাচার্য মহাশয়, রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার রায় তাহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাহার মঙ্গলসাধন হয়, সেই কার্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্য-সাধন-মানসে মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া তদার্চনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রহ-বৈগুণ্যবশত কেদার রায়ের এই কার্য হিতের পরিবর্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়ায়।

গোসাঞি ভট্টাচার্য[২] বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বৈদিক বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত তাহারা কোন পূজাবন্দনাদিই প্রায় অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্নব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণপূর্বক, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজাবন্দনাদি করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় এই অনুষ্ঠানের দিনে, দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে উপস্থিত হওয়ায়, কেদার রায় উহাতে রুষ্ট হন। অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরুদেব পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্বাদ-নির্মাল্য গ্রহণ করিবার জন্য বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণে কেদারের উপর গোসাঞিজীর ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অর্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে তিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন নাই। তখন অক্ষমতার পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের রাজার এই পূজার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাহার কল্যাণ-কামনায় নানা উপদেশ প্রদান করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলি, তিনি উহা যখন শুনেন নাই, তখনই জানিয়াছি তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈব কার্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উপেক্ষা করিলেন। অতএব তাহার অশুভ অনিবার্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর।" এই বলিয়া শাণিত খড়্গ তুলিয়া প্রতিমার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিবামাত্র ঐ ক্ষত স্থান হইতে দরবিগলিত ধারায় শোণিত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি অন্তর্হিত হইলেন। এই সমাচার অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। গুরুদেবের শরাণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর তাহার দর্শন পাইলেন না।

এদিকে স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহ, মোগলসৈন্যে পুষ্ট ও রাজপুত বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বঙ্গের বীরপুত্রগণকে আক্রমণ করেন। মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সর্বাগ্রে বিদ্রোহিগণ মধ্যে ভেদ নীতির সঞ্চার প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। ইতি পূর্বেই তাহার অনেকটা লক্ষণ সঞ্চারিত হইয়াছিল। এখন ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি দেশদ্রোহীগণকে হস্তগত করিয়া তাহাদের নিকট দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমুদয়

বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলেন। তৎপর সাম্য নীতির ভাণ করিয়া সেই বীরপুরুষগণের নিকট বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন।

যাহারা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায়, মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ বহু পূর্বেই ভুএগ্রাদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, মুকুন্দ রায় ব্যতীত আর সকলেই ক্রমে ক্রমে মোগলের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়েন। এই সময়ে মানসিংহ কর্তৃক ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কেদার রায় আক্রান্ত হন।

মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্তী হইলে, তৎকর্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য করা হইবে না, তাহাকে পূর্ববৎ বন্ধুভাবে গ্রহণ করা যাইবে; অন্যথায় তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুবৎভাব প্রকাশ করেন, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে একটি মাত্র শ্লোক লিখিত ছিল। দূতেরা তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূতেরা প্রভুনির্দিষ্ট বাক্যানুসারে, যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা এবং মানসিংহের প্রদত্ত পত্র তাহাকে প্রদান করে। কেদার রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল।

"ত্রিপুর মগ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকলী
সকলপুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী।
হয়গজনরনৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি ঃ
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি।।"

ইহা পাঠান্তে, কেদার রায় উহার উত্তর সূচক আর একটি শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত তোমার প্রভুকে যাইয়া বল, আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাহার যতদূর ক্ষমতা থাকে তৎপ্রয়োগে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয় তাহার অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাবিলুণ্ঠিত হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইলে এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদার রায় উত্তর সূচক যে শ্লোকটি মানসিংহ সদনে প্রেরণ করেন তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্য ঃ।।"[৩]

মানসিংহ কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ ও উল্লিখিত কবিতা পাঠ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। এবার কিন্তু আর মানসিংহকে কেদার রায়ের বিনাশ সাধন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। দূতপ্রেরণের অব্যবহিত পরেই কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা জন্য দশমহাবিদ্যার মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমন সময় মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত এক গুপ্তঘাতক সহসা দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্যাননিমগ্ন মহাবীর কেদার রায়কে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। অনেকে অনুমান করেন গৃহশত্রু বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ এই বিষয়ের প্রধান প্রযোজক

ছিল। আরও প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার রায়ের ছিন্নমুণ্ড ভূপতিত হইয়াও "ছিন্নমস্তে নমস্তে" এই ইষ্টনাম উচ্চারণ করিয়াছিল।

বিক্রমপুরাধিপের এই আকস্মিক মৃত্যু নিবন্ধন, তৎপক্ষীয় সৈনিকেরা ভীত হইয়া পড়ে, কিন্তু মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরি ও সেনাপতি রঘুনন্দন রায় কোনও ভয় না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। অন্যান সেনানায়কের মধ্যে কালিদাস ঢালী, রামরাজা সরদার, পর্টুগিজ ফ্রান্সিস, সেখ কালু প্রভৃতি উহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু পরিণামে সেখ কালু ও ফ্রান্সিস বিপক্ষের বাধ্য হইয়া পড়ে। মানসিংহ এই সময়ে মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরিকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তাহারা এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তাহাদিগকে মার্জনা করা যাইবে এবং বিক্রমপুরের প্রতি কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজকার্য সম্পাদনের ভার, কেদার রায়ের বিধবা পত্নীর হাতেই ন্যস্ত রাখা যাইতে পারে।

একেই ত রাজা বিহনে সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হইয়াছিল, তাহাতে আবার দুইজন সেনানায়ক তাহাদের দল পরিত্যাগ করায় উহারা অধিকতর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মন্ত্রী রঘুনন্দন ও সেনাপতি রঘুনন্দন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই বিধেয়। রাণীকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করান হইল, তিনিও আর যুদ্ধের পোষকতা করিলেন না। পরে দুই রঘুনন্দন, কালিদাস ও রামরাজা এবং বিশ্বনাথ পত্রনবিশ প্রভৃতি অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ মানসিংহ সমীপে উপস্থিত হইয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যতদিন পর্যন্ত কেদার রায়ের মহিষী জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজকার্য তাহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রাণী লোকান্তরিত হইলে, মোগলরাজ প্রতিনিধির আদেশ মত্ চাঁদরায়ের রাজ্য বিভক্ত হইয়া, মন্ত্রী বৈদ্য রঘুনন্দন বিক্রমপুরের ও সেনাপতি কায়স্থ রঘুনন্দন ইদিলপুরের[৫] এবং সেখ কালু কার্তিকপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন। কালিদাস ঢালী ও রামরাজা সরদার দেওভোগ ও মূলপাড়া নামক পৃথক দুইটি তালুক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। পূণ্যময় স্বদেশ-প্রেমিক মহারাজ এইরূপে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, আপন কীর্তির ও বীরত্বের শত শত নিদর্শন রাখিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পথ প্রদর্শক হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। পরে কিন্তু তাহাদের অনুকৃতি বঙ্গে আর প্রদর্শিত হয় নাই। অতঃপর আমরা রায় রাজগণের কতিপয় কীর্তির ও শাসনের বিবরণ উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ চাঁদরায়ই উহার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি যাঁহারা অদ্যাপি বিক্রমপুরে বাস করিতেছেন, তাহারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন ; এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চাঁদ রায়ের উর্ধতন পুরুষেরা শ্রীপুরে বাস করিতেন, এবং চাঁদ রায় ও কেদার রায় ক্ষমতাশালী হইয়া শ্রীপুরের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। আমাদের আরও বিশ্বাস তাহাদের পূর্বপুরুষ ১৫০ বৎসর কেন তাহার বহু পূর্বে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য রাজোচিত যাবতীয় বন্দোবস্ত বিদ্যমান ছিল। তৎসন্নিহিত আলাফুলবাড়িয়া স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর পল্লীতে দেবালয় ছিল। এই স্থানগুলি কালীগঙ্গানদীর তটে সংস্থাপিত ছিল বলিয়া জানা যায়। জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে ক্রোর টাকা বেদি মূলে প্রথিত করিয়া তদুপরি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এজন্য ঐ শিবলিঙ্গের নাম হয় কোটীশ্বর। পরে স্থানের নামও কোটীশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। এই কোটীশ্বর পল্লীতে রায়রাজগণ কর্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণনির্মিত দশভুজা মূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণে উহাকে স্বর্ণময়ী বলিত। এই দেবালয় অথবা দেবমূর্তি মধ্যে ভুবনেশ্বরী ব্যতীত এখন আর কিছুই

বিদ্যমান নাই, তবে রায়বংশের যে দুটি চারিটি কীর্তির ক্ষীণ জ্যোতি বর্তমান থাকিয়া তাহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তদ্বিবরণ যতদূর পারিলাম পাঠকমহোদয়গণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

১ম— কাচকির দরজা। উহা এক বৃহৎ রথ্যা— ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ির হাট ও দেওভোগ প্রভৃতি স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনা নদীর তটবর্তী ঘড়িসার, কমলাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে বরাবর পদ্মাতট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই রাস্তা দুইটি বক্রগতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেনারাজগণের সময় যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সর্বাংশ রায়রাজগণের নিজকৃত নয়।

এই রাস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্টগণনা করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিলেন, মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকিগুঁড়া নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য সর্বদা নদীতে পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী হইতে ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামতো রাজধানীতে পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদরায় কর্তৃক ঐ রাস্তার পত্তন হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক কাচকি মৎস্য ধৃত হইয়া আনয়ন জন্যই যে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছে। এজন্য রাস্তার নামকরণ হইয়াছিল "কাচকির দরজা।" প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই চতুর্দিক প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশবাসীরা যে বর্তমান অধিবাসীগণের অপেক্ষায় অধিক সুখস্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২য়— কেদারবাড়ি। এই স্থানটি দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত। কেদার রায় এই স্থানে এক প্রকাণ্ড বাড়ির পত্তন করেন। উহার চতুর্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়া কয়েকটি অট্টালিকার ভিত্তি পর্যন্তও গ্রথিত হইয়াছিল; কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আজ পর্যন্ত ঐ স্থান কেদার বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম পালং স্টেশনের অন্তর্গত। বর্তমান সময়ে কেদার বাড়িতে কতিপয় ধনী সাহাসন্তান বাস করিতেছেন।

৩—রাজাবাড়ির মঠ। বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাচুরতলার 'ঠারিণ' বাড়ি; অপরটি মাঐসারের দিগম্বরীর বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে চাচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং মাঐসারে গোসাঞী ভট্টাচার্য সিদ্ধিলাভ করেন। কেদার রায় মাতৃ-নির্দেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাচুরতলার নিকট অপর একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া অনায়াসে সর্বদা দেবীর অর্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ি নির্মিত হইয়া রাজাবাড়ি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মিঃ রালফ ফিচ্ স্বীয় ভ্রমণ-পুস্তকে এই রাজাবাড়ির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে অদ্যাপি এক প্রকাণ্ড মঠ বর্তমান রহিয়াছে, উহা কেদার রায়ের কীর্তির একমাত্র ধ্বংসাবশেষ।[৬]

কীর্তিনাশা নদীর তটে এতাদৃশ প্রাচীন কীর্তি আর এখন দেখা যায় না। উত্তালতরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী খরবেগে যেমন একদিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমন ভ্রূকুটি সঞ্চালন করিয়া এক একবার ঐ উচ্চ মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। পরবর্তী কত অত্যুচ্চ সুদৃশ্য হর্ম্যরাজী কীর্তিনাশার উদারস্থ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! জানিনা, কেদার

রায়ের কি পুণ্যবলে এই মন্দির অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া তাঁহার বংশের একটি ক্ষীণজ্যোতিঃ লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে। এই মঠ নির্মাণ সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন কেদার রায় মাতৃ-সমাধির উপর এই মঠ নির্মাণ করিয়া "মাতৃদায় হইতে এতদিনে নিষ্কৃতি পাইলাম" এই বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র মঠের অত্যুচ্চচূড়া ভগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। হায়! যাঁহার স্নেহপারাবার সহস্র সহস্র দেবাসুরের মন্থনেও একবিন্দু বিশুষ্ক হইবার নয়, যাঁহার এক দিবসের দায় চিরজীবন লাভ করিয়াও পরিশোধ করিবার উপায় নাই, তাহার সমাধিক্ষেত্রোপরি সামান্য একটি মৃন্ময় মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেই মাতৃদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে যাওয়া মহা মুর্খতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কেদার রায়ের ন্যায় একজন বুদ্ধিমান রাজার দ্বারা যে এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছিল তাহা কোনও মতে বিশ্বাস করা যায় না। এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ যে একটি কিংবদন্তী পরিশ্রুত হওয়া যায় তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

আরব্ধকাল হইতে বহুবৎসরাতীতে মঠ প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাহার চূড়া আর হইয়া উঠিতেছে না। বহু আয়াসে স্থপতি উহা সংযোজিত করিয়া দিয়াছে, কেদার রায় সানন্দে উহা সন্দর্শন জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যে ভাবে নির্মিত হইলে উহার সুদৃশ্যতা রক্ষা পাইত কাজটা তদনুরূপ হয় নাই, এজন্য রাজা স্থপতিকে বড়ই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সে ভাবিল রাজহস্তে আর অব্যাহতি নাই, অথচ যাহা সাধ্যায়ত্ব তাহাই করিয়াছি; আমার প্রাণ তো যাইবেই তবে উহারও একটা অনিষ্ট করিয়া প্রাণত্যাগ করা কর্তব্য। তখন মিস্ত্রী বলিল যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তবে উহার পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি এই আদেশ প্রচার হইল, যদি কার্য সুন্দর মতো সম্পাদন না হয়, তবে নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। স্থপতিও সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশে মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভাঙিয়া তৎসহ নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ ভগ্ন স্থান বহুশতবৎসর যাবৎ একভাবেই বর্তমান ছিল। অধুনা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে রাজবাড়িতে একটি পুলিশ আউটপোস্ট বর্তমান আছে। এই স্থানটি ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

৪র্থ— ঢোল সমুদ্র বা কেশার মার দীঘী। ইহা একটি প্রকাণ্ড জলাশয়। প্রবাদ আছে যে কেশার মাতা পতিপুত্রহীনা হইয়া পতিকুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। বিক্রমপুরাঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া যে এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে, তাহাদের রমণীরা বিপন্নবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক প্রভু পরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে। এই নফর শ্রেণী আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কেহ যদি প্রভু পুত্রের 'ধাইভাই' হইতে পারে তবে তাহারা বড়ই সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাইভাই বিক্রমপুর অঞ্চলে আতাভাই নামে প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, তাহার পিতা কেশার মাকে তাহার ধাত্রী-পদে নিযুক্ত করিয়া পুত্রের প্রতিপালন ভার তৎকরে ন্যাস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ধাত্রীমাতার ইচ্ছানুসারে ঐ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দারা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ জলাশয়ের নাম হয় কেশার মার দীঘী। আরও প্রবাদ এই যে কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় এক মাইল স্থান চলিয়া যাওয়ার পর অন্য লোক কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এই জন্য ঐ দীর্ঘিকাও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হয়। অধুনা উহার অধিকাংশ মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই দীঘীর পারের হাটটি আজও বর্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন, ঢোলসমুদ্র ও কেশার মার দীঘী

দুইটি স্বতন্ত্র জলাশয়। রেনেলের মানচিত্রে ঢোলসমুদ্রের চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজনগরের রাজসাগর অপেক্ষাও উহার আয়তন বড় ছিল।

রায় রাজগণের রাজধানী ও বহু কীর্তি কীর্তিনাশা নদীর তরঙ্গাঘাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে কালীগঙ্গা নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরে শ্রীপুর, ফুলবাড়িয়া ও কোটীশ্বর বর্তমান ছিল। কালক্রমে পদ্মার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া কালীগঙ্গার সহিত মিলিত হয়। পরে উহা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রায় রাজগণের কীর্তিকলাপ ধ্বংস করিতে থাকে, এবং নয়পাড়ার বৈদ্য জমিদারগণের বহু কীর্তি কুক্ষিগত করে। এই সকল কীর্তি বিলোপ করিয়াই উহার নাম হর কীর্তিনাশা। উহাই পরে মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থান হইয়া পড়ে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রেনেল যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার নাম ও চিত্র স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়া রহিয়াছে। উহার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীপুর ও কোটীশ্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের নাম উহাতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ফুলবাড়িয়া ও ঢোলসমুদ্র তৎকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকায় রেনেল স্বীয় মানচিত্রে উহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে উহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। সমুদয়ই কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

১. ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের অংশবিশেষ। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়া ছিলেন বলিয়া উহার নাম লাঙ্গল-বন্ধ হয়। প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিবস এখানে বিস্তর লোক গমন করিয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকেন।

২. এই মহাত্মাকে কেহ কেহ চাঁদ ও কেদার রায়ের পুরোহিত এবং ব্রহ্মানন্দকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উহা অনুমোদন করিতে পারি না। বৈদিক-কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার রায়রাজগণের পুরোহিত ছিলেন। বিদ্যালঙ্কার পূর্বে অশূদ্রযাজী ছিলেন। পরে চাঁদ রায়ের বাধ্য হইয়া তাহার পৌরোহিত্য-কার্যে ব্রতী হন। এই কারণে তাহার জ্ঞাতিগণ কৃষ্ণদেবকে সমাজে স্থান দিতে স্বীকৃত হন না। তিনি তখন জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরান্তর্গত ধূল্লা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। প্রবাদ এই যে একটি লৌহনির্মিত মৎস্যে জীবন সঞ্চার করায়, ইনি কেদার রায়ের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ধূল্লা গ্রাম নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ার পর বিদ্যালঙ্কারবংশীয়গণ ধলছত্র গ্রামে বাস করিতেছেন।

রায়রাজগণ গুরুদেবকে রামভদ্রপুর ও সাজনপুর এবং পুরোহিত মহাশয়কে ধূল্লা, বেড়াগাঁ ও মানগাঁ প্রভৃতি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

৩. বৈদ্যবংশীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ সেন এই সময়ে কেদার রায়ের পত্রনবীস বা মুন্সীর কার্য করিতেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। এই শ্লোকটি পণ্ডিত বিশ্বনাথ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চাঁদরায় কেদাররায় বিক্রমপুর শাসক।
সুয়ী বংশী বিশ্বনাথ তৎপত্রলেখক।।

গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা দেখ।

৪. এই দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরী মূর্তি নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাখড়িয়া নিবাসী বৈদ্যচৌধুরি মহাশয়গণের বাড়িতে বিদ্যমান আছেন। দেবীর পাদোপরি কেদার রায়ের নাম অঙ্কিত আছে, রায়রাজগণ প্রতিষ্ঠিত দশমহাবিদ্যা মধ্যে উহা অন্যতম। ১২৯১ সনের চৈত্র সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন "চাঁদ রায় তারামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্তি স্থাপন জন্য চাঁদ রায় এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন" (বর্তমান গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৫৫)। আমরা কিন্তু তাহার এই কথাটি অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ চাঁদরায় দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহাই দেশপ্রসিদ্ধ। বিশেষ পূর্বোক্ত ভুবনেশ্বরী মূর্তি বিদ্যমান থাকিয়া আজি পর্যন্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা ইহাই হইল দশমহাবিদ্যা। ভুবনেশ্বরী বিদ্যমান থাকায় তারা মন্দির না হইয়া দশমহাবিদ্যার মন্দিরই সূচিত হইতেছে। দেশীয় প্রবাদ অনুসারে

আরও জানা যায় যে, রায়রাজগণ ছিন্নমস্তার উপাসক ছিলেন' কেদার রায়ও মৃত্যুসময়ে ওই ইষ্টদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করেন।

৫. মন্ত্রী রঘুনন্দন, নয়পাড়ার জমিদার বংশের ও সেনাপতি রঘুনন্দন ইদিলপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। বিক্রমপুরের ইতিহাসে সেনাপতি রঘুনন্দনের পুত্র কমলশরণকে কার্তিকপুরের জমিদার নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। ইতিপূর্বে বারভুঞা প্রবন্ধে কমলশরণকে সেনাপতি বলা হইয়াছিল। বাস্তবিক কমলের পিতা রঘুনন্দনই সেনাপতি ছিলেন। বিক্রমপুরাঞ্চলে ইহারাই সর্বপ্রথম জমিদার।

৬. শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই মঠটিকে চতুশ্চূড় মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৩১৪ সন বৈশাখ ঐতিহাসিক চিত্র ২০ পৃষ্ঠা)। বাস্তবিক উহা ঠিক নয়। মাত্র মঠটি একটি চূড়া দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, আর নাই। বর্তমান সময়েতে কেহ কেহ বলেন ও ইতিহাসে লিখিয়াছেন উহা হয়তো বৌদ্ধদের সময়ে নির্মিত মঠ হইতে পারে। অন্যথা মঠ পূর্বদ্বারী কেন হইবে? হিন্দুদের দেব দেবীর কোন গৃহ উত্তর দ্বারী বা পূর্ব দ্বারী থাকে না। আমরা পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইব যে এই উক্তির কোন মূল্য নাই। দেবগৃহ অবস্থা ভেদে সর্বদ্বারীই হইতে পারে। কেবল গুপ্ত মহাশয় নন, আজ কাল বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখক মাত্রেই এই যুক্তির বলে অনেক দেবগৃহকে বৌদ্ধমঠ ও অনেক দেব মূর্তিকে বৌদ্ধ বিগ্রহ বলিয়া অনুমান করিয়া লেখনি সঞ্চালন করিতে সঙ্কুচিত হন না।
(বর্তমান সংকলন ১১৭ পৃঃ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়

বঙ্গদেশের যে কয়েকটি হিন্দু ভুঞার পরিচয় পাওয়া যায়, বাকলার কন্দর্প রায় তাহার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আকবারনামা গ্রন্থে কন্দর্প স্থলে দর্পনারায়ণ উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে কন্দর্পের পিতামহ পরমানন্দ রায়ের নাম প্রেমানন্দ বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই পরমানন্দ রায় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের বসু রাজবংশের রাজত্ব প্রথম আরম্ভ হয়। ডাক্তার ওয়াইজ বারভুঞা প্রবন্ধে এই মহাত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের স্থাপয়িতা দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুরবাসী ও "দে-বংশীয়" বলিয়া পরিচিত। প্রবাদানুসারে তাহার প্রথম পরিচয় যদিও ৬০৬ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ সময়ের অব্যবহিত পরে বক্‌তিয়ার খিলিজী সেনরাজগণকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন। সেনরাজগণ তৎসময়ে বিক্রমপুর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন এইরূপ অবগত হওয়া যায়। তৎপরে সেন রাজবংশধরেরা আরও প্রায় শতবৎসর পর্যন্ত ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ দনুজকে যাঁহারা সেনবংশীয় বলেন সন হিসাবে তাহারা কখনও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।

সেনবংশীয় দনুজমাধব ও এই দনুজমর্দ্দন যে পৃথক ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দনুজমাধবের রাজত্ব সময়ে বাদসাহ বুলবন, মুঘুসুদ্দিন তুগলকের দমনার্থ আগমন করিলে পর[১] দনুজ বাদসাহের সাহায্য করিয়াছিলেন। দনুজ তৎসময়ে বিক্রমপুর ও সোনারগাঁ রাজত্ব করিতেন, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

আজকাল কয়েকজন খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই দনুজমর্দ্দন দেবকে ও সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজমাধবকে একই ব্যক্তি স্থির করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির করিতেছেন। কিন্তু যখন বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মাধবপাশার রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া, ঐ রাজবংশের ইতিহাস প্রথম সংগ্রহ করেন, তখন তিনি তৎকালীন রাজাদের নিকট হইতে অবগত হইতে পারেন না যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ দনুজমর্দ্দন সেনরাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন বিক্রমপুরবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর শিষ্য অথবা ভৃত্য বলিয়াই দনুজ পরিচিত ছিলেন, এইমাত্র দেখা যায়। কাজেই মিত্র মহাশয় দনুজ দেকে সেনবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় তদীয় বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহার মতেও কয়েকটি মাত্র অনুষ্টুপ ছন্দে বিরচিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া দনুজমাধব ও দনুজমর্দ্দনকে কখনও এক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

"লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর মাধবসেন কিছুকাল নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করেন। তিনিই রাঢ়ীয় কুলজীগ্রন্থে দনৌজামাধব নামে উক্ত হইয়াছেন। তাহার দনৌজা নাম কেন হয় তাহা বুঝা যায় না। তিনি রাঢ়ীয় কুলীনদিগের চারিবার সমীকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন যে হরিমিশ্রের কারিকা মতে তিনি কেশবসেনের পুত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হরিমিশ্রের কারিকানুসারে তিনি বল্লাল সেনের পৌত্র এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্র।

"এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণসমাযুক্তা দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ।।
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধঃ কৃতবন্তশ্চ সৰ্ব্বে ভূধরপুঙ্গবাঃ।।"
(হরিমিশ্র)

"এখানে 'পিতামহ' শব্দে বল্লালসেনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে— লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্য করা হয় নাই।" (পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ৩২১ পৃষ্ঠা)

পরেশবাবু পুনশ্চ বলেন যে মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে—

"নবদ্বীপেহ্বসদ্রাজা তব পশ্চাৎ পিতামহঃ।
যদা পিতৃবিরোধেষু বৈদ্য শ্রেণী দ্বিধাহভবৎ।।"

"যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বল্লালের নিকট কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হন, তাহাদের অনেকের পুত্র মাধবসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং মাধবসেন এবং দনৌজামাধব যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারও পৌত্র দনৌজামাধবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।"

"বঙ্গজকায়স্থকারিকার কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, সুবর্ণগ্রামের দনুজ রায় কিংবা দনৌজমাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইয়া পরিশেষে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত কারিকাগ্রন্থগুলির উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করা কর্তব্য নহে। দনুজরায় ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্যমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের পুত্রগণ দনুজরায়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর বোধ হয় না।" (৩২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কবি কীর্তিবাস বিরচিত একটি রচনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ কবি দনুজরায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি এইরূপ কথা লিখেন নাই যে দনুজমর্দন ও দনুজমাধব একই ব্যক্তি। অতএব সেন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে একটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার ভাবও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তদ্বিরচিত বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে দনুজ রায় সম্বন্ধে যে একটি নতুন কথা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তদবলম্বনে দনুজ রায়কে সেনবংশের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতঃপর আমরা উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বল্লাল সেনের * * * "এক উপপত্নীজাতপুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপের করদ রাজা করিয়াছিলেন। পাঠান কর্তৃক বৈদ্যরাজপাট নির্মূল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন।"

"কালুরায় ও তদ্বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থজাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, এজন্য কায়স্থ-সমাজে বিশেষ মাননীয় ছিলেন।" (১১৮—১১৯ পৃঃ)

"চন্দ্রদ্বীপের রাজ দনুজরায় নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইলে, "তাহার ভাগিনেয় (মতান্তরে তাহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকারী হইয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্যি রাজকুলীন কায়স্থসন্তান এবং তাহার মাতামহ-কুল বাঙ্গালাদেশের সম্রাটবংশজাত। এইজন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিলেন।" (১১৯ পৃষ্ঠা)

ডাক্তার জেমস ওয়াইজের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[২] তিনি এই দুই দনুজকে সম্ভবতঃ এক বলিয়াছেন[৩]। পরে দনুজমর্দনদেকে ভৃত্য বলায়, কথার সামঞ্জস্য হয় না। ৩৫৫ পৃষ্ঠার নোট দেখ।

এতৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপ্রণীত জাতিতত্ত্ব-বারিধির "বল্লালমোহমুদ্গর" প্রবন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে দনুজমাধব ও দনুজমর্দন দে যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার লিখিত গ্রন্থ হইতে কোনও অংশ গ্রহণ করিলাম না। অপর যাঁহাদের মত উদ্ধৃত করিলাম তৎপাঠেই পাঠক মহোদয়গণ এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের অধিক লেখা নিস্প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিক্রমপুরের রায় রাজগণ ও ভূষণার দেবংশীয় রাজগণ ও চন্দ্রদ্বীপের দেরাজগণ একই বংশতরুর পৃথক পৃথক শাখা মাত্র। এখন দনুজমর্দন কিরূপে বাঙ্গালাদেশের আধিপত্য লাভ করেন, তদ্বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী কাত্যায়নী দেবীর উপাসক ছিলেন। চন্দ্রশেখর বিবাহ সময়ে জানিতে পারিলেন যে তাহার নবপরিণীতা বনিতা ও তাহার উপাস্যা দেবী একই নামে অভিহিতা। তখন তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইষ্টদেবীর নাম গ্রহণ সময়ে কিরূপে তাহাকে মাতৃসম্বোধন করা যাইবে। এই চিন্তায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে যে সময়ে চন্দ্রশেখর একখানি তরী আরোহণ করিয়া অকুল সাগরজলে ভাসিতেছিলেন, তখন দেখিতে পান যে একটি ধীবরবালিকা ঐ অসীম জলরাশির মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে মৎস্য ধৃত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাহার মনোমধ্যে যারপরনাই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি কে এবং কোন সাহসে একাকিনী এই অকুল পারাবারে অবস্থান করিতেছ? তদুত্তরে বালিকা বলিল যে মদীয় প্রিয়শিষ্য অকুল পাথারে ভাসিতেছে, আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমি তাহার অপেক্ষায় এই সলিলরাশি মধ্যে অবস্থান করিতেছি। তাহার ভ্রম নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহার সহধর্মিণীর নামের সহিত আমার নামের ঐক্যতা প্রযুক্ত সে কিরূপে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিবে তাহা ভাবিয়াই আকুল হইয়া গৃহ পত্যিাগ করিয়াছে। কিন্তু যদি বুঝিত যে জগতের যাবতীয় নরনারী ও সমুদয় বস্তুনিচয়ই আমাতে প্রতিবিম্বিত এবং আমারই অংশসম্ভূত, তাহা হইলে সে কখনও স্ত্রী বা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবাগি হইত না। বালিকার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারই ইষ্টদেবী আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সন্দেহ দূরীভূত করিতেছেন। তখন ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাহাকে বলিলেন, মাতঃ আমার ভ্রম এতদিনে নিরসন প্রাপ্ত হইল, এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়? দেবী বলিলেন, যাও বৎস, এখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণীতা বনিতাসহ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ কর।

দেবী আরও বলিলেন, এই যে অকুল সাগর বিদ্যমান দেখিতেছ, ইহা অতি ত্বরায় বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে এবং এই স্থান দ্বীপে পারিণত হইবে। কিছুকাল পরে এইস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জলে অবতরণ করিয়া অন্বেষণ করিও, তবেই আমার প্রকৃত কাত্যায়নী ও মদনগোপাল বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইবে[৪]। যে কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিয়া এই স্থানে সংস্থাপন করাইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি সংসারাসক্ত নও, অতএব রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? প্রবাদ যে দেবীর আদেশ মতো চন্দ্রশেখর ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, উহা আপনার প্রিয় ভৃত্য বিক্রমপুর নিবাসী দনুজমর্দন দেকে সমর্পণ করেন। দনুজ দেবীনির্দিষ্ট চড়াতে ঐ কাত্যায়নী ও মদনগোপাল সংস্থাপন করিয়া, ঐ স্থানে নাম স্বীয় প্রভুর নামানুসারে "চন্দ্রদ্বীপ" রাখিয়াছিলেন। এই হইতে দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। এই মহাত্মাই চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সংস্থাপয়িতা বলিয়া পরিকীর্তিত[৫]।

সমতট বঙ্গের পূর্ব ও দক্ষিণবর্তী ভূভাগ যাহা অধুনা দৃষ্ট হয়, উহা অধিকাংশ সমুদ্রজলে

নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে চড়া পড়িয়া উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপবৎ ভূখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গা নদী কর্তৃক উচ্চ ভূভাগ হইতে পঙ্কিল প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি বিধৌত হইয়া স্রোতবেগে যে স্থানে কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে তথায়ই এইরূপ দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থানই সোন্ধা বা সুগন্ধা নদীর জল নিঃসরণের সহিত উদ্ভূত হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে দেবাদিদেব যখন সতীর মৃত্যুজনিত শোকে আতুর হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পর্যটন করিয়াছিলেন সেই সময় বিষ্ণু তদীয় চক্রদ্বারা শবদেহ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই কারণে সতীর দেহ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে নিপতিত হয়। ঐ স্থানগুলি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, সোন্ধার জলে এইরূপে দেবীর নাসিকা পতিত হওয়ায় উহার নাম হয় সুগন্ধা। পরে ঐ নদী ক্রমে মজিয়া যাওয়ায় বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হইয়া সোন্ধার কুল নামে পরিচিত হয়। পূর্বে সোন্ধার কুল বলিয়া একটি পরগণার পরিচয় ছিল। পরিণামে উহা সিলেমাবাদ ও হাবেলী সিলেমাবাদ নামক পরগণাদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপ সম্ভবতঃ এই সুগন্ধার জলে নিমগ্ন ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া কোন পরগণার পরিচয় পাওয়া যায় না। আইনই আকবরীতে ও আকবরনামাতে উহার নাম বাকলা বা ইসলামপুর। আইন ই আকবরীতে বাকলা সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাই উল্লেখ করা গেল।

"সরকার বাকলা মহালের সংখ্যা চারি। রাজস্ব ৭১৩০৬৮৫ দাম, ইসলামনপুর (বাকলা) ৪৩৪৭৯৬০, শ্রীরামপুর ২৫০০০০, সাহাজাদপুর ১৫৫৩৪৪০, ইদিলপুর ২৫৫৩৪৪০ দাম। এই সরকারে ৩২০ অশ্বারোহী ও ১৫০০০ হাজার পদাতিক সরবরাহ করিত। অধুনা বাখরগঞ্জের রাজস্ব হিসাবে যতগুলি পরগণার নাম দৃষ্ট হয়, উহার অধিকাংশই পূর্বে বাকলার অন্তর্গত ছিল। পরে পৃথক পৃথক পরগণাতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণতঃ আরিয়লখা নদীর দক্ষিণ, বলেশ্বর নদীর পূর্ব, সমুদ্রের উত্তর ও মেঘনা নদের পশ্চিম ভূভাগ বাকলা নামের পরিচিত ছিল। অদ্যাপি বাখরগঞ্জের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আপনাদিগকে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

দে-বংশীয় রাজাদের বংশাবলী

মিঃ বিভারেজ রাজবংশের তালিকা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।[৬] কোন কোন মতে শ্রীবল্লভের পুত্র জয়দেব দেব, তৎকন্যা কমলা। বঙ্গীয়সমাজ নামক গ্রন্থের মতে বংশাবীল—

দনুজমর্দন
|
রমাবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
জয়দেব দেব
|
কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ

পরমানন্দ বসুবংশীয় ছিলেন। মাতামহের সিংহাসন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। আইন-ই-আকবরীতে পরমানন্দকে রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করায় বোধ হয়, পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুই শ্বশুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। পরে এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

দে-বংশের রাজ্য লোপ হইলে পরমানন্দ বসু বাকলার রাজাসনে আসীন হন। তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে দক্ষিণবঙ্গে জলপ্লাবিত হইয়া যেরূপ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার স্থূল বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৭]

পূর্বোদ্ধৃত বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, পরমানন্দের পূর্ববর্তী রাজা ঐ জলপ্লাবনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন দেখা উচিত যে, এই রাজা কে? পরমানন্দকে রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহার পিতাই রাজা ছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে জামাতা কখনও কন্যা বা দৌহিত্র বর্তমানে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরমানন্দ যদি ঐ দুর্ঘটনার সময়ে শিশু থাকিতেন, তবে সম্ভবত তাহার মাতার নামেই রাজ্য চলিয়াছিল। কারণ পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুর কোন সুনাম বা কীর্তির বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না ; কিন্তু তাহার মাতা কমলার কীর্তির কিছু কিছু নিদর্শন আজিও বাখরগঞ্জ জিলাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমলা রাজধানী কচুয়ার নিকট কালাইয়া নদীর অনতিদূরে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। এরূপ বৃহৎ জলাশয় সচরাচর দেখা যায় না। উহার কতক ভগ্নাবশেষ বর্তমান থাকিয়া অদ্যপি কমলার প্রচুর ঐশ্বর্যের কথা জনগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রবাদ এই যে, জলাশয় খননে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, উহার পরিসর তিন দ্রোণ তের কানি স্থান ব্যাপী ছিল। এই সকল কারণে আরও বোধ হয় যে, দে-বংশের রাজ্যাবসানের পর, কতককাল রাজ্যভার পরমানন্দের মাতার হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং দে-বংশীয় শেষ রাজাই জলপ্লাবনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

রাজা পরমানন্দ রায় কায়স্থগণের ১১।১২।১৩ পর্যায় লইয়া বঙ্গজ কায়স্থের সমাজ সমীকরণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কারণ যতদিন পর্যন্ত দে-রাজবংশ সমাজপতিপদে বৃত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত সমুদয় কুলীনগণ তাহাদের অধীনতায় অবস্থান করিতে ও সমাজপতির মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরে যখন

কুলীনবংশ হইতে রাজা নির্বাচিত হইয়া সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন অনেক কুলীনের পক্ষেই উহা অপ্রিয়কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমকক্ষ লোকের অধীনতা বিশেষ তাহার সম্মান বর্ধিত করিয়া দেওয়া বড়ই মর্মবেদনার কারণ বলিয়া কেহ কেহ তখনই সেই সমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এতদ্বিষয় আমরা যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সহ পরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক থাকিলাম। যাহা হউক বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে ঘটকেরা চন্দ্রদ্বীপের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়া গিয়েছেন। তাহাদের মতে চন্দ্রদ্বীপ শিরঃস্থান, যশোহর সমাজ বাহুস্বরূপ, বিক্রমপুর সমাজ উরুদ্বয়সদৃশ, ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ পদদ্বয়তুল্য, বাজু গুহ্য এবং তদেতর সমাজ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

পরমানন্দ রায়ের পুত্র জগদানন্দ রায়। বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। এজন্য তৎপুত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় নদী প্রধান প্রদেশে বসতি করা বিপজ্জনক মনে করিয়া কচুয়া হইতে রাজধানী তুলিয়া মাধবপাশা নামক স্থানে সংস্থাপন করেন।[৮] কেহ কেহ বলেন রাজা জগদানন্দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এজন্য মৃত্যুকালে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিবশে গঙ্গা বা পদ্মা জলবৃদ্ধি করিয়া রাজপুরী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জন করেন।[৯] যেরূপেই হউক, জগদানন্দের মৃত্যু যে জলে পতিত হইয়া হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসু-রাজবংশ মধ্যে কন্দর্পনারায়ণ খ্যাতনামা সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উজ্জ্বল কীর্তিস্বরূপ ছিলেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সন্দ্বীপের যুদ্ধে তাহার কম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবৎসর মাসুম কাবুলীর সহিত সাহাবাজ খাঁর যুদ্ধকালে কন্দর্পনারায়ণ সাহাবাজকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া আইন-ই-আকবরী প্রণেতা তাহাকে নারায়ণ ভৌমী (ভুঞা) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] হোসেনপুরের যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণ পাঠান সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া ছিলেন। সাতগাঁর শাসনকর্তা মীর জানজাদ খাঁ মোগল বাদসাহের পক্ষ সমর্থন করিলে, পাঠান কতুল খাঁ তাহাকে আক্রমণ করেন। তখন মীর জানজাদ দক্ষিণবঙ্গের সলিমাবাদে পলাইয়া যান, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া কন্দর্প রায় ও পর্তুগিজ প্রতাপ রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবরনামা গ্রন্থে এক স্থান কন্দর্পনারায়ণকে দর্পননারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বার-ভুঞার বিদ্রোহদলের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য কায়স্থ-সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। সমাজ-সমন্বয় সময়ে ভুলুয়া-রাজ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র অপেক্ষা যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সমধিক সম্মান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে ভুলুয়া ও চন্দ্রদ্বীপের মধ্যবর্তী মেঘনা নদের কতকগুলি দ্বীপ লইয়া বড়ই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। প্রবাদ এই যে এই বিবাদ নিবন্ধন রামচন্দ্র ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দি করিয়া স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু এই কথা কতদুর সত্য, তাহা লক্ষ্মণমাণিক্য প্রকরণে প্রদর্শন করা যাইবে।

রামচন্দ্র যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু এই বিবাহের আমোদোৎসবাদি পরে ভয়ানক বিষাদে পরিণত হয়। প্রবাদ, রামচন্দ্রের একজন অনুচর রামাই ভাঁড় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া বিবাহরাত্রিতে রাজ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করে। পরে রাণীর সহিত হাস্যকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলে, পুরুষ বলিয়া-ধৃত হয়। প্রতাপাদিত্য উহা অবগত হইয়া পরিচারকের পরিবর্তে তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হন। এমন কি তিনি ক্রোধান্ধ ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জামাতৃবধের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। এই সমাচার প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্যের কর্ণগোচর হইলে পর তাহারা বিষম

প্রমাদ গণিয়া রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীবেশে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দেন। পরিণামে ব্যাপার এইরূপ ঘটিল যে, সেনাপতি রামমোহনের[১১] প্রচুর সাহায্যে রামচন্দ্র নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে নব পরিণীতা বনিতাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এদিকে প্রতাপের কন্যা ইন্দুমতী প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া ক্রমে কৃশা ও মলিনা হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজমহিষী রাজাকে অনেক বুঝাইয়া কন্যাকে জামাতৃসদনে প্রেরণ করেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাহাকে কোন মতে গ্রহণ করিলেন না। ইন্দুমতীর সখীরা তাহাকে এই অবস্থায় পুনরায় পিত্রালয়ে যাইতে বলেন। রাজতনয়া তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়া বলিলেন,— "তোমরা আমাকে পতির রাজ্য মধ্যে যে কোনও স্থানে রাখিয়া যাও, আমি আর পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিব না।" এই সকল কথা ক্রমে রামচন্দ্রের জননীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়া ও তাহার মত গ্রহণ করিয়া পুত্রবধূকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন।[১২]

রাজবধূ ইন্দুমতী চন্দ্রদ্বীপের যে স্থানে প্রথম নৌকা হইতে অবতরণ করেন, তাহার সম্মানার্থে সেই স্থানে একটি বাজার সংস্থাপিত হয়। এখনও ঐ বাজার "বৌঠাকুরানির হাট" নামে প্রসিদ্ধ।

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রামচন্দ্র মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং প্রতাপের পূর্ব আচরণ স্মরণ করিয়া শ্বশুরের কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন নাই। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্তিনারায়ণ। তৎপুত্র প্রতাপনারায়ণ[১৩] ও তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ। এই প্রেমনারায়ণের সহিত বসু রাজবংশের রাজ্যের অবসান হয়। তৎপরে দৌহিত্রসূত্রে মিত্রবংশ চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী প্রাপ্ত হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থাদি ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখকগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। অতএব আমরা অতি সংক্ষেপে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-বিবরণ পরিসমাপ্ত করিলাম।

বাকলা সম্বন্ধে মিঃ রালফ্ ফিচ্ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম আমরা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নিম্নে তাহার স্বলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১৪] রাজা কন্দর্প রায় যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। রালফ্ ফিচ্ তাহার বিবরণীতে ঐ রাজার বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

ঘটক মহোদয়গণ তাহাদের কারিকায় কন্দর্পরায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১৫]

রামচন্দ্র রায়ও একজন বুদ্ধিমান ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। পর্তুগিজ পাদরিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম প্রচারের জন্য, ফন্‌সেকা, ফর্নাণ্ডেজ, বার্ডয়েস ও সোসা নামীয় চারিজন পাদরি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন (১৫৯৮—৯৯ খ্রিস্টাব্দে)। ইহাদের মধ্যে ফন্‌সেকা বাক্‌লায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় অষ্টমবর্ষীয় বালক। তথাপি তিনি যেরূপভাবে এই বিদেশীয়দিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফন্‌সেকা প্রভৃতি তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

রাজার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ফন্‌সেকা বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকান অধিপতির রাজ্যে গমন করিতেছি। আমাদের ইচ্ছা আপনার রাজ্য মধ্যে আমাদের ধর্ম প্রচার ও গীর্জা স্থাপন কার্যে কোনওরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তৎপ্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষিত হয়।" রাজা তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ফন্‌সেকা এই বিবরণ গোয়ার প্রধান পাদরি 'পাইমেন্টের' নিকট প্রেরণ করেন। পাইমেন্ট স্বীয় মন্তব্য সহ উহা ১৬০১—২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। "পার ডি জেরিব" তৎকৃত

'ডিস্ত্রিইস্ ওরিয়্যালন্টাল' নামক গ্রন্থে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। বিভারেজ এতৎসম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল[৬]।

---

১. মুখুসুদ্দিন পলাইয়া যাজনগর (ত্রিপুরা) রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২. The first of the Chandradwip family was Danuj Mordon De. He is styled by the Ghatak as "Raja" and he was the first Samajpati or president of the Bangaja Kayasthas.

* * * * *

It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Rai of Sunargaon, named Dhanuj Rai, who met the Emperor Balban on his march against Sultan Maghisuddin in the year 1280. It is not likely that the Mahommedan usurper would have allowed a Hindu to remain in independence at his capital Sunargaon It the principality of Chandradwip extended to the river Megna, the agreement made with the Emperor that he would guard against the escape of Sughril to the west becomes intelligible (Quoted from Sir H Elliot's History of India, Vol. III P. 116, in J. A S. B. III, 1874 P 206.)

৩. "নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমর্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।" গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪. ওয়াইজের পুস্তকে জানা যায় যে দনুজমর্দন স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন।

৫. Another legend conneted with Chandradwip is that in former days a holy ascetic, by name Chandrashekhar Chakrabarti, was in the habit of travelling about with a servant Danujmordon De. One night the goddess Bhagabati appeared to him in a vision and told him that in the river near his boat were several images which he must secure The following morning he made his servant dive for them, and each time he brought up a stone image fortunately He did not try a third time or he would have found Lakhmi, the goddess of prosperity. The two images he found in the river Sonda, and they are still shown by the Chandradwip family.

Chandrashekar then predicted to his servant that the sea would soon become dry land and that he would be the Raja of it. He also told him to call it Chandradwip after the name of his master. J. A. S. B. Vol XLII , pages 206.

৬. মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ দেখ।

৭. In the Ain-i-Akbari, (Gladwin's Translations) there is the following notice of Bakla : Sarkar Bakla is upon the banks of the sea ; the fort is situated among trees. On the first day of the moon, the water begins to rise and continues increasing till the 14th, from which time to the end of the month it decreases gradually everyday. In the twenty-nineth year of the present reign one afternoon at 3 O'clock there was a terrible inundation which delued the whole Sarkar. The Rajah was at an entertainment, from which he embarked in a boat : his son Paramananda Roy, with many people climbed to the top of a Hindu temple and the merchants be took themselves to the high land. It blew a hurricane with thunder and lightning for five hours, during which time the sea was greatly agitated. The houses and boats were swallowed up nothing remaining but the Hindu temeple on the height. Near 200,000 living ereatures perished in this calamity.
Beveridge Antiquities and History, page 27.

৮. প্রথমতঃ বাসুরকাটি, পরে হোসেনপুর, তৎপরে ক্ষুদ্রকাটি, সর্বশেষে মাধপাশায় রাজধানী সংস্থাপিত হয়।

৯. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরি ; বি-এল প্রণীত বঙ্গীয় সমাজ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

১০. ইলিয়ট ৩য় ভলুম, ৪১২ পৃষ্ঠা।

১১. বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উজীরপুরের প্রাচীন জমিদারবংশের আদিপুরুষ।

১২. কেহ কেহ বলেন, রামচন্দ্র রায় তাহাকে গ্রহণ না করায় ইন্দুমতী কাশীধাম যাইয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

১৩. কোনও কোনও মতে প্রতাপনারায়ণের পূর্বে বাসুদেবনারায়ণ নামে এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়।

১৪. "From Chittagong in Bengal, I came to Bacoler ; the king where of is a gentleman very well disposed and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful and store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses are very fair and high-builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste.

The women wear great store of silver hoops about their necks and arms and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephant's teeth."

১৫. "কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ।।
অক্ষৌহিণীপতিবীরঃ সব্যসাচীসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ।।
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ।।
স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটিসংজ্ঞকম্'
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ।।
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাত্তথা।
রথীনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।।

"মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে.

"চতুর্ব্বর্ষসহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ। শমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপস্তদা মহৎ
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি। মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ।।

১৬. "And it appeared to be by the disposition of our Lord that when I was about to go to Arracan in the place of Fırnandez who was ill with fever, I too should fall ill, and should be transfered to Cıandeca, so that in this journey the company gained a residency ın the kingdom of Bacala. I had scarcely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, bu whose descreation surpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waitıng for me, all the nobles and captains rose up and I, a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him After compliments he asked me where I was going and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the company trusting His Highness would give permission to the erection of churches and the making of Christians. The King said 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualities' and so he gave me a letter of authority and also assigned a maintenance sufficient for two of us.

(Beveridge's Bakargunj, pp. 30-31.)

চতুর্দশ অধ্যায়

মুকুন্দ রায়

বারভূঞা দলের মধ্যে ভূষণার মুকুন্দ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর জমিদারগণের মধ্যে যাহারা কিছুমাত্র স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, বাদসাহ বা তৎপ্রতিনিধিগণকে গ্রাহ্য করেন নাই, বরং সময় সময় প্রতিযোগীভাবে সমরাঙ্গণে অবতরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় বলবীর্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের অনেকের নামই তৎসময়ের পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এস্থানে যে মহাত্মার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম, তাহার নামও সেইরূপভাবে গৃহীত হইয়া মহামনা আবুল ফাজেল কৃত "আকবরনামা" গ্রন্থে চির অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থে মুকুন্দ রায় "মুকুন্দ জমিদার" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন। সাধারণত লোকে ঐ স্থানকে ভূষণা মামুদপুর বলিয়া থাকে। অধুনা মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মামুদপুর এবং উহার পূর্ব তীরে ভূষণার অস্তিত্ব বর্তমান দেখা যায়। বোধ হয়, যেমন পদ্মা নদীর বেগ পরিবর্তিত হইয়া কীর্তিনাশা নাম ধারণপূর্বক বিক্রমপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্রূপ গোড়াই নদীর গতি পরিবর্তনে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণাও মামুদপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূষণা এখন কেবল মাত্র একটি পুলিশ স্টেশন বক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ব গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি জনগণের গোচরীভূত করিতেছে।

সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্বে সাগর স্রোত প্রবাহিত হইত। ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা শত শত ক্রোশ পর্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সম্যকরূপে উহার জল নিঃসরণ না হওয়ায় কোথাও বা হ্রদরূপে বর্তমান রহিয়া গিয়াছে। এই সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়লখা নদীর পশ্চিম তীর হইতে মধুমতীর পূর্ব তীর পর্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেইস্থানেই মৃত্তিকার কিছু নিম্নে একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দল-দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহাও ঠিক তদনুরূপ। এজন্য অনুমান হয় যে বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল দল ছিল, কালক্রমে উহা পচিয়াই এইরূপ মৃত্তিকা রাশির ও উহা ক্রমে নিম্নে পতন হওয়ায় স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। বোধ হয় ফরিদপুর পূর্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত থাকিয়া পরে চাকলে ভূষণার অন্তর্ভূত হয়।[১]

প্রবাদ আছে যে এই স্থানে বহু জল ও জঙ্গল থাকায়, কেহই আর আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলী নামীয় একজন মুসলমান বহু আয়াসে এই স্থান মনুষ্যবাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে উহার নাম হয় "ফতেয়াবাদ"[২]। আইন-ই-আকবরিতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেখ আছে। উহার মহলের সংখ্যা ছিল ৩১ এবং রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৫৭ দাম। হাবেলি ফতেয়াবাদ সাধারণত ভূষণা নামে কথিত হয়। তোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে সরকার ফতেয়াবাদ এবং সুজা খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে চাকলে ভূষণা নামের সৃষ্টি হয়।

মুকুন্দ রায়ের পূর্বপুরুষেরা কিরূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন তাহার

কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বিক্রমপুরের, চন্দ্রদ্বীপের ও ফতেয়াবাদের রাজগণ একই বংশোদ্ভব। অন্য কোন কোন লেখকও এই মতের পোষকতা করেন।

মুকুন্দ রায় প্রথমত ভূষণার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে ভুঞা শ্রেণীতে উন্নত হইয়া মুসলমান দেশাধিপতিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে শঙ্কিত হন নাই।

হিজরি ৯৮৮ সালে (১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে) বাদসাহ্ আকবর সাহের বঙ্গাধিকারের সময় মোরাদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলে হিজলীর খামার খাঁ ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ[৩] এবং সাতগাঁর মীর জানজাদ খাঁ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। মোগল সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর, পাঠান কতুল খাঁ এই অবসরে পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন, কারণ তদধীন এই তিন কাপুরুষ পাঠান হইয়াও মোগলের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। এই তিন কুলাঙ্গারকে শিক্ষা দেওয়াই কতুলের উদ্দেশ্য ছিল।

কতুল খাঁ প্রথমতঃ সাতগাঁর শাসনকর্তা মীর জানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন।[৪] মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া প্রস্থান করেন। এ বিষয়ে কন্দর্প রায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এদিকে কতুল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে মুকুন্দ রায় তথাকার একজন সামান্য জমিদার মাত্র। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্যতা থাকায়, মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হন।

কতুল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দ মোরাদের সৈন্যের সহিত নিজ দলবল মিশাইয়া কতুল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এদিকে মোগল সেনাপতি মুজাফরও ঠিক এই সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া, কতুল খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হওয়ায়, অনন্যোপায় হইয়া পাঠানগণ পুনর্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করে। ডাক্তার ওয়াইজ অথবা অন্য কোন ইতিহাস লেখক মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পারস্যভাষায় লিখিত মুল আকবরনামা অনুবাদ করাইয়া এ সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এ স্থানে উল্লেখ করিলাম।

তোডরমল্ল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদে অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি পূর্ব শাসনকর্তা মোরাদ খাঁর পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূ-বৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাহারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকিতে পারেন, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপ নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া তিনি অচিরে সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

মানসিংহ মধ্যসময়ে যখন একবার বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন তৎসময়ে শাসনকর্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও মতে নব শাসনকর্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে এইজন্য একটি যুদ্ধ ঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবলসহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ রায়কে পরাস্ত ও হত করেন।[৫] প্রবাদ যে, যাহাকে ফতেয়াবাদের নব শাসন কর্তা পদে নিযুক্ত করা হয়, ঐ দুরাচার মুকুন্দ রায়ের কন্যার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার সতীত্ব নাশ

করিতে উদ্যত হওয়ায় ঐ রমণীর হস্তস্থিত অসির আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া বাঙ্গালার অপরাপর ভুঞারা প্রমাদ গণিয়া মোগলদিগের উচ্ছেদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসেন। তাহার ফলে মোগল বাদসাহের বহু অর্থ ও সৈন্যপাতের পর মানসিংহের কুটনীতিতে বঙ্গদেশ মোগল শাসনাধীনে আইসে।

ফতেয়াবাদের কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মুকুন্দ রায় প্রদত্ত বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তরে বহু লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার একখানা ব্রহ্মোত্তরের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু এখন ঐ দলিলের প্রকৃত অনুসন্ধান সীতারাম রায়ের জীবনচরিত পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।[৬]

মুকুন্দ রায়ের ছয়টি পুত্রের মধ্যে শত্রুজিৎ রায় ও শিবরাম রায়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শত্রুজিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে, ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাজাহান বাদসাহের রাজত্বকালে ঢাকার নবাব সুলতান সুজা কর্তৃক বন্দি হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত হন। পরে তথায় তাহার মৃত্যু ঘটে। শত্রুজিৎ প্রদত্ত একখানা দেবোত্তরের সনন্দও পাওয়া গিয়াছে[৭]। শত্রুজিতের বংশধরেরা কিছুকাল ভূষণার ঢালী সৈন্যের নায়ক ছিলেন। শত্রুজিৎ রায় স্বীয় নামে এক স্থান নির্দেশ করেন[৮]। সীতারাম রায়ের মৃত্যুর পর শত্রুজিতের বংশধরেরা তথায় যাইয়া বাসস্থান সংস্থাপন করেন। ভূষণা পরে সংগ্রাম সাহের হস্তগত হয়। মুকুন্দ রায়ের সময় হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিলী, মালী, কর্মকার প্রভৃতি মধ্যে ভূষণা পঠী বলিয়া একটা সমাজের উদ্ভব হয়। এই সময়ে ফতেয়াবাদের স্থপতিরাও শিল্পকার্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

১. যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াখালি জেলার কোনও কোনও পরগণা এই স্থানে অন্তর্গত ছিল।

২. যে ফতে আলীব নামানুসারে ফতেয়াবাদের নামকরণ হয়, স্টুয়ার্ট তাহাকে সন্দ্বীপের মোগলপক্ষীয় শাসনকর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জন স্টিভেনস্ কর্তৃক ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে যে পুস্তক ভাষান্তরিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ফতে খাঁ পর্তুগিজ মা টুস কর্তৃক নিযুক্ত ও সন্দ্বীপের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতে খাঁ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া খ্রিস্টিয়ানদিগের নিধন সাধন করেন। ফতে খাঁর পতাকা মধ্যে লিখিত ছিল 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতে খাঁ সন্দ্বীপের অধীশ্বর, খ্রিস্টিয়ানের রক্তপাতকারী ও পর্তুগিজ জাতির বিনাশকর্তা।" পরে কিন্তু পর্তুগিজদের হস্তেই তাহার নিধন সাধন হয়। সন্দ্বীপ সরকার ফতেয়াবাদের 'অন্তর্গত' ছিল।

৩. ব্লকমানের আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা অধিকার করেন। আমাদের বিবেচনায় তৎসময়ে ফতেয়াবাদ মোগলের নাম মাত্র অধিকারে আইসে, বাস্তবিক এইকালে পাঠানদের হস্ত হইতে ফতেয়াবাদ একেবারে বিচ্যুত হয় নাই।

৪. কাজী জেদা নামক একজন বিদ্রোহী পাঠানের প্রবর্তনায় কতুল খাঁ এই কার্যে প্রবৃত্ত হন। কাজী জেদা ফতেয়াবাদের কোন স্থানে অবস্থান করিয়া মুকুন্দ রায়ের সহিত নিয়ত বিবাদ করিতেন। পরে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মাসুম কাবুলির সহায়তা করিতে যাইয়া "গড়িয়াতে" মোগলসেনাপতি অজিজ খাঁর পক্ষ কর্তৃক হত হন।

৫. এই যুদ্ধ যে স্থানে সংঘটন হয় তাহার নাম ফতেজঙ্গপুর। উহা অধুনা মাদারীপুর সাবডিভিসনের অধীন একটি পরগণা, অন্য নাম ফতেপুর।

৬. দীঘলবালা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্যের যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের তায়দাদে যাহা মুকুন্দরায় কৃত নিষ্কর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে দেওয়া হয়।

৭. গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের ১৯৩৩ নং তায়দাদে যশোহরের কালেক্টরীতে যাহা শত্রুজিৎ রায়প্রদত্ত নিষ্কর বলিয়া দেখা যায়।

৮. যশোহর জেলার অন্তর্গত শত্রুজিৎপুর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফজল গাজী ও চাঁদ গাজী

বর্তমান সময়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু যখন ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করে, ভাওয়ালের পরিচয়ও তৎসময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবাদ আছে পালবংশীয় অনেক রাজা ভাওয়ালে বাস করিতেন। পূর্বে ভাওয়াল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরে পাল রাজাদের সময় হইতে উহা পূর্ববঙ্গের অন্তগর্ত হয়। ভাওয়ালের একাংশ রণ-ভাওয়াল নামে পরিচিত। অবশ্যই এই স্থানে এক সময়ে কোনও প্রসিদ্ধ রণাভিনয় হইয়া থাকিবে। সম্ভবত কামরূপাধিপতির সহিত পাল রাজাদের রণ হইতেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। রণ-ভাওয়ালের তিনটি স্থানে তিনটি রাজবাড়ির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কাপাশিয়া থানার চারি মাইল পশ্চিমে শিশুপাল রাজার আবাস ছিল। ধলেশ্বরী নদীতীরে সাভার[১] গ্রামে এখনও হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয়। তেলিপাবাদ পরগণার তরাগ নদীতটে যশঃ পাল রাজার বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল রাজারা বঙ্গীয় পাল রাজবংশের শাখা বলিয়াই অনুমিত হয়।

সম্ভবত শেষ পাল-রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গাজীবংশ ভাওয়ালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটি পরগণার শাসনভার গাজী বংশের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাহারা পালোয়ান সাহ নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্তমান সময় হইতে প্রায় ৫৭০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান গাজী বংশের উনবিংশ পুরুষ পূর্বে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়[২]।

প্রচলিত কিংবদন্তি হইতে ইহাই অনুমোদিত হয় যে, মুসলমান কর্তৃক গৌড়ের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ বিজয় সাধারণত ধর্মোন্মত্ত অস্ত্রধারী মুসলমানগণ দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। তাহারা ধর্মের নামে উন্মত্ত হইয়া দিল্লির দরবার কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়াও এই যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পালওয়ান সাহ এই দুর্দান্ত ধর্মোন্মত্ত দলের অধিনায়ক বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র কায়াম খাঁ সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা শুনা যায় যে, দিল্লিতে অবস্থানকালে বুদ্ধিকৌশলেই হউক অথবা দৈববলেই হউক একটা ভগ্ন প্রাসাদের ছাদ, যাহা স্থপতিরা বহু চেষ্টাতেও সম্যক মিলাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তৎকর্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এজন্য বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু কায়াম খাঁ সাহেব ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বাদসাহকে জানান যে, অর্থ লইয়া বঙ্গদেশে গমন করা সহজ কার্য বা নিরাপদের বিষয় নহে, তবে যদি তাহার কৃত কার্যের জন্য বাদসাহ যথার্থই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাকে ভাওয়াল পরগণা দান করিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হইবে। বাদসাহ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ভাওয়াল পরগণা প্রদানের অনুজ্ঞা পত্র লিখিয়া দেন।

দানপত্র প্রস্তুত হইবার সময় আর একটি বিষয়ের অবতারণা হইল যে, ঐ দলিল কাহার নামে সম্পাদিত হইবে। তৎসময় পর্যন্ত কায়াম খাঁ বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তিনি বাদসাহকে

জানাইলেন যে তাহার মৃত্যুর পূর্বে অষ্টাদশটি পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইবে "বড়গাজী" অতএব দানপত্র এই বড়গাজীর নামেই প্রস্তুত হউক। পালোয়ান সাহেবের পুত্র কায়ম খাঁ সাহেব তৎপর ঐ দানপত্র লইয়া ভাওয়াল আগমন করেন, পরে লক্ষা নদীর তীরে চৌয়াব নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন।

কায়াম খাঁ সাহেবের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে বাহাদুর গাজী নিঃসন্তান হওয়ায় তাহার ভ্রাতা মাতাব গাজী ভাওয়ালের আধিপত্য গ্রহণ করেন। মানসিংহ যখন, ঈশা খাঁর বংশধর ও কেদার রায়কে দমন জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন তৎসময় মাতাবগাজী ও তাহার পুত্র ফজল গাজী বর্তমান ছিলেন। আকবরনামা পাঠে এই মাত্র জানা যায় যে বিদ্রোহী পক্ষের সৈন্যগণ পলায়ন করিলে ভাওয়ালের বিদ্রোহী গজনবি (গাজী) মানসিংহের আধীপত্য স্বীকার করেন[৩] (১৬০২ খ্রিঃ)।

ইতিহাসে ফজল গাজী সম্বন্ধে অধিক কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদসাহের বাধ্য হইয়া তাহারা পুনর্বার আর কোনও গোলযোগ উপস্থিত করেন নাই। ইঁহাদের বর্তমান বংশধরগণের নিকট এখন কয়েকখানা প্রাচীন দলিল আছে, কিন্তু সেগুলি কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। প্রথম দলিল দৈলত গাজীর সম্বন্ধে। সাহ সুজা উক্ত গাজীকে ভাওয়ালের জমিদার স্বীকার করিয়া তৎপ্রদেশীয় শাসনকর্তা ইসলাম খাঁনের প্রতি আদেশ পত্র প্রচার করেন। দ্বিতীয় দলিল ভাওয়ালের রাজস্ব সম্বন্ধে। ঐ পরগণার তৎসময়ের রাজস্ব ৪৮৩০০ টাকা ধার্য হয়। ঔরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বাবসানে যে প্রবল অরাজকতায় দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিল, তৎসময় গাজী বংশধরের নানারূপ ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া আপনাদের অধঃপতনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দৌলত গাজী রাজস্ব প্রদানে বিরত হওয়ায় ঢাকার নবাব তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন। তৎপর দৌলত মুর্শিদাবাদ নিজামত আদালতে আপিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের বর্তমান রাজবংশের পূর্ব পুরুষ কুশধ্বজ রায় তাহার উকিল বা মোক্তার হইয়া যথেষ্ট আয়াস স্বীকারে মোকর্দমা চালাইয়া গাজীর পক্ষে জয় লাভ করিয়াছিলেন। গাজী এজন্য যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কুশধ্বজ রায়কে আপন জমিদারীর প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিয়া ভাওয়াল লইয়া আইসেন। গাছার ও পলাশনার ভূম্যধিকারীগণের পূর্ব পুরুযেরা এই সময় গাজীর সরকারের নিযুক্ত হন।

কিছুদিন পরে কুশধ্বজ রায়ের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বলরাম রায় (অপর নাম জানকীনাথ রায়) গাজীদের দেওয়ান হইলেন। বলরাম রায় ও গাছার ঘোষ মহাশয়েরা ও খরচ-সেরেস্তার মোহরের পলাশনার রায় মহাশয় একত্রিত হইয়া অকর্মণ্য ও ব্যসনাশক্ত গাজীগণের পরিবর্তে ক্রমে জমিদারী আপন আপন নামে চালাইতে আরম্ভ করেন। এই ধর্মাধর্ম-জ্ঞান বিরহিত কর্মচারীগণই পরে ভাওয়ালের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন। ১৭৭৯ খ্রিঃ অব্দে সুলতান গাজী লর্ড কর্নওয়ালিশের নিকট বিষয় পুনরুদ্ধার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

বর্তমান সময়ে গাজীর বংশধরেরা নিকটবর্তী মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট কৃপা প্রার্থী হইয়া অতি দীনভাবে বাস করিতেছেন। চৌয়ারে এখনও পালোয়ান সাহ ও কায়াম সাহেবের কবর দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত সমাধির নিকট এখনও একটি ধ্বংস মুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বর্তমান আছে। মসজিদের এক মাইল পশ্চিমে আর একটি সমাধি-মন্দির আছে। উহা প্রাচীর বেষ্টিত। কোশাখালী নামে আর একটি শুষ্ক সরিৎ আছে, উহাতে যুদ্ধতরী সকল থাকিত। লক্ষার সন্নিহিত আধুনিক বালীগাঁর নিকট মাতাব গাজীর পিতা বাহাদুর গাজী নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদ ছিল। উহা পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তরলিপি অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

গাজীদিগের অধীনে বহু তালুকদার ছিল. ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি আছে। গাজী বংশের বিবরণ আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। বর্তমান জমিদারগণের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের আর কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক।

চাঁদ গাজীকে ভাওয়ালের গাজীবংশেরই এক শাখা বলিয়া জানা যায়।[৪] তাহার নামানুসারেই পরগণাটির নাম চাঁদপ্রতাপ হইয়াছে। আরও প্রবাদ যে তাহার ভ্রাতা সেলিমের নামানুসারে সেলিমপ্রতাপ পরগণা এবং সুলতানের নামানুসারে সুলতানপ্রতাপ পরগণার নামকরণ হয়।

আইন-ই-আকবরীতে জানা যায় যে, চাঁদপ্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ সরকার বাজুহারের অন্তর্গত ছিল। সেলিমপ্রতাপ বাজু, সুলতানপ্রতাপ বাজু এবং চাঁদপ্রতাপ বাজুর কর একত্রে মোট ধার্য হয় ৪৬২৫৪৭৫ দাম। এই তিন পরগণার কর একত্র ধার্য নিবন্ধন বোধ হয় উহা একই ভূমাধিকারীর সম্পত্তি ছিল। পরে তিন ভ্রাতার নামে তিনটি পরগণার সৃষ্টি হয়।

প্রবাদ এই যে চাঁদগাজীর পিতা দেলওয়ার খাঁ, প্রথম ঐ প্রদেশে আগমন করেন। তথায় আসিবার সময় বর্তমান জায়গীর বন্দরের কিছু উত্তরাংশে ধলেশ্বরীর পশ্চিমপারে মেঘশিমূল নামক স্থানে আসিয়া প্রথম উপস্থিত হন। নদী মধ্যে যখন নৌকা চলিতেছিল, তৎসময় ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ দেখিয়া একটি শিমূলগাছে তাহারা নৌকা বন্ধন করেন, তাহাতেই ঐ স্থানের নাম হয় মেঘশিমূলিয়া। দেলওয়ার উহার নিকট বাসস্থান স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। উহাকে সাধারণ লোকে রাজবাড়ি বলিত। ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাতে মেঘশিমূলিয়া ও রাজবাড়ি উভয়স্থানই ভগ্ন হইয়া পুনরায় নতুন চড়াতে পরিণত হইয়াছে।

ভাওয়ালের গাজীবংশ যে সময় মোগল বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তৎসময় ইহারাও এই পন্থা অবলম্বন করেন।

চাঁদগাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার জাতি সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানা যায় না। এ দেশে ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা সন্দর্শন করিয়া তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। পরে ব্যসনাসক্ত গাজীবংশের বিষয়কর্মের সর্বেসর্বা হন। পরিণামে সঞ্জয়ের বংশধরেরাই গাজীবংশের জমিদারী হস্তগত করিয়া পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

১. ভাওয়ালের পশ্চিম সীমায় সাভারের নিকট ধামরাই গ্রামে যশঃমাধবের মন্দির আছে। লোক প্রবাদানুসারে জানা যায়, এই মূর্তি বহুকাল পূর্বে যশঃ পাল রাজার বাড়ির ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মূর্তি নিমকাষ্ঠে নির্মিত, নীল বর্ণে চিত্রিত, সাধারণতঃ উহা মাধব নামে পরিচিত। অদ্যাপি রথযাত্রার সময় ধামরায়ের মাধববাড়িতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

২. বর্তমান সময়ে তদপেক্ষা অধিক পুরুষ হইয়া থাকিবে।

৩. আকবর নামা, ইলিয়ট, ৬ ভলুম, ১০৬ পৃঃ।

৪. এশিয়াটিক জার্নেল, ৪৩ সংখ্যা।

ষোড়শ অধ্যায়

লক্ষ্মণমাণিক্য

ভুলুয়া অবস্থিতি কালে, রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহার কতিপয় সারাংশ পাঠকগণের অবগতি জন্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গীয় যে দ্বাদশজন ভৌমিক আকবর বাদসাহের সমকালে অভ্যুদিত হইয়া বঙ্গে স্বাধীনতার ধ্বজা প্রোথিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন. মহাত্মা লক্ষ্মণমাণিক্য তাহার অন্যতম। মেঘনার পূর্বতটবর্তী ভুলুয়া প্রদেশে তাহার বিস্তৃত রাজ্য বর্তমান ছিল। অধুনা তাহা নোয়াখালি জেলার অন্তবর্তী থাকিয়া অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উহার 'বালাজোয়ার' নাম দৃষ্ট হয়। ঐ জোয়ার সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত একটি মহাল ছিল। উহার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১৩৩০৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৬২ টাকা। 'বালা' শব্দটি 'ভুলুয়ার' অপভ্রংশ হইবে। নোয়াখালির ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী স্থানগুলি পূর্বে ভাটি নামে অভিহিত হইত। প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর অতীত হইল, নোয়াখালির অন্তর্গত বাবুপুরের চৌধুরীদের একটা দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া, 'চৌধুরীর লড়াই' নামে যে একখানা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত চৌধুরীরা আপনাদের সম্পত্তির গৌরব উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের মতো জমিদার আর ভাটির বাঙ্গালায় নাই।" এই বাবুপুর ভুলুয়ার এক অংশ। অতএব আইন-ই-আকবরীর বালাজোয়ার ও ভাটি এবং আধুনিক ভুলুয়া প্রভৃতি দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি যে একই, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ত্রিপুরা ও সমতট বঙ্গের পূর্বদক্ষিণবর্তী স্থানগুলি সাগরশাখা মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। পরে জল সরিয়া পড়ায় উহা চরাতে এবং তৎপশ্চাৎ জননিবাসে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপের উদ্ভব সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর শর্মার ও দনুজমর্দন রায়ের যেরূপ একটা কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে, ভুলুয়ার উদ্ভব সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। আমরা উহা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার সারমর্ম এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রবাদ যে মিথিলানিবাসী ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব আদিশূরবংশীয় বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথ তীর্থ সন্দর্শন মানসে স্বজনগণ সহ নৌকারোহণে তথায় যাইতেছিলেন। মেঘনা নদী অতিক্রম করিবার সময় নদী মধ্যেই তাহাদের একরাত্রি যাপন করিতে হয়। কুল কিনারা না পাইয়া তাহারা ভয়ে অভিভূত হয়েন ও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে থাকেন। যখন ত্রিযামা অতীতপ্রায়, সেই সময়ে শূর মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হয়। তদবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান যে, এক দেবীমূর্তি আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তোমার আর ভয়ের কারণ নাই। এই যে বিস্তীর্ণ জলরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বিভাবরী অবসানের সহিত উহাও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তোমার এই বৃহৎ যান মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে পর, সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে খনন করিও, তবেই আমার বারাহী মূর্তির অনুরূপ এক পাষাণময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। উহা উত্তোলন করিয়া যদি এই স্থানে সংস্থাপিত কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই এই স্থানের অধিপতি হইবে, এবং বহুপুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশধরেরা এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত থাকিবে। অন্যথা আমার কথা অবহেলা করিয়া যদি প্রস্থান করিতে চাহ,

তাহা হইলে কখনই সফলকাম হইতে পারিবে না।" দেবীর অন্তর্ধানের সহিত শূর মহাশয়েরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ইষ্টনাম স্মরণানন্তর তিনি স্বপ্নের যাবতীয় বিবরণ সঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ নিকটে বলিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে সকলে 'শুভ শুভ' বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশা অবসান হইয়া গেল। এই সময়ে দৃষ্ট হইল যে, বহু দূর পর্যন্ত স্থল ব্যতীত জল বিদ্যমান নাই। বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, নৌকা চড়ায় সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূচনাতেই স্বপ্নের সত্যতা লক্ষ্য করিয়া মৃত্তিকা খনন করা আরম্ভ হইল। কিছু দূর খুঁড়িতেই তন্মধ্য হইতে এক পাষাণময়ী প্রতিমা উত্থিতা হইলেন। সকলেই আনন্দে মাতিয়া গেল। ঠিক হইল যে, ঐ দিবসেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যে দিবস প্রতিমা সংস্থাপন করা হইল, ঐ দিবস দিনমণি একবারও উদিত হইলেন না। নিবিড় কুজ্মাটিকাজালে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পরদিন যখন প্রভাতে সূর্যদেব স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া গগনে সমুদিত হইলেন, তখন দেখা গেল যে, দেবীকে পূর্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া, শূর মহাশয় ঐ স্থানের নাম রাখিলেন, "ভুলুয়া" (ভুল-হুয়া হইতেই ভুলুয়া নামের উৎপত্তি এইরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে)। আবার কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রদেশের পূর্বাধিপতিকে অল্প পরিমিত স্থান বলিয়া ভুলাইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আধিপত্য লাভ করায়, উহার নাম করা হয় 'ভুলুয়া'। বাস্তবিক গল্পাংশে প্রথমটিই মনোরম এবং সমীচীন বোধ হয়।

রাজা আদিশূরবংশীয় এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের জন্ম হয়। এই স্থালে যে আদিশূরের কথা লিখিত হইল, ইনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি বৈদ্যজাতীর আদিশূর নহেন। ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। পরে তদ্বংশীয়েরা কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের তিন কি চারি পুরুষ অন্তর রাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। বঙ্গদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত আদান-প্রদান সম্পাদন সুকঠিন বিবেচনায়, লক্ষ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলন লাভের প্রয়াস পান। এই সময়ে গাভার ঘোষবংশের পূর্ব পুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়াকে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে পর, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতা-সহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লক্ষ্মণমাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হইলেন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চারিজন দলপতি ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়, ইহারা স্ব স্ব সমাজের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারিজন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায় সকলেই তাহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের বাড়িতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দলবল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করিলেন না। এই নিমিত্ত রাজাগণের আদেশে ঘটকগণ এই উদ্ধত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করিলেন, যথা—

"বেজগ্রামস্থিতাঃ সৰ্ব্বে
যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনীচাকুলীমেব
নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ।।

এইরূপে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী, চাকুলী গ্রামবাসীরা, কুলভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। অপরদিকে ভূষণা সমাজের অর্ন্তর্গত উজানীর রাজবংশও এইরূপ জাত্যন্তর হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। তেলিহাটী ও ভুলুয়ার এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ঘটক মহাশয়গণ দ্বারা অপর এক একটি শ্লোক বিরচিত হয়। যথা—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাসু তদুত্তরে।।
কায়স্থাঃ অত্র বৈনস্তাঃ (?) ভিন্নদেশনিবাসিনাম্।
ভুলুয়াতেলিহাটিয়ৌ শূরাদিত্যৌ প্রশস্তকৌ।।

অপি চ ঃ

সিংহগ্রামে স্থিতঃ সিংহঃ শিখায়ে গুহকঙ্কীশঃ (?)।
ভুলুয়ায়াংতেলিহট্টে শূরাদিত্যৌ নৃপাবুভৌ।।

ভুলুয়ার রাজাবা শূর বংশীয় এবং ফরিদপুরান্তর্গত তেলিহাটি পরগণার মধ্যবর্ত্তী উজানীর রাজগণ আদিত্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা পরে বিভিন্ন সমাজ হইতে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই রাজগণ যে কোন্ জাতি বা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজত্বের সময়ে আরাকানের মগেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ স্থানগুলিকে মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎস্থানীয় হিন্দুরা এই সময়ে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাবিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করিত। অধিকাংশ স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। মহাত্মা মিঃ গ্রান্ট বলেন যে, ১৫৪৮ খ্রিঃ অব্দের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিশেষত মগদের দৌরাত্ম্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম হইতে শেষোক্ত কারণটি সমধিক ভয়ানক বলিতে হইবে। তৎকালে যাহারা ঐ সকল বিঘ্ন-সঙ্কুল স্থানে কোনরূপে বাস করিত, তাহারা ভিন্ন স্থানের হিন্দুগণের নিকট জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি আরাকানের মগেরা এই সময়ে যাহাদের বাড়ির উপর দিয়া চলিয়া যাইত, সর্বসাধারণে তাহাদিগকেও জাতিচ্যুত মনে করিয়া 'মগীয়' অপবাদ দিতে লাগিল। এইরূপে পূর্ববঙ্গে বহু 'মগীয়' তিলি, বারুই, কামার প্রভৃতি উপাধিযুক্ত দলের সৃষ্টি হয়। উহা অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া মগদিগের অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা নিদর্শনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া আরাকানীরা অধিকার করিয়া লয়। পরে ভুলুয়ায় আপতিত হইয়া উহাও লুণ্ঠন করিতে থাকে। লক্ষ্মণমাণিক্য দুই তিনবার আক্রমণকারী আততায়ীদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন, কিন্তু পরে রাজার গৃহশত্রু কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আরাকানরাজ ভুলুয়ার রাজাকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই শত্রু আর কেহই নহেন, লক্ষ্মণ মাণিক্যেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাপিষ্ঠ রাজানুজ রাজ্যলোভে অভিভূত হইয়া, আরাকানরাজের সহায়তা প্রার্থনা করে। সুযোগ পাইয়া আরাকানরাজ গৃহবিচ্ছেদে ব্যতিব্যস্ত লক্ষ্মণমাণিক্যকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য অনন্যোপায় হইয়া খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ-ই আলির সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঈশা খাঁ বারভুঞা দলের অন্যতম। খিজিরপুর তাহার বাসস্থান ছিল। একবার রাজা মানসিংহ বাদসাহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া খিজিরপুর অবরোধ করেন। পরে তাঁহার বীরত্ব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পরাজিত ঈশা খাঁকে লইয়া দিল্লিতে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার বীরত্বের কথা ও কতিপয় মহত্বের বিষয় বাদসাহকে অবগত করান। গুণগ্রাহী আকবর সাহ সন্তুষ্ট হইয়া ঈশা খাঁকে মুক্তি প্রদান করিয়া সোনারগাঁয়ের শাসনভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ, বাদসাহের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এই কারণে

অন্যান্য বারভুঞা দলপতির সহিত তাহার মনান্তর ঘটিয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদসাহের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

ঈশা খাঁ আরাকানবাসীগণের এই সকল দৌরাত্ম্যের বিবরণ বাদসাহকে লিখিয়া পাঠান। আকবর সাহ উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালার তৎকালীন সেনাপতিকে আদেশ প্রেরণ করেন। যদিও বারভুঞা দলের নেতারা বাদসাহের প্রতিকুলাচারী ছিলেন, তথাপি এই সময়ে তাহারা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কারণ, মগের দৌরাত্ম্য সকলের রাজ্য মধ্যেই সমভাবে প্রসারিত হয়। এই জন্য উহাদের উচ্ছেদ সাধন করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাদসাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় সমুদয় ভূম্যধিকারীগণকে তাহার সহায়তা জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। সাধারণের শত্রু মগদিগকে উচ্ছেদ করিতে কাহারও কোন আপত্তি রহিল না। জমিদারগণ সকলেই বাদসাহ সেনাপতির সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

মোগলবাহিনী সমবেত হইয়া মগদিগের অন্যতর কেল্লা 'সহর কসবা' আক্রমণ করিল। এই স্থান ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত। অধুনা 'হুদা ভুলুয়া' নামে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মণমাণিক্য তাড়িত হইলে পরে, ঐ স্থানেই আরাকানীয়রা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। মোগল সেনাপতির সহিত ঐ স্থানে মগদিগের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বারভুঞাদল পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া মোগলপক্ষের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সমবেত সৈন্যদলের নিকট আরাকানীয়রা পরাজিত হইয়া, সন্দ্বীপের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভুলুয়াতে তাহাদের আর কোন আধিপত্য রহিল না।

ভুলুয়ায় অবস্থিতি সময়ে, আমি এই 'সহর কসবায়' বহুদিন বাস করিয়াছি। ঐ যুদ্ধের নিদর্শনযোগ্য কতিপয় উপকরণও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কামান, ঐ যুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ আজও তথায় প্রোথিত দেখা যায়। শুনিলাম, আরও তিন চারটি কামান ইতিপূর্বে ঐ স্থান হইতে নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা খনন করিলে তন্মধ্য হইতে গোলাগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ একটি গুলি আমি দেখিয়াছি। উহা মৃত্তিকানির্মিত, কিন্তু অগ্নিতাপে বিশেষ দৃঢ়ীভূত করা। তত্রত্য মুসলমানেরা বলিল, এই গুলি 'গুলাল বাঁশে ব্যবহৃত হইত। তৎকালে বন্দুক, কামান অপেক্ষা, তীর ও গুলাল বাঁশের সমাধিক প্রচলন ছিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মুসলমান জায়গিরদার ও পর্তুগিজ খ্রিস্টান আজিও উহার নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছেন। যে সকল সৈনিকেরা এই যুদ্ধে গমন করিয়াছিল এবং যুদ্ধান্তে প্রত্যাগমন না করিয়া মগদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তথায় অবস্থান করিয়াছিল, তাহাদিগকে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়। ঐ সম্পত্তি 'খোসবাস' নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণমাণিক্য পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই জায়গিরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তদবধি ব্রিটিশ অধিকার পর্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর কোন রাজস্ব ধার্য হয় নাই। উহা নিষ্কর চলিয়া আসিতেছে।

মোগলসেনার সহিত নবী সাহেব নামে একজন ফকির বা গাজী এই যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধান্তে ঐ ফকির আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন না। তিনি তথায় এক দরগা নির্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। উহা আজ অবধিও নবী সাহেবের দরগা বলিয়া প্রসিদ্ধ। একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর নবী সাহেবের পদচিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মণমাণিক্য তথায় একটি দীর্ঘিকা খনন ও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সহর কসবায় ঐ সকল দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ্মণমাণিক্য পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আপন ইষ্টদেবী বারাহী দেবীর প্রচুর বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই দেবীমূর্তিই বিশ্বম্ভর শূর ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হন এবং ইহার স্বপ্নাদেশেই তিনি ভুলুয়াতে রাজ্য সংস্থাপন করেন। বারাহী দেবী অধুনা আমিশাপাড়া গ্রামে রাজপুরোহিতগণের

বাড়িতে বর্তমান আছেন। তাহার চারি হাত, তিনি মুণ্ড এবং বাহন বরাহ। ঐ রাজপুরোহিতেরা যে ধ্যান পাঠ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বারাহীং চাষ্টভুজাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাম্।।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণং মধ্যে শ্রীবদনাম্বুজাম্।
দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকম্।
বরাহবাহিনীমাদ্যং সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে।।"

পূজক মহাশয়েরা যেরূপ বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ধ্যানটি বড়ই অশুদ্ধ। দেবীর আট হাতের মধ্যে মাত্র চারি হাত বর্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন শ্লোকে ছন্দের দোষ আছে, তাহাতে 'দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা' প্রভৃতির অর্থও অবোধ্য। যদি কেহ বারাহীদেবীর বিশুদ্ধ ধ্যান অবগত থাকেন, তবে ঐ পুরোহিতদিগকে জানাইলে, তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের গুরু ও পুরোহিতের বংশধরেরা সকলেই আপনাদিগকে মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। চৌপল্লী, বাবুপুর প্রভৃতি স্থানের গুরুবংশ ও আমিশাপাড়ার পুরোহিতেরা অদ্যাপি প্রচুর ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছেন। বর্তমান জমিদারেরা উহার অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাতে কর ধার্য্য করিয়াছেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া ভুলুয়াতে সংস্থাপন করেন। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতট পাণ্ডববর্জিত স্থান বলিয়া পরিচিত। সেই স্থানে সমাজ সংস্থাপিত করিয়া সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর সমাবেশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে, ভুলুয়াধিপতি যে বিবাহ-সভায় অন্যান্য কায়স্থ সমাজপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বালয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সভায় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। বাকলাধিপতি রামচন্দ্র তৎকালে বালক থাকিলেও তাহার ধারণা ছিল যে, সমাজ মধ্যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতিই সকলের শীর্ষস্থানীয়। এইস্থলে প্রতাপাদিত্যকে অধিক সম্মান করায়, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরেও কোন কোন ঘটনায় ভুলুয়ারাজ রামচন্দ্রকে বালক বলিয়া ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। এই সকল কারণে আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদানার্থ চন্দ্রদ্বীপরাজ, লক্ষ্মণমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, সহসা কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ভুলুয়া আক্রমণ করেন।

অচিরে এই কথা ভুলুয়ারাজ জানিতে পারিয়া, ক্রোধে অধীর হইলেন ও 'বালক' রামচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার রণতরীর উদ্দেশে কতিপয় সৈনিক সহিত, যাত্রা করিলেন। এইরূপ উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ অন্যের সাহায্য লওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া স্বয়ং বাকলার রণতরীর নিকটবর্তী হন এবং রামচন্দ্রকে ধৃত করিবার জন্য যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া বিপক্ষের রণযানে পতিত হইলেন, অমনি প্রচণ্ড বলশালী রামচন্দ্র তাহাকে ধৃত করিয়া নৌকার নিম্নে ফেলিয়া দিলেন। ভুলুয়ারাজ এইরূপে ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইলে রামচন্দ্র শত্রুকে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ রাজ্য আর আক্রমণ না করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে তাহার মাতা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে এই বীরবিনাশরূপ পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখেন।

কোন এক সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্যের বীরত্বের পরিচয় জানিবার জন্য, তাহাকে মল্লযুদ্ধে উপস্থিত করা হইলে তাহাকে শৃঙ্খলচ্যুত করা হয়। এই সুযোগে লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে রামচন্দ্রকে

হত্যা করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপাধিপতির দেহরক্ষকেরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া ফেলে। এই সংবাদ রাজা রামচন্দ্রের মাতা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য সম্পন্ন হয়।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, তিনি আরাকানের মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়া লোকান্তরিত হন। আমাদের বিশ্বাস, এটি প্রবাদ নয়, সত্য ঘটনা। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া বারভুঞাদল মগদিগের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপে যে লোকবিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর বীর-জীবনের শেষ পরিচয় প্রদান করেন, যুদ্ধবীর লক্ষ্মণমাণিক্য সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে অব্যবস্থিতচিত্ত চপল বালকের ন্যায় ধৃত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হইয়াছিলেন না, তাহা নিশ্চয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

দেব বংশের রাজত্ব অবসান হইলে, রাজা জয়দেব দেবের দৌহিত্র প্রেমানন্দ বসু বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন মতে জয়দেব দেবের নাম একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণবল্লভ দের কন্যা কমলার গর্ভজাত বলিয়া তাহারা প্রেমানন্দ বসুকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রেমানন্দ যে দেববংশের পরবর্তী রাজা, তাহা সর্ববাদীসম্মতই বলিতে হইবে।

বাকলাতে দেববংশের রাজত্ব স্থাপনাবধি ঐ স্থান বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হইয়া দাঁড়ায়। ঘোষ, বসু, ও গুহ, এই কুলীনগণ রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। দেববংশের রাজত্বকালে তাহারা সসম্মানে বাস করিতেছিলেন। রাজা বংশ মর্যাদায় ন্যূন হওয়া প্রযুক্ত কুলীনদিগকে বিশেষ মান্য করিয়া চলিতেন. কুলীনেরাও রাজাকে রাজোচিত সম্মান দান করিয়া সমাজপতিপদে বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে বসু কুলীনবংশই চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সে সময় কিন্তু অন্যান্য কুলীনেরা বড়ই চিন্তা ও সমস্যায় পতিত হইলেন। মনুষ্য সকলই সহিতে পারে, কিন্তু সমকক্ষ লোকের নিকট কদাপি ন্যূন হইয়া থাকিতে চাহে না। নীচ বংশকে বরং উচ্চ আসন দিয়া তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকা যায়, তথাপি আপনার জ্ঞাতি, সমকক্ষ বা সমমর্যাদাশালীর নিকট কখনও কেহ অবনত হইতে চাহে না। কথায় বলে—

"অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।"

বসুবংশ রাজা হইলে সেইরূপ হইয়া পড়িল।

পরমানন্দ বসুর রাজত্বকালে সমাজ সমীকরণ লইয়া গোলযোগ হয়। কুলীনেরা বিবাহাদি কার্যে যেরূপ রাজার অনুমতি লইত, বসু রাজার নিকট তাহার সেইরূপ অনুমতি লইতে অস্বীকৃত হয়। এই কারণে রাজা কুলীনদিগকে নানারূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করেন। যাহারা উহা সহ্য করিতে পারিল তাহারা রাজার আজ্ঞা মান্য করিয়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু বসুবংশীয় রাজার জ্ঞাতিগণ উহাতে যারপরনাই মর্মাহত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্য বংশ মধ্যে গুহবংশীয় রামচন্দ্র নিয়োগীও তৎপথাবলম্বী হইলেন। এই সময় বিক্রমপুরে আর একটি রাজবংশের অভ্যুদয় হওয়ায়, বসুবংশীয়রা কেহ কেহ সেই রাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিক্রমপুরাধিপতি রায়-রাজগণ তখন সাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে ভূবৃত্তি দান করিয়া স্থাপন করিলেন। গুহবংশীয়দের এক শাখাও বিক্রমপুরাধিপতির বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমপুরে বাস করিতে লাগিল। রামচন্দ্র নিয়োগী আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ববাঙ্গালা পরিত্যাগ পূর্বক সপ্তগ্রামে প্রস্থান করিলেন। জন্মভূমি বিচ্যুতি ও দরিদ্রতা-নিবন্ধন রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পতিত হইলেন, কিন্তু যত দিন তাহার গ্রহ প্রতিকূল ছিল, ততদিন কোন মতে শত চেষ্টা করিয়াও কাহারও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না। পরে যে সময় ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন, সেই সময় শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক পদস্থ কায়স্থ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। পরে রামচন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের মধুরতা প্রভৃতি অবগত হইয়া তাহার নিকট আপনার কন্যা সম্প্রদানও

করিয়াছিলেন। শ্বশুরের অনুগ্রহে ও চেষ্টায় পরে রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় এক মোহরের পদে নিযুক্ত হন।

কালক্রমে রামচন্দ্র বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। এ সময় তাহার ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই বালকেরা পরে সপ্তগ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় কার্য গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার সহিত রামচন্দ্রে মতান্তর ঘটে। রামচন্দ্র কার্য পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত গৌড়ে প্রস্থান করেন। এই সময় নবাব জালালুদ্দীন অন্তিম শয্যায় শায়িত। তাহার শিশু পুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। রামচন্দ্র সুযোগক্রমে রাজসরকারে একটি কার্যে নিযুক্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই নবাবের দেহাবসান হয় ও তাঁহার পুত্র শত্রু হস্তে নিহত হন। তৎপর করাণীবংশীয় সুলেমান ১৫৬৩ খ্রিঃ অঃ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সৌভাগ্যের আলোকচ্ছটায় এই সময় রামচন্দ্রের প্রতিভাকে সমাধিক উজ্জ্বল করিয়া নূতন নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দিল। দিন দিন তাহার পদোন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু রামের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় অধিক কাল তাহাকে আর নবাবের অনুগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। রামচন্দ্রের দেহাবসানে নবাব সুলেমান তাহার পুত্রদিগকে সদয় ভাবে গ্রহণ করিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময় ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবপুত্রের সহিত একই মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিত। এই সূত্রে নবাবপুত্র দায়ুদের সহিত তাহাদের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে।

পরে যে সময় দায়ুদ পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে প্রধান অমাত্য পদে বরণ করিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় উপাধি প্রদান করেন। এ স্থলে বোধ হয়, শ্রীহরিকে বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভকে রাজা বসন্ত রায় ধরিয়া গুহ বংশের বনিয়াদ ঠিক করা হইয়া থাকিবে। অন্যথা নামের উপাধি আবার নাম হয়। উহার ভাব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে হিন্দু মাত্রেরই নামকরণ কালে দুইটি নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, হয়ত বা ঐরূপ ভাবেই তাহাদের দুইটি নাম হইয়া থাকিবে।

দায়ুদের সহিত মোগলসম্রাট আকবরের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। দায়ুদ আপনার ধনবল ও জনবলের আধিক্য সন্দর্শনে একটি মোগল দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এই জন্য বাদসাহ তাহাকে দমন জন্য ১৫৭৫ খ্রিঃ অব্দে সেনাপতি মুনেম খাঁ ও রাজা তোডরমল্লকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মোগল পক্ষের বিপুল বাহিনীর পরিচয় পাইয়া নবাব দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পরে যুদ্ধে নিজ পরাজয় দেখিয়া দায়ুদ মোগল সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সন্ধি করেন। তদনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহার বাদসাহের হস্তগত হয়। মুনেম খাঁ গৌড়ের রাজধানীতেই অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া উহাকে জনশূন্য করিয়া তোলে। মুনেম খাঁও গতায়ুঃ হন। দায়ুদ সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন ও আগমহলের যুদ্ধে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ছদ্মবেশে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে যে সময় তোডরমল্ল বাঙ্গালা জরিপ করিয়া করসংক্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ঐ দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব নবাবের সময়ের যাবতীয় কাগজপত্র বুঝাইয়া দেন। এজন্য তোডরমল্ল সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া, কয়েকখানা পরগণার আধিপত্য প্রদান করেন।

দায়ুদ যে সময় উড়িষ্যায় পলায়ন করেন, তৎকালে তাহার বহু মূল্যবান সম্পত্তি সকল অমাত্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। অমাত্যদ্বয় তখন গৌড় বা

তসন্নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করা শুভকর নহে বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন ; (পরে যাহা যশোহর নামে খ্যাত হয়)। শিবানন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যশোহরে না যাইয়া পৈত্রিক পূর্ব স্থান বাকলাতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের রাজ্য পদ্মার দক্ষিণ ভাগীরথী হইতে ভৈরব, কপোতাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত আসমুদ্র বঙ্গাংশ, অর্থাৎ হিন্দু রাজার আমলের বাগড়ি বিভাগ, মুসলমান আমলের সপ্তগ্রাম ও যশোহর সরকার, ইংরাজের প্রথমামলের যশোহর ডিবিজান ও বর্তমান কালের প্রেসিডেন্সী ডিবিজনভুক্ত ছিল। কালীঘাট তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং সে সময় অরণ্যময় ছিল। কালীর প্রথম সেবক ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীকে রাজা বসন্ত রায় প্রথম কালীর ইষ্টকনির্মিত মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দির নির্মাণ পূর্বক কালীঘাট প্রকাশিত করিয়া কালীর সেবা সৌকার্যার্থ, রাজা কালীঘাট গ্রাম গুরুকে দান করেন।[১] বর্তমানকালে ভাগীরথীবক্ষে ইংরাজ প্রদত্ত কণ্ঠহার রূপী যে জুবিলী সেতু শোভমান আছে, সেই সেতুর পূর্বপ্রান্তবর্তী বর্তমান হুগলী নগরের পরপারস্থিত নৈহাটি গ্রামে যশোহর রাজবংশের গঙ্গাবাসের বাটি ছিল ও তথায় অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বর্তমান চব্বিশ পরগণা জিলার ডায়মন্ডহারবার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন মথুরাপুর থানার অর্ন্তগত সাহাজাদপুর গ্রামে বসন্ত রায়ের অপর গঙ্গাবাসের বাড়ি ছিল। এইক্ষণ সুন্দরবন মধ্যে নানা স্থানে যশোহর রাজবংশের বহুতর কীর্তিকলাপ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান আছে। ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ তোরণ, প্রাচীর ও গড় সহ প্রাচীন যশোহর নগর হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ ভীমা অটবীরূপে বিদ্যমান আছে এবং নৌকাবক্ষ হইতে তদ্দর্শনে বঙ্গবাসীর হৃদয় এখনও পূর্ব গৌরবের স্মৃতি সহকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে। এইরূপ চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জিলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের বহুতর স্থানে এইক্ষণ পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য উপলক্ষে বহুতর প্রস্তরময় কড়ি কাষ্ঠ ও জানালা দরজাদি বিশিষ্ট মন্দির ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত সৌধাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে মোগলাধিকারের মধ্যকালে, বর্তমান শ্বাপদসঙ্কুল, জনসমাগম পরিশূন্য, অস্বাস্থ্যকর লবণাম্বু জলাভূমিবিশিষ্ট অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন সুন্দরবন অঞ্চল বহুতর জনপদে সমালঙ্কৃত ছিল।

বোধ হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রভাবে, বহুতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তদিতর জাতীয়গণ, পূর্ববঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়া বিত্তলাভ সহকারে বঙ্গের এই অংশে বাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত ভাগীরথীর পূর্বতটবাসী বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজা বসন্ত রায়ের প্রভাবে তথায় স্থাপিত হইয়াছিলেন।[২] এই সময় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাহাদের পিতামহ রামচন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপাধিপতির সহিত সামাজিক বিষয়ে বিবাদ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করেন। এখন সেই সমাজে যাহাতে চন্দ্রদ্বীপ-রাজ সম্যক প্রভুত্ব পরিচালন না করিতে পারেন, তৎপ্রতিকারে তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিপতি হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ বলীয়ান হইয়াছিলেন।

তাহাদের চেষ্টা যে তৎসময় ফলবতী হইবে, তৎবিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহাতে কুলীন কায়স্থেরা আপনাদের বংশ বিশুদ্ধ রাখিয়া আদান্ন প্রদান করিতে পারেন ও নীচ সংসর্গ সংস্পৃষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিল। এই সময়ের পূর্বে বাকলা সমাজ ভিন্ন বিক্রমপুর ও ভুষণা বা ফতেয়াবাদ নামক আরও দুই সমাজ পৃথক সৃষ্টি হইয়া দুটি রাজবংশের সাহায্যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। যশোহরাধিপতিরা ভিন্ন সমাজ সৃজনের মানস করিয়া

উহার সফলতাও লাভ করিতে পারিলেন। বিভিন্ন সমাজ হইতে নানা সম্প্রদায়ের কুলীনেরা সমাগত হইয়া যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। রাজারা তাহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বসন্ত রায় কর্তৃক যদুনন্দন বসু বিক্রমপুর পরগণা হইতে এবং তাহার জ্ঞাতি ভবানী দাস চোধুরী বাকলা হইতে উঠিয়া আসিয়া যশোহরের অন্তর্গত মাঙ্গলপাড়া ও মাইহাটি নামক স্থানে সংস্থাপিত হন। এইরূপে বাকলা বিক্রমপুর ও ভূষণা সমাজ হইতে অনেকানেক কুলীন আসিয়া ক্রমে যশোহর সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এই নব সংস্থাপিত সমাজের সমাজপতি পদে বিক্রমাদিত্য বরিত হইয়া বসন্ত রায়ের সাহায্যে সামাজিক শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য যথাক্রমে দুই বিবাহ করেন। প্রথমা উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যা, দ্বিতীয়া জগদানন্দ ঘোষের কন্যা। আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রিঃ অব্দে তাহার প্রথম পক্ষে প্রতাপাদিত্য ও দ্বিতীয় পক্ষে মুকুটমণি নামে দুইটি পুত্র হয়।

গৌড় নগরে প্রতাপের জন্ম হয়। তৎকালে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রাজামাত্য পদে বরিত থাকিয়া নিতান্ত যশের সহিত কাল কর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রবাদ শুনা যায় যে, প্রতাপ জন্মগ্রহণ করিয়াই বিকট শব্দে নিনাদ করিয়া উঠেন, তাহাতে রাজপরিবারস্থ সকলেই ভীত হন, পরে জ্যোতির্বিদেরা কোষ্ঠী-গণনাফলে নির্দেশ করেন যে, প্রতাপ পিতৃঘাতী হইবে। এই সকল মনক্ষোভকর বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বিক্রমাদিত্য নবজাত শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত রায়ের ও স্বীয় বনিতার কাতরতায় অভিভূত হইয়া ঐ কার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ইহাতে স্বভাবত কুরুপতি দুর্যোধনের বিষয় মনে পড়ে, এবং পরে এই কায়স্থ রাজবংশও যে কুরুকুলের ন্যায় আত্মীয়, জ্ঞাতি, পুত্র কলত্রাদির রুধিরে উহার শেষ যবনিকা পাতিত করিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ক্রমে প্রতাপাদিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দিকে যেমন তাহার হৃদয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি সঞ্চারের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর দিকে আবার ঔদ্ধত্য, একগুয়ে প্রকৃতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ও তাহার প্রবৃত্তির অন্যতর উপকরণ স্বরূপ লক্ষিত হইতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য কোন মতেই পুত্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। পুত্রের মুখাবলোকনে কোথায় তাহার হৃদয়ে সন্তোষ উদ্ভাসিত হইয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে, তাহা না হইয়া তৎবিপরীত নানা অসন্তোষকর বিষয়ের নায়ক বিবেচনায় তিনি পুত্রকে বরং কুগ্রহবৎ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিদ্যা বুদ্ধির কথঞ্চিত ন্যূনতা থাকিয়াও যদি প্রতাপ সচ্চরিত্রতার উচ্চ পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, বিক্রমাদিত্য তাহাকে সস্নেহে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে সর্বদা নিবদ্ধ রাখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পরে এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি পুত্রকে দূরতর প্রদেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বিদ্যাগবেষণার সহিত বহুদর্শিতা লাভ হইলে ভবিষ্যতে পুত্র নিজ হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কমনীয় প্রকৃতি হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া প্রতাপকে দূরদেশে, রাখাই ঠিক হইল।

অচিরে উপযুক্ত লোক সহিত পিতৃনির্দেশক্রমে প্রতাপাদিত্য দিল্লিতে প্রেরিত হইলেন।

এ স্থলে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়, অপর একটি কারণ লিখিয়াছেন যে, প্রতাপ রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্যব্যপদেশেই বিক্রমাদিত্য কর্তৃক দিল্লিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ স্থলে তদনুকূলে মত প্রদান করিতে পারি না।

১। শ্রীযুক্ত সত্যচারণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—

"দূরতর দেশে অবস্থান করিলে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধববিয়োগজনিত বেদনা তাহার (প্রতাপের) হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর করিয়া তাহার স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিবে, বিবেচনা করিয়া, আগ্রাতে তাহাদের প্রধান কর্মচারীর পরিবর্তে, প্রতাপকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন।"

মানিলাম, জমিদারগণের রাজধানীতে, একজন কর্মচারী নিযুক্ত অসম্ভব নয়, কারণ রাজ্যের যে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রাজধানীতে রাজসকাশেই হইয়া থাকে। কিন্তু কি কার্য উপলক্ষ করিয়া প্রতাপকে তাহার পিতা ও পিতৃব্য দিল্লিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখা যাউক। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আগ্রাতে রাজস্ব আদায় উপলক্ষ করিয়াই, প্রতাপ প্রেরিত হয়েন। যথা—

"প্রতাপ যখন দেখিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত, তাহার বিশেষরূপ পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাহাদিগের বার্ষিক দেয় কর প্রদান রহিত করিয়া দেন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা, সম্রাটের কর্ণগোচর হয়।"

অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, বোধ হয়, শাস্ত্রীকৃত গ্রন্থে পাঠকমাত্রেই জানেন যে, প্রতাপ এই রাজস্ব বন্ধ করার কারণ, আপন পিতৃব্য বসন্তরায়ের স্কন্ধে চাপাইয়া, ও পিতা বিক্রমাদিত্যকে উদাসীন বানাইয়া পাকে প্রকারে জমিদারিটা আপন হস্তে আনয়ন করেন। প্রতাপ ছলে বলে জমিদার হউন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু তৎসাময়িক বঙ্গীয় জমিদারগণ কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লিতে কর প্রদান করিতেন, না তাহারা প্রদেশীয় নবাব বা দেওয়ানদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন, এই বিষয়টা দেখা আবশ্যক।

প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লিতে রাজকর আদায় করিতে বরিত হন, তৎসময় মোগলকুলগৌরব আকবর সাহ দিল্লির রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই বাদসাহের সমসাময়িক মহাত্মা আবুল ফজল, তৎকৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে, রাজস্ব আদয়ের বিধান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারা বঙ্গানুাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"যখন পাতসাহ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আতমাদ খাঁ নামক একজন খোজা, রাজার এই সকল কার্যের সহায় ছিলেন। রাজার খাস মহল এবং জায়গীর জমি পৃথক রাখা হইল। যে যে মহলের রাজস্ব এক কোটি দাম, সেই সকল মহলের উপর একজন করিয়া তহশিলদার নিযুক্ত হইল। এই সকল মহলের পরগণার উপর একজন প্রধান কোষাধ্যক্ষ দারগা নিযুক্ত হইয়াছিল।"

দেখা গেল, তহশিলদার, কোষাধ্যক্ষ ও দারগা, ইহারা মহাল, পরগণা প্রভৃতির রাজস্ব আদায় কার্যে নিযুক্ত ছিল। এখন দেখা যায়, তৎসময়ে বঙ্গদেশে কতটা মহাল ছিল ও কয়জন তহশিলদার থাকিয়া উহার আদায় তহশীল কার্য সম্পাদন করিত। তৎসময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশে ২২ বাইশটি সরকার নির্দিষ্ট ছিল।[৩] তন্মধ্যে যশোহর বা রসুলপুর সরকার খালিফেতাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই সরকারের মহালের সংখ্যা ৩৫, রাজস্ব ৫৪০২১৮০ দাম, তন্মধ্যে যশোহরে (রসুলপুরে) ১৭২৩৫৬০ দাম অর্থাৎ ৪৩০৮৯ টাকা কর আদায় হইত। আমরা বুঝিলাম না, যশোহরের এই অল্প রাজস্ব হাবেলী খালিফেতাবাদের তহশিলদারের নিকট আদায় না করিয়া, কিজন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লির রাজকোষে দেওয়া হইত।

২। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নানাদেশ হইতে নানা প্রকার বিজয়লব্ধ দ্রব্য আনয়ন পূর্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার প্রতাপের বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া, রাঢ়দেশীয় রাজন্যবর্গকে অধীনস্থ করেন।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকার হয়ত, তখন ইতিহাস লিখিবার অধিক সরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই জন্য সেই সময় ইতিহাস পাঠানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে একটা উপকথা লিখিয়া প্রবোধ দিয়া গিয়াছেন। তাহা বলিয়া এই গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস লিখিবার দিনে, সেই উপকথা প্রকাশ ও ব্যক্তিগত অত্যুক্তিপূর্ণ মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া জন সমক্ষে প্রকাশ করা কতদুর সুসঙ্গত হইয়াছে তাহা কি আমাদের মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় একটুকুও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? তিনি যদি বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতেন, তবে উড়িষ্যা কেন, বঙ্গবিজেতা বলিয়াও প্রতাপের বর্ণনা করিতেন না। তবে স্বাধীনতা প্রয়াসী ও স্বদেশ-বৎসল বলিয়াই প্রতাপের উপযুক্ত প্রশংসাবাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন। সেই গৌরবাত্মক কথা কয়েকটি বরং ঐ সকল অত্যুক্তি হইতে, অধিক উজ্জ্বলতর থাকিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমধিক প্রতিফলিত হইত।

যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের পূর্ণ বিকাশ, তৎকালে বঙ্গদেশ মোগল-করতলগত। উহা বাইশ সরকারে বিভক্ত ও নবাবগণ দ্বারা শাসিত ছিল। বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা তখন সেই সকল শাসনকর্তাদের অধীনে থাকিয়াই কালযাপন করিতেন। পূর্ণ স্বাধীনতা তাহাদের ছিল না। তন্মধ্যে মাত্র দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারী স্বদেশ-স্বাধীনতা মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, জন্মভূমির উদ্ধার সাধনব্রতে কৃতসংকল্প হন। অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা নবাবকে পূর্বে যেরূপ মান্য করিয়া চলিতেন, পরেও তদ্রূপই করিতেন, এই কারণেই অর্থাৎ সমুদয় জমিদারগণ একমতাবলম্বী না হওয়া প্রযুক্ত বিদ্রোহী জমিদারেরা অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হন। এস্থলে সমুদয় বঙ্গীয় রাজগণকে করায়ত্তকারী বলিয়া, প্রতাপাদিত্যকে অধিক বাড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? অবশ্য প্রতাপের বুদ্ধিবলে ও মন্ত্রণাগুণেই এই ভুঞাগণেব পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্তু প্রথম সূত্রপাতের কারণ মুসলমান পাঠানগণ।

৩। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় ঈশা খাঁ মসনদ আলি ও ঈশা খাঁ মছলন্দি, দুই ব্যক্তি ঠিক করিয়াছেন, উহা কোন্ ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, তাহা জানান উচিত ছিল। কিন্তু পুস্তকপাঠে হঠাৎ উভয়কে এক বলিয়াই ধারণা হয়।

৪। শাস্ত্রী মহাশয় ঈশা খাঁকে নিহত করিয়া উড়িষ্যায় তাহার কবর দিলেন, তৎপর প্রতাপ দ্বারা বিক্রমপুরাধিপতিকে দমন জন্য, পদ্মাপার পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিলেন, এবং একটা রণাভিনয় করিয়া চাঁদ ও কেদার রায় দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে কতকগুলি অনুনয় বিনয় করাইয়া পরে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু এই কথাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতাপ কখনও যে রায় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বিক্রমপুরে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাঁ আমরা এই মাত্র প্রথম শুনিলাম। যদি ইহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোনও তথ্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া লেখাই কর্তব্য। অন্যথা এইরূপ কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা বর্ধিত করা কোন ক্রমেও সুসঙ্গত হয় না। বিশেষত মিত্রগণের সহিত শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে যাওয়ায় প্রতাপের চরিত্রে একটা দোষ প্রবেশ করান ব্যতীত উহা তাহার সুখ্যাতির পরিচায়ক হয় না। এইরূপ নানা কথায় তাহার সহিত আমাদের মতানৈক্য আছে। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, তাহার গুণবত্তার কথা প্রকাশ করা কর্তব্য, কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত বিশদভাবে তৎকর্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও বহু বিষয়ে তদনুসরণ করিয়াই প্রবন্ধ পরিপূরণ করিতে পারিব। এ পর্যন্ত বারভুঞা লিখিতে বসিয়া অন্য কাহারও নিকট কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই ; বিষয়টি যে কতদূর গুরুতর, তাহা কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বুঝিতে পারি নাই, এজন্য ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত লোকের নিকট বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কত প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর বড় পাই নাই। অনেক খ্যাতনামা

লেখকগণের নিকট আশা পাইয়াছিলাম, তাহারা কতকটা অনুসন্ধান লইয়া কোন কোন বিষয় যতদুর জানিতে পারেন, তাহা আমাকে জানাইবেন, পরে কিন্তু চিঠি লিখিয়াও তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাই নাই। এই কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক।

প্রতাপাদিত্য দিল্লি হইতে দেশে প্রত্যাগমন করার কিছুদিন পরেই রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে রাজা, পুত্র প্রতাপকে দশ আনা ও ভ্রাতা বসন্ত রায়কে ছয় আনা জমিদারী বিভাগ করিয়া দেন। এই সময় হইতে কতকদিন পর্যন্ত খুল্লতাতের সহিত প্রতাপ বড়ই সদ্ভাবে কাটাইয়াছিলেন। তৎকালে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও সৌষ্ঠব সংসাধিত হইয়া, যশোহর বঙ্গের একটি প্রধান নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

বসন্ত রায়ের অভিমতে প্রতাপাদিত্যই রাজোপাধি ধারণ করেন। এই সময় তাহার সকল কার্যই পিতৃব্যের পরামর্শ গ্রহণান্তর সম্পন্ন হইতেছিল। কার্যও সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল। প্রতাপ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে খুল্লতাত কেবল নিজহিতকল্পেই সময় ব্যয় না করিয়া তাহার উন্নতি ও হিতজনক কার্যেও সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া তৎসম্পাদনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। একারণে পিতৃব্যের প্রতি ইতিপূর্বে তাহার যে বিদ্বেষ ভাব সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপরিবর্তে বিশ্বাস ও ভক্তি চক্ষেই তৎকার্য সমুদয় এখন প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এই সুখময় সুদিনে যশোহর রাজবংশের দ্বারা যে যে শুভকর ও পূণ্যজনক কার্যকলাপ সম্পাদিত হইয়াছিল, আমরা উহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ক্রমে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রতাপ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পিতৃক্রোড় ও জন্ম ভূমিবিচ্যুত হইয়া, দিল্লিতে অবস্থান করেন। তৎকালে নানাবিধ কার্যকলাপ সন্দর্শনে, তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। বিশেষত মুসলমানেরা কি উপায় অবলম্বন করিয়া, ভারতের একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, কি নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ক্রমে পরাজিত করিয়াছে, তৎবিষয় অতি বিচক্ষণতার সহিত বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

সেই সময়ে মিবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ যেরূপ অমানুষিক সাহস সহকারে, সুখ ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, দিল্লির অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এমন কি মহাবিপদে আত্মহারা না হইয়া, বাদসাহের ও স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, তাহাদের কৌশলজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে নিরত ছিলেন ; যখন জগৎ স্তম্ভিত হইয়া তাহার সেই কার্যবত্তার,—পুণ্যকীর্তি সন্দর্শনে বিস্ফারিতনয়ন, যখন সেই পুণ্যশ্লোক নরেশের উচ্ছ্বাসময় ও মহাপ্রাণতার জীবনব্যাপী সমরসন্দর্শনে শত্রুরা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তদীয় গুণগানে নিরত না হইয়া পারে নাই, তৎকালোচিত সেই অদ্ভুত বিবরণ প্রতাপাদিত্যেরও জানিবার বাকি ছিল না।

প্রতাপাদিত্য সেই রাজপুতরাজের বীরচরিত যতই অনুধ্যান করিয়াছিলেন, ততই তাহার প্রাণে যেন আর একটি নব দুরাকাঙক্ষা-চিন্তা প্রসূত হইয়া তাহাকে এক অভিনবপথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রতাপের সেই নব ভাবনা আর কিছুই নহে, কেবল বিজাতীর হস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনা করা।

মোগল পাঠানের পরস্পর সংঘর্ষণে তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতাপ আত্মচিন্তা-সাফল্যের মহাসুযোগ পাইয়া, উহার প্রসার আরও বর্ধিত করিয়া তুলিলেন। তখন পাঠান সামন্তগণ ও হিন্দু জমিদারেরা এক মতাবলম্বী হইয়া মোগল-বাদসাহের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া প্রথমত মনোগত ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, এমন কি, মোগলরাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রাজ্য

মধ্যে দুর্গাদি নির্মাণকার্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ধূমঘাটে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। নৈহাটির অনতিদূরে জগদ্দল, শালিখা, রায়গড়, মাতলার নিকট, এতদ্ভিন্ন কালিন্দী তীরে বংশীপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্মিত হয়। প্রবাদ আছে, ধুমঘাটের দুর্গ পাঁচবৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

বহু রথ্যা ও জলাশয় যশোহর রাজবংশের কীর্তিস্বরূপ আজিও বিরাজিত আছে, এতন্মধ্যে যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া ঘাট্টারায়পুর যাইবার জন্য যে সুপ্রশস্ত পথ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সুন্দরবন প্রদেশে ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু বকুলবৃক্ষ বর্তমান দেখা যায়।

বসন্তরায়ের নামানুসারে বসন্তপুর এবং প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে প্রতাপনগর বলিয়া দুইটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটের অনতিদূরে এক শিলাময়ী কালী সংস্থাপন করেন, ইনি পরে যশোহরেশ্বরী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই প্রতিমা সংস্থাপন সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প পরিশ্রুত হওয়া যায়। নিশীথে কোন জ্যোতির্ময় পদার্থ অবলোকন করিয়া দশা পাটনী এই বিষয় মহারাজকে অবগত করায়; রাজার অনুসন্ধানে ঐ ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন; পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে নিশ্চয় ভগবতী আবির্ভূতা আছেন বুঝিয়া তথায় দেবী প্রতিমা সংস্থাপন করেন।

এতদ্ভিন্ন এই রাজবংশ দ্বারা উৎকল হইতে আনীত গোবিন্দজী ও উৎকলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যশোহরের রাজবংশীয়গণের নিকট যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদঙ্কিত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"নির্মমে বিশ্বকর্ম্মায়ৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বর সংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গ মনুত্তমম্।।
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলাদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চতৎ।।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত, ৬৪ পৃষ্ঠা।

যশোহর রাজবংশের দানশীলতার বিষয় বিস্তর পরিশ্রুত হওয়া যায় ও রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্নস্থান হইতে আসিয়া যশোহরবাসী হন। বিশেষত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের "কল্পতরু" ব্যাপার তো এক আলৌকিক কাণ্ড। একার্যে প্রবৃত্ত হইলে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিবে, দাতাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ এই কার্যে যে কত লোকের প্রার্থনীয় কত দান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জনপ্রবাদ শুনা যায়, কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার সাত্ত্বিক, রাজসিক কি তামসিক ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য রাজমহিষীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, রাজা অম্লানবদনে তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিয়া স্বীয় সহধর্মিণীকে তৎকরে সম্প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন বিপ্রবর ভক্তিভরে মহারাজকে শতশত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন— "আমার রাজমহিষীতে কোন প্রয়োজন নাই, রাণী আমার মাতৃস্থানীয়া; কেবল মহারাজ যথার্থ ধর্মভাবে কি লৌকিক আড়ম্বরে এই কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি সর্বান্তঃকরণে বলিতেছি, মহারাজ! রাণীমাতাকে পুনঃ গ্রহণ করুন ; এবং মহারাজ সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন?" বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা গ্রহণে, নিষ্ক্রয়স্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করিয়া রাণীকে পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত গেল সব শুনা কথা, কিন্তু খুলনাঞ্চল পরিভ্রমণকালে আমি এতৎসম্বন্ধে যে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহার সম্যক্ বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

জেলা খুলনা বাগেরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত মুলঘর গ্রাম অতি প্রসিদ্ধ। অনেক সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ তথায় বাস করিতেছেন; তন্মধ্যে বৈদ্যবংশীয় রায়চৌধুরী উপাধিধারী ব্যক্তিদের পূর্বপুরুষ ঐ স্থানের (খরড়িয়া পরগণার) জমিদার ছিলেন। তাহাদের জমিদারী মহারাজা প্রতাপাদিত্যেরই প্রদত্ত। এতৎসম্বন্ধে তত্রত্য জনসাধারণ মধ্যে যে ইতিবৃত্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ দাশগুপ্ত মুলঘরের নিকট কোন চতুষ্পাঠাতে শিক্ষকতার কার্য করিতেন। তৎকালে ঐ স্থানে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত। উহারা সকলেই জানকীবল্লভকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিত। অদ্যাপি ঐ প্রদেশের লোকেরা পাঠশালার শিক্ষকদিগকে "বিশ্বাস" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। জানকীবল্লভও বিশ্বাস মহাশয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[৪]

খরড়িয়া পরগণাটি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এতন্নিবন্ধন প্রজাদিগের অভাব, অভিযোগ ইত্যাদি যশোহরের রাজসদনেই করিতে হইত। কোন সময়ে বিশেষ জলকষ্টানুভব করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণ মহারাজকে আপনাদের অভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত করায়, রাজা রামদাস দেওয়ান নামক একজন অমাত্যের প্রতি প্রজাগণের অভাব তদন্ত করিয়া যাহাতে উহা নিরাকৃত হয়, তদনুরূপ আদেশ প্রদান করেন।

রামদাস দেওয়ান তৎকালে দক্ষিণ প্রদেশের করসংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অচিরে খরড়িয়া পরগণায় উপস্থিত হইলেন, পরে প্রজাদের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, তথায় এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে দেওয়ানের সহিত, বিশ্বাস মহাশয়ের বেশ আলাপ পরিচয় হয়। জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয়কে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, রামদাস দেওয়ান পুষ্করিণী খনন বিষয়ের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। জানকীবল্লভও বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে আরব্ধ কার্য অচিরে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তখন দেওয়ান পরিতুষ্ট হইয়া জানকীবল্লভকে বলেন, "আপনি এতাদৃশ কুৎসিত স্থানে কেন অবস্থান করিতেছেন? আমার সহিত চলুন, অবশ্য আপনার উন্নতি সংসাধিত হইবে।" বিশ্বাস মহাশয় তাহার কথায় আশ্বাসিত হইয়া তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান রামদাস জানকীবল্লভকে এক মোহরের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। কার্যপারদর্শিতাগুণে, পরে রাজানুগ্রহে বিশ্বাস মহাশয় প্রধান কাননগুর পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্য যখন কল্পতরু হইয়াছিলেন, সেই সময় বিশ্বাস মহাশয়ের উপর অনেক কার্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, "কার্য সুসম্পন্নের সহিত তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহাতে কোনরূপ ত্রুটি ঘটে, তবে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" ভাগ্যদেবীর অনুকূলতায় জানকীবল্লভ তাহার হস্তে ন্যস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া যশোলাভ করিতেই পারিয়াছিলেন। এজন্য রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনার অনুমতি প্রদান করেন। রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া জানকীবল্লভ খরড়িয়া পরগণার জমিদারী প্রার্থনা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া তাহাকে ঐ পরগণার জমিদারী সনন্দ ও মজুমদার উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও জানকীবল্লভ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত ছিলেন না। পরে রাজা বন্দি হইলে পর, যখন প্রবল মোগলবাহিনী রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল, তখন জানকীবল্লভ অনন্যোপায় হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি লক্ষ্মীনারায়ণ ও একটি রাজরাজেশ্বর চক্র লইয়া স্বীয়াবাসে প্রস্থান করেন।[৫]

রাজা বিক্রমাদিত্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার দেহাবসানে তদীয় প্রিয় ভ্রাতা বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের সদ্ভাব রক্ষা কঠিন। এজন্য জীবিত থাকিতেই জমিদারী বিভক্ত করিয়া দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করেন। তদনুসারে প্রতাপাদিত্যকে দশ আনা ও বসন্ত রায়কে ছয় আনা অংশ নির্দেশ করিয়া দেন। বসন্ত ও প্রতাপ কেহই তখন তাহাতে কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লন। রাজলক্ষ্মী যতদিন যশোহরের প্রতি অনুকূলা ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ভ্রাতুস্পুত্র ও খুল্লতাত সৌহার্দের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু চঞ্চলার মন ত সর্বদাই অস্থির। বহুদিন এক ভবনে বাস করা তাহার কোন কালেই ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার আগমনের লক্ষণটা বরং কিছু বুঝিয়া লইতে সক্ষম হওয়া যায়, কিন্তু নির্গমন কাণ্ডটা এত ত্বরিতে সংঘটিত হয় যে ক্ষণস্থায়ী তড়িতের গতিকেও পরাস্ত মানিতে হয়। দুর্ভাগ্য পবনে সৌভাগ্যের দীপ অতি সত্বরই নির্বাপিত হইয়া থাকে।

কমলার আসন টলিল। পিতৃব্যের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানাবধিই বসন্ত রায়কে সন্দেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। কিছুকাল পাংশু আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহা দৃষ্ট্যতীত ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যসমীরণের প্রথম সঞ্চারেই সৌভাগ্য পাংশু চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আবার সেই দ্বেষ-বহ্নির সঞ্চারে রাজভবন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহা আর নির্বাপিত হইল না।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, জামাতা রামচন্দ্র রায়ের সহিত প্রতাপের মনোমালিন্যের প্রধান নায়ক বসন্ত রায়। নাতজামাইয়ের বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করিয়া তিনিই স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র প্রতাপকে দুর্দ্দান্ত নর রাক্ষসরূপে বর্ণনা করিয়া, রামের কোমল মনে মৃত্যুর বিভাষিকা প্রকটিত করিয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের মোহিনীরূপ ধারণ হইতে পলায়ন পর্যন্ত যত কিছু ব্যাপার সমস্তই সেই 'বুড়ো' বসন্তের ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র। প্রতাপাদিত্য এমন কাপুরুষ ছিলেন না যে তদ্দ্বারা জামাতৃবধ নামক একটা লোমহর্ষণ ব্যাপারের সংঘটন হইতে পারে। ধন্য বাঙ্গালী লেখক!

কেহ কেহ বলেন চাকসিরি পরগণা বসন্ত রায়ের অংশে পতিত হয়। ঐ স্থানটি সমুদ্রের নিকটবর্তী থাকায় পোতাশ্রয়ের বিশেষ আনুকূল ছিল এবং প্রান্তবর্তী জলদস্যু ও জলযুদ্ধকারী-দিগের আক্রমণ নিবারণের পক্ষেও সুন্দর বন্দোবস্তের উপযুক্ত স্থান ছিল। তৎদৃশ অন্য আর একটি পরগণা পরিবর্তিত করিয়া প্রতাপাদিত্য উহা পাইবার জন্য পিতৃব্যের নিকট প্রস্তাব করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন না।

প্রতাপ নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে মোগল বাদসাহের সহিত তাহার সংঘর্ষণ অনিবার্য এবং এজন্য ঐ চাকসিরিতে দুর্গ নির্মাণ ও জলযুদ্ধোপযোগী পোত বিনির্মাণ প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া উঠিবে। পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকাই কর্তব্য তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। এই সকল কারণে এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বসন্ত রায়কে বাদসাহের প্রতিপক্ষে আনিতে না পারায়, প্রতাপ খুল্লতাতকে পরম শত্রু বোধ করিতে লাগিলেন। বসন্ত রায় ও তৎপুত্রগণের নিকটও এই বিবরণ অবিদিত রহিল না। এই সূত্রে যশোহরের সমুজ্জল সৌভাগ্যগগনে দুর্ভাগ্যের তিমিরচ্ছটা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

বসন্ত রায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে জ্ঞাতি প্রতাপাদিত্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায় যে সময়ে শ্রাদ্ধ-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে প্রতাপ সশস্ত্র ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন যে, বসন্তরায় ঘটনাক্রমে এই সময়ে কোন পরিচারককে 'গঙ্গাজল আনয়ন কর' এই কথা বলায়, প্রতাপ মনে করিলেন, পিতৃব্য তাহাকে বধ করিবার জন্য স্বীয় শর আনয়ন করিতে বলিতেছেন। বসন্ত রায়ের অস্ত্রের নাম ছিল 'গঙ্গাজল'। অব্যবস্থিতচিত্ত প্রতাপ এই কথাতেই উত্তেজিত হইয়া প্রথমেই বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ

পুত্র গোবিন্দকে, পরে বসন্তরায়কে, তৎপরে ক্রমে জগদানন্দ, পরমানন্দ, রূপরাম, মধুসূদন, মাণিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের অন্যান্য পুত্রগণকেও শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বসন্ত রায়ের স্ত্রী দেখিলেন বংশ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বালক রাঘবকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর এই রাঘবই কচুরায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময়ে বসন্ত রায়ের একটি পুত্র চাঁদ রায় ও অপর আর একটি পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করায়, তাহাদের প্রাণ রক্ষা পায়। বসন্ত রায়ের সাধ্বী পত্নী পতিসহগামিনী হইলেন।

এই কাণ্ডের অবতারণায় যিনি যতই বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করুন না কেন, প্রতাপই যে এজন্য সম্পূর্ণ দোষী তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভূমি লাভের জন্য জগতে এইরূপ ব্যাপার বহু সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। একই আসনে বহু শ্রমণ ও যোগী উপবেশন করিয়া বহুকাল কর্তন করিতে পারেন, কিন্তু একটি বিস্তৃত রাজ্যে একাধিক রাজার স্থান সংকুলন হয় না। দুই হাতে গেলেই তাহার পরিণাম ফল হাতাহাতি ও কাটাকাটি। যাহা হউক প্রতাপাদিত্যের এই বীভৎস ব্যাপার সংসাধনের পর রাজলক্ষ্মী প্রতাপের উপর বিরূপা হইলেন। মা যশোহরেশ্বরী ফিরিয়া বসিলেন। একটা দুর্লক্ষণে সমস্ত যশোহর যেন ভাসিয়া চলিল!

একদা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রতাপ দেখিতে পান যে বাটির ঝারুদারিণী স্বীয় বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিয়াই স্বকার্য সাধনে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। তদবস্থা অবলোকনে রাজার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ভৃত্যগণকে সেই নির্লজ্জা রমণীর স্তন কাটিয়া ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আজ্ঞা অনুসারে কার্য সম্পাদিত হইল। প্রবাদ এই যে ইহাতেই কুলদেবী যশোহরেশ্বরী নিতান্ত কুপিতা হইলেন। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলে দেখিলেন যে যশোহরেশ্বরী মন্দিরসহ উত্তরাস্যা হইয়া রহিয়াছেন। রাজাকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে, রাজা ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য মন্ত্রপূত "হস্তচালনা"র আশ্রয় লইলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত হইল।

"শুম্ভঃ সুরেন্দ্রবিজয়ী নিহতো নিশুম্ভঃ
সংগ্রামমূর্ধনি যরা মহিষাসুরশ্চ।
সৈষা সুরাসুরগণার্চ্চিতপাদপদ্মা
কীটোপমেন মনুজেন কৃতোঽবমানা।।"

যশোহর রাজ্য সমুদয় হস্তগত করিয়া, প্রতাপ কোষ ও বলসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন। শঙ্কর, সূর্যকান্ত, ফিরিঙ্গি রুডা, রঘু, মদনলাল, প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণের সাহায্যে তাহার নৌসৈন্যগণ এরূপ সুশিক্ষিত হইল যে তাহারা মোগল অনীকিনীগণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতে লাগিল।

কোন এক বিশেষ আত্মীয়ের (রূপরাম বসুর) সাহায্যে বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়, বসন্তের প্রিয় বন্ধু হিজলীর মছন্দরীর[৬] আশ্রয় গ্রহণ করেন। মছন্দরী কচুরায়ের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, প্রতাপ ও বসন্ত রায় ঘটিত সমুদয় বিবরণ দিল্লিশ্বরের গোচর করেন। প্রতাপ তাহাতে রুষ্ট হন এবং হিজলী আক্রমণ ও মছন্দরীকে পরাস্ত করিয়া, হিজলী অধিকার করিয়া লন।

প্রতাপের এই আচরণে রাজমহলের মোগলশাসনকর্তা, সের খাঁ নামক একজন বীরপুরুষকে যশোহর আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন। যশোহরের সন্নিধানে উভয়পক্ষের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে মোগলেরা পরাস্ত হয় এবং সের খাঁ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহাই প্রতাপের মোগল জয়ের প্রথম উদ্যোগ পর্ব।

তৎপরে ইব্রাহিম খাঁ মোগল পক্ষ হইতে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যসহ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। তথা হইতে নৌকাযোগে ক্রমে মাতলার নিকট গমন করেন। ইতিপূর্বে

প্রতাপ তথায় একটি দুর্গ নির্মাণপূর্বক বহুসংখ্যক সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম তথা হইতে রায়গড় দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতরযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। মোগলেরা রায়গড় পরিবেষ্টন করিয়াছে, এই কথা অবগত হইয়া প্রতাপ আদেশ করিলেন যে কমল খোজা ও সূর্যকান্ত স্ব স্ব দলসহ পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুন। সূর্যকান্ত স্বীয় দলসহ নৌকাযোগে এমনভাবে আক্রমণ করিলেন যে মোগলরা তাহার কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারিল না। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ইব্রাহিম কতিপয় সৈন্য তথায় রাখিয়া অন্যান্য সহচরগণসহ মাতলার দিকে প্রস্থান করিলেন। ইতিপূর্বেই রুডা যুদ্ধতরীর ও সূর্যকান্ত, শঙ্কর, মদনমল্ল, সুখময়, সুন্দর প্রভৃতির কেহ বা পদাতিক, কেহ বা অশ্বারোহী, কেহ বা গজারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া মাতলার দুর্গ রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইল ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জল ও স্থল উভয়দিকে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মাতলার প্রাঙ্গন ও তলবাহী স্রোতস্বতী নরশোণিতে রক্তাভ ও শবপূর্ণ হইয়া প্রেতভূমিরূপে পরিণত হইল। প্রতিপক্ষ তাহাদের সমস্ত বিক্রম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে কোনরূপেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এবারেও মুসলমান সৈনিকগণের উপর বিমুখ হইলেন। "জয় মহারাজ প্রতাপের জয়" এই রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরাজিত ইব্রাহিম লজ্জাবনতমুখে যশোহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

প্রতাপের এই সকল বিজয়বার্তা বঙ্গের চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, পার্শ্ববর্তী রাজগণ অনেকেই তাহার সহিত মৈত্র সংস্থাপন করিতে লালায়িত হইলেন। বুদ্ধিমান ও বীরবর প্রতাপ সময়োপযোগী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও বাদসাহের সহিত যুদ্ধকালে পরস্পর সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইলেন।

এই পর্যন্ত প্রতাপাদিত্য কেবলমাত্র আত্মরক্ষণেই উদ্যোগী ছিলেন। ক্রমে দুই জন মোগল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। তিনি সেই দুর্দমনীয় বেগ কোন মতে সংযত রাখিতে পারিলেন না। বিশেষত এই সময়ে অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মোগলাধিকৃত সপ্তগ্রাম বন্দর লুণ্ঠন করিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে প্রতাপের অভিপ্রায় হইল। পরে সেনানায়কগণকে এই কথা পরিজ্ঞাত করিয়া প্রতাপ বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ এ পর্যন্ত তোমরা কেবল আক্রমণ নিবারণ করিয়া কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ মাত্র, কিন্তু কোথাও আক্রমণকারী হইয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হও নাই। হিজলী বিজয় তো একটা সামান্য মৃগয়া ব্যাপার মাত্র, কিন্তু যদি তোমরা সিংহ, ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ মৃগয়া ক্ষেত্রে আপতিত হইয়া উহা বধ বা বন্ধন করিতে সমর্থ হও তবেই বুঝিব যে তোমাদের অস্ত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে তোমরা অভ্যস্ত হইয়াছ। যদি গৃহের একাংশে বিষধরের অবস্থান হয়, তবে আর কত দিন জাগ্রত থাকিয়া তাহার আঘাত হইতে পরিত্রাণের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে? আর চিন্তিত মনে কতকালই বা জাগ্রত থাকা যায়? অতএব আমার ইচ্ছা বন্ধুগণ, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রতিবেশী হিংস্র জন্তুগুলিকে শীঘ্রই বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়া কতকদিন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া লও। অন্যথায় এমন এক দিন উপস্থিত হইবে যে, সেদিন হয়ত আমাদের এই নিদ্রাই মহানিদ্রারূপে পরিণত হইবে এই সকল কার্য করিবার পূর্বে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লওয়া কর্তব্য, অতএব আমি ঠিক করিয়াছি যে মোগলাধিকৃত সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগের সেই অভাব পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এস ভ্রাতৃগণ, কেহই ভীত বা বীতশ্রদ্ধ হইও না। আমার কথা মানিয়া চল, দেখিবে যশোহরেশ্বরী অবশ্যই আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।" প্রতাপের বাক্য সমাপ্ত হইতেই তাঁহার সহচরগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা মহারাজের আদেশ অবশ্য প্রতিপালন করিব।

যত দিন জীবন তত দিন পণ, মা যশোহরেশ্বরীর নামে আমরা এই শপথ গ্রহণ করিলাম।" বলা বাহুল্য অচিরে সপ্তগ্রাম বিলুণ্ঠিত হইল। মোগলশাসনকর্তা বাধা প্রদানে অসমর্থ হইয়া পরিজন সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য বিজয়লাভান্তে যশোহরে প্রত্যাবর্তন করিয়া যমুনা-তটে উপনীত হইলেন। পরে জাহাজঘাটায় অবতীর্ণ হইবামাত্র বুরুজপোতা হইতে[৭] ঘন ঘন তোপধ্বনি হইয়া মহারাজের বিজয় ও আগমনবার্তা জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া দিল। অমাত্য[৮] লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী সকলের অগ্রণী হইয়া মহারাজের সম্বর্ধনা করিলেন। পরে সেনাপতিগণ ও অপরাপর কর্মচারীরা আসিয়া তাহাকে মহাসমারোহে রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। অসংখ্য জনতায় রাজপথ পরিপূর্ণ হইল। রণবাদ্যের তালে তালে সৈনিকগণের পাদবিক্ষেপ সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব দৃশ্যের ও জাগ্রত সমররসের মদিরাসার ঢালিয়া দিতে লাগিল। রাজা স্ববাসে, উপনীত হইবামাত্র বন্দিগণ সমস্বরে মহারাজেব বিজয় ঘোষণার গানগুলি পঞ্চমে চড়াইয়া দিল। নারীগণের হুলুধ্বনিতে দশদিক পরিপূর্ণ হইল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মহারাজকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ আজ মুক্তহস্ত। বড় বড় অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে, নিতান্ত ক্ষুদ্রবেতনভোগী পর্যন্ত সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উচ্চহারে ও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণনন্দনেরা নিম্নহারে বিদায় পাইলেন। দরিদ্রগণ আশাতিরিক্ত দান পাইয়া, সেই পুরাতন গাথার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিল—

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
প্রতাপ আদিত্য দাতা এ মহীমণ্ডলে।।"

যশোহর আজ উন্মত্ত। একদিকে যেমন এই নববিজয় ও অর্থসঙ্গতি সংগ্রহ জন্য উল্লাসে নৃত্যময়, অপরদিকে তেমনই ইহার পরিণাম ভাবিয়া অশ্রুযুক্ত। এই মহাব্যাপারে সকলেই আমোদে বিহ্বল, কেবল একমাত্র রাজলক্ষ্মীরূপিনী রাজরাণী সচকিতা ও উদ্‌ভ্রান্তা, যেন কোন নিধি হস্তগত হইয়া তাহা পুনরায় হস্তচ্যুত হইল। এইরূপ একটা ভাব লইয়া তিনি জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তির ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন প্রতাপাদিত্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া রাণীর সম্মুখীন হইলেন, তখন রাণী তাহাকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রেমাশ্রুভাবেই উহা গ্রহণ করিয়া মহিষীকে হৃদয়ের প্রতিদান করিলেন। কিন্তু দম্পতির মনোগতভাব ইহাতে কিছুই পরিব্যক্ত হইল না।

রাজা স্নানাহ্নিক ও আহার পরিসমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলেন। তখন মহিষী সময় বুঝিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, আপনার সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া এই হতভাগিনী নিজকে ধন্য মনে করিতেছে, কিন্তু জানি না, সময়ে সময়ে কেন একটা দুর্ভাগ্যের আবরণ আসিয়া আমার এই সুখ সূর্যকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। অলক্ষিতে কেহ যেন আমার শ্রুতিমূলে এই কথার অবতারণা করিয়া যায় 'ললনে! সুখের পর দুঃখ বিধাতার চিরনির্দেশ, অতএব যাহাতে ভবিষ্যতে সুখ বদ্ধমূল হয়, সেই উপদেশ পতিকে প্রদান কর। প্রবলের সহিত দুর্বলের সংঘর্ষণ কেবল নাশের সুপ্রশস্ত পন্থা মাত্র। এখনও সময় আছে। রাজা এখনও মহিমান্বিত বাদসাহের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিতে পারেন। উহাতে তাঁহার ও তোমার রাজশ্রী অটুট রহিবে!' মহারাজ, আমার এই সমস্ত ভাবোদয় কি কষ্টকল্পনা প্রসূত, না গতি পরিবর্তিত হইয়া আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের সুত্রপাতের পূর্বলক্ষণ?"

প্রতাপ বলিলেন—"প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরী, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা এবং তোমার মনোগত ভাব সমুদয়ই আমি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। কার্যের প্রথম সূত্রেই সমুদয় বিবেচনাসাপেক্ষ, কিন্তু উহাতে অগ্রসর হইয়া যে কাপুরুষ পথভ্রষ্ট হয়, তাহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। খুলিয়া বলিলেই বা কি, তোমার বিবেচনায় মোগল মার্তণ্ডের নিকট আমাদের মত উপগ্রহ সকল

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। অতএব উহার সুতীক্ষ্ণ তেজ আমরা কিরূপে প্রতিহত করিব?' কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সূর্য বিশ্বব্যাপী হইলেও, নবঘনসঞ্চারে সময়ে সময়ে তিনিও অদৃশ্য হইয়া থাকেন। মেঘ সরিয়া গেলে পুনরাবির্ভূতও হইয়া থাকেন। যতক্ষণ মেঘের বিকাশ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ত জগৎ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া থাকে। মোগল বাঙ্গালীর সংঘর্ষণে যতটুকু সময় অতিবাহিত হইবে, ততটুকু কালের জন্যও তো দেশীয় জনগণ মোগলের কঠোর অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া কতকটা শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইবে? এই পুণ্যটুকু যদি উপার্জন করা যায় তবে সেই সুযোগই বা পরিত্যাগ করি কেন? অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে? বাদসাহের পিতামহ বাবরসাহ এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সাহ সেই অর্জিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। আবার তৎপুত্র আকবরসাহ নববলে বলীয়ান হইয়া হিন্দুস্থান গ্রাস করিয়া বসিতে উদ্যোগী। তিনি যে সফলকাম হইবেন, তাহারই বা বিশ্বাস কি? রাণাপ্রতাপকে তো তিনি এ পর্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় পাঠানেরাই বা তাঁহাকে দেশাধিপতি বলিয়া কোথায় স্বীকার করিয়াছে? তুমি যাহাই মনে কর না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠান ও বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা বলবতী থাকিলে, আকবরসাহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। বিশেষ সকলে একমতাবলম্বী হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি; আর ফিরিবার উপায় নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আর এতৎ সম্বন্ধীয় কোন কথাই আমার সমক্ষে উত্থাপন করিবে না, একমাত্র যশোহরেশ্বরীর পরমপদ ভাবিয়া দিন অতিবাহিত করিতে থাক। কার্যের ফলাফল চিন্তা করিয়া তুমি অনর্থক শরীর ও মন নষ্ট করিও না।"

প্রতাপের প্রতাপ যতই বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল, মোগল কর্মচারিগণ ততই উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া দিল্লিতে নূতন নূতন সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। বাদসাহপক্ষীয় আজিম ওসান ও দ্বাবিংশতি আমীর পরাজিত হইয়া যশোহর হইতে বিতাড়িত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট আকবরসাহ লোকান্তরিত হন ও তৎপুত্র সেলিম সাহ, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লির মসনদে অধিরোহণ করেন (১৬০৬ খ্রিঃ অব্দে)।

রূপরাম বসু, কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া এই সময়ে দিল্লিতে অবস্থান করিতেছিলেন। আকবরসাহের পীড়া নিবন্ধন তখন পর্যন্ত রূপরাম কোনরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন নূতন বাদসাহের নিকট কুচরায়ের পক্ষ হইতে আর্জি দাখিল করিলেন। তাহাতে প্রতাপ আদিত্যের যাবতীয় অমানুষিক দুষ্ক্রিয়ার কথা যথাভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা প্রতাপের বিরুদ্ধে যে সকল লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ সঙ্গে উপস্থাপিত করা হইল। তখন জাহাঙ্গীর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, যিনি ইতিপূর্বে বঙ্গে আগমন করিয়া বহু বিদ্রোহীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই রণনীতিবিশারদ মানসিংহের উপরেই প্রতাপকে দমন করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এতদ্বিষয় অবলম্বনে মহাকবি ভারতচন্দ্রের অমিয়-লেখনী হইতে যে অমৃতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ উহা হইতেই প্রতাপের বলাবল ও আধিপত্যের বিষয় এবং মহারাজ মানসিংহের প্রতাপ-দমনজনিত বাঙ্গালায় আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে বাদসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।।

বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।
তার খুড়া মহাকায়, আছিলা বসন্ত রায়,
রাজা তারে স্ববংশে কাটিলা।
তাঁর বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা।।
ক্রোধ হৈল বাদসার, বান্ধিয়া আনিতে তায়,
মানসিংহে বাঙ্গালায় পাঠা'লা।।
মানসিংহ রণরঙ্গে, মজুমদারে নিয়ে সঙ্গে
কতদিনে বাঙ্গালায় আইলা।

পদ্যময় এই কতিপয় পংক্তিতে যশোহরের রাজপরিবারের আত্মকলহের ব্যাপার, বসন্তরায়ের নিধন, কচুরায়ের বাদসাহসকাশে ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ, প্রতাপ দমন জন্য জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রেরিত মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন ও ভবানন্দ মজুমদারের সহিত সম্মিলন ইত্যাদি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী কচুরায়কে প্রতিপালন করিতেন। তাহার কৃপাতেই, কচুরায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উহা পাঠ করিয়া আরও জানা গেল যে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্যক্তি মানসিংহকে এই সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভবানন্দকে যশোহর রাজবংশের কর্মচারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে কি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে তাহার উল্লেখ নাই। এইরূপ অবস্থায় একমাত্র প্রবাদ কথার উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণনগরের স্থাপয়িতাকে যশোহরের রাজবংশের কর্মচারি নির্দেশ করা সঙ্গত কিনা তাহা পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন। কার্ত্তিকেয় বাবু প্রকাশিত ক্ষিতীশবংশাবলী পাঠে জানা যায় "হাবেলী পরগণা নিবাসী কাশীনাথের অনাথা পত্নী, একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস ও একটি দাসী এবং দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহিত আন্দুলিয়া নিবাসী বাগয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লয়েন এবং তথায় সম্মান ও সমাদর পূর্বক গৃহীতা হয়েন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঐ কামিনীকে অতি সুশীলা দেখিয়া দুহিতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উক্ত রমণী গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। হরেকৃষ্ণ নবকুমারের অপরূপ রূপ লাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন এবং যথাকালে উপনয়ন ও বিবাহ দিলেন। পরিশেষে তাহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী করিলেন এবং স্ব বংশের সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন।" কাশীনাথের এই পুত্রই ভবানন্দ। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্বতঃই বোধ হয় যে হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার হইতেই কাশীনাথের জমিদারী প্রাপ্তি হয়। আবার শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত গ্রন্থে ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থ ক্ষিতীশবংশাবলী হইতে প্রামাণ্য কিনা আমরা জানি না। পাঠক মহোদয়গণই ইহার বিচার করিবেন।[*]

যে উপায় অবলম্বন করিয়া মানসিংহ পূর্ব পূর্ব্ববার কেদাররায়, মুকুন্দরায় প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরপুরুষগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, প্রতাপের সহিত যুদ্ধোদ্যোগেও সেই নীতি প্রবর্তিত হইল। এবার বিভীষণ পদে বরিত হইলেন, ভবানন্দ মজুমদার ও ভবেশ্বর রায় এবং তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা। মানসিংহ আটঘাট সমুদয় বন্ধ করিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে উপনীত

হইলেন। নিয়ম মত শৃঙ্খল ও তরবারি প্রেরিত হইল। দূত প্রতাপের সমক্ষে উহা স্থাপিত করিয়া, দুইয়ের মধ্যে যেটি তাহার অভিরুচি হয় তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কোনটি গ্রহণ করিলে যে তাহার ফল কি হইবে তাহা বর্ণনা করিতেও ভুলিলেন না। দূতের কথা শুনিয়া প্রতাপ গর্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "বার্তাবহ, তুমি সর্বথা ক্ষমনীয়, কিন্তু আজ যদি তোমার প্রভু আমার সমক্ষে এই উপহার লইয়া উপস্থিত হইতেন, তবে তাহার ও আমার এই উভয়ের মধ্যে অগ্রে তরবারি পরীক্ষা হইয়া পরে শৃঙ্খল যাহার যোগ্য তাহারই জন্য ব্যবস্থা করা হইত। সেই স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহিকে বলিও সাক্ষাৎ মত তাহার সহিতই এই তরবারির পরীক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। তুমি শৃঙ্খল লইয়া উহা তোমার প্রভুর চরণে প্রদান কর। প্রতাপ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিবেন না।"

আমরা ইতিপূর্বে পিতৃব্য ও তৎসন্তানগণের নিধন বৃত্তান্তে প্রতাপাদিত্যকে যথার্থ সংহারমূর্তিতে প্রকটিত করিয়াছি। জামাতৃনিধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি ভয়ানক নির্মমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া একটি রমণীর স্তন কর্তন কার্যও তৎদ্বারা সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা লিখিয়াছেন যে প্রতাপ রিপু-বশীভূত হইয়া ইহা হইতে গুরুতর আর একটি পাপানুষ্ঠান করিতেও বিরত হন নাই। উহা এস্থলে উল্লেখ না করাই বিধেয়। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে প্রতাপ স্বদেশের উদ্ধারসাধনরূপ মহৎ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যে মহাপ্রাণতার সহিত উহার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, যদি চরিত্রের পবিত্রতার সহিত তাহা উদ্‌যাপিত হইত তবে বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অধ্যায় বোধ হয় ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিত। যে স্থানে গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়বিচ্ছেদ ও যথেচ্ছাচার শাসন, ভাগ্যদেবী তথায় আর কতদিন তিষ্ঠিতে পারেন? তাই সর্বসৌভাগ্য দাত্রী ভগবতী প্রতাপের প্রতি বিরূপ হইয়া তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্য একদিন ইষ্টপূজায় নিযুক্ত থাকা সময়ে, তাহার কন্যা উপস্থিত হইয়া প্রতাপকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক ইনি কন্যা রূপধারিণী জগন্মাতা যশোহরেশ্বরী। প্রতাপ বার বার তাহাকে "চলিয়া যা" ইহা বলায়, কন্যারূপধারিণী দেবী বলিলেন "রাজন্‌, তুমি আমাকে বার বার চলিয়া যাইতে বলিতেছ। আমি এখনই যশোহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু জানিও ন্যায়ের অবমাননা ও সুনীতির বিপরীত ঘটনা যথায় সংঘটিত হয়, তথায় ভাগ্যলক্ষ্মীর অবস্থান কখনই হইতে পারে না। আমি চলিলাম বটে, তোমারও পতন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। তুমি শেষ পর্যন্ত যুঝিয়া অন্তত বীর নামের সার্থকতা সাধন করিয়া, সেই সুরভোগ্য ত্রিদিবধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।" রাজা মহামায়ার চক্রান্ত সমুদয়ই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পরে তাহার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ, তৎপুত্র উদয়াদিত্য এবং অন্যান্য সেনানায়কগণ বহুদিন পর্যন্ত মানসিংহের সহিত সমানভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সময় সময় এমন হইয়া পড়িত যে মোগলবাহিনী রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হইত, কিন্তু মানসিংহের অদম্য উৎসাহের নিকট উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। পরিণামে বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপ শত্রু হস্তে বন্দি ও তাহার সেনাপতিগণ ও পুত্র নিহত হইলেন। এই অলৌকিক লোক বিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া প্রতাপের পক্ষীয় বীরপুরুষগণ যে স্বর্গীয় স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্যন্তও কেহ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। প্রতাপ ও তৎপক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধপ্রণালী সন্দর্শন করিয়া মানসিংহ ও তৎপক্ষীয় সেনানায়কগণ পর্যন্ত তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। বাদসাহের আদেশ, প্রতাপকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে পারিলে যেন, পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া সেই নর-শার্দ্দুলকে দিল্লিতে প্রেরণ করা হয়। মানসিংহ নিতান্ত

অনিচ্ছার সহিত সেই কথা স্মরণ করিয়া তদবস্থায় প্রতাপকে দিল্লিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাকে আর দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছিতে হয় নাই, বারাণসী ধামে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই প্রতাপ বাঙ্গালার শেষ বীর বীরাগ্রগণ্য প্রতাপ, এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বেশ্বরের পদে বিলীন হইয়া গেলেন। মর্তধামের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ বর্তমান রহিল না।[১০]

মানসিংহ যশোহর প্রদেশ কচু রায়কে সমর্পণ করিয়া তথাকার রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে তিনি যশোহরজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় পুত্র মুকুটমণি যশোহর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ বা বিক্রমপুরের কোন অংশে বাস করেন এইমাত্র অবগত হওয়া যায়।

ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার কতক জমিদারী ও ফর্মান প্রাপ্ত হন। চাচড়ার রাজাগণও মানসিংহের অনুগ্রহে "যশোহরের রাজা" বলিয়া অভিহিত হন।

মানসিংহ বীরবর শঙ্করের বীরত্বে ও প্রভুপরায়নতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই জন্য বিরুদ্ধপক্ষ হইলেও তদীয় গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন, ভবিষ্যতে বাদসাহের বিরুদ্ধে কখনও আর যুদ্ধ করিব না শঙ্করকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়া ছিল।

প্রতাপাদিত্য একদিকে যেরূপ কূটনীতিজ্ঞ ও স্বজন পীড়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেন, অন্যদিকে কিন্তু, স্বদেশ প্রাণ ও দীনের অভাব মোচনে মুক্ত হস্ত; পণ্ডিত প্রতিপালক, কাব্যামোদী, স্বধর্মে অনুরক্ত থাকিয়াও পর ধর্মের প্রতি অসূয়া পরিশূণ্য ছিলেন। বীরত্ব তাহার চিরজীবনের সাথী ছিল। একদিনের জন্যও তিনি উহা হইতে বিচ্যুত হন নাই, তদধীন বীরগণও তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন।

তাহার দাতৃত্বের ও স্বদেশ উদ্ধার সাধনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যানগণের প্রতি ইহার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকা নিবন্ধন, শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নামক একজন অসাধারণ পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পঞ্চাননের ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পৌরহিত্য কার্যে বরণ করেন। প্রতাপ একজন গোড়া শাক্ত ছিলেন। মায়ের উপাসনার জন্য সময় সময় কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ভগবতীও তাহাকে বরপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য সর্বসাধারণে তাহাকে ভবানীর প্রিয়পুত্র বলিয়া অনুমান করিতেন। "যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী" এই কথার উদ্ভবও ঐ সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল।

শাক্ত হইলেও যশোহরের রাজগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেও শ্রদ্ধা করিতেন। বৈদ্য বংশীয় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস প্রতাপের সভার এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণকেও ঘৃণা করিতেন না। (১৫৯৯ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে) খ্রিস্টানগণ প্রতাপাদিত্যের অনুজ্ঞায় যশোহরাঞ্চলে এক গির্জা প্রস্তুত করেন। মুসলমান প্রজাদের জন্য মৌতালি ও মুকুন্দ পুরের নিকট পরবেজপুরে এক মসজিদ নির্মাণ করাইয়াদেন। উহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আজিও ঐ মসজিদের কারুকার্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় বহু বিবরণ বঙ্গভাষার নানা পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এজন্য তদবৃত্তান্ত সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করিলাম। কিন্তু এইরূপ বীরবরের বিবরণ আকবরনামা গ্রন্থে কেন বিবৃত হয় নাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

১. ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্রসম্ভূত কালীর বর্তমান সেবক হালদার মহাশয়েরা রাজা বসন্ত রায় প্রদত্ত সেই ব্রহ্মাত্র অদ্যাদি উপভোগ করিতেছেন। যশোহর রাজবংশের পতন সহকারে যখন কালীঘাট অঞ্চল

সাবর্ণ চৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তখন সেই প্রসিদ্ধ রাজন্যবংশকৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গীয় সমাজ, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

২. বঙ্গীয় সমাজ, ১৪৩, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৩. ১ম টাণ্ডা, ২য় জেন্নেতাবাদ (গৌরী), ৩য় ফতেহাবাদ, ৪ খালিফেতাবাদ, ৫ বাকলা, ৬ পূর্ণিয়া, ৭ তাজপুর, ৮ ঘোড়াঘাট, ৯ পিঞ্জিয়া ১০ বারকাবাদ, ১১ বাজুহার, ১২. সোণারগাঁ, ১৩. সিলেট, ১৪. চট্টগ্রাম, ১৫. সেরিফাবাদ, ১৬. সলিমাবাদ, ১৭. সাতগাঁ ১৮. মান্দারণ, ১৯. জলেশ্বর, ২০. ভদ্রক, ২১. কটক, ২২. কুলেনর্দগুপৎ, এই বাইশটি সরকার।

৪. ১৩১৭ সালের ঐতিহাসিক চিত্রের "রাজা হরিনাথ" প্রবন্ধে জানকীবল্লভ বিশ্বাস স্থানে সরকার লিখিত আছে, বাস্তবিক তাহার উপাধি বিশ্বাস ছিল।

৫. মুলঘরের চৌধুরী মহাশয়দের বাড়িতে আমি এই লক্ষ্মীনারায়ণ সন্দর্শন করিয়াছি। দেবত্র ভূমির দ্বারা তাহার অর্চনাদিও চলিতেছে।

৬. পরিশিষ্ট ভাগে হিজলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইবে, তাহাতে মছন্দরীর বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইবে। উহাতে ঈশা খাঁ মছন্দরীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে খোজা ঈশা নামে কতুল খাঁর একজন মন্ত্রী ছিল।

৭. ইহার উপর কামান রক্ষিত হইত, এখন ইহার কতকটা ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

৮. এই মহাত্মা বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ।

৯. যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজবংশকেও কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের কর্মচারীর বংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু চাঁচড়ার রাজগণ উহা একবারেই স্বীকার করেন না।

১০. মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ ইতিপূর্বে ১৫৮৯ খ্রিঃ অব্দে একবার যশোহর জয় জন্য প্রেরিত হন। স্টুয়ার্ট ২০৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের সাধারণ অবস্থা

ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে হইলে, মহামনা আকবরের রাজত্বের বিবরণকেই মূল স্বরূপ ধরিয়া লওয়া কর্তব্য। কারণ ইতিপূর্বে তাহার পিতামহ বাবরসাহ, পিতা হুমায়ুন এমন কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহা আদর্শভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। হুমায়ুনের রাজত্বের মধ্যভাগে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া সেরসাহ দিল্লির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে সেরসাহ কর্তৃক যে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অশ্বারোহণে ডাক চলন, পান্থশালা সংস্থাপন প্রথাই সর্বপ্রধান।

সেরসাহের মৃত্যুর এক বৎসর পরে, হুমায়ুন পুনরায় ভারত রাজ্য প্রাপ্ত হন বটে কিন্তু অচিরেই লোকান্তরিত হওয়ায়, তৎপুত্র আকবরসাহ পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হন। এই বাদসাহের রাজত্ব সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তারা পর্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য

বাদসাহ আকবরের শাসন সময়ে চট্টগ্রাম হইতে করইবাড়ি পর্যন্ত দৈর্ঘে চারিশত ক্রোশ এবং উত্তরে হিমালয়ের নিম্ন ভূমি হইতে দক্ষিণে মদারণ পর্যন্ত বিস্তারে দুইশত ক্রোশ পরিমিত স্থান বাঙ্গালা নামে কথিত হইত। সুই আবগান নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ পূর্ব্বদিগে ভাটি নামে একটি প্রদেশ জয় করিয়া সুবেবাঙ্গালার অন্তর্গত করেন। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা বলেন "এই নতুন অধিকৃত স্থানের আম্রবৃক্ষগুলি একজন মনুষ্যের তুল্য দীর্ঘকায় ছিল মাত্র। এই ভাটি প্রদেশের সীমান্তেই ত্রিপুরাধিপতির বিস্তৃতরাজ্য বর্তমান ছিল। এই রাজার নামে মাণিক্য উপাধি দৃষ্ট হয়।[১] ঐ নামের সহিত নারায়ণ শব্দ সংযুক্ত আছে। এই রাজ্যে অশ্বারোহী সৈন্য দৃষ্ট হয় না। ইহার উত্তর পূর্ব দিকে কোচবিহার রাজ্য, এই রাজার এক সহস্র অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্য দেখা যায়। কামরূপ প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎসন্নিকটে আসাম প্রদেশ, এই রাজা অসীম ক্ষমতাশালী। বঙ্গদেশের দক্ষিণ পূর্বকোণে আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" বলিতে গেলে এই সময়ে বাঙ্গালার প্রান্তবর্তী এই রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল, মোগল শাসনের সহিত উহাদের কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

এখন মোগলাধিকৃত বঙ্গদেশের কথা বলা যাইতেছে। বাদসাহী শাসন সময়ে বঙ্গদেশে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ একজন সুবেদার অবস্থান করিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষের ভার ও তৎপ্রতি অর্পিত হইত বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে দিল্লি হইতেও নূতন নূতন সেনাপতিগণ আগমন করিয়া সুবেদারের সাহায্য করিতেন।

সুবেদারের পরেই দেওয়ান, তৎপরে নায়েব দেওয়ানের পদ ছিল, বাদসাহের দেওয়ান উজীর নামে খ্যাত ছিলেন। প্রধান সেনাপতির নাম ছিল সরলস্কর, রাজস্ব বিভাগে বহু তহশিলদার ছিলেন, তাহাদের উপাধি ছিল, সীকদার, মজুমদার, চাকলদার, চৌধুরী ইত্যাদি। সাধারণত এক কোটি দাম যে সকল মহলের আয় ছিল, তাহাতে যিনি নিযুক্ত হইতেন তাহাদের উপাধি ছিল "ক্রোড়ী"। এক কোটি দামের মূল্য এখন আড়াই লক্ষ টাকা। টাকশালের প্রধান অধ্যক্ষের নাম ছিল দারোগা। আমরা কিন্তু এখন পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারিকে দারগা বুঝি।

তাহার সহকারীর নাম ছিল সরফে। রাজস্ব, মুদ্রা বা শস্যের দ্বারা আদায় হইত। বঙ্গদেশে প্রধানত অর্থ দ্বারাই রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল।

তৎপর শাসন বিভাগ—চারিটি, পাঁচটি, ছয়টি, পরগণা একত্র করিয়া তদুপরি একজন ফৌজদার নিযুক্ত করা হইত, প্রত্যেক পরগণায় একজন কাজী থাকিতেন। ফৌজদারের সদর থানায় দুইজন কাজী, দুইজন মীরমদন, দুইজন মুফ্‌তী, দুইজন মৌলবী, দুইজন মুন্সী নিযুক্ত থাকিতেন। কাজি বিচার করিতেন, মুন্সী জবানবন্দী লিখিতেন, মুফ্‌তী আইন সম্বন্ধীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, মুফ্‌তী কতকটা বর্তমান সময়ের উকীলের ন্যায়, মৌলবী আইনের বিধানগুলি কোথায় কোন ভাবে খাটা উচিত তাহা বলিয়া দিতেন। মীর আদন রায় পাঠ করিতেন।

প্রধান শান্তিরক্ষকের নাম ছিল কোতোয়াল, বর্তমান সময়ে ইহাকে দারগা বা সবইনস্পেক্টার বলে। বহু তদন্তের ভার থাকায়, তাহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি দেখিতেন, মদ, গাঁজা, ইত্যাদি নেশার বস্তু প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় না হয়; রাজপথে কেহ মাতলামি না করে ; মহিলাগণের লজ্জাশীলতার বিঘ্ন কেহ না করিতে পারে; বেশ্যাপল্লীতে অধিকসংখ্যক পাহারা যাহাতে নিযুক্ত থাকে; ভদ্রপল্লীর অভ্যন্তর কেহ গণিকাসহ গমনাগমন না করে ; ঐ সকল পল্লীতে যাহাতে অশ্লীল গীত না হয়; কসাইখানা নগরের বহির্ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়; মহিষ, উষ্ট্র, বিশেষত গো বধ যাহাতে না হয়। স্ত্রীর অনিচ্ছা স্বত্বে তাহাকে মৃত পতির সহগামিনী করিতে না পারে; চৈত্র অথবা কার্তিক মাসে যাহাতে জীব হত্যা না হয়; ইত্যাদি।

আকবর সাহের প্রবর্তিত নিয়মাবলী যে কোন সুসভ্য রাজ-বিধান হইতে কোনরূপও নিকৃষ্ট ছিল না। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরগণের প্রতি কেহ কোনরূপ অবমাননার কার্য করিতে না পারে কোতোয়ালকে তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইত। এই সময়ে শূলদণ্ডের প্রথা রহিত হইয়া যায়।

দেওয়ান, মীরবকসী প্রভৃতি প্রধান কর্মচারিগণ বাদসাহ দরবার হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল বিভাগে বিশেষ বিশ্বাসী, সুপণ্ডিত ও সদ্‌বংশজাত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতেন।

সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদে, বহু হিন্দু নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ প্রায় অর্ধশত লোকের নাম অবগত হওয়া যায়; যাঁহারা সাত হাজার হইতে এক সহস্র সেনার সেনাপত্য কার্যে বরিত ছিলেন। তন্মধ্যে রাজা তোডরমল্ল ও রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারী পদে পর্যন্ত নিযুক্ত হন।

শিক্ষাবিভাগের প্রতি ও বাদসাহ সরকারের দৃষ্টি না ছিল এই কথা বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক জেলাদার বা ফৌজদারের অধীনে একটি করিয়া মখতব বা বিদ্যালয় সংস্থাপিত থাকিত। ঐ সকল বিদ্যালয় প্রায় মসজিদের সংসৃষ্ট ছিল। জমিনদার বা জায়গিরদারগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে জাতি অনুসারে, পারস্য ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভদ্রপল্লী মাত্রেই দেশীয় পাঠশালা সংস্থাপিত ছিল, তথায় গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে, অঙ্ক, জমিদারী ও মহাজনী হিসাব, পাট্টা, কবুলিয়ত, কর্জ্জপত্র আদি লিখন পঠন ও জরিপ প্রণালী শিক্ষা দিতেন। তৎকালে অমনোযোগী ও দুষ্ট বালকগণ বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

ব্রাহ্মণগণ, ব্যাকরণ, কোষ, তর্ক, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, দশকর্ম-পদ্ধতি শিক্ষা করিতেন। বৈদ্যেরা ব্যাকরণ, কোষ, কাব্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সাধারণত কবিরাজী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জনে রত হইতেন। উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা টোল খুলিয়া ছাত্র অধ্যয়ন করাইতেন। ছাত্রেরা কোনরূপ বেতন প্রদান করিতেন না, বরং ঐ সকল পণ্ডিতেরা ও গ্রামস্থ বর্ধিষ্ণু লোকেরা উহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারিলে, তাহারা এই কালের মতনই উপাধি পাইতেন। তৎকালের প্রধান প্রধান কয়েকজন ব্যক্তির উপাধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

যে পণ্ডিতবরের পরামর্শ অনুসারে রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গোৎসব প্রথা প্রবর্তন করেন,

তাহার নাম ছিল রমেশ শাস্ত্রী, রাজা মানসিংহ শিলাদেবীর অর্চনার জন্য এ দেশ হইতে যাহাকে অম্বরে লইয়া যান তাহার নাম ছিল রত্নগর্ভ সার্বভৌম, চাঁদ ও কেদার রায়ের পুরোহিতের নাম ছিল কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার, রাজা প্রতাপাদিত্যের গুরু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন; এই সকল উপাধি বর্তমান সময়েও চলিত আছে। তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞ এইরূপ শত শত পণ্ডিত যে বর্তমান ছিলেন, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ দ্বারা এই কালে অনেক বঙ্গকাব্য বিরচিত হইয়াছিল। বিশেষত বৈষ্ণব কবিগণের অমৃতনিস্যন্দ বীণার ঝঙ্কারে বঙ্গকানন তৎকালে যথার্থই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জাতিত্রয় ব্যতীত অপরাপর জাতি এমন কি মুসলমান কবিগণ পর্যন্ত এই কবিকুঞ্জে প্রবেশ লাভ করিয়া বঙ্গভাষার বিশেষ গৌরব সংসাধন করিয়াছিলেন।

পুরমহিলাগণের শিক্ষারীতি একেবারে ছিল না তাহা বলা যাইতে পারে না। বড়ঘরের ও পণ্ডিতগণের গৃহের কোন কোন ললনার সুশিক্ষার কথা অবগত হওয়া যায়। রাজা গণেশের হিন্দু স্ত্রী বিদূষী ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মতিগতি, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ও পতি সেবার এবং গৃহস্থালীর প্রতিই অধিক পরিমাণে আকর্ষিত হইত। গুরুজনের, উচ্চবর্ণের, বিদ্বানের ও বয়োধিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই করিতেন। রাজা সকলেরই ভক্তির পাত্র ছিলেন।

আকবর বাদসাহের রাজত্বের পূর্বভাগে হিন্দুরা পারস্য ভাষা শিক্ষার প্রতি ততটা মনোযোগ প্রদান করিতেন না, মুসলমান সম্প্রদায় তো সংস্কৃতের কোন খোজখবর রাখিতেন না। বাদসাহ এই প্রথার প্রতি মনোযোগী হইয়া যাহাতে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়ন চলিতে পারে তজ্জন্য যত্নবান হন। তাহার ফলে হিন্দুগণ পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু মুসলমানেরা ততটা যত্নবান হন না। কয়েকজন মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফৌজি ও আবুল ফাজেলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এই দুই মহাত্মা, রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ পারস্য ভাষাতে করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

পূর্বকালে আমাদের দেশে শক ও সংবৎ হিসাবে বৎসর গণনা হইত। পরে মুসলমান অধিকার কালে পরগণায়তি সনের প্রথা প্রচলন হয়। মুসলমান অধিকার কালেই আমাদের দেশে পরগণা উদ্ভব হয়। সেই হিসাবে ১২০১ খ্রিস্টাব্দে এই সনের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। বর্তমান সময়ে ৭১০ পরগণাইতি সন হইয়াছে। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কোন দলিল প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকখান দলিল হইতে এই বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পরিশিষ্ট ভাগে উহা সন্নিবেশিত করা যাইবে।

সাধারণত মুসলমান শাসন কালে হিজরী সনের প্রচলিত ছিল। আকবর বাদসাহের রাজত্ব কালে হিন্দু সম্প্রদায়, বাদসাহ নিকট জ্ঞাপন করেন, হুজুর আমাদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধীয় বিবরণাদি বা কার্য কর্মে হিজরী সহ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমাদের জন্য আর একটি পৃথক সন নির্দিষ্ট করিয়া দিন। মহাযশা আকবর ধর্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তিনি হিন্দুপ্রজার মনরঞ্জনার্থ হিজরী হইতে দশ, এগার বৎসর ন্যূন করিয়া এলাহি নামে আর একটি সনের প্রচলন করিলেন, যাহা আমাদের বঙ্গদেশে সন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময়ে হিজরী ১৩২৯/৩০ চলিতেছে এখন বাঙ্গালা ১৩১৮ সন। ষোড়শ শতাব্দীর এই সন পরিবর্তন ব্যাপারও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে ১২০১ খ্রিস্টাব্দে পরগণা বিভাগ আরম্ভ হয়।

এই শতাব্দীতে হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ের লোকই অধিক ছিলেন, সৌর বা গাণপত্যের সংখ্যা তত দৃষ্ট হইত না বলিয়াই অনুমতি হয়। হিন্দুর প্রধান পর্ব শারদীয় দুর্গোৎসব—তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দ্বারা এই কালে প্রথম প্রচলন

হয়। উহারি অব্যবহিত পরে ভাদুরিয়ার রাজ্য জগৎনারায়ণ বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। বর্তমান সময়ে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে যেরূপ দেশব্যাপী ঘটা হইয়া থাকে, তৎকালে বসন্তের শুভাগমন সহিত বাসন্তী দুর্গোৎসব ও হোলি পর্বের অনুষ্ঠান সেই ভাবে সম্পন্ন হইত; এজন্য ঐ দুইটি উৎসব উপলক্ষ করিয়া রাজকীয় অফিসাদি তৎকালে কতক দিনের জন্য বন্ধ থাকিত। তখন বিদেশবাসী হিন্দুগণ প্রবাস হইতে স্বদেশে গমন করিয়া কতক দিনের জন্য ও আত্মীয় পরিজনগণসহ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া যাইতেন। বিশেষ বর্তমান সময়ের মত তৎকালে পরিবার লইয়া কর্মস্থানে অবস্থান করার প্রথা ছিল না, কাজেই অধিকাংশ প্রবাসী এইকালে বাড়ি যাইবার লোভ কোনরূপেই পরিত্যাগ করিতেন না।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের প্রচলন এইকালে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। ব্রহ্মানন্দ গির্, সর্বানন্দ সর্ববিদ্যা, গোসাঞী ভট্টাচার্য, অর্ধকালী সন্তান, বিল্বপুষ্করিণীর ভট্টাচার্য, প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষেরা এই শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কৃত শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী, সর্ববিদ্যা প্রণীত সর্বানন্দ তরঙ্গিণী এই সময়ে বিরচিত হয়। রাজগণ ও অধিকাংশ বড়লোক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, তন্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইত বলিয়া উহা সর্বসাধারণের বোধগম্য হইত না। অপরদিকে চৈতন্য সম্প্রদয়ীগণ দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম সাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বৈষ্ণবকবি গোপালভট্ট গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, যদুনন্দ দাস, জ্ঞানদাস রায় বসন্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণের ধর্মপ্রচার ও সুধাময়ী কবিতা হইতে এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রচুর উন্নতি সংসাধিত হয়।[২]

এই কালে দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রতিনিগতই হইত, আঢ্য হিন্দু মাত্রেই স্ব স্ব গৃহে শিলাচক্র সংস্থাপন করিতেন; বড়লোকেরা মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বিগ্রহ সংস্থাপন করিতেন, অর্চনার জন্য দেবত্র ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল মন্দির, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ নিবন্ধন দেশে স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ইতিপুর্বে হিন্দু তীর্থ যাত্রী হইতে বাদসাহ সরকারে একরূপ কর আদায় হইত। আকবর সেই প্রথা রহিত করিয়া দেন। হিন্দুরা চিরকাল তীর্থানুরক্ত, এই প্রথা তিরোহিত হওয়ায়, সর্বসাধারণের তীর্থ পরিভ্রমণ করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

হিন্দু সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া মুসলমান হওয়ার রীতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতেই বঙ্গদেশীয় মুসলমানের সংখ্যা পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু তিন জন সুবিখ্যাত উচ্চবংশ জাত হিন্দু এই শতাব্দীতে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হন। প্রথম রাজা গণেশঁ যিনি পরে গয়েসউদ্দীন নামে পরিচিত হইয়া একরূপ গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হন। ২য় রাজাচন্দ্র পরে কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত হন, তৎ কর্তৃক উড়িষ্যার স্বাধীনতা ধ্বংস হইয়া মুসলমান রাজত্বে পরিণত হয়। বাঙ্গালার বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্তি তৎ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ৩য় কালীদাস গজদানী, ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া সুলেমান নামে পরিচিত হন ও সুবর্ণ গ্রামের এক স্বাধীন জমিদার বলিয়া স্পর্ধা করেন। সুবিখ্যাত ঈশা খাঁ মসনদ ই আলি ইহারই বীর পুত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তৃতীয় ব্যক্তি অযোধ্যা দেশীয় রজঃপুত বলিয়া পরিচিত।

মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ, হিন্দু ধর্মে যোগদান না করিত তাহা নয় ; তবে রাজশাসন ভয়ে উহাতে কেহ অগ্রসর হইত না, মুসলমান হিন্দু হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু মুসলমান মহিলার জন্য এই নিয়ম ছিল না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গারামশর্মা মুসলমান স্ত্রী ভূষণা ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে ভেক প্রদান করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই জন্য আবদুলের প্রাণদণ্ড হয়। গঙ্গারাম ভূষণার সহিত একত্র বাস করিতেন, এই জন্য তিনি হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হন। কতকদিন পরে ভূষণার মৃত্যু হইলে পর গঙ্গারাম স্ব সমাজ প্রবেশলাভ জন্য

সিন্দুরিয়া নিবাসী বারেন্দ্র রাজার স্মরণাপন্ন হন। বিধি ব্যবস্থা মতে রাজা গঙ্গাইকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বসমাজে গ্রহণ করেন, কিন্তু সমুদয় বারেন্দ্র সমাজ উহাতে সম্মত না হওয়ায় দলাদলির সৃষ্টি হয়। এই হইতে সিন্দুরিয়ার রাজসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ ভূষণাই পটি, নামে অভিহিত হন। যাহা আজি পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্র মত প্রায়শ্চিত্ত হইলে পরও যে আমাদের দেশীয় সামাজিকগণ একটা দলাদলির সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাহা বহু কাল হইতেই অবগত হওয়া যায়; পক্ষান্তরে অন্য ধর্মাবলম্বীগণের ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।[৪]

আকবর বাদসাহ কোনরূপ সামাজিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাহার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পণাপণ বার টাকার অধিক না হয়। সতীদাহ নিবারণ হয়, এবং অল্প বয়সে যাহাতে বালিকাদের বিবাহ না হইতে পারে। কিন্তু তিনি উহা আইন বা আদেশ দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন নাই।

যোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিয়া এই উপলব্ধি হয়, তখন পর্যন্ত বাদসাহ বঙ্গদেশ মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তৎসময়ে উহার অধিকাংশ পাঠান সর্দার ও ভূঞা উপাধিধারি রাজগণের করায়ত্ব ছিল। তাহারা বাহ্যিক ভাবে সময় সময় বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যত কোনরূপ বাধ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেন না। "কল ও উইলফোর্ড" এ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রদান করিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুই নদীর মধ্যবর্তী গঙ্গার "বদ্বীপ" আকৃতি বিস্তৃত ভূভাগ মধ্যে এই দ্বাদশ ভূম্যাধিকারিগণ রাজত্ব করিতেন। এইটি ঠিক কথা নয়, কারণ বিক্রমপুর, সোনারগাঁ, ভাওয়াল, ভুলুয়া প্রভৃতি স্থান পদ্মার পূর্ব তীরবর্তী ছিল। ফারনেল ডের লিখিত বিবরণ হইতে, আরাকান, চণ্ডীখান, শ্রীপুর এই তিনটি পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম অবগত হওয়া যায়। পাদ্রী সুইট ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎ সময়ে তিনি স্থানীয় দ্বাদশ জন মধ্যে নয় জন মুসলমান, তিন জন হিন্দু জমিদারের নাম উল্লেখ করেন। শ্রীপুর, চণ্ডীখান ব্যতীত, রালফ ফিচ্ বাকলার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী, চণ্ডীখান (যশোহর), বাকলা এই তিনটি হিন্দু রাজ্যও তখন পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ ছিল। ফতেয়াবাদের মুকুন্দ রায়ও প্রথমে মোগল শাসন মান্য করিতেন, পরে বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন। ঈশা খাঁ প্রথম অবস্থায় বাদসাহের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়া পরে তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ না এদিক না ওদিক এইরূপ মধ্যপন্থী হইয়া দাঁড়ান। ফলে পরিণামে মোগল বাদসাহই জয়লাভ করেন, তবে আকবরের জীবিত কাল পর্যন্ত সমুদয় গোল নিবারিত হয় নাই, জাহাঙ্গীর বাদসাহকে পর্যন্ত এই জন্য বেগ পাইতে হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই এই দেশীয় জনগণ, আপনারাই স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কার্যের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। তৎসূত্রে নানাবিধ জাতির নামকরণ হয়। যে ব্যক্তি স্বর্ণাভরণ তৈয়ার করিত তাহার নাম হইল স্বর্ণকার; লোহার দ্রব্য প্রস্তুত কারকের নাম হইল কর্মকার, কাংস্য দ্রব্য যাহারা নির্মাণ করিত তাহারা হইল কাঁসারী। এইরূপ তৈল ব্যবসায়ী তিলি, শঙ্খ ব্যবসায়ী শাঁখারী, কুণ্ড প্রস্তুতকারক কুম্ভকার নামে পরিচিত হইল। এইরূপ বহু জাতিতে বিভক্ত থাকিয়া হিন্দুগণ স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইত, ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী কোন দ্রব্যেরই অভাব ঘটিত না। ভূমি উর্বরতা বশত কৃষকেরা অল্পায়াসেই বহু শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। জমির নিরেখ অত্যল্প ছিল। ঈশা খাঁর গুণগান করিয়া তদধিন প্রজারা যে কবিতা রচনা করিয়াছিল, উহার একটি পদে আছে "কাণীক্ষেতে বিকায় চৌদ্দ বুড়ী" অর্থাৎ এক কাণী জমির খাজনার নিরেখ ছিল চৌদ্দবুড়ী; স্থান বিশেষে দ্বিগুণ থাকিলে উহার খাজনা অধিক দিতে হইত না। সর্বদা ধান চাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত, অন্ন

বস্ত্রের জন্য কেহ কখনও কষ্ট অনুভব করেন নাই। তবে দৈব দুর্বিপাক বশত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কোনরূপ শস্য না জন্মিলে অথবা নষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে আমদানি কি রপ্তানি হওয়া তৎসময়ে সহজসাধ্য ছিল না, এই জন্য নিম্ন হিন্দুগণ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্ম বিক্রয় দ্বারা ধনীগণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাহাবাজ খাঁর শাসনের প্রথম বৎসর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রালফফিচ্ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া, প্রথম চট্টগ্রাম তৎপরে বাকলা শ্রীপুর ও সোনারগাঁ হইতে পেগুতে গমন করেন। তাহার লিখিত বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় ঐ সকল স্থানীয় রাজগণ সকলেই অমায়িক ছিলেন, খ্রিস্টানদিগকে যত্ন করিতেন ও গির্জা নির্মাণ করিতে দিতেন। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে ফল, ধান্য, কার্পাস, রেশম উৎপন্ন হইত এবং ঐ সকল দ্রব্য সিংহল, পেগু, মলক্কা প্রভৃতি দ্বীপে প্রেরিত হইত। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিধান করিত। অধিকাংশ লোকেই ধনশালী ছিল ; ইহারা সকলেই জেলালউদ্দী আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। বাদসাহের সহিত যখন এই সকল রাজগণের যুদ্ধ ছিল তৎকালে রালফ ফিচ্ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া উহার যে সুখ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াছিলেন, নির্বিবাদ অবস্থায় উহার সুখ-সম্ভার যে অধিক দৃষ্ট হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ অন্তঃবিদ্রোহ থাকিলেও দেশীয় জনগণ সুখেই দিন কর্তন করিত, তবে যে স্থানে যুদ্ধ বাধিত তথাকার প্রজাগণ নানাবিধ অসুবিধায় পতিত হইত। যে পক্ষই জয়লাভ করুক প্রজা সাধারণের প্রতি অল্পই দুর্ব্যবহার হইত; প্রায়ই হইত না। পণ্ডিত ও কবিগণ স্ব স্ব কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতেন, কারণ দেশীয় ধনী ও জমিদারগণ সর্বদা তাহাদের অভাব মোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন; বৃত্তি ব্রহ্মত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সম্পত্তিশালী মাত্রেই জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্যে মুক্ত হস্ত ছিলেন। কোনরূপ যশোলাভের জন্য উহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, পুণ্য সঞ্চয়ের সোপান বলিয়াই ঐ সকল কার্য সুসম্পন্ন হইত। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব প্রতিপালন করা যে একটা স্বাভাবিক কার্য তাহারা ইহাই বিবেচনা করিতেন। গলগ্রহভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সমুচিত যত্ন লইতে কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। কৃপণের নিন্দা বর্তমান সময় হইতে তৎকালে সমধিক ছিল। যশ ও নিন্দা ভাট মুখে সর্বত্র প্রচারিত হইত। দরিদ্রগণকে দান করা তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার মধ্যেই পরিগণিত ছিল। সামান্য গৃহস্থও একমুষ্টি তণ্ডুল দান না করিয়া, কোন দীনহীনকে বাড়ি হইতে বিদায় করিতেন না, ধনী মাত্রেই অতিথি সেবায় তৎপর ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণের কয়েকখানা কুলজীগ্রন্থ বিরচিত হয়, বোধ হয় মুসলমানগণের ইতিহাস লিখার পদ্ধতি অবগত হইয়া তাহারা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা বংশাবলীতেই পরিণত হয়, ক্বচিৎ দুই, চারিটি ঐতিহাসিক তথ্য উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

এইকালে দস্যুদলের উৎপাত বড়ই প্রবল ছিল। ধনীগণ সশঙ্কভাবে কালযাপন করিতেন, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে, লাঠি ও কুস্তী শিক্ষার প্রচলন থাকায়, তীর, তলোয়ার, গুললবাশ, বন্দুকের ব্যবহার জানায়, ততটা বিপদ বোধ করিতেন না। কোথাও বা ডাকাইতের দল জয়লাভ করিয়া, গৃহস্থের যথা সর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইত, কোথাও বা তাহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত, একতরফা কার্য প্রায়ই ঘটিত না। অস্ত্র আইনের বাধা বিপত্তি না থাকায়, সকলেই স্ব স্ব গৃহে উহা রাখিতে পারিত, ও আপৎকালে তৎদ্বারা এই বিপদের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হইত।

স্থল হইতে জলে দস্যু ভয় সমাধিক ছিল, আরাকানীয় মগ ও পর্তুগিজ দস্যুদল, প্রায়ই জলে, স্থলে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। ইহাদের উৎপাতে দক্ষিণবঙ্গের বহুস্থান জনশূন্য হইয়া

পড়ে। এই কারণে এবং ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রবল ঝটিকায় সমুদ্রজল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বর্তমান নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ ও যশোহর, চব্বিশ পরগণার দক্ষিণদিকস্থ স্থানগুলিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে, এই প্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ লোক প্রাণ পরিত্যাগ করে, চন্দ্রদ্বীপের রাজা জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর মহামারীতে ঐ স্থানের অবশিষ্ট জনগণ প্রায় অধিকাংশ লোকান্তরিত হওয়ায় অবশিষ্ট জনগণ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ঐ জনস্থান অরণ্যানীতে পরিণত হইয়া, সুন্দরবন নামে অভিহিত হয়।

মগ ও পর্তুগিজগণ সাধারণের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, কি বাদসাহ্ সরকার কি দেশীয় রাজগণ সকলেই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেন। সময় সময়ই ঐ সকল মগ, পর্তুগিজ দল দেশীয় রাজগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম, হুগলি, সপ্তগ্রাম, তিনটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, ইয়োরোপীয় বণিকগণ তথায় কুঠি সংস্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেন। দেশীয় মহাজনগণও তথায় বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। এই সকল বন্দর হইতে নানাবিধ শস্য, ঘোড়াঘাটের রেশম, বাকরাবাদের গঙ্গাজলী বস্ত্র, সোনারগাঁর কাসা, বস্তু ও বাজুহায়ের বরগা, বিদেশে রপ্তানি হইত। চট্টগ্রামবাসীরা জলয়ান পরিচালনায় দক্ষ ছিল। তাহাদের দ্বারা যান পরিচালিত হইত।

অস্ত্র, শস্ত্র, এই দেশেই তৈয়ারি হইত। শ্রীহট্টের ঢাল চির প্রসিদ্ধ, বিক্রমপুর সোনারগাঁয়, কামান বন্দুক প্রস্তুত হইত। ডাক্তার ওয়াইজ এশিয়াটিক জার্নেলে লিখিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে একটি কামান আছে। উহাতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নাম ও "৩১৮" এইরূপ একটি অঙ্কচিহ্ন ও নির্মাতা রূপিয়ার খাঁ সাং শ্রীপুর এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে। এই কামানটি পিত্তল নির্মিত। এতদ্ভিন্ন ঢাকার চকবাজারে বহুকাল হইতে আর একটি কামান পতিত রহিয়াছে, নোয়াখালীর অন্তর্গত সহর কসবাতে (হুদাভুলুয়া) কয়েকটি প্রাচীন কামান দেখা যায়। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত সোনারগাঁর, মনোহরবাগ নামক স্থানে, এক কৃষক হলকর্ষণ কালে ভূগর্ভে কয়েকটি কামানের অনুসন্ধান পাইয়া নারায়ণগঞ্জের সাবডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহা অবগত করায় তিনি উহা উঠাইয়া আনিয়াছেন, উহার একটির গাত্রে ঈশা খাঁ মসনৎআলির নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল কারণে নিশ্চয় অনুমিত হয়, তৎকালে ঐগুলি স্থানীয় কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশে লৌহের খনি ছিল, সরকার মাদারণের অন্তর্গত "হান্যান" নামক স্থানে হীরকের খনি ছিল বলিয়া উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তবে ঐ খনিতে অল্প হীরাই পাওয়া যাইত।

এই শতাব্দীতে সঙ্গীতের চর্চাও সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তানসেন বাদসাহের সভায় প্রধান গায়ক ছিলেন। রাজা মানসিংহের দরবারে নায়েক বাসু, মঝু ও ভাউনী, এই তিনজন প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাহাদের দ্বারায় বাঙ্গালায় খেয়াল, টপ্পা, প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রসার বর্ধিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে আমীর খসরু খেয়ালের উদ্ভাবনা করেন ও মৃদঙ্গকে দুইভাগ করিয়া, তবলা ও ডগির আকারে পরিবর্তিত করেন।

বর্তমান সময়ের মত তখন, যাত্রা, থিয়েটার প্রচলিত ছিল না, কবিগান বা পাঁচালীরও নিয়ম ছিল না। দেশীয় গোস্বামীগণ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি গাহিয়া, গৃহস্থ মাত্রকে তৃপ্তিদান করিতেন। শিবসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় গান বিশেষভাবে গীত হইত। ধর্মের গান, মনসার গান, শিবের গাজন বাধিয়া গান করিত। হরি সংকীর্তনের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেই বৎসরের মধ্যে অন্তত এই গানের দল ডাকিয়া আপন আপন বাড়িতে হরিলুঠ বিলাইয়া দিত। সভা বিশেষে কালোয়াত, নর্তক, নর্তকীগণ খেয়াল, টপ্পা,

গাইয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিত। বড় বড় মজলিসে ফাউগের (আবিরের) সহিত সুগন্ধীজলের সংমিশ্রণ দ্বারা সভাসীনগণের বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দেওয়ার রীতি ছিল।

বলিতে গেলে ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয়জনগণ বিশেষ সুখেই কাল কর্তণ করিতে পারিয়াছিলেন। গবাদি পশুচারণের জমি ও সাধারণ রাস্তার উপযোগী স্থান না রাখিয়া প্রজার নিকট জমি বিলি করা হইত না। ইহাতে গো ও মহিষ ইত্যাদির খাদ্য প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা ছিল।

তন্নিবন্ধন উহাদের দুগ্ধেরও প্রাচুর্য ছিল। দেশ নদী ও বিল বাহুল্য থাকায় যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যাইত। ধান ও ডাল প্রচুর উৎপন্ন হইত। সমুদয় জিনিসের মূল্যই অত্যল্প ছিল, কাজেই ভাত, ডাল, মৎস্য, দুগ্ধ প্রায় সকলেই প্রচুররূপে আহার করিতে পারিত। এজন্য জনগণ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। হায় আজ আমাদের দেশের সেই সুখ, শান্তি এখন কোথায়? সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ২৪শে আগষ্ট তারিখে মৎকর্তৃক এইটি ব্রাহ্মদেবালয়ে পঠিত হয়। উহার শেষাংশ এইরূপ ছিল ঃ—

আমি আজ অতি সংক্ষেপে ষোড়শ শতাব্দীর সাধারণ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমার এমন কোন লিপিচাতুর্য্য বা পদবিন্যাসের ক্ষমতা নাই যাহাতে আপনাদের ন্যায় সুধীমণ্ডলির মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। সাদাসিদা ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। কাব্যের রং ইতিহাসে প্রতিফলিত করিয়া বাহুল্যতার অবতারণা করাও আমার বাঞ্ছনীয় নয়, অথবা আমার ক্ষমতার অতীত।

অতঃপর আমার বক্তব্য এই যে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ প্রাণস্পর্শী সুগন্ধী ও সুন্দর ফুলের প্রয়োজন ও প্রচুর উপকরণ সমন্বিত নৈবিদ্যের দরকার, আমার মত অক্ষম জনের দ্বারা সে সংগ্রহ কোথা হইতে হইবে? তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সত্যের অপলাপ না হয়, এই শুদ্ধিটুকু লইয়াই এই দেবাধামে প্রবেশ লাভ করিয়াছি। যদি কোথাও সে পবিত্র পন্থা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকি তবে সেইটি অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়াই আপনারা মনে করিয়া লইবেন। যাহা হউক ইহার একাংশও যদি দেবতার উপভোগ্য হইয়া থাকে তবেই পাঠক নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিবে।

১. এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে, ডাকতার ওয়াইজ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের এশিয়াটিক জার্নেলের ২০৪ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ত্রিপুরার এক রাজা কতকগুলি মণি, মাণিক্য, উপঢৌকন সহ দিল্লিতে উপনীত হইয়া উহা বাদসাহকে প্রদান করেন। বাদসাহ উহা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত পরিতৃপ্ত হন; এবং রাজাকে লাল, এই উপাধি প্রদান করেন। পারস্য ভাষায়, মাণিক্যকে "লাল" বলা হইয়া থাকে তজ্জন্য এই উপাধি প্রদত্ত হয়। কিন্তু রাজা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পারস্য 'লাল' শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক 'মাণিক্য' শব্দ ব্যবহার করিতে থাকেন। আইন আকবরিতে এই সমস্ত উল্লেখ আছে। ১৫৮৫ খ্রিঃ অব্দে যদিও মোগল সৈন্য ত্রিপুরার কতকাংশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু তখনও তথায় রাজ্য স্থাপন করে নাই।
নারায়ণ শব্দ কোচবিহার রাজপরিবারেই দৃষ্ট হইত। ইহাই জানা যায়।
২. এইটি কতকটা আকবর সাহের রাজত্বের পূর্ববর্তী ঘটনা।
৩. এইটি আকবরের রাজত্বের পূর্ব ঘটনা।

প্রথম পরিশিষ্ট

জয়পুরের ইতিহাস ও শিলাদেবী ঃ

জয়পুর কলেজের প্রফেসার নবকৃষ্ণ বাবু ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেন যাহা ১৩১২ সনের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ঐতিহাসিক চিত্রে প্রকাশ হয় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল।[১]

"পাছে কোই দিন পাছে পূরব মাহুঁ চঢ্যা। গজনীপুর নীলোদ মে বা বণারস কাশীমেঁ জার অমল কানু। কাশীমেঁ মানমন্দির বনায়ো। পাছে পটনামেঁ জা অমল কীনু ঔর উঁঠে বৈকুণ্ঠপুর বণায়ো। পাছে গয়াজীমে পৈতালীস (৪৫) সরাধ কীনা। ফের উসমান্ পঠান জগন্নাথজী মাঁহু ছো। জীকাঁ সারা পূরব মেঁ অমল ছো জীসুঁ জার জগড়ো করি। ফতে পাই। উঁকা সারা রাজ মেঁ অমল কীনু। পাছে জগন্নাথজী মে ফেরি বিধিবিধান সু পূজন করায়ো। ঔর স্থাপন কর‍্যা। ঔর পাছে উমন ছা জীঠে গয়া। সো বানে মারি ফতে পাই। পাছে মীরূ গয়া। ঔর মীরূসুঁ জগড়ো করি। মীরূ মে অমল কীনু। হকীমেঁ ছা কুতল মেঁ জানে মারি ফতে পাই, ঔর কুতল মেঁ অমল কীনু সারী পূরব মেঁ অমল কীনু। অর পূরব মাহুঁ ঈসন খাঁ পঠান ছো। জীসুঁ জগড়ো কীনু সো ভাজি গয়ো। জাজমে বৈঠ সমুদ্র পার গয়ো। পাছে উঠা সুঁ চঢ্যা সো কোম সাটি কা চাল্যা, ব্রহন্‌পুত্র গয়া, অর রাজা পরতাপদীপ সু জগড়ো কীনু, অর ফতে পাই। অর পরতাপদীপকে গড় ছো জীনেঁ খোস লীনো। অর বেটো দুরজন সিংঘজী মানসিংঘজী কা কাম আয়া। পর জগৎসিংঘজী ঘায়ল হুয়া। অর রাব পরতাপদীপকা লবাজমা কী সংখ্যা—হাথী তো তেরাসৌ অর ফৌজ। সরঞ্জাম ভৌৎ ছো। জীসুঁ ফতে পাই। পাছে উঠীনে কেদার কায়ত কো রাজা ছো। সো রাজা বাজৈ ছো। সো উঁকে সিলামাতা ছী। সে মাতা কা প্রতাপ সে উনে কোই ভী জীৎ তো নহী। সো মানসিহজী পুছী—ইসো কাঁইকো বল ছৈ। সো অরজ করী সে৷ সীলামাতা কো বল ছে। জদি আপ মাতা নৈ প্রসন্ন হোবা বাস্‌তে হোম উগরৈছ করায়ো জদি মাতা প্রসন্ন হুই। অর কেদার রাজা সুঁ মাতাকো যো বচন ছো—সো তূ রাজা হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্যু। বেটি কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপকী বেটি জানী। অর কহী তূজা—মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈযাঁ তীন বার কহী। জদি মাতা বোলী—থারী মহা কো বচন পুরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ স্থল লীয়ো আপকী মরজী হোয় সো কীজে। যদি মাতা নৈ সবুদ্র মেঁ নাষি দীনী। জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আবাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাষি দীনা ছৈ। সো উঁঠা সুঁ কাট লীজ্যো মেহ তোসুঁ প্রসন্ন হুবা।। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজা নে দবাব দীয়ো জদি রাজা তো জাজি মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবাণ নে মানসিংহ ঘঞ্জীকোঠৌ ভেজ্যো মদীবাণ আপ মিল্যো। যদি রাজা মানসিংহজী উঁকী বেটি মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেণী করী। অর মিল্লাপ হুবো। জদি নীজর করী। যদি আপ ফুরমাই সো থারো রাজ ছৈ সো তোনে দীনু। যদি সলাম করি পাছে সমুদ্র মেঁ মাতা ছী জীঠাব সুকাটি লীনী। অর অরজ করী—মাতা আপ ফুরমাবো জী মাঁফক পূজন করুঁ। জদি মাতা কহী—মহারৈ বলদান নিতি হুবা জাসী জীতেঁ থারো রাজবণ্যো রহসী। অর মৈঁভী রহস্যোঁ। জীঁ দিন বলদান

রোজীনা হোতে রহজাসী জীঁ দিন থারো মহারো বচন পুরো হোসী। জদি আপ কবুল করী। আর মাতা নেঁলে আয়া। অর বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো অর উঠা সুঁ কুঁচ করি আয়া।"

(মানসিংহ) পুনরায় কিছুদিন পরে পূর্বাঞ্চলে গেলেন। তথায় গজনীপুর, নীলোদ ও কাশীতে গিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিলেন ও কাশীতে মানমন্দির নির্মাণ করাইলেন। পরে পাটনায় গিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিলেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠপুর স্থাপন করিলেন। পরে গয়ায় গিয়া তথায় ৪৫টি শ্রাদ্ধ করিলেন। জগন্নাথ (পুরী) অঞ্চলের দিকের সমস্ত পূর্বাঞ্চল উস্‌মান পাঠানের অধিকারে ছিল। তথায় গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। পরে পুরী (জগন্নাথ) আসিয়া জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও স্থাপন করাইলেন। অনন্তর উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। পরে মীরূ গিয়া তথায় যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও মীরূ অধিকার করিলেন। অনন্তর কুতল নামক স্থানে হাকিম ছিল, তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপ সমস্ত পূর্বাঞ্চলে তাহার (মানসিংহের) অধিকার স্থাপিত হইল। পূর্বদেশে ঈশন খাঁ নামক পাঠান ছিল, তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং সে পলাইয়া গেল।

পরে (মানসিংহ) জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইলেন, এবং তথা হইতে ষাট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে গেলেন। তথায় রাজা পরতাপদীপের সহিত যুদ্ধ হইল ও বিজয় লাভ করিলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ (জ্যেষ্ঠ পুত্র) আহত হয়েন। আর রায় পরতাপদীপের অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল; ইহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অনন্তর ঐ দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল, তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। তাহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাহাকে (কেদারকে) কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার এত প্রতাপের কারণ কি?" নিবেদন করা হইল, "ইহার প্রতাপের হেতু শিলামাতা।" ইহা শুনিয়া মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ হোম প্রভৃতি করাইলেন, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইলেন, কেদার রাজার সহিত মাতার এই অঙ্গীকার ছিল যে, তুমি যখন নিজ হইতে বলিবে "তুই যা" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাহার এক কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা তাহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে বলিলেন, "তুই যা, আমাকে পূজা করিতে দে, তুই যা।" এইরূপে তিনবার বলিলে মাতা বলিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে যে অঙ্গীকার ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।" তখন রাজা বলিলেন, "আমাকে ছলনা করিলেন, আপনার যাহা অভিরুচি করুন," পরে মাতাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবী মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখান হইতে আমাকে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা জাহাজে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন, দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর মানসিংহ রাজা কেদারের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন হইয়া গেল, এবং কেদার রাজা মানসিংহকে নজর করিলেন। মানসিংহ কহিলেন তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, "মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব।" তখন মাতা কহিলেন, "যতদিন পর্যন্ত প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হইতে থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্য অটল থাকিবে। আর আমিও থাকিব। যে দিন হইতে নিত্য বলিদান বন্ধ হইবে, সেই দিন তোমার সহিত আমার অঙ্গীকার পূর্ণ

হইবে।" রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং মাতাকে লইয়া আসিলেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, তথা হইতে কুচ করিয়া যাত্রা করিলেন।

রাজস্থানের ইতিহাস ভট্টগ্রন্থ ও চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত; মহাত্মা টড চারণদিগের যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া গিয়াছেন। টডের পুস্তক অনুসরণ করিয়া এবং চারণদিগের মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চারণ বংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট "ইতিহাস-রাজস্থান" নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি জয়পুর স্কুলের ভূতপূর্ব হেড মাস্টার। তাহার পুস্তক হইতে এক অংশ উদ্ধার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইহার হিন্দি ভাষা সহজেই বোধগম্য হইবে। দুই এক স্থলে বন্ধনীর মধ্যে অর্থও লিখিয়া দিলাম ঃ—

"তখত পর বৈঠ্ কর সলীমনে অপনা নাম জাহাঙ্গীর রখ্থা। উস্নে মানসিংজী কো বঙ্গালে কে পূর্বীপ্রাপ্ত মেঁ জো হিন্দুয়োঁকে স্বতন্ত্র (স্বাধীন) রাজ্য থে, উন্‌কো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংহ জীনে পূর্বী বঙ্গালমে পঁহুচ কর্ পহিলে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রাজ্য পর চড়াই কী জিস্কী সেনামে হাথী বহুৎ থে; প্রতাপাদিত্যকে সাথ জো লড়াই হুই, উসমেঁ মানসিংহজীকে ছোটে কঁবর (কুমার দুর্জ্জনসিংজী) কাম আয়ে (মারা পড়েন) ঔর প্রতাপাদিত্যজী জীতা পকড়া গয়া। মানসিংহজী নে উসকো ধীর্জ বন্ধয়া। (আশ্বাস দিলেন, ধীর্জ ধৈর্য্য) ঔর কহা কি আগরে চলকর তুম্হারা রাজ্য তুম কো হী দিলা দুংগা। পরন্তু দীন প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্ কর মার্গমে হী (মার্গ পথ) কালবশ হুয়া (কাল প্রাপ্ত হইলেন)। মানসিংহজী নে উস্‌কে ভতীজে (ভ্রাতুষ্পুত্র) হরিরায় কো রাজ্য নিলায়া।

প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজ্যপর চড়াই কী। বহ (ইনি) জাতি কা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী কা উস্‌কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী ঔর (অভিমুখে, দিকে) ভগ্‌গয়া। ঔর মন্ত্রীসে কহ্ গয়া কি যদি হোসকে (যদি সম্ভবপর হয়) তো মেরী পুত্রী মান সিংহজীকো দে কর সন্ধি করলেনা; মন্ত্রীনে ঐসাহী কিয়া মানসিংহজীনে প্রসন্ন হৌ কর কেদায় কো বাদসাহ কা পাদসেবী বনা কর কস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঐর সল্লাদেবীকো আম্বের লে আয়ে।।

* * * সল্লাদেবী কো মানসিংহজী বঙ্গালমে সে লায়েথে। বংপাবলিয়োমে (চারণ দিগ কর্তৃক রক্ষিত বংশাবলী) লিখা মই কি দেবী নে মান সিংহজী সে কহা থা মৈঁ তুম্হারে যাঁহা (তোমার জ্ঞানে বা নিকটে) তব তক্ হী রহুংগী জবতক্ তুম ঔর তুম্হারী সন্তান মুঝে নিত্য এক ছাগ কা বলি দেতে রহোগে, জব তক মৈঁ তুম্হারে যহা রহুংগী তব্ তক্ তুম্হারে বা তুম্হারী সন্তানকে রাজ্য কো কিসী প্রকার কা ভয় নহী হৈ।" ইস্ দেবী কা মন্দির আম্বেরকে গড়মেঁ বনা হুয়া হৈং পূজারী বঙ্গালী হৈ। ঔর অদ্যাবধি নিত্য মূর্তিকে সামনে এক ছাগ কা বলি হোতা হৈ।" (ইতিহাস রাজস্থান, ১০৩/৪ পৃষ্ঠা)।

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ মানসিংহের রাজত্বকাল বর্ণনা করিবার কালে নিম্নলিখিত ভাবে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন—

"Oosman, Oomar, Meroo, Hakim Khan, Kutloo Khan, Isa Khan and other Pathans had raised a rebellion in the eastern part of the empire, such as Jagannath Puri &c. Mansingh quelled all these. Now he advanced by sea to the country of Brahmaputra where he defeated the Raja of the land and took the country.

After this he defeated the Kayasthe Raja Kaidar Nath (A Shaktik by religion and a favorite of Silla Devi) of Oodey. He then restored his *raj* to him and brought with him the idol of Silla Devi with promises that he would offer the usual sacrifices to it.'

ঈশা খাঁ

ঈশা খাঁর পিতার নাম কালীদাস, এই ব্যক্তি মোসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন। ঈশা কোচবিহার পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। খিরিজপুরের ৩০ মাইল উত্তরে ঈশাপুর নামে স্থান আছে। উহা ঈশার নামানুসারে হইয়াছিল।

প্রবাদ মানসিংহ ঈশাকে দিল্লিতে লইয়া যান। বাদসাহ ঈশাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানিতেন, এজন্য তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন, কিন্তু পরে মানসিংহর নিকট ঈশার অন্যান্য গুণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে তাহার "দেওয়ান মসনদই য়ালী" উপাধি ও কয়েকটি পরগণার অধিকার প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ঈশা প্রজারঞ্জক ছিলেন, তাহার আধিপত্য সময়ে সোনারগাঁ অঞ্চলে বহু খাল ও পুষ্করণী খণিত হইয়া জল সরবরাহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া দেশের শান্তি সংরক্ষণ করিত। এই সময়ে টাকায় ৪/ মন চাউল বিক্রয় হইত। দুর্ভিক্ষ যে কি তাহা ঈশার প্রজাগণ কখনও বুঝিতে পারে নাই। অতি অল্পহারে প্রজার নিকট কর আদায় হইত। এইজন্য "কাণিক্ষেতে লাগিল চৌদ্দবুড়ি"[২] এই গান করিয়া খাঁ সাহেবের যশ ঘোষণা করিত।

পূর্বে ময়মনসিংহের অন্তর্গত, হাজরাদী পরগণা বা "তজ্জা" সরকার বাজুহারের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। লক্ষ্মণ হাজো নামীয় এক কোচ জঙ্গলবাড়ির নিকট দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথাকার শাসন কার্য নির্বাহ করিত।

ঈশা খাঁ এই স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করেন, তথায় তাহার আর একটি বাড়ি নির্মিত হয়।

ঈশা খাঁর জীবিত সময়ে একমাত্র বাজুহারের উত্তরাংশে সুসঙ্গের রাজগণ, সীমান্ত প্রদেশে আধিপত্য করিতেছিলেন।

১৫৯৮ খ্রিঃ অব্দে বীরবর ঈশা কালগ্রাসে পতিত হন (আইন-ই-আকবরি ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ)

প্রবাদ ঈশার হিন্দু স্ত্রী সোনাবিবি মগদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলে, প্রজ্জ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সোনাকান্দার দুর্গ, এই বীরললনা সোনাবিবির দ্বারা বিনির্মিত হয়। খিজিরপুরের দুর্গ ও সুন্দর মসজিদ, গোয়ালদীর মসজিদ, প্রভৃতি এই শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশা খাঁর দুই পুত্র ; প্রথম দেওয়ান মুসা খাঁন, দ্বিতীয় দেওয়ান মহম্মদ খাঁন। মুসাখানের জ্যেষ্ঠপুত্র মাসুম খাঁ, ইহার সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, হুগলীর অবরোধকালে (১৬৩২ খ্রিঃ অব্দে) ইনি মোগল জাহাঁজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পাদসা নামেতে জানা যায় আসাম আক্রমণ কালে মাসুম খাঁ ২৫ খানা কোষা নৌকা মোগল সৈন্যাধ্যক্ষকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। মাসুম খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মনোর খাঁ।

এই মনোর খাঁর নামানুসারে দেওয়ান বাগ বা মনোর খাঁর বাগ নামে একটি স্থান নারায়ণগঞ্জের ৭ মাইল পূর্বকোণে বিদ্যমান আছে। বিগত ১৯০৯ খ্রিঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ তারিখে একজন কৃষক হলচালনাকালে এই স্থলের ভূগর্ভে সাতটি কামান প্রাপ্ত হইয়া, নারায়ণগঞ্জের সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে এই সংবাদ প্রদান করে, অফিসার উহা আনয়ন করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করেন। ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, মিঃ এইচ, ই, স্টেপলটন, বি, সি, এস্ প্রতি উহার সময় নিরুপণ প্রভৃতি ভার অর্পিত হয়। এই কামান কতকটা পিতল নির্মিত। ইহাতে ঈশা খাঁর নাম ও ১০০২ এই সংখ্যা অঙ্কিত আছে। উহা বোধ হয় হিজরী সন হইবে।

ত্রিপুরা ঃ

স্বনাম বিখ্যাত প্রদেশ, মহাভারতের সময় হইতে এই রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন বলিয়া পরিচিত ছিল, বর্তমান সময়েও উহার কতকাংশ স্বাধীন ত্রিপুরা নামে উক্ত হইয়া থাকে।

আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ আছে "ভাটি" প্রদেশের সীমান্তেই ত্রিপুরা রাজার বিস্তৃত রাজ্য। এই দেশের রাজার নামে মাণিক্য উপাধি সংযুক্ত আছে এই দেশের রাজার এক সহস্র হস্তী ও দুইলক্ষ পদাতিক সৈন্য আছে, এই রাজ্যে অশ্বারোহী সৈন্য নাই বলিলেই হয়। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য। (আইন-ই-আকবরী) এই মাণিক্য উপাধি সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন "প্রবাদ এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা দিল্লিতে উপস্থিত হইয়া বাদসাকে কতকগুলি (রত্ন) উপহার প্রদান করায়, বাদসাহ তাহাকে "লাল" এই উপাধি প্রদান করেন। কারণ পারস্য ভাষায় মাণিক্যকে "লাল" বলিয়া থাকে। রাজারা এই "লাল" উপাধি পারস্য শব্দ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃতমূলক মাণিক্য উপাধিতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় "লালা" এই উপাধিটিও "লাল" ওই শব্দে লা অপভ্রংশ হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। সুজাউদ্দীন খাঁর নবাবী সময়ে মীরহবীব ত্রিপুরার কতকাংশ মোগল গবর্নমেন্টের রাজ্যভুক্ত করেন, তাহাতে এই ভূভাগের কতকাংশ মোগলরাজ্যের অন্তর্গত হইয়া, মোগলান নামে পরিচিত হয়।

কোচবিহার ঃ

সুবে বাঙ্গালার উত্তর পূর্বদিকে কোচ রাজ্য। এই রাজ্যে একসহস্র অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। কামরূপ এই রাজ্যের অন্তর্গত। তত্রত্য অধিবাসীগণ অতি সুশ্রী এবং তাহারা ভোজবিদ্যায় পারদর্শী। এই দেশ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প প্রচলিত আছে। তথায় এক প্রকার পুষ্প জন্মিয়া থাকে যাহার সুগন্ধি পাঁচ, সাতমাস পর্যন্ত অবিকৃত থাকে (আইন আকবরী)

বিশ্বসিংহ ১৪৯৮—১৫০৮ পর্যন্ত পরে তৎপুত্র নরনারায়ণ ১৫২৮ খ্রিঃ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি স্বনামে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচার করেন। ১৫৫০ খ্রিঃ অব্দে এই রাজবংশ দ্বারা কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্মিত হয়। ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে কোচবিহার প্রদেশ ও ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে আসাম প্রদেশ প্রদান করিয়া যান। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে নবাব ইসলাম খাঁ তাহাকে পরাজিত করিয়া বন্দি করেন ও আসাম মোগল রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লন। বর্তমান সময়ে উহা ইংরেজ গবর্নমেন্টের অধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত।[৩]

আরাকান ঃ

"সুবে বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্বে আরাকান রাজ্য ; চাটগাঁ বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্যে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্ব বড় মহার্ঘ! উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এখানে অধিক মূল্যে বিক্রিত হয়, এদেশে গাভী বা মহিষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার লোকে গাভী জাতীয় এক প্রকার জন্তুর দুগ্ধ ব্যবহার করে। এদেশের লোক না হিন্দু না মুসলমান জমজ ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ এদেশে প্রচলিত আছে। মাতা পুত্রে ব্যতীত আর সকলের সঙ্গে সকলের বিবাহ হইতে পারে। এদেশের লোকে তাহাদের পুরোহিত "ওয়ালীর" সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ। এখানকার রাজদরবারে স্ত্রীলোকেরা প্রহরীর কার্য করে, পুরুষেরা গৃহে বসিয়া থাকে। আরাকানের নিকটেই পেগু প্রদেশ। এই দেশে শ্বেতহস্তী পাওয়া যায়। এই দেশে বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতুর খনি আছে ; সেই খনি লইয়া ইহাদের সহিত আরাকানবাসিগণের সর্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে।" (আইন-ই-আকবরী)

ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরা, কোচবিহার, আসাম, আরাকান, বাঙ্গালা প্রান্তবর্তী এই কয়েকটি রাজ্য স্বাধীন ছিল।

১. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার একদশ বর্ষের ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রথম জয়পুর, সংস্কৃত কলেজের প্রফেসার মেঘনাদ ভট্টাচার্য এই পত্রের আভাষ প্রদান করেন, তিনি কিন্তু কেদার রায়কে জানিতে পারেন নাই।

২. ২৮০ কৌড়িতে চৌদ্দবুড়ি হয়।

৩. মানসিংহ কর্তৃক কোচবিহার আক্রান্ত হয়, তিনি কোচবিহারের রাজকন্যাকে গ্রহণ করিয়া, সন্ধি করিয়া চলিয়া যান।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইব্রাহিমপুর ঃ

সুবেবিহারের অন্তর্গত, পাটনার নিকটবর্তী। ইব্রাহিম আবুবেকার মালিক ভুএগ্রা এই স্থানে একটি দরগা স্থাপন করেন ; উহা নগরের উত্তর পশ্চিমদিকে পর্বতের উপর সংস্থাপিত। সম্ভবত এই ইব্রাহিমের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম হইয়াছে ইব্রাহিমপুর। জার্নেল ১৮৭৩।৩০০ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বরীপুর ঃ

বড়গঙ্গা তীরস্থ ধূলীয়াপুরের দক্ষিণাংশে, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২২৭ পৃষ্ঠা

আবদুল্লাপুর ঃ

বিক্রমপুরের অন্তর্গত; এই স্থান রামপাল হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।৪৩পৃষ্ঠা)

একডালা ঃ

সোনারগাঁর ৩ মাইল পশ্চিমে এবং ঢাকা হইতে ৯ মাইল উত্তর পূর্বদিকে খিজিরপুরের অন্তর্গত। ১ম সোনাকান্দার দুর্গ, ২য় হাজিগঞ্জের দুর্গ অতিক্রম করিয়া পরে দেশাভ্যন্তরে একডালা দুর্গের সংস্থিতি, এই স্থানে একটি মার্বেল প্রস্তর নির্মিত মসজিদ দেখা যায়, উহা জাহাঙ্গীর বাদসাহের এক তনয়া দ্বারা নির্মিত হয়। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।২১২ পৃষ্ঠা)।

এতদ্ভিন্ন দিনাজপুর, বগুরা ও রাজসাহীতেও একডালা নামের পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুরের একডালা দুর্গ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু দিনাজপুরের এই স্থানটির নাম যোগডালা বলিয়া জানা যায়।

এগারসিন্ধু ঃ

নারায়ণগঞ্জের নিকট। লক্ষা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গ ছিল; এই স্থানে ঈশা খাঁর সহিত মানসিংহের একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জনসিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।২১৩ পৃষ্ঠা)।

কলাগাছিয়া ঃ

স্বনামখ্যাত নগরের তীরে একটি দুর্গ, যাহা সোনারগাঁ হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম অবস্থিতি ছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রীপুর হইতে উহা অধিক দূরবর্তী ছিল না।

(এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।৮৭ পৃষ্ঠা)।

কর্তাভুপুর ঃ

সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত একটি তপ্পা বা পরগণা (১৮৭৪।২১৪ পৃষ্ঠা জার্নেল)

লক্ষা নদীর তীরে অধুনা তপ্পা নামে প্রসিদ্ধ খিজিরপুরের বিপরীত দিকে। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৫।১৮৪ পৃষ্ঠা)

কালীগঞ্জ ঃ

সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বর্তমান রঙ্গপুরের অধীন। ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি স্থানের নামও কালীগঞ্জ বলিয়া জানা যায়।

কচুয়া ঃ

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন, তেঁতুলিয়া নদীর পশ্চিমতীরে। (লঙ্গ সিলেকসন ১৭৮৪ খ্রিঃ অব্দ) বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তিনি এই স্থানে একটি ভগ্নমন্দির দেখিয়াছিলেন। (বাখরগঞ্জের ইতিহাস ৭২।৭৩ পৃষ্ঠা)

কাকষাল ঃ

Stewarts History of Bengal Footnote on Pages 198-99

"গঙ্গানদীর উত্তর পূর্বদিক হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত কাকষাল দেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ডাঃ বুকানন বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক গঙ্গানদীর উত্তর পূর্বপার্শ্বস্থিত স্থানসমূহে জনসাধারণের অবস্থার বিবরণ ঘটিত জরিপী কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে এই সকল নগরে মোসলমানের সংখ্যা দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। উহারা আফগান এবং ককেসেলানদিগের বংশধর হওয়াই খুব সম্ভব এবং দুইশত বৎসরের মধ্যে হিন্দু সংমিশ্রণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু ১ম হিন্দুমন্ত্রী হইতে উৎপাদিত সন্তানাদি ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময়ে উহারা বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক বালক ক্রয় করিয়া মোসলমান ধর্মানুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত। এই সকল বালকগণ এবং যাহারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া মোসলমান ধর্মাবলন করিত তাহারা আরবদেশীয় "শেখ" উপাধি ধারণ করিত। বোধ হয় তাহাদের সন্তান সন্ততিবর্গ বিশুদ্ধ মোসলমানগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক।"

কোঙর সুন্দর বা কুমারসমন্দ ঃ

তোটকের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের অপর তটে। ইলিয়ট V. VI. Page 74

আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় যে সোনারগাঁর অন্তর্গত কাটাসুন্দর নামক স্থানে একটি জলাশয় ছিল, যাহার জলে মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হইত। এই কুমারসমন্দ কি সেই কাটাসুন্দর?

কোকরা ঃ

বর্ধমান জেলার ১৮ মাইল উত্তরদিকে পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান। (ইলিয়ট)

খিজিরপুর ঃ

নারায়ণগঞ্জের একমাইল উত্তর পূর্বদিকে, এই স্থানেই ঈশা খাঁর এক দুর্গ ছিল (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।২১১ পৃষ্ঠা)। পরে মীরজুমলা কর্তৃক তথায় আর একটি দুর্গ নির্মিত হয়। যাহা খিজিরপুরের কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ। (ষ্টুয়ার্ট ৩৩২ পৃষ্ঠা) ১৬৬৩ খ্রিঃ অব্দে মীরজুমলা আসাম বিজয়ে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন সময়ে, এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (ষ্টুয়ার্ট ৩৩২ পৃষ্ঠা)

বর্তমান সময়ে খিজিরপুরান্তর্গত কতকস্থান গবর্নমেণ্টের খাসমহলের অন্তর্গত; তৈজির নম্বর ৯৮৭১ উহা দুইভাগে সার্বে হইয়াছে। (১৮৬৫ সনের সার্বে)

ঘোড়াঘাট ঃ

তোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে উহা একটি সরকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। সদর স্থান ছিল খাসনসরতাবাদ সহর। ঘোড়াঘাট চেকহাণ্ডী; করতোয়ার দক্ষিণ দিকে। সম্প্রতি দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুরা জেলায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। "দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে"। ইহার রাজস্ব ছিল ৮৩৮৩৭২ দাম। (আইন) ও ইলিয়ট ৫ম খণ্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

গড়িয়া বা ঘাড়ি ঃ

সাতগার নিকট পদ্মা ও ভাগীরথী বিভক্ত হইয়া বরাবর সুতী পর্যন্ত পশ্চিমদিগে অগ্রসর হইয়াছে। তৎপর ভাগীরথী দক্ষিণবাহিণী হইলে ঐ নদীতীরে গড়িয়া বা ঘাড়ী নামক স্থান। "ঘড়ি" বাঙ্গালার দ্বারস্বরূপ পার্বত্যময় প্রদেশ, রাস্তার প্রশস্ততা মাত্র এইরূপ যে একজন অশ্বারোহী সহজে চলিতে পারে না। অন্যদিকে কতকগুলি নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হওয়ায় উহাও সহজে অনতিক্রমনীয়। (হিলিয়ট ৭ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

চৌষা ঃ

কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল পশ্চিমোত্তর; বর্তমান সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের একটি স্টেশন।

চুটিয়া ঃ

ছোটনাগপুর ; ইহার অন্তর্গত সিংহভূম, চৌবাসা প্রভৃতি স্থান। এতদ্ভিন্ন চুটিয়া পটিয়া নামে মালদহ জেলায় একটি স্থান আছে। (এশিয়াটিক জার্নেল ২১৩ পৃষ্ঠা।)

চণ্ডভণ্ড ঃ

সুন্দরবন দেখ।

জলেশ্বর ঃ

উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি সরকার। তোডরমল্লের বন্দোবস্ত অনুসারে উহার রাজস্ব ছিল ৫০০৫২ দাম। মহালের সংখ্যা ছিল ২৮। অধুনা বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত।

জগদ্দন ঃ

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চন্দননগরের অপরপারে আজিও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। অপর জগদ্দন রাজমহল নামে খ্যাত। প্রতাপাদিত্যের নিখাত রাজপুষ্করিণী আজও বর্তমান আছে।

জাহানাবাদ ঃ

সরকার মাদারনের অন্তর্গত দারকেশ্বর নদীর তীরে বর্তমান সময়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি সবডিভিসন। (ষ্টুয়ার্ট ২০৫ পৃষ্ঠা।)

ঝারখণ্ড ঃ

ময়ূরভঞ্জ হইতে ছোটনাগপুরের সমস্ত স্থান ঝারখণ্ড নামে পরিচিত। দেওঘর ও বৈদ্যনাথ উহার অন্তর্গত। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে উহার পরিচয় আছে। যথা—

"ঝারখণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর তথৈব চ
বীরভূমৌ সিদ্ধনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ"

ঝুন্দ ঃ

সাসীরামের নিকটবর্তী স্থান। (সাসীরাম দেখ)

তাজপুর ঃ

সরকার তাণ্ডার অন্তর্গত ও সরকার সোনারগাঁর অন্তর্গত দুইটি তাজপুরের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথমটির রাজস্ব ছিল ২০১৯৯৭ দাম। দ্বিতীয়টির রাজস্ব ছিল ৪৫৪৩৪ দাম। এতদ্ভিন্ন সরকার তাজপুর মহানন্দার পূর্ব, ইহার রাজস্ব ৬৪৮৩৮৫৭ দাম। আইন আকবর ও এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২১৫ পৃষ্ঠা।

ত্রিবেণী ঃ

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সম্মিলনে যেরূপ এলাহাবাদ ত্রিবেণী নামে বিখ্যাত। আবার ঐ নদী ত্রয়ের বিচ্ছেদ নিবন্ধন নবদ্বীপের নিকট আর এক ত্রিবেণীর পরিচয়। তদ্রূপ ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লক্ষা এই নদ ও নদীত্রয়ের পরস্পর সম্মিলনহেতু, ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে, সোনারগাঁ পরগণাতে এই ত্রিবেণীর পরিচয়।

(এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।৯৫ পৃষ্ঠা)

তাড়া বা তাণ্ডা ঃ

তোডরমল্লের বন্দোবস্তে উহা একটি সরকার বলিয়া পরিচিত হয়। ইহার রাজস্ব ছিল ২৪০৭৯৩৯৯ দাম। এতদ্ভিন্ন রেনেল গৌড়ের নিকটে পাগলা নদীর তীরে তাণ্ডার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বে গঙ্গা এই স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত তাণ্ডা রাজস্ব ২১৪৪৪৩ দাম।

"তাণ্ডা গঙ্গা নদীর তীরে, গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি স্রোত সাতগাঁ ও উড়িষ্যার দিকে অপর ধারা মহম্মদাবাদ, ফতেয়াবাদ ও সোনারগাঁর অভিমুখে প্রবাহিত ছিল।" (ইলিয়ট)

তুকারো বা তুকারাম ঃ

মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারী (ব্লকম্যান)। আমরা দুইটি মোগলমারীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১ম কাঠালবাড়ি, মোগলমারী, কোচবিহারের অন্তর্গত। ২য় বর্ধমান জেলার মধ্যবর্তী তুকারো বা তুকারাম মোগলমারী, এই স্থানে মোগলপক্ষীর সৈন্যগণ দৌয়ুদসাহকে পরাস্ত করিয়া প্রাণ বধ করে। (১৫৭৫ খ্রিঃ)

তিরা বা তিরুল ঃ

তিরুল সম্ভবত টিবা নামেই পরিচিত হইয়াছিল, এই স্থান ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষীয়ার সঙ্গমস্থলে অঙ্কিত দেখা যায়। (রেনেলের ম্যাপ ১২ নং দেখ)

তোটক ঃ

ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে, কুমারসমন্দের বিপরীত দিকে। এই স্থানে একটি দুর্গ ছিল।

(এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২১৩ পৃষ্ঠা)

(এনাইতুল্লা আকবরনামা, ইলয়ট অনুবাদ ৬ ভলম, ১০৯ পৃঃ)

দড়িয়াপুর ঃ

দড়িয়াপুর ব্রহ্মপুত্রের শাখা কোচবিহারের উত্তরপশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত। ভিতরবন্দ ও বাহিরবন্দ পরগণাদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া এই দুইটিকে পৃথক করিতেছে। দড়িয়ানদীর তীরে দড়িয়াপুর গ্রাম সংস্থাপিত। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২৪০ পৃষ্ঠা)

(হিজলীর ঠিক বিপরীত দিকে রসুলপুর নদীর পূর্বতীরে দড়িয়াপুর নামে আর একটি পর্বতবেষ্টিত স্থান আছে)

ধরমপুর ঃ

সরকার বিহারের অন্তর্গত একটি মহাল। ইহার রাজস্ব ছিল ৫০০০০০০০০০০ দাম।

ধূমঘাট ঃ

২৪ পরগণার অন্তর্গত কালীগঞ্জ স্টেশনের অধীন। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। উহা প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে। এই স্থান অধুনা খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন প্রদেশে। অরণ্য মধ্যে আজিও বহু ভগ্ন অট্টালিকা ও দেবালয়ের নিদর্শন এবং

প্রশস্ত রাজপথ পরিদৃষ্ট হয়। আজিও রাস্তার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি বকুল বৃক্ষ ছায়া প্রদান করিতেছে। (ওয়েস্টলেণ্ড ২৪ পৃঃ)

ফতেয়াবাদ ঃ

তোডরমল্লের বন্দোবস্তে উহা একটি সরকার মধ্যে পরিগণিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে যখন সরকারের পরিবর্তে চাকলার উদ্ভব হয় তখন উহার অধিকাংশ ভূষণা চাকলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানকালে উহা যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। (আইন-ই-আকবরী ও মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্ত দেখ)

ফকিরউদ্দীন আবুল মোজাফর সেরসাহের রাজত্বকালে, সেরিফাবাদ, মহম্মদাবাদ এবং ফতেয়াবাদে টাকশাল ছিল। এশিয়াটিক জার্নেল। ১৮৭৫।২৯৬ পৃঃ

ফতেপুর সিকড়ি ঃ

জৈনপুরের নিকটবর্তী ছাপরাঘাট হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী। ছাপরঘাটা আগ্রা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্তী। ফতেপুর আগ্রা হইতে পশ্চিমদিকে। বাইরাম খাঁর স্ত্রী সপিমা বেগমকে আকবরসাহ পুনঃ বিবাহ করেন, সপিমা বেগমের বাগান এই স্থানে নির্মিত হয়।

এশিয়াটিক জার্নেল ৮৭৫।২৯৯ ও ৩০০ পৃঃ

ফতেজঙ্গপুর ঃ

তিনটি ফতেজঙ্গপুরের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর ফতেজঙ্গপুর, দ্বিতীয়টি ফতেয়াবাদ ফতেজঙ্গপুর পরগণা, এই দুইটি বর্তমান সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। অপর ফতেজঙ্গপুর পরগণা নদীয়া ও যশোহর জেলার অন্তর্গত। বিক্রমপুরের কেদার রায়কে, ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে ও যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া জয়নিদর্শনরূপে মানসিংহ এই তিন ফতেজঙ্গপুরের নাম পত্তন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর ঃ

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান, উহা বনবিষ্ণুপুর নামে প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই স্থানের রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বীর হাম্বীরের রাজধানী।

বংশীপুর ও বসন্তপুর ঃ

কালিন্দী নদীর তটে। বসন্তপুর কালীগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটে বিভারকোট নদীর তীরে।

বজরাপুর ঃ

তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটি পথ ছিল, উহা একটি নদীতীর ধরিয়া, অপরটি ভাওয়াল পরগণার মধ্য দিয়া। সম্ভবত ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী কোন স্থান হইবে।

ভদ্রক ঃ

উড়িষ্যার অন্তর্গত, সরকার ভদ্রকের অন্তর্গত ২১টি মহালের রাজস্ব ছিল ৯১৪৩৭৭২৭৩০ দাম। উহার মধ্যে নিজ হাবেলী ভদ্রকের রাজস্ব ৯৫৪১৭৬০ দাম।

বালকোণা ঃ

গয়া জেলার অন্তর্গত এক পরগণা। ইহার নামান্তর "বালাউলজার"।

এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।১১৮ পৃঃ

ভাটি ঃ

হুগলী নদী ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ পূর্বসময়ে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে বাঙ্গালার ভুঞারা রাজত্ব করিতেন। সাধারণত এই ভূ-ভাগের দক্ষিণ সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার ও ব্রহ্মপুত্রের

সহিত লক্ষার সঙ্গম স্থান পর্যন্ত ভাটি নির্দেশ করিতেন। উহা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই-আকবরিতে দেখা যায় ত্রিপুরার দক্ষিণাংশও ভাটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানকালে বাকরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্তী স্থানগুলিই ভাটি নামে নির্দেশ হইয়া থাকে।

(এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩ ইং)

আইন-ই-আকবরিতে ভাটি সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

ভাওয়াল ঃ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ পরগণা।

ভাদুড়িয়া ঃ

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চলনবিলের মধ্যবর্তী একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ।

মীরজানগর ঃ

কপোতাক্ষ নদী তীরে, ২৪ পরগণা ও যশোহরের মধ্যবর্তী, এই স্থানে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

মঙ্গলকোট ঃ

বর্ধমানের ১৮ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত একটি গণ্ড গ্রাম।

মন্দারণ বা মাদারণ ঃ

বীরভূম জিলার অন্তর্গত নগর হইতে রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী মণ্ডলঘাট পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান। এই স্থানে একটি দুর্গ থাকায় উহা গড়মন্দারণ নামে প্রসিদ্ধ। সরকার মাদারণ ইহার রাজস্ব ছিল ৯৪০৩৪০০ দাম। বীরভূমের অন্তর্গত নগর, বর্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জ এবং হুগলীর অন্তর্গত কান্তঘোষ, জাহানাবাদ, চন্দ্রঘোনা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। দুর্গেশ-নন্দিনীর পাঠকগণ যে গড-মন্দারণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাই এই মদারণ বা মন্দারণের অন্তর্গত।

মশ্বাদিগ্রাম ঃ

সোনারগাঁর অন্তর্গত; নবাব মুরশিদকুলী খাঁ, মুকসুদাবাদকে যেরূপ স্বীয় নামে পরিণত করিয়া "মুরশিদাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন, সেইরূপ বৈদ্যবংশীয় মহেশ্বর নাম্না এক বর্ধিষ্ণু লোক মশ্বাদীকে, মহেশ্বরদী নামে একটি পরগণার গঠিত করেন। সোনারগাঁর কতক গ্রাম লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়।

মেদম্মল ঃ

সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত একটি পরগণা, বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত। উহার পত্তন কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব দিকে, মাতলা রেলওয়ে লাইনের উভয়পার্শ্বস্থ স্থান। বারুইপুর ও অন্যান্য গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

যশোহর ঃ

প্রাচীন যশোহর ২৪ পরগণার অন্তর্গত কালীগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে।[১] আজিম খাঁ ১৫৯২—১৬০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত এই স্থানের ফৌজদার বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বর্তমান জেলা প্রথম মুরলী, পরে কসবায় সংস্থাপিত হইয়া, কসবাতেই বর্তমান আছে, কিন্তু উহা যশোহর জেলা নামেই পরিচিত। গুহ রাজবংশের সময়েতেই যশোহরের পূর্ণ উন্নতি। তৎসময়ের জনৈক কবি যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ এক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

যশোহরপুরী কাশীদীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা
তর্কপঞ্চানন ব্যাসঃ বসন্তকালভৌরবঃ।।

এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপাদিত্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

(ওয়েস্টলেণ্ড হিষ্টরী ২৪ পৃঃ)

রায়পুর ঃ

পাটনার পূর্বদিকে একটা বৃহৎ জনপদ। কোন কোন ইংরাজ লেখক ইহাকে জেসুয়ান নামে পরিচিত করিয়াছেন। বাণ্ডোব্রুকের ম্যাপে আর একটি জেসুয়ানের পরিচয় পাওয়া যায়। উহা মোরঙ্গের পূর্বদিকে। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২৪৪পৃষ্ঠা)

রায়গড় ঃ

২৪ পরগণায় অন্তর্গত বরিষা বেহালার সন্নিকটে।

রোটাস ঃ

শোণ নদের তীরবর্তী রোটাস নামক বিস্তৃত ভূভাগ বা সরকার। এই স্থানে একটি দুর্গ আছে। তন্নিকটবর্তী আকবরপুব ও বলন্দু নামে আরও দুইটি দুর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। সরকার রোটাসের রাজস্ব ৪০৮১৯৪৯৩ দাম। বিহারের অন্তর্গত, রোটাসের রাজস্ব ছিল ২২৫৮৬২০ দাম। (রেনেলের ম্যাপ নং ৩) (আইন-ই-আকবরী)

এই স্থান সাহাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত। সেরসাহ স্বীয় নামে একটি দুর্গ প্রস্তুত করান (সেরগড়) ১৫৩৮ হইতে ১৫৪৫ খ্রিঃ মধ্যে। রোটাস হইতে ১৮ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে।

(এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৫।২৯৬ পৃষ্ঠা)

শালিখা বা শালখিয়া ঃ

এই স্থানে একটি পুলিশ স্টেশন আছে, যশোহর ও ঢাকা রোডের সন্নিকটে। যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা সাবডিভিজনের নিকটবর্তী। হাবড়া জেলার একাংশ শালিখা নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর ঃ

ইলিয়ট কৃত তিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে এই শ্রীনগরে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের শেষ যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বীরবর কেদার রায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। কেদার প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে। এইস্থানে বৌদ্ধ সঙঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

বর্তমান সময় উত্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত যে শ্রীনগর বর্তমান আছে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উহার কোন পরিচয় ছিল না। তখন উহারাই সবর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান প্রকৃত শ্রীনগরের একাংশের নাম, ফতেজঙ্গপুর ও অপর অংশ নগর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং ষ্টেশনের অধীন।

শ্রীপুর ঃ

ডাক্তার ওয়াইজ এই শ্রীপুরকে চড়াতে পরিণত দেখেন। তৎকালে উহাকে "শ্রীপুরের টেক" বলিত। তথায় বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের অফিস ছিল। সম্পূর্ণ নদীগর্ভস্থ হইয়া উহার একটুকুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা "শ্রীপুরের টেক" নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

এই টেক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে।

মনাইফকির নামে একজন মুসলমান সিদ্ধ পুরুষকে, জনগণ প্রশ্ন করিয়াছিল, এই কীর্তিনাশা নদীর বিস্তার কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। তদুত্তরে ফকির সাহেব বলেন, তোমরা আমার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া থলিয়ায় পুরিয়া এই নদীর মধ্যে ফেলিয়া দাও, সপ্তাহ পরে

পুনরায় এইস্থানে আগমন করিলে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার কথানুযায়ী কার্য সমাধান হয়। তৎপর উত্তর প্রার্থীরা সমবেত হইয়া পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ফকিরের সাক্ষৎ লাভ করিলেন। ফকির তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তৎ-সম্বন্ধে আমি যতটা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। "কীর্তিনাশার উত্তর তটে চাচুরতলার ঠাকুরাণী বাড়ি ও দক্ষিণ পারে মাঐসারের দিগম্বরী বাড়ি বলিয়া যে দুইটি জনপদ ও দেবীস্থান বর্তমান দেখিতেছ, তাহাই এই নদীর উভয় তটে বর্তমান থাকিবে। এতদ্ মধ্যবর্তী যাবতীয় স্থান নিশ্চয় নদীগর্ভে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। আর এই যে রাজনগরের সতেররত্ন ও একুশরত্ন প্রভৃতি দেখিতেছ, উহার নিম্নে সোনার ইলিশ মৎস্য নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল মৎস্য এই নদীর জলে নিশ্চয় বিচরণ করিবে। তবে শ্রীপুরের যে টেক বর্তমান আছে উহার বিলয় সাধন কোন কালেই হইবে না।"

আজ পর্যন্ত ঐ সিদ্ধ পুরুষের কথা কতকটা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কারণ চাচুরতলার ঠাকুররাণীর বাড়ির দিকে বহুবার নদী অগ্রসর হইয়াও পুনরায় চড়ায় পরিণত হইয়াছে। রাজনগরের সেই অভ্রভেদী চূড়া সমন্বিত মন্দিরসমূহ অতীতের স্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এবং শ্রীপুরের সেই টেক কখন বা নদীর জলে, কখন বা চড়ায় বেষ্টিত থাকিয়া আপনার শীর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম রহিয়াছে। কত শত জনপদ, কত কীর্তিরাজি কীর্তিনাশার গর্ভে বিলীন হইয়া কীর্তিকর্তার নাম পর্যন্ত বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ফকিরের নির্দেশ একটুকুও নড়ে চড়ে নাই। দৈবশক্তির যে কি অপূর্ব মহিমা তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কিরূপে বুঝিব! ১৮২২ খ্রিঃ অব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট জন পীটারসন ঢাকা জেলার দুর্গ-সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে চণ্ডীপুরের নিকট একটি প্রাচীন কেল্লা ছিল, যাহা শ্রীপুরের কেল্লা বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান সেটেলমেণ্ট অফিসার, এফ্, ডি, এস্কলি কলিকাতা এশিয়াটিক জার্নেলে "বাঙ্গালার বদ্বীপ" সম্বন্ধীয় যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, রেনেলের সময়ে শ্রীপুর বর্তমান ছিল, কিন্তু তিনি এই প্রসিদ্ধ স্থানটি সম্বন্ধে কোন কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই।

সাতগাঁ ঃ

সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত, হুগলী নদী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থান। উহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর ছিল। (এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২১৭ পৃষ্ঠা)। সরকার সাতগাঁর রাজস্ব ছিল ১৭৬২৯৯৬৪ দাম। সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামকে মোসলমান লেখকগণ মোগল সরকারের "বুলঘাকখানা" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বুলঘাকখানা অর্থ বিদ্রোহী স্থান।

সাসীরাম ঃ

রোটাস প্রদেশের অন্তর্গত একটি স্থান। এই স্থানে একটি দুর্গ আছে। ইহার পশ্চিমে শনিগড় (একটি ক্ষুদ্র দুর্গ) ও পূর্বদিকে বামজারনগর। (রেনেলের ম্যাপ দেখ)। এই স্থানটি বর্তমান সময়ে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি সবডিভিসন।

সুগন্ধা ও সোন্ধারকুল ঃ

সরকার বাক্‌লার অন্তর্গত সুগন্ধা নদীর পরিচয়, অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে উল্লেখ আছে সুগন্ধা নদীতে ভগবতীর নাসিকা পতিত হয়। এজন্য উহা একান্ন পীঠের অন্যতম। পনাবালীয়ার নিকটবর্তী শ্যামরাইলে ভৈরব ও শীকারপুরগ্রামে শক্তিপীঠ বর্তমান আছে।

উহা সূতালড়ী, রায়েরকাঠি, ঝালকাটি, মধীপুর, মাধবপাশা প্রভৃতি স্থান হইতে ইদ্রাকপুর

গৌর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার তটবর্তী যাবতীয় ভূভাগ "সোন্ধারকুল" নামে পরিচিত ছিল। এই নদীর তটবর্তী অরণ্যময় প্রদেশের বৃক্ষরাজী হইতেই প্রথম সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হয়।

সোন্ধারকুল পরগণার ভূভাগসমূহ অধুনা চন্দ্রদ্বীপ, সিলেমাবাদ ও হাবেলী সিলেমাবাদ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য দশসনার বন্দোবস্ত সময়ে এই প্রত্যেক পরগণার সহিত "গয়রহ" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। রেনেলের ম্যাপে সোন্ধারকুলের সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত আছে।

ইংরেজ লেখকেরা কেহ কেহ সোন্ধাকে "ফ্রেগ্রেণ্ট" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সোন্ধা হইতে সুন্দরবন নামের উক্তিও তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়।[২]

বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ২৪।২৬।৪০ ও ১২৪ পৃষ্ঠা।

সেরপুর ঃ

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দশকাহনীয়াবাগিরদা (রেনেলের ম্যাপ) সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত সেরপুর মুরচা। ইহার রাজস্ব ছিল ১২০৭৭১৫ দাম। এতদ্ভিন্ন মুরশিদাবাদ জেলাতেও সেরপুর নামে দুইটি স্থান আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গতও সেরপুর আটিয়া নামে একটি স্থান আছে। উহা সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত। এই স্থানে মানসিংহের সহিত আফগানদের যুদ্ধ হয়।

আইন-ই-আকবরী, ৩৪১ পৃঃ ও

এশিয়াটিক জার্নেল, ১৮৭৩।২১৮ পৃঃ ও ১৮৭৫।২৯২ পৃঃ।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৭ সনের ৫ম খণ্ডে অতিরিক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ দাস কুণ্ড মহাশয় সেরপুরের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, "বগুড়ার অন্তর্গত সেরপুর মুরচা ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত দশকাহনীয়া সেরপুর, করতোয়া নদীর উভর তীরে বিদ্যমান ছিল। এই নদী পার হইতে হইলে খেয়া পার জন্য দশকাহন কড়ি দিতে হইত বলিয়া, উহার নাম দশকাহনীয়া।" এখন দেখিতে হইবে এই উভয় সেরপুর করতোয়ার তীরে বিদ্যমান ছিল কিনা।

রেনেলের ম্যাপে দেখিতে পাই বগুড়ার সেরপুর করতোয়ার পশ্চিম তীরে এবং ময়মনসিংহের সেরপুর ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীরে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে ঝিনাই নদী, বাজু পরগণা ও জাফরসাহী প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মপুত্র যে করতোয়ার পরবর্তী নদ তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহার কথা স্বীকার কঁরিতে গেলে ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাইএর অস্তিত্ব থাকে কোথায়? উভয় সেরপুরের ব্যবধান সোজাভাবে প্রায় ৪৪ মাইল। রেনেলের সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৪।৬৫ খ্রিস্টাব্দে করতোয়ার পরিসর ছিল অর্ধমাইল এবং ব্রহ্মপুত্রের পরিসর ছিল ১।। মাইল হইতে ৪ মাইল। ইহার মধ্যে কতকটা দ্বীপবৎ স্থানও বিদ্যমান ছিল। ঝিনাই-এর পরিসর অর্ধ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। এই সকল কারণে আমরা উভয় সেরপুরকে এক বলিয়া কখনই মনে করিতে পারি না। আমরা উভয়কে করতোয়ার তীরবর্তী বলিয়াও স্বীকার করি না।

সুন্দরবন ও চণ্ডভাণ্ডা ঃ

"সুন্দরবন" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে ইহা সুন্দর অর্থাৎ মনোরম ও বন এই দুইটি শব্দ হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন এই বনে 'সুন্দরী' গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সেই জন্য ইহার সুন্দরবন নাম হইয়া থাকিবে। বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ নামে যে জমিদারী আছে সেই জমিদারী নামক ব্যঞ্জক 'চন্দ্রদ্বীপ বন' হইতে সুন্দরবনের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও কোনও কোনও ব্যক্তির ধারণা। চণ্ডভাণ্ডা (Chandabhanda) নামে সুন্দরবনের অধিবাসী এক জাতির নামানুসারে এই বনের নাম হইয়াছে কেহ কেহ এরূপও মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।[৩] গ্রাণ্ট সাহেব 'চন্দ্রবাঁধ' হইতে ইহার

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। এই 'চন্দ্রবাঁধ' তাহার সময়ের ইউরোপীয়গণ Soondebund রূপে লিখিতেন।

দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র দক্ষিণ ভাগের (অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল) সুন্দরবনাভিধান আধুনিক। পূর্বে ভাঁটার জল বহু দূর পর্যন্ত নামিত। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ সেই জন্য হুগলী নদীর মোহনার নিকট হইতে মেঘনা নদীর মোহনার নিকট পর্যন্ত স্থান 'ভাটি' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখনও সময়ে সময়ে এই 'ভাটি' শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে সেই সমস্ত ও আকবরনামা হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশ দ্বাদশ জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়। কর্নেল উইলফোর্ড বলেন যে আরাকান ও কুমিল্লার রাজগণ এই দেশের প্রভুত্ব ও এই দ্বাদশ জন ভুঞার উপর কর্তৃত্বের জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাহার এইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোথায় আমরা জানি না। Asiatic Researches XIV, pages I & 51).

(See J. A. S. B., No. 3 of 1873 page 226)

হোসেমপুর, ঢাকা ঃ

রেনেল এই স্থানকে ওসমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেল 'সার্বে' উপলক্ষে ১৭৬৫ খ্রিঃ ২২শে জুলাই তারিখ এখানে পৌঁছিয়া স্বীয় ডায়রিতে লিখিয়াছেন—এই স্থানে একটি পর্তুগিজ গির্জার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। এই গ্রাম ঢাকা হইতে ৫০ মাইল দূরবর্তী উত্তর-পূর্ব দিকে। ইহার তলবর্তী খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে বরাবার সিলেট নদীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

এখানে যে গির্জা আছে হান্টার সাহেব তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। List of Ancient Monuments নামক গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই। Pere Barbier এর ১৭২৩ খ্রিঃ ১৫ই জানুয়ারী তারিখের পত্রে উসুমপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পত্র Letters Edifianteset Curienses সংজ্ঞক পত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত। (Form XIII page 272). এই উসুমপুরে মোগল বাদসাহের অনেক পর্তুগিজ কর্মচারীর অবস্থান এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তিনি নিজে Bishop Laynez এর সহিত ১৭১৪ খ্রিঃ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পত্র Rew W. K. Firminger মহোদয় কর্তৃক 'Bengal, Past and Present' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

আর একটি হুসেনপুর পরগণা নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশ পরগণার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ভূমির পরিমাণ ১৫০ বর্গমাইল। ইহার রাজস্ব ২৮ ভাগে বিভক্ত; ৪৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং মাত্র। সমুদায় রাজস্ব নদীয়ার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে। (ইম্পিরিয়েল গেজেট)

হাজিগঞ্জ ঃ

সোনারগাঁর অন্তর্গত ও নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র মেঘনা ও লক্ষীয়ার সঙ্গমস্থানে, উহা নির্দেশিত হয়। রেনেলের ১৭নং ম্যাপে তথায় একটি দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহা কেল্লা বলিয়া লিখিত আছে। এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৪।৮৬ পৃষ্ঠা।

অপর হাজিগঞ্জ ঃ

বর্তমান ফরিদপুর হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত ছিল।

(রেনেলের ডাইরি ২২ পৃষ্ঠা, অনুবাদ ঢাকা রিভিউ ৩৩০ পৃষ্ঠা)

হাজিপুর ঃ

হাজিপুর পাটনার অন্তর্গত গণ্ডক নদীর তীরে। মোসলমানদের রাজত্ব সময়ে তথায়

রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। সরকার হাজিপুরের রাজস্ব ছিল ২৭৩৩১০৩০ দাম। খাস হাজিপুরের কর ছিল ৩৮৩৩৭৬০ দাম (আইন-ই-আকবরী)।

এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২২১ পৃষ্ঠা, ইলিয়ট ৫ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা।

হিজলী ঃ

১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাজখান মসনদ-ই-আলী ও তাহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান, সাগর দ্বীপের বিপরীতদিকে রসুলপুর নদীর তীরবর্তী এই স্থানে বাস স্থাপন করেন। তাহাদের বংশধরগণ প্রায় ৮০ বৎসর পর্যন্ত এই স্থানে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালন করেন। ১৬৩০ খ্রিঃ অব্দে এই স্থানে মোগল-বাদসাহের আধিপত্য সংস্থাপন হয়। এই সময়ে তথাকার অধিপতি মসনদ আলী সাহ স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া স্বেচ্ছায় কবর গ্রহণ করেন। ১৬৬০ খ্রিঃ অব্দে ইংরাজ ও দিনমারেরা তথায় বাণিজ্য জন্য কুঠি সংস্থাপন করেন। স্টুয়ার্ট (২০ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন খোজা ঈশা কুতুলখাঁর মন্ত্রী ছিলেন। ইলিয়ট লিখিয়াছেন উকিল। "মখ্জানে আফগানই" গ্রন্থে জানা যায় ঈশা খাঁ কুতুল খাঁর ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু হিজলীর ঈশা খাঁ মছন্দরী কে ছিলেন তাহা নির্দেশ করিতে পারিলাম না। বর্তমান সময়ে হিজলী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। উহার পাঁচ মাইল দূরে খিজিরী নামে একটি গ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।
এশিয়াটিক জার্নেল ১৭৭৩।২২৫ পৃষ্ঠা।

হাতীয়াগড় ঃ

ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকটে। উহা সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মহাল। তাহার নাম ছিল হাতীকুণ্ড। রাজস্ব ছিল ৫৫৭০২ দাম (আইন-ই-আকবরী)। উহার উত্তর পূর্বে বরিটার্টি ও মেদিনীমল, উত্তর পশ্চিমে পোর্টক্যানিং। মাইহাটি, ধুলীয়াপুর, ভালুকা হইতে কপোতাক্ষ পর্যন্ত। এশিয়াটিক জার্নেল ১৮৭৩।২২৭ পৃষ্ঠা।

১. বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত।

২. "ভেন ডেন ব্রুক্" সেরপুর ফিরিঙ্গি নামক স্থানের বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ধলেশ্বরী নদীর তীরে ঈদ্রাক্পুর নামক স্থানের দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। ইদ্রাক্পুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্তমান মুন্সীগঞ্জ। উপরে যে ইদ্রাক্পুরের কথা লেখা হইল উহা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যবর্তী একটি পরগণা।

৩. ইদিলপুরে প্রাপ্ত সোসাইটির অধিকারে একখানা তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে Baguli, Bittogada এবং Udayamana গ্রাম কেশব সেনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১৩৬ খ্রিঃ) জববদেব (Jovaradev) শর্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে Chandabhanda জাতির উল্লেখ আছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে এই Chandabhanda-ই গোবিন্দরাম কর্তৃক Chattabhatta নামে প্রকাশিত হইয়াছে।
(Vide, J. A. S. B. VII, 40)

তৃতীয় পরিশিষ্ট

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ঃ

ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য যেরূপ বীরপুরুষ ছিলেন, তদনুরূপ পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হন। তদ্‌বিরচিত "বিখ্যাত বিজয়" নামক একখানা নাটকের কথা অবগত হওয়া যায়, উহা অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ অবলম্বনে লিখিত হয়। এই নাটকের সূত্রধর-প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। বীররচিত এই নাটকে বীর-রসের লক্ষণ যে অধিক লক্ষিত হইবে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ কি?

"প্রক্ষাবৎ পরিতোষনিস্তলমহামাণিক্যরত্নাকরঃ।
প্রাক্‌সৎপুরুষপৌরুষোৎকরকথাস্রোতস্বীভূধরঃ।।
দৃপ্যচ্চারণচাতুরীমধুকরীপ্রাগলভ্যপুষ্পাকরঃ।
শ্রীলক্ষ্মণভূপতেরভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ।।
আশ্রয়ো যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধোভূভূজাবদ্ধস্তস্মিন্নৌপয়িকশ্রমঃ।।

শুনা যায় প্রায় এক মন ওজনের একটি কবচ পরিধান করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। উহার কিয়দংশ অদ্যপি বর্তমান আছে। ইহা বড় কম কথা নয়। বর্তমানে এমন কোন বীর আছেন যে অর্ধ মন শরীরে চাপাইয়া, নড়া চড়া করিতে পারেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলরাম রায় ভুলুয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৫৯৭ খ্রিঃ)। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার না করায়, অমর ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া বলরামকে করদানে বাধ্য করেন। অমরমাণিক্য কর্তৃক বাকলা আক্রমণের বিবরণ ও লুণ্ঠনের কথা এই সময়ে অবগত হওয়া যায়।

ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী ঃ

"ঢাকা অতি প্রাচীন সময় হইতে পরিচিত। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি "ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন।" সমতটের পাশাপাশি 'ডবাক' নাম থাকায় উহা বর্তমান ঢাকাকেই বুঝাইতেছে। এতদ্ভিন্ন আইন-ই-আকবরির সরকার বিভাগে 'দুখাবাজু' বলিয়া যে নাম দৃষ্ট হয় তাহাও ঢাকাবাজু।

প্রবাদানুসারে, রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক ঢাকেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। তবে তিনি কোনও প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা ঘটসংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমান ঢাকেশ্বরীর প্রতিমূর্তি মানসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন ইহাই প্রসিদ্ধ কথা।

সাধারণের বিশ্বাস, জয়পুরের শিলাদেবী প্রস্তর দ্বারা নির্মাতা হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়; নবকৃষ্ণবাবু ঐতিহাসিক চিত্রে এতৎসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেই উহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বরং ধাতুময়ী ঢাকেশ্বরীর সহিতই উহার সৌসাদৃশ্য সম্ভব হয়।

হিন্দু দেবমন্দির পূর্বদ্বারী হইতে পারে ঃ

"অথ দ্বারনির্ণয়ঃ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে— গ্রামমধ্যে চ পূর্বে চ প্রত্যগ্দ্বারং প্রকল্পয়েৎ। বিদিশাসু চ সর্বাসু তথা প্রত্যঙ্মুখং ভবেৎ।। দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিমে প্রাঙ্মুখং ভবেৎ।।"

শব্দকল্পদ্রুম, মন্দির শব্দ।

পরগণাতি-সন-সম্বন্ধীয় দলীল ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

স্বহায়

ইয়াদি বারিভূমি জমাশূন্য বিক্রয় পত্রমিদং—শ্রীজয়নারায়ণ সেন সুচরিতেষু শ্রীরামকান্ত শর্মা ওলদে রুদ্রদেব শর্মা ইরণে রামপ্রসাদ শর্মা কস্য লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোনারগাঁও কিসমত ছয় পারা আমার উৎসর্গ দত্ত অনন্তরাম সেন মাপ জমী মহাফিক চিঠা /৪ এক কালী যোল কড়া ভিটি ৬।। গণ্ডা নাল ১৭।। গণ্ডা এই এক কানী যোল কড়া জমি এহার মূল্য ভিটি দর ফি কানী ১২০ রুপাইয়া কাত ৩৯ রূপাইয়া নাল ফী কানী দর ৪৮ রূপাইয়া কাত ৪২ রূপাইয়া একুনে ৮১ একাশী রূপাইয়া জমা শূন্য বিক্রয় করিলাম ইত্যাদি ইতি সন ১১৮৩ এগার শত তিরাশী বাঙ্গালা, পরগণাতি ৫৭৪ পাঁচ শত চৌসত্তরি তারিখ ৯ মাহ চৈত্র।

সম্পূর্ণ।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ
ও
বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ

শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র কর্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে,
শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৭৯৭ শক।
(1875)

বিজ্ঞাপন

স্বজাতি-স্নেহ যে স্বভাবত অন্তকরণকে অধিকার করে, ইহা বলা বাহুল্য, আমি সেই স্নেহের বশবর্তী হইয়া অনেকদিন অবধি প্রাচীনদিগের নিকট আমাদের বঙ্গজ কায়স্থ জাতির পূর্ব বৃত্তান্ত উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিতাম। ক্রমশ সেই বৃত্তান্ত আরো অধিকতর রূপে অবগত হইতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। ইত্যবসরে আমাকে রাজকার্যোপলক্ষে ঢাকা, বাকরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নওয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যেখানে যাইতাম, সেখানকার অন্যান্য বিষয়ের সহিত কায়স্থ জাতির পূর্বতন কীর্তিকলাপের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতাম এবং যাহা জানিতে পারিতাম, তাহা লিখিয়া রাখিতাম। যদি তৎকালে আমার এইরূপ পুস্তক প্রকাশের অভিলাষ থাকিত এবং দৈনন্দিন রাজকার্য সাধনের পর যথেষ্ট অবকাশ পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ওই সকল বৃত্তান্ত আরো অধিক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু তখন আমার এইরূপ পুস্তক প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল না ; যথেষ্ট অবকাশও ছিল না। কেবল স্বাভাবিক অনুরাগ বশত পিতৃপুরুষদিগের বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক হইয়া, যতদূর পাইলাম, তদ্বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই বঙ্গজ কায়স্থ জাতির কতকগুলি বিবরণ মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, এমন অবস্থায় ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস্ ওয়াইজ সাহেব মহোদয়ের এই পত্র প্রাপ্ত হইলাম—

My dear Babu,

Previous to the settlement of Bengai. in the reign of Akbar, there were five Bhuyans or landholders in this part of the country. Their names were —

1. Isakhan, Masnud Ali of Kesrapur.

2. Kundurp Rai of Chunder Deep. (There is, I understand, a Pergannah of this name in Backergunge.)

3. Luckken Manik of Beluah, (Bhulloah.)

4. Chand Rai and Kedar Rai of Bickrampur.

5. Chand Ghazi of Chand-pertap.

I would be much obliged if you would ascertain, if the descendants of any of these Zemindars are still alive, if they possessed any pedigree, sanud, or deed from any of the kings of Delhi, or if any tradition exists regarding any of them. I am informed that in Chunder Deep a family, still honored with the title of Rajah, is to be found. It may be Kundurp Rai's family.

Chand Rai and Kedar Rai erected the Tower at Rajah Baree. There is a tank some where in Bickrampore that goes by their name.

If you can pick up any information about these families, it will be invaluable as tending to elucidate a most obscure part of Bengal History.

3-6-72

Your's faithfully,
JAMES WISE

তাহার এই পত্র প্রাপ্তে উৎসাহান্বিত হইয়া আমি উক্ত বিষয় সকলের কতকগুলি বিবরণ সাধ্যমত তাহাকে লিখিয়া দিলাম। তৎপরে আমার এই বৃত্তান্ত প্রকাশের ইচ্ছা জন্মিল। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া আমি পূর্ব সংগৃহীত উপাদান লইয়া এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। ইত্যবসরে বাকরগঞ্জের কোন প্রধান ইওরোপীয় রাজ কর্মচারি চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্ত্যাদি সম্বন্ধে যে যে বিবরণ উপরোক্ত ডাক্তার সাহেবকে প্রেরণ করেন, তাহাও আমার হস্তে আসিল এবং উক্ত প্রণয়ন কার্যে আমার সহকারিতা করিল।

ভরসা করি, এই পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকবর্গের কৌতূহলজনক হইবে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বংশের লোকে এই রূপে তাহাদের পূর্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তাহা বঙ্গদেশের ভাবী পুরাবৃত্ত লেখকের অনেক উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। আরো বিবেচনা করি, প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রদেশের ইতিবৃত্তে এমন সকল বিষয় আছে, যাহা বড় বড় পুরাবৃত্তের ন্যায় কৌতূহলজনক ও উপকারি হইতে পারে।

পরিশেষে ইহা ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু এই পুস্তক রচনা বিষয়ে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ঢাকা
১লা চৈত্র ১৭৯৬ শক

শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে বঙ্গদেশের অধিপতি রাজা আদিশূর[১] পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ৯৯৯ শকাব্দায় কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ পাঁচজন ব্রাহ্মণ[২] আনয়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। এই সকল কায়স্থের নাম—

(১) মকরন্দ ঘোষ,

(২) পূষণ বসু অথবা দশরথ বসু,

(৩) বিরাট গুহ অথবা দশরথ গুহ,

(৪) কালিদাস মিত্র অথবা তারাপতি মিত্র,

(৫) পুরুষোত্তম দত্ত।

ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে রাজা আদিশূরের যজ্ঞ সমাপন হইলে কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা স্বদেশে পতিত ব্রাহ্মণ বোধে অপরিগৃহীত হওয়াতে স্বীয় স্বীয় কলত্র সমভিব্যাহারে লইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক এই দেশে বসতি করেন। ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারি কায়স্থগণেরও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। যখন যাহারা ব্রাহ্মণগণের সহিত পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তাহাদের সহিত নাগ নাথ ও দাস উপাধিধারী আর তিনজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, ইহা ঘটকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু নাথ উপাধিধারী কায়স্থ এক্ষণে বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয় না।

রাজা আদিশূরের রাজধানী বর্তমান জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর পরগণায় রাজাপুর নামে খ্যাত ছিল। ওই স্থান এক্ষণে রামপাল নামে খ্যাত। এক্ষণে সে রাজধানীর পূর্ব অস্তিত্বের স্মরণীয় কয়েকটি চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।[৩]

মিশ্রগ্রন্থে উল্লিখিত আছে, আদিশূর উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচখানি গ্রাম বসতি করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত রামপালের নিকটবর্তী যে পঞ্চসার নামক এক প্রাচীন বৃহৎ গ্রাম আছে, কেহ কেহ বলেন, ওই গ্রাম তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল, উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ সেই পাঁচ গ্রামে বসতি করিতেন। কেহ বলেন, রাজধানীর নিকটেই সেই সকল গ্রাম ছিল বটে, কিন্তু কোন্ সকল গ্রাম তাহা নিশ্চয় নাই। ঘটক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ওই পাঁচখানি গ্রামের এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; (১) পঞ্চকোটি, (২) কামকোটি, (৩) হরিকোটি, (৪) কঙ্কগ্রাম, (৫) বটগ্রাম[৪]। কিন্তু রাজা কায়স্থদিগকে কোথায় স্থান দিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কথিত ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন গোত্রীয় ছিলেন. কায়স্থগণেরও গোত্র ভিন্ন ভিন্ন ছিল। মকরন্দ ঘোষ সৌকালিন গোত্রীয়, পূষণ বসু গৌতম গোত্রীয়, বিরাট গুহ কাশ্যপ গোত্রীয়, কালিদাস মিত্র বিশ্বামিত্র গোত্রীয়, পুরুষোত্তম দত্ত মধুকুল্য গোত্রীয়।[৫]

এই পাঁচজন কায়স্থের আগমনের পূর্বেও যে এদেশে কায়স্থ জাতীয় বহুসংখ্যক লোক ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহারা কোথায় বসতি করিতেন, তাহা জানা যায় না ; এবং কান্যকুব্জ হইতে আগত উক্ত কায়স্থগণ প্রথমে যে তাহাদিগের সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

কান্যকুব্জ হইতে দ্বিতীয়বার আগমনকালে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কায়স্থগণও তাহাদের পত্নীগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ঐ সকল পত্নীর গর্ভে তাহাদের সন্তানোৎপাদন হইয়া বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

আদিশূরের মৃত্যুর পর বল্লাল সেন তাহার সিংহাসন অধিকার করেন।[৬] তাহার অধিকারকালে উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল। তিনি তাহাদিগের জ্ঞান, গুণ ও কর্ম অনুসারে তাহাদিগকে মর্যাদা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং যাহাদিগের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান প্রভৃতি মর্যাদোচিত গুণ দর্শন করিলেন, তাহাদিগকে তিনি কুলীন পদবাচ্য করিলেন।

বল্লাল সেন উপরোক্ত কায়স্থগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, কতকগুলিকে রাঢ়দেশে ও কতকগুলিকে বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তদবধি তাহাদের মধ্যে বঙ্গবাসী কায়স্থগণ "বঙ্গজ" ও রাঢ় দেশীয় কায়স্থগণ "রাঢ়ীয়" এই দুই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কোন সময়ে কায়স্থগণ এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহার ঠিক নির্ণয় হয় না। বোধ হয়, খ্রিস্টের একাদশ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই উপলক্ষে কতকগুলি কায়স্থ বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া গেলেন ; কতকগুলি বঙ্গেই রহিলেন। যাহারা বঙ্গে রহিলেন, তাহাদের নাম ও পরিচয় এই––মকরন্দ ঘোষের পুত্র শুভাশিব ঘোষ ; পূষন বসুর পুত্র দিবাকর বসু ; বিরাট গুহের পুত্র নারায়ণ গুহ ; কালিদাস মিত্রের পুত্র গোট মিত্র এবং পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র অর্ক দত্ত। ইহাদিগকেই বঙ্গজ কায়স্থদিগের মূল পুরুষ বলা যাইতে পারে।

বল্লাল সেন যে কুলমর্যাদার নিয়ম করিয়া ছিলেন, তদনুসারে উক্ত বঙ্গজ কায়স্থদিগের প্রথমোক্ত চারিজন[৭] কুলীন ও শেষোক্ত ব্যক্তি মধ্যল্য অথবা মৌলিক এইরূপ মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কী বঙ্গজদিগের মধ্যে, কী রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে দত্ত বংশীয়েরা কোথাও কৌলিন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই; এবং কী বঙ্গদেশে কী রাঢ় দেশে সকল কায়স্থেরই মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যখন কায়স্থদিগকে কুলমর্যাদা প্রথম প্রদান করা হয় তখন "আমরা ব্রাহ্মণদিগের দাস" এইরূপ তাহাদিগকে স্বীকার করাইয়া লওয়া হয়। আর সকল কায়স্থেরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু দত্ত বংশীয়েরা তাহা স্বীকার করেন নাই। "তোমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য কি না" ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহারা এইরূপ উত্তরও দিয়াছিলেন—

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় শুন মহাশয়।
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি, এই পরিচয়।।"[৮]

এইরূপে বঙ্গজ কায়স্থগণ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জেলা বাকরগঞ্জের অন্তঃপাতী চন্দ্রদ্বীপে এক সমাজ স্থাপন করেন। তৎকালে বাকরগঞ্জ জেলার সেলিমাবাদ পরগণা ভিন্ন আর সকল পরগণা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত এবং তখন তাহার "বাকলা চন্দ্রদ্বীপ" এই নাম ছিল।[৯]

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জ হইতে কায়স্থগণ আসিবার পূর্বেও বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতীয় অনেক লোক ছিলেন। উক্ত নবাগত কায়স্থগণ তাহাদের সহিত প্রথমত কোন সংস্রব রাখেন নাই। পরে তাহাদিগের নিম্ন পুরুষেরা ওই সকল কায়স্থের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যৎকালে বঙ্গজ কায়স্থেরা চন্দ্রদ্বীপে সমাজ স্থাপন করেন, তৎকালে এ দেশের আদিম নিবাসী দনুজমর্দন দে নামক ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে বংশীয় এক ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপের ভূম্যধিকারী ছিলেন। কায়স্থগণ তাহাকেই আপনাদের সমাজপতিরূপে বরণ করিলেন। ঘটকদিগের গ্রন্থে তিনি রাজা দনুজমর্দন দে নামে উক্ত হয়েন। ক্রমে এই চন্দ্রদ্বীপের সমাজ অতি মাননীয় হইয়া উঠিল এবং কায়স্থদিগের পক্ষে উহা শিরস্থানরূপে পরিগণিত হইল। "চন্দ্রদ্বীপং শিরঃস্থানং যত্র কুলীন মণ্ডলং।"

বাকরগঞ্জের কোন ইউরোপীয় প্রধান রাজকর্মচারি ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস্ ওয়াইজ সাহেবকে চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদের কথা লিখিয়াছেন—

বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি "ভগবতী" মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। দৈবযোগে এমন ঘটিয়াছিল, তিনি যে কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহারও নাম ভগবতী। তিনি প্রথমত তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে যখন তাহা জানিলেন, তখন চমকিত ও শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি, আমি কি ইষ্টদেবতার ব্যপদেশে পত্নীর নাম জপ করিয়া থাকি? লোকে কি আমাকে পত্নী-উপাসক বলিবে? অথবা আমি কেমন করিয়াই বা সেই স্ত্রীকে পত্নী বলি, যে আমার ইষ্টদেবতার নাম ধারণ করে? এইরূপ চিন্তা হেতু তিনি স্থির করিলেন, বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি এই দুষ্কর্ম আর করিব না। এইরূপে নির্বেদ পরতন্ত্র হইয়া তিনি নৌকারোহণ পূর্বক সমুদ্র যাত্রা করেন। তৎকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সমুদ্র প্রসারিত ছিল। দিগন্ত বিস্তারিত সমুদ্রে কাহারো সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই ; চন্দ্রশেখর একাকী একদিন এক রাত্রি নৌকা বাহিয়া চলিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি হঠাৎ দেখিলেন, এক ক্ষুদ্রতর নৌকাতে এক ধীবর কন্যা স্বয়ং ক্ষেপণী সঞ্চালনপূর্বক সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া কি সাহসে একাকিনী এই অকুল সমুদ্র মধ্যে আগমন করিলে?" কন্যা উত্তর করিল, "আমি আমার ব্যবসার বশে সমুদ্রোপরি সঞ্চরণ করি, আমার ইহাতে ভয় নাই। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ ও ভূম্যধিকারী হইয়া কিরূপে এখানে আগমন করিলেন?" চন্দ্রশেখর তাহাকে তাহার অন্তরের ক্লেশের বিবরণ বলিলেন। তৎশ্রবণে কন্যা হাস্যপূর্বক ভর্ৎসনা বাক্যে কহিল, "ব্রাহ্মণ! তুমি কি নির্বোধ ও মূর্খ! তুমি কি জান না যে, শক্তিরূপিণী কালী সকল স্ত্রীর মধ্যে বিরাজ করেন? তবে তোমার স্ত্রীর নামের সহিত কালীর নামের সমতা দেখিয়া তুমি এত ভীত হও কেন?" চন্দ্রশেখর সামান্য ধীবর কন্যার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে আশ্চর্যান্বিত ও উদ্ভ্রান্ত হইলেন এবং সেই কন্যাকে মায়ারূপিণী ভগবতী জ্ঞান করিয়া স্বীয় যান হইতে ঝম্প প্রদান পূর্বক তাহার তরণীতে উঠিলেন। তিনি একেবারে তাহার পদদ্বয় ধারণ পূর্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা কিছুক্ষণ আপনাকে ধীবর কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিতে লাগিলেন ; কিন্তু চন্দ্রশেখর কোন মতে ভুলিলেন না। পরে তাহার নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে কন্যা বরদা হইয়া পরিচয় দিলেন, "আমি তোমার ইষ্টদেবতা ভগবতী।" অনন্তর তিনি তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপ হইবে, তিনি সেই স্থান অধিকার করিবেন এবং তাহার নামে সেই দ্বীপের নামকরণ হইবে। এই বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থান চররূপে পরিণত হইল।

আর এক প্রবাদ এই—

চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। দনুজমর্দন দে নামক তাহার এক শিষ্য ছিল। তাহার সমভিব্যাহারে তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিবস রাত্রিতে তিনি নৌকায় নিদ্রিত আছেন এমন সময় স্বপ্নযোগে কালী দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে বলিলেন, এই জলতলে কতকগুলি দেবমূর্তি নিহিত আছে, তুমি তৎসমুদায় উদ্ধার কর। তদনুসারে পরদিন তিনি তাহার শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলিলেন ; প্রতি ডুবে তিনি এক একটি দেবমূর্তি উত্তোলিত করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি চতুর্থবার ডুবিলেন না, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্মীর মূর্তি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। লক্ষ্মীর মূর্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার রাজ্যলক্ষ্মী চিরস্থায়ী হইত। (মাধবপাশার রাজবাটিতে ওই সকল উদ্ধারিত দেবমূর্তি বর্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি মূর্তির নাম কাত্যায়নী ও একটির নাম মদনগোপাল। চন্দ্রশেখর তাহার শিষ্যের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেন যে, ঐ স্থান শুষ্ক হইয়া চর হইবে এবং তিনি (ঐ শিষ্য) তাহার রাজা হইবেন। তিনি শিষ্যকে ইহাও আদেশ করিলেন যে, ঐ স্থানের নাম তাহার (চন্দ্রশেখরের) নিজের নামানুসারে অবধারিত হইবে।

কোন্ সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয় ও রাজা দনুজমর্দন দে তাহার অধিপতি হয়েন, তাহা ঠিক জানা যায় না। বোধহয়, রাজা বল্লালসেনের কিছুকাল পরেই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কারণ, দেখা যায়, প্রথমাবধি এ পর্যন্ত ১৮ জন রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন এবং কায়স্থদিগেরও ২২।২৩।২৪ পর্যন্ত পর্যায় অর্থাৎ বংশ সাধারণত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের পদ বা স্থান কিরূপ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে মুসলমানগণ বঙ্গদেশের পূর্বাংশ অধিকার করেন, তৎকালে এদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজা ছিলেন। মোঘলকুলরত্ন আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ১২ জন রাজা ভুঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গঙ্গা ও ভাগীরথীর পূর্ব ও উত্তরদিকস্থ সমুদায় স্থান সেই ১২ ভুঁইয়ার রাজ্য ছিল। এই ১২ জন ভুঁইয়ার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি এক ভুঁইয়া ছিলেন। বারভুঁইয়ার পরিচয় এই—(১) চন্দ্রদ্বীপে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ;

(২) যশোরে রাজা প্রতাপাদিত্য ;

(৩) ভুলুয়ায় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য ;

(৪) বিক্রমপুরে চাঁদরায়, কেদার রায় ;[১০]

(৫) পঃ চাঁদপ্রতাপে চাঁদগাজি ;

(৬) ভূষণায় মুকুন্দ রায় ;

(৭) খিসরপুরে ইসা খাঁ মসনদ আলি ;[১১] (ইসাখাঁর সন্তানগণ জঙ্গলবাড়ি ও হয়বৎ নগরে বাস করেন।)

(৮) পঃ ভাওয়ালে ফজল গাজি ;[১২]

(৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ ;[১৩]

(১০) রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতি পুটিয়ার রাজা ;[১৪]

(১১) রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতি তাহীরপুরের রাজা ;[১৫]

(১২) দিনাজপুরের রাজা।[১৬]

এই সকল ভুঁইয়া অথবা রাজা মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভকালে কখন তাহাদের বশীভূত ও কখন বা স্বাধীনতাচারী হইতেন। যখন বশীভূত হইতেন তখন তাহারা নবাবকে কিঞ্চিৎ রাজস্ব মাত্র প্রদান করিতেন। কিন্তু রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় সমুদায় ক্ষমতাই তাহাদের কর্তৃত্বাধীন থাকিত। তাহাদের সৈন্য, গড়, বিচারালয়াদি রাজত্বের সকল লক্ষণই ছিল। পরে যখন তাহারা মুসলমানদিগের একান্ত বশীভূত হইলেন, তখনও তাহারা সেই সকল রাজ লক্ষণহীন হয়েন নাই। তখন সময়ে সময়ে তাহারা নবাবের পক্ষ হইয়া সৈন্য গজ কামান ও নৌকা প্রভৃতি দ্বারা নবাবের সহায়তা করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে বরাবর অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন।

পূর্বোক্ত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব রোম দেশীয় কোন পর্যটকের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন যে, বাক্‌লা (অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপ) নামক স্থানে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি সেই পর্যটকের সম্বর্ধনা করেন। পর্যটক সেই গ্রন্থে উক্ত রাজাকে নম্র, সুশীল ও প্রিয়ম্বদ বলিয়া কীর্তিত করিয়াছেন এবং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার দেশে স্ত্রীগণ হস্তে শঙ্খ (ব্রেসলেট) পরিধান করিতেন ; রাজার সৈন্যদিগেরও বিচিত্র পরিচ্ছদ ছিল।

যে সকল কায়স্থকে লইয়া এই চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজ স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে যেরূপ মর্যাদা ও আদানপ্রদান প্রভৃতির নিয়ম অবধারিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথমত কায়স্থগণের শ্রেণীসংখ্যা ও তাহাদের ভাবের বিষয় কথিত হইতেছে।

১	২	৩	৪
বসু	ঘোষ	গুহ	মিত্র

এই চারিজন কুলীন। ইহারা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের কুলের নিয়ম পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

৫	৬	৭	৮
দত্ত	নাগ	নাথ	দাস

এই চারি জন মধ্যল্য। ইহাদের সর্বথা কুলকার্য অর্থাৎ কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান আবশ্যক। কতকগুলি মধ্যল্য এরূপ নির্দিষ্ট হইলেন যে, তাহাদিগের সহিত যদি কুলীনগণ আদান প্রদান করেন, তাহাতে তাহাদের কুলের কোন হানি হয় না। এরূপ মধ্যল্য তাহাদের "বিশ্রাম স্থল" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

৯	১০	১১	১২
সেন	সিংহ	দে	রাহা

এই চারিঘর মহাপাত্র। ইহাদিগের অবিচ্ছিন্নরূপে কুলকার্য হওয়া উচিত। ইহাদিগের সহিত আদান প্রদান করিলে কুলীনদিগের মর্যাদার কিঞ্চিৎ হানি হয়, কিন্তু কুল নষ্ট হয় না।

এই বার ঘর এবং পশ্চাল্লিখিত পনর ঘর, যথা—

১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
কর	দাম	পালিত	চন্দ	পাল	ভদ্র	ধর	নন্দী
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
কুণ্ড	সোম	রক্ষিত	কুরু	বিষ্ণু	আদ্য	নন্দন,	

এই সাতাইশ ঘর কায়স্থকে কায়স্থশ্রেণীর মধ্যে প্রথম গণনা করা হয়।[১৭] এতদ্ভিন্ন আর চৌষট্টি ঘর কায়স্থ আছে, তাহারা নিকৃষ্ট কায়স্থ রূপে গণ্য। তাহাদের নাম এই—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেতু	সাই	সিল্প	সর্ম	খর্ম	সুর	শাম	পাহি	বিদি	হোর
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
আদিত্য	ভূয়	বর্ধন	লধ	লোধ	বিধি	বিদ	গুণ	বল	বর
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ধীর	ব্রহ্মা	আইচ	ভুঞ্জ	ভৃতক	নাহা	কুন্দ	ক্রন্দ	সুবুদ্ধিদ	হীরা
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ইর্ষা	নন্দ	চম্পক	অম	শুক	অনো	হন	হরি	শুশ্চ	কুশ
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
ক্রুঞ্চ	মাঝি	রাহুত	রাজক	আখণ্ড	মুটেক	সাধু	গর	পানি	হদেশ
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
সুত	শুক্ত	অন্য	রধ	রাধ	মালি	হাতি	বধ	শ্যাম	অঞ্জ
৬১	৬২	৬৩	৬৪						
ভঞ্জ	সির্ছা	বির্ছা	রুদ্র						

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল প্রকার কায়স্থের পরিচয় ঘটকদিগের গ্রন্থে এই পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন আর কতকগুলি উপাধিকারী কায়স্থ বর্তমান রহিয়াছে। তাহাদিগকে গণনার বহির্ভূত বলিতে হইবে।[১৮]

এই শেষোক্ত চৌষট্টি ঘর কায়স্থ অপকৃষ্ট কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত। কুলীনগণ ইহাদিগের সহিত আদান প্রদান করিলে তাহাদের কুল নষ্ট হইয়া যায়। ঘটকদিগের পুস্তকে এরূপ লিখিত

আছে যে, উক্তরূপ কার্য করিলে কুলীনগণ অচৈতন্য মোহভাব প্রাপ্ত হয়েন ও কুলভ্রষ্ট হয়েন।[১৯]

বঙ্গজ শ্রেণীস্থ কায়স্থগণের কুলের প্রধান প্রধান নিয়ম সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

(১) কুলীনের সকল সন্তানই পিতার তুল্য কুলীন গণ্য হয়েন।

(২) কুলীনের পোষ্যপুত্র কুলীন নহেন।

(৩) কুলীনের পোষ্যপুত্রকে যদি অপর কুলীন কন্যা দান করেন, তাহাতে যে দোষ স্পর্শে, তাহা শত কুলকার্য দ্বারাও খণ্ডন হয় না।

(৪) যে সকল কুলীন ক্রমাগত কেবল কুলীনের সহিতই আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের কুল "গঙ্গাশ্রুত" কুল নামে খ্যাত।

(৫) কুলীনগণ পর্যায় অনুসারে আদান প্রদান করিবেন ; পর্যা-বিপর্য্যয় হইলে কুলভঙ্গ হয়।[২০]

(৬) যে সকল কুলীন স্বীয় পর্যায়ক্রমে পাত্র বা পাত্রী না পাইবেন, কুলজ[২১] অথবা মধ্যল্য তাহাদের বিশ্রামস্থল। তাহারা উহাদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন—নিতান্ত অগত্যা মহাপাত্রদিগেরও সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন। যদি তাহাদের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত কেহ কুলীনে দানও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের কুল বজায় থাকিবে।

(৭) কুলীনগণ যখন কুলীনদিগের সহিত কার্য (আদান প্রদান) করেন, তখন অবস্থা অনুসারে তাহাদের সেই কার্যের "আত্ম", "উচিত", "গৃহ", "করি" এই চারি ভাব হয়। যখন তাহারা কুলজের সহিত কার্য করেন, তখন তাহাদের সেই কার্যের "উপ" ভাব লেখা যায়। যখন তাহারা মধ্যল্যের সহিত কার্য করেন, তখন "ক্ষম" ভাব লিখিত হয়। যখন তাহারা মহাপাত্রের সহিত কার্য করেন, তখন তাহা "অপ" ভাব লেখা হয়। ছোট কুলীন যদি বড় কুলীনের সহিত কার্য করেন, তাহা হইলে ছোট কুলীনের পক্ষে ওই কার্যের "সৎ" ভাব হয়। কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র, ইহারা কুলীনের সহিত কার্য করিলে তাহাদের পক্ষে সেই কার্যের "সৎ" ভাব গণ্য হয়।

(৮) কুলীনগণ যদি তিন পুরুষের মধ্যে কুলীনের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া পুরুষানুক্রমে অপসম্বন্ধ করে, তাহা হইলে তাহারা কুলচ্যুত হইয়া হীন হয়েন। কুলীনগণ তাহাদিগের সহিত আদান প্রদান করিলে তাহাদের সেই সম্বন্ধ অবস্থানুসারে কুলীনের পক্ষে অপ ও অত্যপ সম্বন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

(৯) কুলীনের তিন পুরুষ পর্যন্ত যদি দৌহিত্র দোষ জন্মে অর্থাৎ তিন পুরুষ মধ্যে যদি এক পুরুষেরও মাতামহ কুলীন না হয়, তাহা হইলে কুলে দোযস্পর্শ হয়।

কায়স্থ-সমাজ-পতি চন্দ্রদ্বীপাধিরাজ আপনার সমাজের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ (মুন্সিগঞ্জের নিকট হইতে এই নদী মেঘনা নামে বিখ্যাত) ; উত্তর সীমা ঢাকা জেলাস্থ ইছামতী নদী ; পশ্চিম সীমা তেলিহাটি পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণা ; দক্ষিণ সীমা সমুদ্র। এইরূপ নিয়ম হয় যে, এই সকল সীমার বাহিরে ছোট বাজু, বড় বাজু, ঘোড়াঘাট, ফতেয়াবাদ, তেলিহাটি, সেলিমাবাদ, এই সকল স্থানে কুলীনগণ বাস করিলে তাহাদের কুল থাকিবে না।[২২] এই সীমার মধ্যেও কোন কোন স্থান—যথা বিক্রমপুরে বেজগ্রাম, চতুর্মণ্ডল, চাঁদনী প্রভৃতি ও চন্দ্রদ্বীপে কোন কোন স্থান এরূপ নির্দিষ্ট হইল যে, তথায় বাস করিলেও কায়স্থগণের কুল নষ্ট হইবে। পরন্তু ওই সকল বর্জিত স্থানের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার ব্যতীত অন্য কোন বর্জিত স্থানে বাস করিয়া যদি কোন কুলীন আপন কুল নষ্ট করেন, কিন্তু যদি তিনি পুরুষানুক্রমে কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করেন, তবে তিনি অপেক্ষাকৃত মাননীয় হইয়া "কুলজ" আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। বল্লালী সম্বন্ধে রামানন্দ মিশ্রের গ্রন্থের নিম্নলিখিত বচন এই শেষোক্ত নিয়মের প্রমাণ।

ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোহপি তৎকুলৈঃ কথ্যান্ত কুলভূষণৈঃ।
কুর্যাচ্চেৎ কুলকর্মাণি তত্র কুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতো কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ।

উক্ত রামানন্দ মিশ্রের গ্রন্থের আর এক বচন এই—

ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
নৃপতীনাং পদং প্রাপ্য স্বস্থানঞ্চ নিবাসিনঃ।
কুর্যাচ্চেৎ কুলকর্মাণি কায়স্থাঃ স্বান্নভোজিনঃ।
কুলজাশ্চ ইতি খ্যাতাঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ।

এই বচনটি চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান মিত্রবংশোদ্ভব রাজার প্রতি বর্তিয়াছে। ঐরূপে আর যে ব্যক্তি ঐ সকল বর্জিত স্থানবাসী হইবেন এবং পুনরায় স্বস্থানে অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপে গিয়া উক্ত রাজপদ পাইবেন, তাহার প্রতি বর্তিবে, অপর কাহারও প্রতি বর্তিবে না। কারণ, কায়স্থদিগের গণনীয় স্বস্থান কেবল চন্দ্রদ্বীপ এবং কায়স্থদিগের গণনীয় রাজা বা সমাজপতি কেবল চন্দ্রদ্বীপের রাজা।

এই সীমা নির্ধারণ হইবার কিছুকাল পরে যশোরে বঙ্গজ কায়স্থগণের আর এক সমাজ স্থাপন হয়। তাহাতে বঙ্গজ কায়স্থগণ সেখানেও বিস্তারিত হইয়াছেন। সীমা সম্বন্ধে চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিয়ম সে সমাজের প্রতি খাটে নাই।

চন্দ্রদ্বীপ সমাজের পূর্ব সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে একটি পূর্ব ইতিহাস বা জনশ্রুতি আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হয়।

প্রায় সমস্ত আর্যাবর্তে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দেশ ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়া বঙ্গদেশের কতক দূর আইসেন ; তাহার পরবর্তী দেশের কোন কোন দোষ দর্শন করিয়া তথা হইতে তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। যে সকল দেশে পাণ্ডবগণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশ পবিত্র বলিয়া গণ্য ; যে সকল দেশে তাহারা পদার্পণ করেন নাই, তাহা "পাণ্ডববর্জিত দেশ" বলিয়া হিন্দুদিগের ঘৃণার্হ বোধ হয়। সেই সকল দেশ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার স্থিত। তৎসম্পর্কে জনশ্রুতি এই—

পাণ্ডবগণ বনবাসকালে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পারে লাঙলবন্দ[২৩] নামক স্থানের নিকটে আসিয়া প্রথমে ভীমকে পরপারে পাঠাইয়া দেন। ভীম পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই যুধিষ্ঠিরাদিকে শ্যালক বলিয়া সম্বোধন করে। তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ চমকিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, দেশগুণে ভীমের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহারা কোন প্রকারে ভীমকে সেই পার হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাহাদের প্রত্যাগমনের এই কারণটি সম্পূর্ণ সত্য হউক বা না হউক, পঞ্চপাণ্ডবের এই স্থান পর্যন্ত আগমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন নিঃসংশয়িত সত্য।[২৪] সেই কারণে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার "পাণ্ডব বর্জিত দেশ" বলিয়া চিরদিন হিন্দুদিগের ঘৃণার্হ হইয়া রহিয়াছে। রাজা বল্লাল সেন যে সকল লোককে মর্যাদা দিয়া শ্রেষ্ঠ পদবিতে আরূঢ় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উক্ত স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়া তাহাদের বাসস্থানের পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার পর্যন্ত নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বল্লালী প্রথা উত্তরে রঙপুর, দিনাজপুর ও পশ্চিমে বর্ধমান ও মেদিনীপুর পর্যন্ত দৃষ্ট হয় ; কিন্তু উক্ত নদের পূর্ব পারে আদৌ দৃষ্ট হয় না। ওই সংস্কারক্রমে পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজাও তাহার সমাজের পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

দুইটি স্থলে এই সীমা ভঙ্গ করিয়া কার্য করা হইয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করা উচিত।

ব্রহ্মপুত্র নদের ঐ পূর্ব পারস্থিত ভুলুয়ার পূর্ব জমিদার শূরবংশীয়গণ এবং পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপের রাজার বিশেষ বর্জিত স্থানবাসী আদিত্য বংশীয়গণ কায়স্থশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ও ঘটকদিগকে বিস্তর অনুরোধ ও প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত সমাজপতি তাহাদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছিলেন।

এস্থলে ইহাও বিদিত থাকা আবশ্যক যে, পূর্বে যে সকল কায়স্থের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে শেষোক্ত নিকৃষ্ট কায়স্থ সম্প্রদায়ের কতকগুলি ওই পাণ্ডব বর্জিত ও কায়স্থ সমাজ বর্জিত স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পারস্থিত মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ভুলুয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। তাহারা বল্লালী সম্প্রদায়চ্যুত। তাহারা চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অতি নিকৃষ্ট কায়স্থ রূপে পরিগণিত হইত। এই দেশ হইতে সে দেশে গিয়া তাহারা এ দেশীয় কায়স্থদিগের নিকট আরও নিকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়া থাকে। মৈমনসিংহের পূর্ব ভাগ, ত্রিপুরা জেলার উত্তর ভাগ ও শ্রীহট্টের এবং চট্টগ্রামের কায়স্থগণ বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকে। যখন নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হয়, তখন শ্রীহট্টের কায়স্থগণ সাহা (শুঁড়ি) দিগকেও কন্যাদান করিয়া থাকে। সাহাগণ তাহা তাহাদের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় জ্ঞান করে।

চন্দ্রদ্বীপের সমাজ স্থাপন হইলে সমাজাধিপতি কতকগুলি ব্রাহ্মণের উপর দুইটি কার্যের ভারার্পণ করেন। সেই দুইটি কার্য নিবন্ধন তাহারা ঘটক বা কুলাচার্য ও স্বর্ণামাত্য এই দুই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। (কেহ কেহ বলেন, ঘটক বা কুলাচার্য পদ বল্লাল সেন প্রদান করিয়া যান।) ঘটকদিগের প্রতি এই ভার অর্পিত হইল যে, তাহারা কায়স্থদিগের বর্ধনশীল বংশাবলী, তাহাদের বিবাহের সংখ্যা—কে উৎকৃষ্ট বংশে কে নিকৃষ্ট বংশে বিবাহ করেন, এই সমুদায় পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন এবং রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কায়স্থদিগের কুলকার্যাদির বিবরণ বিশেষরূপে রাজসমীপে নিবেদন করিবেন। স্বর্ণামাত্যদিগের উপর এই ভার অর্পিত হইল যে, তাহারা রাজসভায় অথবা ভোজনার্থ রাজনিমন্ত্রণে আগত কায়স্থদিগের ভোজনস্থলে মর্যাদানুসারে কায়স্থদিগের, কেহ রাজার নিকটে কেহ তাহার পরে, এইরূপ স্থান নির্ণয় করিয়া দিবেন। প্রথম স্বর্ণামাত্যগণ ঘটকদিগের পুস্তক দেখিয়া কায়স্থদিগের এই মর্যাদার ক্রম নির্ণয় করিতেন, পরে তাহারা আপনারাই ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থদিগের বিবাহাদি বিষয়ের এক পুস্তক রাখিতে লাগিলেন। এই দুই পদ ও তাহার কার্য এখনো চলিত রহিয়াছে।

কায়স্থগণ যে রাজবাড়িতে ভোজন করিবেন, তাহার নিমিত্ত রাজার চিল্‌ছতর্ বা চিল্‌ছত্র নামে এক বৃহৎ গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজার আসন থাকিত ; তন্নিকটে কুলীনগণ বসিতেন ; এবং তাহার পর কুলজ, মধ্যল্য মহাপাত্র ও অন্যান্য কায়স্থগণ ক্রমান্বয়ে চতুস্পার্শ্বে বসিতেন। এখনো সেই বৃহৎ গৃহ (কতক ভগ্নাবস্থায়) আছে। তন্মধ্যে ওই নিয়মে এখনো কায়স্থগণ ভোজন করিয়া থাকেন।

চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ কোন কায়স্থের স্বীয় পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাহাকে বিবাহের পূর্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমাধ্যস্থ দিতে হইত। যদি কোন কুলীন কায়স্থ রাজার অনুমতি বিনা ঐ কার্য করিতেন, তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজার খাসখাল নামক কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে রাজসমীপে উপস্থিত করিত। রাজা বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিতেন।

রাজা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণাদিগকে "নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে এবং কুলীন কায়স্থদিগকে "শ্রী অমুক—সানুগ্রহপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে" এই পাঠে পত্র লিখিয়া থাকেন। উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ উক্ত রাজাকে পত্র লিখিবার সময় "আৰ্দ্দাশ শ্রী অমুক—নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে পত্র লিখিয়া থাকেন। কায়স্থগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলে কুর্নিশ অর্থাৎ ললাট দেশে হস্তস্পর্শ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করেন। বহুকাল হইতে এই রীতি প্রচলিত আছে।

চন্দ্রদ্বীপে প্রথমত দে বংশীয় নিম্নলিখিত পাঁচজন পরে পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১। রাজা দনুজমর্দন দে।
২। রাজা রমাবল্লভ রায়।
৩। রাজা কৃষ্ণবল্লভ রায়।
৪। রাজা হরিবল্লভ রায়।
৫। রাজা জয়দেব রায়।

ইহাদের মধ্যে রাজা দনুজমর্দন দের বিষয়ে আর কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল কচুয়াতে তাহার রাজধানী ছিল, ইহাই প্রকাশ আছে। তাহার পুত্র রাজা রমাবল্লভ রায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বহু দূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তাহাদের বিবাহ ও কুল সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করেন।

এই পাঁচজন যেমন চন্দ্রদ্বীপের রাজা, তেমনি তত্রত্য কায়স্থদিগেরও সমাজপতি ছিলেন। রাজা জয়দেবের পুত্রসন্তান ছিল না। তাহাতে তাহার দেহুড়গাতি নিবাসী দৌহিত্র কুলীন শ্রেণীস্থ বসুবংশজ রাজা পরমানন্দ রায় তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন। তদবধি উক্ত বসুবংশীয় ৮ জন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও কায়স্থসমাজপতি হইয়াছিলেন।

রাজা পরমানন্দ রায় তাহার আদিপুরুষ পূষণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। তাহার পূর্ব পুরুষদিগের নাম এই—

১। পূষণ বসু,
২। দিবাকর বসু,
৩। বাভট বসু,
৪। তমারপন্থ বসু,
৫। অহরপতি বসু,
৬। পুরু বসু,
৭। ভাই বসু,
৮। থাক বসু,
৯। কন্দর্প বসু,
১০। মার্কণ্ড বসু,
১১। উষাপতি বসু,
১২। বলভদ্র বসু—ইহার পুত্র
১৩। পরমানন্দ বসু অথবা রাজা পরমানন্দ রায়।

রাজা পরমানন্দ রায় হইতে বসুবংশীয় যে আট পুরুষ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন, তাহাদিগের নাম এই—

১। রাজা পরমানন্দ রায়,
২। রাজা জগদানন্দ রায়,
৩। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়,
৪। রাজা রামচন্দ্র রায়,
৫। রাজা কীর্তিনারায়ণ রায়,
৬। রাজা বাসুদেবনারায়ণ রায়,
৭। রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়,
৮। রাজা প্রেমনারায়ণ রায়।

রাজা পরমানন্দ রায় কুলীন কায়স্থগণের বিষয়ে অনেক নিয়ম করেন। কায়স্থগণের গণনাস্থলে পূর্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। ইহার সময় হইতে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পুত্র রাজা জগদানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। উক্ত রাজা শক্তি উপাসনায় একজন "সিদ্ধ পুরুষ" ছিলেন। তিনি গঙ্গার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। একদা গঙ্গার (পদ্মার) জল উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজবাটির দ্বার পর্যন্ত ধাবিত হইল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া স্মরণ করিলেন, বুঝি গঙ্গা তাহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া, তৎপ্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন। রাজা পরমানন্দ দেবীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, গঙ্গার জলও যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এক্ষণে যাহাকে নিজ বাকরগঞ্জ বলে, তাহার সন্নিকটে কচুয়া নামে যে স্থান আছে, সেই স্থানে রাজা কন্দর্পনারায়ণ পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ অবস্থিতি করিতেন। রাজা জগদানন্দ রায়ের কন্যা কমলা উক্ত কচুয়াতে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন। কচুয়া বাযুফল থানার অধীন। এখনও সেখানে ঐ পুষ্করিণী বর্তমান রহিয়াছে।

মগদিগের উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ ঐ স্থান পরিত্যাগ উচিত বিবেচনা করিয়া বরিশালের পূর্বোত্তর কোণে বাসুরিকাটি গ্রামে এক রাজধানী নির্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। পরে তাহা ত্যাগ করিয়া ঐ জেলার মধ্যে পঞ্চকরণের নিকটবর্তী হোশনপুর গ্রামে এক রাজধানী প্রস্তুত করেন। তাহার পর ক্ষুদ্রকাটি নামক স্থানে এক রাজধানী নির্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তৎপরে তথা হইতে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। এই স্থানে একজন গাজি উপাধিধারী মুসলমান বাস করিত। তিনি তাহাকে বধ করিয়া তথায় এক রাজধানী নির্মাণ করেন, তাহাই এখন বর্তমান আছে। কচুয়াতে প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইস্টকালয় প্রভৃতি পূর্ব রাজধানীর চিহ্ন সকল দৃশ্যমান হয়। বাসুরিকাটিতেও মন্দির ও ইস্টকালয় বহুতর ছিল ; নদীর ভাঙ্গনে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হোশনপুরে ঐ রাজধানীর চিহ্ন কেবল গড় মাত্র আছে। ক্ষুদ্রকাটিতে স্থানে স্থানে ইস্টক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তথায় এক প্রকাণ্ড দিঘি আছে। রাজার সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণও উক্ত রাজধানী চতুস্টয়ের নিকটে ও দূরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

যশোরের প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপ আদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতকগুলি কায়স্থকে লইয়া যশোরে এক পৃথক কায়স্থ সমাজ স্থাপন করেন। পরে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহ হয়। সেই বিবাহের বিবরণ এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় ঃ—

বিবাহার্থী রাজা রামচন্দ্র বহু সমৃদ্ধি সহকারে বহু সমারোহ পূর্বক রাজা প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বিবাহ রাত্রিতে বিবাহ কার্য সমাপনান্তর বরকন্যা গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, বর রাজা রাচমন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, অদ্য রাত্রিতে তাহাকে হত্যা কবিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব ও কায়স্থ সমাজপতিত্ব অধিকার করা হইবে, তাহার সমুদায় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রাজা তাহার নববিবাহিতাপত্নীর নিকট এই মন্ত্রণার কথা শুনিতে পান ; কেহ বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় তাহাকে এই সম্বাদ জ্ঞাপন করেন।) আর ইহাও তিনি অবগত হইলেন যে, রাজধানীতে আসিতে হইলে যে খাল দিয়া আসিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রাজা রামচন্দ্র এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাহার ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ তখন রাজবাটির বহির্ভাগে ছিল। তিনি

একাকী নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া অত্যন্ত সঙ্কট ভা'বিতে লাগিলেন ; পরিশেষে, কেহ বলেন রাজা বসন্ত রায়ের, কেহ বলেন তাহার নববিবাহিতা পত্নীর সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী উত্তীর্ণ হইয়া আইলেন। রাজার রক্ষিদিগের সর্দার রামমোহন মাল অতি বলবান ব্যক্তি ছিলেন। সে আপন প্রভুর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার অধীনস্থ লোকদিগের সাহায্যে রাজার ৬৪ দাঁড়ের কোষ নৌকা আনয়ন পূর্বক খাল মধ্যস্থ কাষ্ঠাদির উপর দিয়া তাহাকে ত্বরিত গতিতে একেবারে প্রতাপাদিত্যের অধিকারস্থ স্থান অতিক্রান্ত করিয়া আনিল। রাজবাটি হইতে কতকদূর আসিয়া নৌকাস্থিত কামানের শব্দ দ্বারা রাজা বিপক্ষ পক্ষকে তাহার গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাহার গমন প্রতি রোধার্থ উপস্থিত হইল না।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার নববিবাহিতা পত্নী পিতৃগৃহেই রহিলেন। রাজা তাহাকে স্বালয়ে আনিবার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পরে উক্ত রাজপত্নী কাশী যাত্রাচ্ছলে বহুসংখ্যক রক্ষী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে নৌকাযানে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তিনি আপনা হইতে রাজাকে আপনার আগমন বৃত্তান্ত না জানাইয়া, রাজবাটির কিঞ্চিৎ দূরে নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ও বাসনা ছিল যে, রাজা আপনা হইতে তাহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনাপূর্বক স্বভবনে লইয়া যাইবেন। তিনি প্রথমত যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার তীরোপরি প্রতি সপ্তাহে দুইবার এক হাট বসিতে আরম্ভ হইল। এখন সে স্থানে হাট নাই, কিন্তু সেই স্থানটিই "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে তিনি বিল্ববাটি গ্রামের উত্তরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তথায় কিছুদিন ছিলেন। সেই সারসী গ্রামে তিনি এক বৃহৎ দিঘি খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্বদা নৌকাতে থাকিতেন, কখন কখন তীরে তাম্বু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন। তাহার এই সকল কীর্তির বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু কে তিনি, রাজা তাহার পরিচয় না পাইয়া তাহার বিষয়ে কোন মনোযোগ করিলেন না। পরে রাজার অন্তঃপুরে তাহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইল। রাজমাতা বধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া তাহাকে স্বভবনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাহার নৌকাতে আগমন করিলেন। তাহাতে রাজপত্নী এক থাল মোহর দিয়া শাশুড়িকে প্রণাম করেন। পরে তিনি সমারোহপূর্বক বধূকে স্বভবনে লইয়া গেলেন। কিন্তু বধূকে গৃহে আনিয়া রাজমাতার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। রাজার চিত্ত বিবাহ রাত্রি অবধি প্রতাপাদিত্য ও তাহার সমস্ত পরিবারের প্রতি যে কেমন বীতরাগ ও বিরূপ হইয়াছিল, সে ভাব আর কোন মতে পরিবর্তিত হইল না। রাজমাতা বধূকে গৃহে আনয়ন করিলে রাজা তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন, তথাপি সেই পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। রাজপত্নী তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন, কিন্তু কোনক্রমে তাহার ভাগ্যে পতিসন্দর্শন লাভ হইল না। তিনি এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া তথা হইতে একেবারে কাশীধাম যাত্রা করেন। রাণীর ভাগ্যে পতিসন্দর্শন লাভ হইল না বটে, কিন্তু তিনি পতির পরসাদ লাভ বিষয়ে একান্ত বঞ্চিত হন নাই। তিনি যে সকল লোককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু বিত্ত দিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া গেলেন, রাজা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন না।

রাজা প্রতাপাদিত্য দিল্লির বাদশাহ জাহাঙ্গিরের প্রতি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে বাদশাহ তাহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহের সহিত কতক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য এক বা দুই বার ওই মোঘল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, পরে পরাজিত হইয়া নিহত হয়েন। কথিত আছে, তাহার মৃত শরীর এক লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লিতে প্রেরিত হইয়াছিল ; দিল্লিশ্বর সেই শরীর দর্শন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন

যে, এমন বলিষ্ঠ শরীর মৃত অবস্থায় আমার নিকট না পাঠাইয়া জীবিত অবস্থায় পাঠান উচিত ছিল।

রাজা রামচন্দ্রের সম্বন্ধে আর এক ইতিহাস আছে, তাহাও এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী ভুলুয়া পরগণায় লক্ষ্মণমাণিক্য নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি রাজোপাধি ধারণ করিতেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ অতি বলিষ্ঠ ও যোদ্ধা ছিলেন, রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও সেইরূপ বলিষ্ঠ ও বীরপুরুষ ছিলেন। অধিকন্তু তিনি অতি গর্বিত ছিলেন। ইহারা উভয়ে পরস্পরকে বিশেষ জানিতেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজা রামচন্দ্রকে নিতান্ত বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া কথা বলিতেন, তাহাতে রাজা রামচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য শ্রবণ করিলেন, তাহার তুচ্ছীকৃত বালক রাজা রামচন্দ্র তাহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধে ও গর্বে পরিপূরিত হইলেন এবং অবলীলাক্রমে সেই বালককে পরাভব ও নিধন করিতে পারিবেন এই বিশ্বাসে একাকী রাজা রামচন্দ্রের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের এইরূপ আগমনে তাহার এতদূর কোপ ও অভিমান জন্মিয়াছিল যে, তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অমনি রাজার নৌকা পরি লম্ফ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈবযোগে এইরূপ হইল যে, তিনি নৌকার উপরিভাগে পতিত না হইয়া তাহার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। সেই সময়ে রাজা রামচন্দ্রের পূর্বোক্ত রামমোহন মাল প্রভৃতি সামন্তগণ সতর্ক ছিল, তাহারা তাহাকে ডহর হইতে আর উঠিতে দিল না ; সেইখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া নৌকাকাষ্ঠে বন্ধন পূর্বক, তাহারা অমনি নৌকা খুলিয়া ছিল। নৌকা তীরবেগে পশ্চিমাভিমুকে ধাবমান হইল। লক্ষ্মণমাণিক্য তদবস্থাতেই রহিলেন। কিয়দ্দিন পরে নৌকা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।

এইরূপে রাজা রামচন্দ্র দুর্দান্ত লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্ধন করিয়া স্বদেশে আনিয়া তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মাতা লক্ষ্মণমাণিক্যের দীর্ঘাকৃতি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর দর্শন করিয়া তাহাকে বধ করিতে নিষেধ করিলে, রাজা তাহাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখেন। এক দিবস রাজা তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় তাহাকে লৌহ পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য এক নারিকেল বৃক্ষের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি রাজা রামচন্দ্রের উপর বৈর নির্যাতন করিবার অবকাশ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই নারিকেল বৃক্ষে হেলান দিয়া রাজার অভিমুখে এমনি চাড় দিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন হইয়া রাজার অতি নিকটেই পতিত হইল—ধর্মে ধর্মে রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজমাতা এরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, সেই প্রবল শত্রুকে তিনি গৃহে রাখিতে একান্ত শঙ্কুচিত হইলেন। পরে তাহার সম্মতি হইলে রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন।

রাজা কীর্তিনারায়ণ রায়ের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—তিনি একজন মহা যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নবাবের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন। এক দিবস নবাবের নিমিত্ত রন্ধন হইতেছে, তিনি সেই স্থানে ছিলেন, রন্ধনের গন্ধ তাহার নাশারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে "ঘ্রানেনার্দ্ধভোজনং"। নবাব উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ওই হেতুতে রাজার জাতি নষ্ট হইয়াছে। নবাব যাহা বলিলেন, তাহার খণ্ডন হইবার নহে। অতএব রাজা জাতিভ্রষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় ভূসম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বাসুদেব নারায়ণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি তদবস্থায় রহিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় সপ্তম অথবা শেষ নৃপতি রাজা প্রেমনারায়ণ অল্প বয়সেই কালগ্রাসে

পতিত হয়েন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার সহোদরও কেহ ছিল না। সুতরাং তাহার পিতৃদৌহিত্র মিত্র বংশীয় উলাইল নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদারের পুত্র উদয়নারায়ণ তাহার মাতামহের আসন অধিকার করিলেন, এবং সেই রাজবংশের নিয়মানুসারে "রাজা উদয়নারায়ণ রায়" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা উদয়নারায়ণের আর এক সহোদর ছিলেন। তাহার নাম রাজা রাজনারায়ণ রায়। তিনিও মাতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে "রাজমাতা তালুক" নামে এক বৃহৎ তালুক এবং চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মহাল হিস্যাজাত ও মহাল উজুহাত এই কয়েক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া মাধবপাশার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার বংশীয়গণ এখনও সেই স্থানে বসতি করিতেছেন ; কিন্তু উক্ত মহামূল্য সম্পত্তি আর তাহাদের নাই।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় তদ্বংশীয় আদি পুরুষ কালিদাস মিত্র হইতে সপ্তদশ পুরুষ। তাহার পূর্ব পুরুষগণের নাম এই—

১। কালিদাস মিত্র,

২। গোট মিত্র,

৩। বাহন মিত্র,

৪। সৌরী মিত্র,

৫। পাই মিত্র,

৬। সুলোচন মিত্র,

৭। ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র,

৮। সুপ্রসাদ মিত্র,

৯। ভাস্কর মিত্র,

১০। থাক মিত্র,[২৫]

১১। বিদ্যাধর মিত্র,

১২। শিবানন্দ মিত্র,

১৩। সানন্দ মিত্র।

ইহার অন্য নাম শ্রীরাম খাঁ—ইহার চারি পুত্র, বলরাম মিত্র, দুর্গাপ্রসাদ মিত্র, গোপাল প্রসাদ মিত্র, রাজীবলোচন মিত্র।

১৪। বলরাম মিত্র,

১৫। হরিনারায়ণ মিত্র,

১৬। গৌরীচরণ মিত্র। ইহার পুত্র

১৭। উদয়নারায়ণ মিত্র, পরে—রাজা উদয়নারায়ণ রায় এবং রাজনারায়ণ মিত্র, পরে—রাজা রাজনারায়ণ রায়।

রাজা উদয়নারায়ণের উপরোক্ত পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে সানন্দ মিত্র মুসলমান রাজ সরকারে খাঁ উপাধি এবং হরিনারায়ণ মিত্র ঐ রাজসরকারের মাল সংক্রান্ত বিভাগে অতি উচ্চপদ ধারণ করিয়া মজুমদার উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিনারায়ণ দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে ও অন্যান্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল উপাধির সনন্দ এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই বংশের আরো অনেকে প্রধান প্রধান রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সানন্দ মিত্র অথবা শ্রীরাম খাঁ ও হরিনারায়ণ মিত্র মজুমদার তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মিত্রবংশীয় উক্ত রাজকর্মচারিদিগের উক্ত রাজ সরকারে এরূপ প্রতিপত্তি ও আধিপত্য ছিল যে, ইহারা অনুকূল হইলে অনেকের ধনসম্পত্তি নবাবের কোপ হইতে রক্ষা হইত। তাহার একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—একদিবস বঙ্গাধিকারী রাজকার্য সমাপনানন্তর সন্ধ্যাকালে তাহার বহুনাবিকযুক্ত

বিচিত্র নৌকারোহণপূর্বক নদীতে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার বর্তমান জমিদারগণের পূর্বপুরুষ এক ব্যক্তি তত্তুল্য এক নৌকারোহণপূর্বক সাড়ম্বরে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে উক্ত দুই নৌকা একত্রিত হইলে জমিদার মহাশয়ের নৌকা হইতে ক্ষেপনী নিক্ষিপ্ত জল বঙ্গাধিকারীর গাত্রে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত নৌকার আরোহীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিলেন এবং পরদিন তাহার সমুদায় জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। বঙ্গাধিকারী নবাবের মাল সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাহার আদেশ রহিত হইবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সে সময়ে উক্ত মিত্র বংশীয় যিনি ওই সরকারে কার্য করিতেছিলেন, তিনি উক্ত জমিদারের প্রতি সদয় হইয়া কোন প্রকারে তাহার জমিদারি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ মিত্র বংশীয়েরা সুলতান প্রতাপ, ইসপ্ সাহি, নরুল্লাপুর ও অন্যান্য পরগণার জমিদার ছিলেন। সুলতান প্রতাপ পরগণা ১২৪৮ সাল পর্যন্ত তাহাদিগের অধিকৃত ছিল। তৎপরে তাহা খাজনা অনাদায় জন্য বিক্রিত হইয়া যায়।

উক্ত মিত্র মজুমদার বংশ উলাইল গ্রামে বসতি করিতেন। উলাইল গ্রাম ঢাকা জেলার অন্তর্গত বংশ নদীর পশ্চিমতটে ছিল। ওই গ্রামে উক্ত বংশীয়দিগের অনেক ইস্টক নির্মিত গৃহ ছিল। লোকে বলে যে, আঠার গণ্ডা কোঠা ছিল। ইহাদিগের বিগ্রহ ঠাকুর গোপীজনবল্লভ ; তাহার যোড়মন্দির ও ভোগমন্দির ইত্যাদি ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আদেশানুসারে রেনল (Rennell) সাহেব ১৭৮৫ খ্রিঃ অব্দে বঙ্গদেশের নদী সকলের দৈর্ঘ প্রস্থাদি মাপিয়া তাহার চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার কৃত চিত্রে প্রকাশ পায় যে, উক্ত উলাইল গ্রামে তৎকালে অনেক ইস্টক নির্মিত গৃহাদি ছিল। ১২২৬ বা ১২২৭ সালে ধলেশ্বরী নদীর গাজিখালি নামক এক শাখানদী সাভার নামক স্থানের অভিমুখে নির্গত হইয়া বংশনদীর সহিত মিলিয়া যায়। তাহাতে ওই নদীর বেগ বর্ধিত হইয়া উলাইল গ্রামকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উক্ত নদীর তীববর্তী ফুলবেড়িয়া নামক যে স্থানে মেঃ জে পি ওয়াইজ সাহেবের নীলকুঠি আছে, তাহারই অপর পারে এক চর আছে। তাহাকে চর উলাইল বলে। সেই স্থানে উলাইল গ্রাম ছিল। উক্ত মিত্র বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত তিনটি অতি প্রাচীন দেবমূর্তি এখনো বর্তমান রহিয়াছে। এক, গোপীজনবল্লভ ; দ্বিতীয়, বাসুদেব ; তৃতীয়, দশভুজা। ঢাকা জেলার অন্তর্গত উক্ত ফুলবেড়িয়া গ্রামের নিকট এক স্থানে ঐ মিত্রবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি বাস করিতেছেন; ঐ স্থানকে তাহারা উলাইল বলেন। প্রথমোক্ত দেবমূর্তি তাহাদেরই এক ব্যক্তির গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দ্বিতীয়টিও ঐ জেলার অন্তর্গত ধমরাই গ্রামে স্থাপিত।[২৬]

তৃতীয়টি পাবনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুরে স্থাপিত রহিয়াছেন। উপরোক্ত হরিনারায়ণ মিত্র মজুমদারের এক ভ্রাতা দর্পনারায়ণ মিত্র মজুমদার কোন কারণে ঢাকার নবাবের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ঐ দৌলতপুরে গিয়া তথায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। তিনি ঐ দশভুজা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাহার বংশীয়েরা এখনো বর্তমান রহিয়াছেন।

ঐস্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, নবাবের ঐ বিরাগ ও তজ্জনিত উপদ্রবে মিত্রবংশীয় অন্যান্য লোকদিগকেও উলাইল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কিয়দ্দিবসান্তে উক্ত দর্পনারায়ণ মিত্রের ও মনিরাম মিত্রের বংশীয়গণ ভিন্ন আর সকল পলায়িত মিত্র বংশীয়েরা উলাইল গ্রামে পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মনিরাম মিত্র মজুমদারের বংশীয়গণ ঢাকা জেলার মধ্যে জালালাদি নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। সেই স্থান পদ্মানদীর বেগে ভগ্ন হওয়াতে তন্নিকটবর্তী স্থানে তদ্বংশীয় এক ব্যক্তি এখনো বসতি করিতেছেন—এইরূপে মিত্রবংশীয়দিগের একশাখা চন্দ্রদ্বীপে, একশাখা দৌলতপুরে, একশাখা জালালদিতে ও অবশিষ্ট শাখা সকল এক উলাইল গ্রামে থাকিয়া পরে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল।

এই বংশীয়দিগের অন্যান্য বহুতর কীর্তি ছিল। তাহাদের গৃহস্থাপিত দেবতাদিগের বহু সমারোহে নিত্য সেবা ও পর্বাহ্ কৃত্য সকল সম্পাদিত হইত। অর্ধকালীর সন্তান নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান দেশ-গুরু-প্রায় মিতড়ার ভট্টাচার্যদিগের প্রথমে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শিষ্য ছিল না। কায়স্থদিগের মধ্যে এই বংশীয়েরাই প্রথমে তাহাদের শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহাও তাহাদের এক কীর্তির বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে ঘটনা সূত্রে তাহারা উক্ত ভট্টাচার্যদিগের শিষ্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে ঘটনাটিতে কিছু অসাধারণত্ব উপলব্ধি হয়।

ঘটনাটি এইরূপে কথিত হইয়া থাকে—হাটিপাড়া নিবাসী রায়োপাধিকারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি তাহার কন্যার বিবাহ সভায় তাহার গুরু উক্ত মিতড়ার ভট্টাচার্য বংশীয় এক ব্যক্তিকে প্রথমে চন্দন দিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে উপস্থিত কুলীনগণ তাহার বিরোধী হইলে কন্যাকর্তা চন্দন বন্ধ রাখিলেন এবং সেই বিবাহও স্থগিত রাখিলেন। কন্যাকর্তার প্রতিজ্ঞা, গুরুকেই প্রথমে চন্দন দিবেন। এজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে আমার গুরু কুলীনদিগের অগ্রে চন্দন পাইতে পারেন? কুলীনগণ বলিলেন, যদি ইঁনি আমাদের মধ্যে প্রধান কুলীনকে কন্যাদান করিয়া সকল কুলীনের সম্বর্ধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা হইতে পারে। কিন্তু ঐ কার্য নির্বাহ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, ভট্টাচার্য ও রায়দিগের তাহার সঙ্গতি ছিল না। তাহাতে ভট্টাচার্যেরা উলাইল নিবাসী ঐ মিত্র পরিবারকে শিষ্য করেন। ঐ শিষ্যদিগের অতুল ব্যয়ে উক্ত গুরু বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন প্রধান এক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ কার্যোপলক্ষে ঐ শ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন ও কুলজ্ঞগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ক্রিয়া দ্বারা উক্ত ভট্টাচার্যেরা প্রধান শুদ্ধ শ্রোত্রীয় পদপ্রাপ্ত হয়েন। এ পর্যন্ত সেই রায় পরিবারের বিবাহ ক্রিয়া স্থগিত ছিল। এই কার্য দ্বারা উক্ত গুরু চন্দন গ্রহণযোগ্য হওয়াতে সেই বিবাহের উদ্যোগ হয় ; এবং বিবাহ সভায় সেই গুরু কুলীনদিগের অগ্রে চন্দন প্রাপ্ত হয়েন।

উপরোক্ত দর্পনারায়ণ মিত্র মজুমদার যৎকালে উলাইল ত্যাগ করিয়া দৌলতপুরে গমন করেন, তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ মিত্র মজুমদারের পুত্র কালীচরণ মিত্রকে স্বীয় সম্পত্তি আদায় উসুলের অধিকার পত্র প্রদান করেন। সেই অধিকার পত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা দ্বারা উক্ত বংশীয়দিগের ওই সময়ের ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ; আর সে কালেরও এই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে যে, যে স্থলে এক্ষণে স্ট্যাম্প কাগজে রেজিস্ট্রি না করিয়া এবং কবুলতী না লইয়া কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার সম্পত্তির কোন অধিকার দেওয়া যায় না, সে স্থলে তখন এক সাদা কাগজে বিনা রেজিস্ট্রিতে ও বিনা কবুলতীতে ঐরূপ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।

অধিকার পত্র

"শ্রীশ্রীরাম
কাগজ পত্র বুঝিয়া ইস্তক সন
১১২১ সাল সুরু পুন্যানাগাদ
আখের কীফাইত হয় পাইব টোটা
হয় দিব হিস্যা মজকুর বিনা টোটা
না দিয়া আমল করিতে না পারিব
ইতি।
শ্রীদর্পনারায়ণ মিত্রস্য

ইয়াদিকির্দ সকল মঙ্গলালয়—

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মজুমদার—

পরম কল্যাণবরেষু লিখিতং শ্রী দর্পনারায়ণ মিত্র পত্রমিদং আগে আমার তালুক ও চৌধুরাই[২৭] পরগণে সুলতান প্রতাপতপে ধামরাই ও পরগণে খলিলাবাদ ও পরগণে নুরুল্লাপুর তপে হাজিপুর ও পরগণে সৈদপুর ও তালুক পরগণে মকিমাবাদ আমার হিস্যা দুই আনা আস্ট৹গণ্ডা তোমার হাওয়ালে করিলাম হিস্যা মজকুর আমল করিয়া বজায় রাখিয়া সদর মালগুজারী করিবা সাল আখের জমাখরচ ওগয়রহ নওয়াজীমাত কাগজ আমাকে বুঝাইবা কীফাইত হয় পাইব টোটা হয় তাহার নিসা করিব আর আমার হিস্যা মজকুরের নফর শূদ্র ও চণ্ডাল[২৮] আমার খেদমতের উপযুক্ত জে হয় তাহা দিবা বাকি জে থাকে। তুমি আমল করিয়া তালুক মজকুরের সরবরাহ করিবা আমার হিস্যা মজকুল জখন আমল করিতে চাহি আমল করিব কাগজ বুঝিয়া টোটা হয় তাহার নিসা করিব কীফাইত হয় পাইব। ইতি তারিখ ২৫ বৈশাখ সন ১১২১ সাল সদর।"

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা উদয়নারায়ণের পূর্বপুরুষদিগের বিষয় কথিত হইল। তিনি ও তাহার অধস্তন যে কয় পুরুষ রাজাসনে উপবিষ্ট হয়েন, তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

তদ্বংশীয় যে কয় পুরুষ উক্ত রাজাসনে রাজত্ব করেন, তাহাদের নাম এই—

রাজা উদয়নারায়ণ রায়,

রাজা শিবনারায়ণ রায়,

রাজা জয়নারায়ণ রায়,

রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়,

রাজা বীরসিংহ নারায়ণ রায়,

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

এই মিত্র বংশীয়দের রাজত্বের পূর্বে যে বসু বংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞাতিবর্গ এ পর্যন্ত যুবরাজ উপাধি ধারণ করেন। এক্ষণে চন্দ্রদ্বীপের নিকটবর্তী দেহড়গাতি নামক গ্রামে তাহারা বাস করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে একজন চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় অদ্যাপি যুবরাজের আসনে আসীন হইয়া থাকেন। তাহার পূর্বের প্রথা অনুসারে এখনো আপনাদের নামের সহিত "নারায়ণ" এই শব্দ যোগ করেন। মিত্রবংশীয় রাজাগণ পূর্বতন কুলপ্রথা অনুসারে মিতড়ার ভট্টাচার্যদিগের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের রাণীগণ বসুবংশীয় রাজগণের গুরুসিদ্ধ বিদ্যার সন্তানগণের নিকট মন্ত্র লইয়া থাকেন।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজত্ব লাভ করিবার পরেই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাহাকে অধিকারচ্যুত করেন। তাহাতে তিনি নবাবের সমীপে গমন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। নবাবের বিচিত্র মতি। তিনি বলিলেন, তুমি যদি এক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া আইস, তাহা হইলে রাজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। মহাবল রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং দ্বিতীয় সের সার ন্যায় এক ব্যাঘ্রকে সমরে নিহত করিয়া অব্যাহত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন. এইরূপে ওই অসাধারণপণে বিজয় লাভ করিয়া রাজা মহোৎসারে পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু নবাবের বেগম তাহার সেই ন্যায্য পুরস্কার লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাহার রাজ্যাধিকার হইলে তাহার ভ্রাতাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। তথাপি রাজা কৌশলক্রমে উক্ত রাজ্যাধিকার নিজ হস্তগত করিয়াছিলেন।

রাজা শিবনারায়ণের একটি কলঙ্কের বিষয় আছে। এস্থলে তাহা উল্লেখ করা অনুচিত বোধ হয় না। তিনি পূর্বোক্ত সুলতান প্রতাপ পরগণার ষষ্ঠভাগের অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু তিনি

রামগোপাল দালাল নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পরগণার সমুদায় অংশ আপনার বলিয়া ইজারা লিখিয়া দেন। উলাইল নিবাসী দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গির নগরে (বর্তমান ঢাকা) দেওয়ানি আদালতে নালিশ উত্থাপিত করেন। তাহাতে উক্ত ইজারাদার ও দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার প্রভৃতি রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাদাসকে শালিশ মান্য করেন। পরে সেই শালিশের সাক্ষাতে ইজারাদার রামগোপাল দালাল ইজারা ইস্তফা করিয়া দিলে উক্ত জমিদারি পুনরায় সেই ছয় অংশীদারের হস্তে যথাবৎ প্রত্যাগত হয়। সেই মোকদ্দমার বিচারের রায় পারসি ও বাঙ্গালাতে আছে। তাহার তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ ১১৭৯ সাল ; ইংরাজি ২ ডিসেম্বর ১৭৭২। জজদিগের নাম এন গ্লোবর ও রায় হরিরাম মল্লিক। মোহর শাহ আমল বাদসাহ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামাঙ্কিত। এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাহ আলম বাদসাহের নিকট বঙ্গদেশের দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সকল রাজ্যেরই রাজশ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন রাজা ভোগবিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া রাজাসনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের মধ্যেও যে এরূপ রাজা কেহ ছিল না, এমন বলা যায় না। শুনা যায়, রাজা শিবনারায়ণ রায় স্ত্রীগণ লইয়া বিবিধ প্রকার কুৎসিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেন।

রাজা জয়নারায়ণ রায়ের যখন শৈশব অবস্থা, সেই সময় তিনি পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। তাহার কর্মচারি শঙ্কর বক্‌সী তাহাকে শৈশবাবস্থায় পাইয়া আপনি এক প্রকার রাজা হইয়া বসিলেন এবং ৭ বৎসর রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার মাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গোবিন্দ সিংহের সাহায্যে ওই ভূমাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। উক্ত রাণী বহু ব্যয়ে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠাকার্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ওই দীর্ঘিকা এক্ষণে দুর্গাসাগর নামে খ্যাত। ওই দিঘির (পাড়ের সহিত) আয়তন ৩ দ্রোণ ১৩ কানি। (এক কানি ৪ বিঘার সমান ; ১৬ কানিতে এক দ্রোণ হয়।)

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রসিদ্ধ দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগণে কোটালিপাড়া, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, বুজরুগ, উমেদপুর এবং আরো কয়েকস্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথককৃত হয়। এই সকল স্থান চন্দ্রদ্বীপ হইতে পৃথক হইলেও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অতি বৃহৎ জমিদারি। রাজা জয়নারায়ণের সহিত তাহারই বন্দোবস্ত হইল।

এই অবধি চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীর সৌভাগ্য সূর্য দেখিতে দেখিতে অস্তমিত হইতে লাগিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিলামের আইন জারি করিলেন। নিলামের ভয়ে খাজনা মাথায় লইয়া অবধারিত দিবসের পূর্বে প্রাণপণে কালেক্টর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা তখন এ দেশীয়দিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল। বিশেষত রাজার কর্মচারিগণ অতি অধার্মিক ও দুষ্টাশয় ছিল। সুতরাং তাহার সরকারি খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। প্রথমে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রাজস্ব যত পরিমাণে বাকি পড়িবে, সেই পরিমাণে টাকা ঐ বাকি পড়া বিত্তের যতখানি অংশ বিক্রয় করিলে উঠিতে পারে, তাহাই বিক্রিত হইবে, অল্প বাকির দায়ে একবারে সমুদায় বিত্ত বিক্রয় হইবে না। তদনুসারে প্রথম ১২০০ সালে রাজার উক্ত চন্দ্রদ্বীপের রকম /১৭।= এক আনা সতর গণ্ডা এক কড়া দুই ক্রান্তি অংশ ঢাকার কালেক্টরিতে (তখন বাকরগঞ্জে ভিন্ন কালেক্টরি ছিল না) নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। ঢাকা সহর নিবাসী দল সিংহ নামে এক ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। ঐ কারণে ১২০২ সালে আবার ঐ জমিদারির রকম ৵/১২॥ দুই আনা সাড়ে বার গণ্ডা বিক্রিত হয়। ঢাকাবাসী মেঃ জন পেনিয়টি সাহেব তাহা ক্রয় করেন। ১২০৪ সালে আবার ঐ কারণে উহার রকম ৵/১৭॥ দুই আনা সাড়ে সতর গণ্ডা বিক্রিত হয়। তাহাও

উক্ত সাহেব ক্রয় করেন। রাজার মাতুল প্রভৃতি নিতান্ত আত্মীয়গণ তাহার কর্মচারি ছিলেন। তাহাদিগের প্রবঞ্চনাতেই রাজার ঐ সকল জমিদারি অংশ বিক্রিত হইয়া যায়। রাজা খাজানা দিবার জন্য যে সকল টাকা দিতেন, ঐ সকল কর্মচারিরা তাহা কালেক্টরিতে জমা না দিয়া আপনারা বিভাগ করিয়া লইতেন।

উল্লিখিত অংশ সকল বিক্রিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঐ কারণে একবারে বিক্রয় হইয়া গেল। ১২০৬ সালে রাজার অবশিষ্ট জমিদারি অংশ রকম ।।১২।।—আট আনা বার গণ্ডা দুই কড়া এক ক্রান্তি একবারে নিলাম ভুক্ত হইল। মানিক মুদী নামে রাজার এক মুদী ছিল, সেই ব্যক্তি ঐ অংশ ক্রয় করে। মানিক মুদী রাজার খানাবাড়িতে বাস করিত। তদ্‌বংশীয়েরা এখনো সেই খানাবাড়ির সীমার মধ্যে বাস করিতেছে। মানিক মুদী তাহার ভ্রাতা রাধু মুদীর প্ররোচনায় প্রস্তাব করিয়াছিল যে, রাজা উক্ত ক্রীত অংশের মধ্যে রকম ।৶১২।।—সাত আনা বার গণ্ডা দুই কড়া এক ক্রান্তি গ্রহণ করেন, কেবল রকম এক আনা অংশ তাহার থাকিবে। কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহার বোধ হইল এবং তাহার আত্মীয় স্বজনেরাও বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মুদীর সহিত সরিকিতে তিনি জমিদারি ভোগ করিবেন, ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয়। কেহ কেহ বলেন যে, যে টাকাতে ঐ বস্তু ক্রয় হয়, সে টাকাও রাজারই ; মুদী তদ্দারা আপনার নামে উহা ক্রয় করিয়া আত্মসাৎ করে।

রাজা ঐ মানিক মুদীর ক্রীত অংশ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নালিশ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে তিনি ডিক্রি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু সদর দেওয়ানি আদালতে ঐ ডিক্রি রহিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রীবি কৌন্সিলে তদ্বিরুদ্ধে আপিল করেন। কিন্তু তাহার ফলাফল জানিতে তিনি অবকাশ পাইলেন না। ঐ সময়ে তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পুত্র রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায় তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাহার মাতা রাণী করুণাময়ী ঐ নাবালক পুত্রের পক্ষ হইয়া প্রীবি কৌন্সিলে মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রীবি কৌন্সিলের মোকদ্দমা দীর্ঘকাল পরে নিষ্পত্তি হইত। ঐ মোকদ্দমার ফল কয়েক বৎসর জানা গেল না। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত মুদী ও তৎ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, তিনি ঐ জমিদারির অন্তর্গত কয়েক খান তালুক লইয়া তাহাদের সহিত মোকদ্দমায় ক্ষান্ত থাকেন। কেহ কেহ বলেন, এই বন্দোবস্ত হইবার পরে প্রীবি কৌন্সিলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় রাজা জয়ী হইয়াছিলেন। রাজার বর্তমান সম্পত্তি তাহার খানাবাড়ি ও কয়েকখানি সিকমী তালুক। উক্ত খানাবাড়ি অতি বিস্তীর্ণ স্থান। তাহা বাজেআপ্তি দপ্তর হইতেও নিষ্কর রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায় তৎকালের পুরুষদিগের মধ্যে পরম সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তাহার সৌভাগ্য তাহার রূপের অনুরূপ ছিল না। চন্দ্রদ্বীপের উক্ত রাজগণ দিল্লির বাদসাহ ও বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে অনেক সনন্দ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজবাটিতে এক বৃহৎ কামান আছে। তাহা এক গৃহের পত্তনস্থল হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার উপর বঙ্গাক্ষরে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নাম এবং ৩১৮ এই অঙ্ক খোদিত রহিয়াছে। এই অঙ্কটি বোধহয় কামানের সংখ্যা হইবে। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ যে যোদ্ধা ছিলেন ও তাহাদের যথেষ্ট যদ্ধ সজ্জা ছিল. এই কামান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।[২৯]

পরিশিষ্ট

রাজা বল্লালসেনের ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীর বিবরণ ঃ

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের অধীনস্থ রামপাল নামক গ্রামে রাজা বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। পূর্বে সেই স্থানকে রাজাপুর বলিত। এক্ষণে তাহাকে লোকে বল্লালবাড়ি বলে। সেই রাজধানীর ইস্টক-নির্মিত কোন গৃহ কি কোন মন্দিরাদি কিছুই বর্তমান নাই, সমুদায়ই ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে ; কেবল কতকগুলি গড়, পুষ্করিণী ও পথ তাহার পূর্ব অস্তিত্বের ও পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। রাজবাড়ির চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ দিঘির ন্যায় চৌগড় নামে পরিখা আছে। তদ্বারা তন্মধ্য স্থানটি একটি সমচতুষ্কোণ আকারে দৃশ্যমান হয়। উহাকেই এক্ষণে বল্লালবাড়ি বলে। এই চতুষ্কোণটির আয়তন ৪ দ্রোণ।[৩১] উহার পূর্ব দিকে রাজবাটির প্রবেশ দ্বার। উত্তর দিকেও একটি গুপ্ত দ্বার অর্থাৎ খিড়কি ছিল। ওই সকল চৌগড় গভীর। তাহা যে শীঘ্র ভরাট হইয়া চতুর্দিকস্থ ভূমি সকলের সমান উচ্চ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৈত্র কি বৈশাখ মাসে সে সকল স্থানে এক্ষণে ধান রোপন হইয়া থাকে। সমস্ত চৌগড়ের বাহিরের দিকের অর্ধভাগ তৎপার্শ্ববর্তী ভূমির অধিকারীরা ভোগ করে ; ভিতরের দিকের অর্ধভাগ বল্লালবাড়িরই সামিল আছে। বল্লালবাড়ির অভ্যন্তর ভাগে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহাকে মিঠা পুষ্করিণী বলে। ঐ পুষ্করিণীও শুষ্ক অবস্থায় আছে। তথায় একটি গর্ত আছে, তাহা অগ্নিকুণ্ড নামে খ্যাত্। অত্রত্য লোকেরা বলে, তাহা খনন করিলে তাহা হইতে কয়লা নির্গত হয়।

বল্লালবাড়ির অদূর দক্ষিণে রামপালদিঘি নামে এক বৃহৎ দিঘি আছে। সেই দিঘির উত্তর পশ্চিম কোণে এক গজাড়ি বৃক্ষ আছে। তৎপ্রদেশে তজ্জাতীয় বৃক্ষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বৃক্ষের গুঁড়ি অতি প্রাচীন বোধ হয়। তত্রত্য লোকে সেই বৃক্ষের এই পরিচয় দেয় যে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমত রাজ সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহাদের হস্তস্থিত রাজাশীর্ব্বাদোপযোগী পুষ্প রাজার বহির্দ্বারস্থিত হস্তী বন্ধনের স্তম্ভকাষ্ঠোপরি স্থাপন করেন ; তাহাতে সেই শুষ্ক কাষ্ঠ সজীব হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল ; সেই বৃক্ষ এই। এই বৃক্ষকে দেবতার আবির্ভাব স্থান বিবেচনা করিয়া তত্রত্য লোকেরা তাহার মূলদেশে সিন্দুর লেপন করিয়া থাকে।

বল্লালবাড়ির পশ্চিম দিকে "কোদাল ধোওয়া দিঘি" নামে আর এক দিঘি আছে। তৎস্থানবাসীরা বলে যে, রামপাল দিঘি খননকালে এত লোক তাহাতে খাটিয়াছিল যে, তাহারা তৎকর্ম সমাপন করিয়া আপনাপন কোদালী দ্বারা এই স্থানে এক এক চটা মাটি খনন করে, তাহাতেই এই দিঘি হইয়াছে। তাহারা এই রূপে এই দিঘি কাটিয়া ইহার জলে আপনাদের রামপাল-দিঘি কাটা কোদালী শেষবার ধৌত করিয়াছিল। তাহাতেই ইহার "কোদালী ধোওয়া" এই নাম হইয়াছে।

উক্ত বল্লালবাড়ির নিকটস্থ অনেক স্থান এখনো শাখারিবাজার, তাঁতিবাজার, লাখিবাজার

প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ইহা বাস্তবিক কথা, যখন (ইংরাজি ১৬০৮ অব্দে[৩৩]) ঢাকা নগর স্থাপিত হয়, তখন ওই সকল স্থান হইতে অনেক শাঁখারি, তাঁতি ও সাহা আসিয়া ঢাকায় বসতি করে। এরূপ কথিত হয় যে, লক্ষ টাকার সঙ্গতি সম্পন্ন না হইলে কেহ উক্ত লাখিবাজারে ব্যবসায় করিতে পাইত না।

বল্লালবাড়ি নামক স্থানের চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত স্থানে স্থানে অল্প অল্প ইস্টক বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সেই সকল স্থান খনন করিলে অনেক স্থলে বিস্তর ইস্টক বাহির হইয়া পড়ে। আমি স্বয়ং জরিপ সম্বন্ধীয় রাজকার্যোপলক্ষ্যে তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিয়াছি, রামপালের নিকটবর্তী বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী কোন ভদ্রলোকের মজুরগণ তাঁহার গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে এক স্থান খনন করিতেছিল, হঠাৎ ভূমির নিম্নে বৃহৎ এক রাশি (প্রায় তিন লক্ষ) উত্তম ইস্টক প্রাপ্ত হইল। সেই ইস্টক কোন গৃহ নির্মাণার্থ কোন কালে ব্যবহৃত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। লোকে নতুন ইস্টক যেরূপ পাঁজা সাজাইয়া রাখে, তাহা সেইভাবেই ছিল। সেই ইস্টকে ঐ ভদ্রব্যক্তির কাঁচা বাড়ি সকল পাকা হইয়াছে। শুনা গেল আরো অনেক লোকে ঐ রূপে রাশি রাশি ইস্টক প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেনের রাজধানী অতি বিস্তৃত ছিল।

উক্ত রাজধানী হইতে বহুদূর পর্যন্ত অনেক পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুই একটি পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান দেখা যায়। একটি পথ রামপাল দিঘি হইতে দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে। কাঁচকি দরজা নামে আর একটি পথ পশ্চিমে পদ্মানদী পর্যন্ত ছিল। সুবচনী খালের তীরবর্তী বড় মোকম স্থান হইতে কনকশার[৩৪] গ্রাম পর্যন্ত এই শেষোক্ত পথের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। রাজার নিমিত্ত পদ্মানদী হইতে প্রত্যহ কাঁচকি মৎস্য ধৃত হইয়া এই পথ দিয়া রাজবাটিতে নীত হইত ; সেই উপলক্ষে ইহার কাঁচকি দরজা[৩৫] নাম হইয়াছিল।

রামপাল ও তন্নিকটবর্তী অনেক স্থানের ভূমি খনন করিতে করিতে অনেক লোক বহুমূল্য প্রস্তর এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার বারুই জাতীয় এক ব্যক্তি ঐরূপে একখণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিল। সে তাহার মূল্য না জানিয়া তাহা এক স্বর্ণকারকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করে। পরে স্থির হয় যে, ঐ প্রস্তর খণ্ডের মূল্য আশি হাজার টাকা। এই বিষয় লইয়া সদর দেওয়ানী আদালত পর্যন্ত এক মোকর্দ্দমা চলিয়াছিল। তদ্বৃত্তান্ত ডাক্তার টেলরের টপগ্রেফি গ্রন্থে লিখিত আছে।

রামপাল ও তন্নিকটবর্তী স্থানের ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহা রম্ভা, বার্তাকু, আর্দ্রক প্রভৃতি বহুতর ফল মূল প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু এক কালে ইহাতে যে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিপূর্ণ লক্ষ্মীর নিবাস স্বরূপ রাজধানী ছিল, তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!!

১. রাজা আদিশূর রাজা মাধবশূরের পুত্র।
২. ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোত্থ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ।।
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ।।
৩. পরিশিষ্ট দেখ।
৪. পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ।।
৫. এই সম্প্রদায়স্থ কায়স্থেরা চিরদিন এই সকল গোত্রে পরিচিত হইতেছেন।

৬. বিক্রমপুরস্থ সে রাজধানীর কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা বল্লাল সেনের রাজধানী বলিয়াই তদ্দেশে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহাই যে আদিশূরের রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায়। প্রবাদ আছে যে, কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ জামাজোড়া, উষ্ণীষ, ঢাল ও তরবারি আদি ধারণ ও ঘোটকারোহণ পূর্বক আসিয়াছিলেন; তাহাদিগকে ঐরূপ যুদ্ধবেশধারী দেখিয়া আদিশূর প্রথমত অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তাহারা রাজার তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়া বহির্দ্বার হইতেই প্রত্যাগমন করিতে উদ্যুক্ত হয়েন; এবং রাজাকে আশীর্বাদ করিবেন বলিয়া হস্তে যে পুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিকটস্থ হস্তী বন্ধনের স্তম্ভ কাষ্ঠোপরি স্থাপন করেন। তাহাতে সেই শুষ্ক কাষ্ঠ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বৃক্ষ অদ্যাপি উক্ত রাজধানীর নিকটে প্রদর্শিত হয়। আর রাজা বল্লালসেন যে রাজা আদিশূরের অব্যবহিত পরেই সেই সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার প্রমাণ ঘটকদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে আগত উক্ত কায়স্থদিগের পুত্রগণকেই কৌলিন্য মর্যাদা প্রদান করেন।

৭. এই চারিজন কায়স্থের মধ্যে নারায়ণ গুহ ও তদ্বংশীয়েরা দেশেই কুলীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ে যাহারা গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গুহ বংশীয়েরা কুলীন পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রসিদ্ধি আছে, "বঙ্গে গুহঃ কুলীনঃ।"

৮. এই প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে যে কায়স্থগণ আইসেন, তাহারা পূর্বে ব্রাহ্মণদিগের "দাস" ছিলেন না, এইখানে আসিয়া "দাসত্ব স্বীকার" করিয়াছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কোন কোন কায়স্থ যে বিচার করিতেছেন যে, কায়স্থেরা শূদ্র নহেন, এই বৃত্তান্তে সেই মত সমর্থিত হইতেছে।

৯. ১৫৭৪ খ্রিঃ অব্দে মুসলমানগণ জেলা বাকরগঞ্জ অধিকার করে।

১০. ইহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন।

১১. ইহার বিষয় আকবর বাদসাহের সময়ে লিখিত "ছয়রল্ মত খরীন" নামক পারসি গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

১২. ফজলগাজির নবম পূর্বপুরুষের নাম পলওয়ান সাহা। ইনি দিল্লি হইতে আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পরাজয় করিয়া তথাকার প্রথম জমিদার হয়েন।

১৩. সাতৈল এক্ষণে পাবনা জেলার চাটমহল স্টেশনের অধীন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ রাজা রঘুনন্দন উক্ত সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন।

১৪. প্রবাদ আছে, নাটোরের রাজা রঘুনন্দন পূর্বে পুটিয়াধিপতির অধীনে কোন ক্ষুদ্র কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

১৫. এই রাজবংশের রাজা কংশনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিরাবিলপটীর নিয়মবন্ধন করেন। ঐ বংশের শেষ রাজার নাম রাজা শিবপ্রসাদ।

১৬. এই রাজবংশের রাজা গণেশ রায় বিখ্যাত ছিলেন। তাহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন।

১৭. এই সাতাইশ ঘর কায়স্থের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস, ইহাদের বঙ্গদেশে আগমন বৃত্তান্ত পূর্বে কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েক ঘর কায়স্থ, কেহ বা ঐ সকল কায়স্থেব পূর্বে, কেহ বা তাহাদের পরে রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে আসিয়াছেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যাহারা এইরূপে দেশান্তর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রাধান্য লাভ করেন, তাহাদের এক এক শ্রেণী এক এক ব্যক্তির সন্তান, অতএব তাহাদের শ্রেণীভেদে এক এক গোত্র। কিন্তু কতকগুলির সমান উপাধিধারী কায়স্থের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রও দৃষ্ট হয়। যথা—

ঘোষ—সৌকালীন, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য গোত্রীয়।

গুহ—কাশ্যপ ও কক্ষীশ গোত্রীয়।

দত্ত—মধুকুল্য, শাণ্ডিল্য, অগ্নিবাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ ও আলম্বান গোত্রীয়।

দাস—কাশ্যপ, মধুকুল্য, গৌতম, আলম্বান ও আত্রেয় গোত্রীয়।

সেন—আলম্বান ও বাসুকী গোত্রীয়।

দে—ঘৃতকৌশিক, আলম্বান, কাশ্যপ, পরাশর, মধুকুল্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ গোত্রীয়।

চন্দ—কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয়।

বিষ্ণু—বৈয়াঘ্রপদ্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও গৌতম গোত্রীয়।

সিংহ—বাৎস্য, গৌতম ও ঘৃতকৌশিক গোত্রীয়।

কর—আলম্বান, কাশ্যপ, গৌতম ও জামদগ্ন্য গোত্রীয়।
দাম—শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রীয়।
কুণ্ড—শাণ্ডিল্য ও গৌতম গোত্রীয়।
রক্ষিত—মধুকুল্য ও বাৎস্য গোত্রীয়।
নন্দী—কাশ্যপ, মধুকুল্য ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়।

কিন্তু বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান কায়স্থদিগের এক এক গোত্রই প্রসিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো এক গোত্র ভিন্ন আর গোত্র নাই' যথাক্রমে তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে। বসু গৌতম গোত্রীয় ; মিত্র বিশ্বামিত্র গোত্রীয় ; নাগ সোপায়ন গোত্রীয় ; নাথ পরাশর গোত্রীয়। ইহাদিগের অন্য গোত্র নাই। বিভিন্ন গোত্রীয় প্রধান শ্রেণীস্থ কায়স্থদিগের মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ, কাশ্যপ গোত্রীয় গুহ, মধুকুল্য গোত্রীয় দত্ত, কাশ্যপ গোত্রীয় দাস, বাসুকী গোত্রীয় সেন, বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ, আলম্বান গোত্রীয় দে এই সকল কায়স্থেরা প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত অষ্টপ্রকার দত্তদিগের মধ্যে মধুকুল্য গোত্রীয় দত্তেরা মধ্যল্য। অপর সপ্ত গোত্রীয় দত্তেরা উত্তম সম্বন্ধ করিলে মহাপাত্র হইতে পারেন। "সপ্ত দত্তা মহাপাত্রাঃ সম্বন্ধরূপতঃ সুধীঃ।"

১৮. দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর কুলীন ; দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ এই আট ঘর মৌলিক ; তদ্ভিন্ন সমুদায় কায়স্থ অপকৃষ্ট কায়স্থ ও 'বাহাত্তরে' নামে আখ্যাত।

১৯. এস্থলে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ আবশ্যক যে, (৪২২) মধ্যল্য ও মহাপাত্র বলিয়া যাহাদিগকে লিখা গেল, তাহাদের সেই উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ—যথা, দত্ত, নাগ, সেন, সিংহ ইত্যাদি হইলেই মধ্যল্য ও মহাপাত্র হয় না। যে সকল বিশেষ ঘরে ঐ সকল মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে, তাহারাই ঐ পদের অধিকারী।

২০. সম্প্রতি বঙ্গজ কায়স্থগণ পর্যায় গণনার ব্যতিক্রম করিতেছেন। তাহারা বলেন যে, সমান পর্যায়মত কর্ম করা বিহিত বটে ; কিন্তু তাহারা পিতৃপর্যায়স্থিত বর বা কন্যার সহিত বিবাহ হইলেও পর্যায় রক্ষা হয় বিবেচনা করেন, পিতামহ পর্যায়ে বিবাহ হইলে পর্যায় ভঙ্গ বোধ করেন। যাহারা নিম্ন পর্যায়স্থ হইয়া এক বা দুই বা ততোধিক উচ্চতর পর্যায়স্থ কন্যার সহিত বিবাহ করেন, তাহাদের ঐ ঐ সংখ্যক পর্যায় জিত হইল বলেন।

২১. কুলজ কিরূপে হয়, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

২২. বল্লাল সেন কুলপ্রথার প্রবর্তক। তাহার প্রবর্তিত প্রথা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে বর্ধমান ও মেদিনীপুর, উত্তরে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর এবং দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে। এই চতুঃসীমান্তবর্তী স্থানের যে কোন স্থানে হউক, কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ বাস করিলে তাহাদের কুল নষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল বঙ্গজ কায়স্থগণের সম্বন্ধে এই সীমা নির্ধারণরূপ একটি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অবশ্যই বল্লালী প্রথা বিরুদ্ধ ও অন্যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বহু দিনাবধি কার্যে পরিণত হইয়াছে।

২৩. এই স্থান সম্বন্ধে আরও দুইটি প্রবাদ আছে। (১) বলরাম এই নদের উৎপত্তি স্থান হইতে লাঙল চালাইয়া উৎখাত করতঃ এই স্থানে আসিয়া লাঙল চালান স্থগিত করেন, তাহাতেই ইহার "লাঙলবন্দ" এই নাম হয়। (২) ঐ স্থানের নিকটবর্তী পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম পঞ্চমীঘাট হয়। পঞ্চমীঘাটও উক্ত নদের পশ্চিম তীরবর্তী। হিন্দুগণ এই স্থানদ্বয়কে তীর্থজ্ঞান করিয়া চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান করিয়া থাকেন।

২৪. ত্রিপুরা জেলার জরিপ সুপারিনটেন্ডেন্ট জে এফ্ ব্রাউন, সি এস এই বৃত্তান্ত তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন।

২৫. ইনি চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ইছামতী নদীর উত্তরে ছোট বাজুস্থিত উলাইল গ্রামে গিয়া বাস করেন। চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ঐ বর্জিত স্থানে বাস করাতে তাহার কুল নষ্ট হয়, কিন্তু তিনি কুলীনগণের সহিত আদান প্রদান করাতে কুলজ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তদ্বংশীয়েরা কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া আপনাদের কুলজ মর্যাদা স্থিরতর রাখিয়াছেন।

২৬. ঢাকা জেলার মধ্যে তালিপাবাদ নামক এক পরগণায় অতি পূর্বে পাল বংশীয় যশোপাল নামক এক রাজা ছিলেন। তাহার গৃহে যশোমাধব নামক এক বিগ্রহ ছিলেন। সে রাজবংশ ধ্বংস হওয়াতে রাজপুরোহিত উক্ত বিগ্রহকে সে স্থান হইতে আনিয়া "ঠাকুর বাড়ি পঞ্চাশ গ্রাম" নামক গ্রামে আপনার বাড়িতে রাখেন। পরে ঐ যশোমাধব ঠাকুরকে লইয়া যাইবার জন্য বঙ্গাধিকারী চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পুরোহিত অন্য কোন উপায় না পাইয়া বিগ্রহকে ধামরাই গ্রামস্থিত তাহার জামাতৃগৃহে লইয়া রাখেন। এই বিষয় লইয়া নবাবের নিকট এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ

পুরোহিতের জামাতা সেই বিগ্রহের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমার ফয়শলার তারিখ ১০৭৯।১০ই আষাঢ়। সেই ধামরাই গ্রামস্থ লোকেরা বলেন, বাসুদেব তথায় যশোমাধবের পূর্ব হইতে স্থাপিত।

২৭. জমিদারি।

২৮. নফর শব্দের অর্থ সেবাকারী ভৃত্য। প্রাচীনকালে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ লোকদিগের যেরূপ অস্পৃশ্য ঘৃণার্হ জাতি ছিল, এক্ষণে তাহারা সে রূপ ছিল না ; এক্ষণে শূদ্র ভৃত্যগণ বোধহয় ঐ সকল শ্রেষ্ঠ জাতির গৃহমধ্যস্থ সকল কর্মই করিত ; বহির্ভাগের নিকৃষ্ট কার্য সকল সম্পাদন করিবার জন্য আর একজন ভৃত্য ছিল, তাহারা চণ্ডাল শ্রেণীয় ; তাহারাই প্রাচীনকালের শূদ্রের ন্যায় উক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের নিকট অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ নফরগণ এখনো প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারদিগের সেবার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে শূদ্র নফরগণ শিকদার এবং চণ্ডাল নফরগণ শানা নামে আখ্যাত। শূদ্র নফরদিগের বাসস্থানকে শূদ্রপাড়া বা শিকদারপাড়া এবং চণ্ডাল নফবদিগের বাসস্থানকে শানাপাড়া কহা গিয়া থাকে। কায়স্থগণ এরূপ শূদ্র ও শূদ্র নফর হইতে ভিন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহাও উক্ত কায়স্থ মহাশয়ের এইরূপ ভৃত্যগণনা দ্বারা প্রকাশ পায়।

২৯. বাকরগঞ্জের কালেক্টর বেবরিজ সাহেব মহোদয় অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়েছেন যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটির নিকট এক পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম কামান তালাও ; সেখানে অনেক কামান থাকা সম্ভব।

৩০. ৪ বিঘাতে এক কানি এবং ১৬ বিঘাতে এক দ্রোণ হয়।

৩১. এই অগ্নিকুণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে— রাজা বল্লালসেনের সময়ে পীর আদম নামে এক মুসলমান যোদ্ধা তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা তাহার সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া রাজধানী হইতে গমনের পূর্বে ঐ অগ্নিকুণ্ড খনন করেন এবং স্বীয় অন্তঃপুরস্থ পরিবারদিগকে বলিয়া যান যে, তিনি তাঁহার সহিত দুইটি পায়রা লইয়া চলিলেন ; যদি সেই পায়রা দুইটি উড়িয়া ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে তাঁহারা জানিবেন যে, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন এবং তাহা হইলে তাহারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিবেন ; আর যদি পায়রা দুইটি উড়িয়া না আইসে, তাহা হইলে তাহারা জানিবেন যে, তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। এই যুদ্ধে রাজা জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়াতে পায়রাগুলির প্রতি যথোচিত মনোযোগ করিতে পারেন নাই। পায়রাদ্বয় কোন প্রকারে আলগা পাইযা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। সেই পায়রা দর্শন করিয়া পূর্ব নিবন্ধানুসারে সমস্ত রাজপরিবার সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই নিদারুণ দুর্ঘটনা দর্শন করিলেন এবং শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আপনিও সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। এই প্রবাদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় না। তাহার কারণ এই যে, বল্লালসেনের সময়ে কোন মুসলমান বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পীর আদম যে সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন, সে বল্লালসেনের সময়ের অনেক পরে বলিয়া বিবেচিত হয়। পীর আদমের নির্মিত মসজিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে ; কিন্তু বল্লালসেনের নির্মিত কোন গৃহ বা মন্দির দৃষ্ট হয় না। ঢাকার মেজিস্ট্রেট ডি আব লায়েল সাহেবের নিকট ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস ওয়াইজ সাহেব ইংরাজি ১৮৭২ সনের ১৫ মার্চ তারিখে ১৫২ নম্বর চিঠি দ্বারা সোনারগাঁ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে এইরূপ লিখা আছে, "ইংরেজি ১২০৩ সনে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণের পূর্বে সুবর্ণগ্রামে এক হিন্দু রাজধানী ছিল। এই সময় রাজা লক্ষ্মণসেন নদিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক ঐ স্থান অধিকৃত হইলে রাজা তাঁহার পূর্ব পুরুষ বল্লালসেনের বাসস্থান বিক্রমপুরে পলাইয়া যান। তিনি বিক্রমপুর কি সুবর্ণগ্রাম ইহার কোন এক স্থানে থাকিয়া সমুদায় পূর্ববাংলা শাসন করিতেন। এখনও বিক্রমপুরের লোকেরা অতি গৌরবের সহিত তাঁহার রাজবাটির চতুষ্কোণ স্থানকে "বল্লালবাড়ি" বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে, যখন বল্লালসেন রামপালের রাজত্ব করেন, তখন রামপালের অর্ধক্রোশ দূরে (যেখানে পীর আদমের কবর অদ্যাপি বর্তমান আছে) পীর আদম একদল সৈন্য সহিত হঠাৎ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; তিনি রাজবাটিতে কয়েক খণ্ড গোমাংস নিঃক্ষেপ করায় রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে গমন করেন। এক স্থানে পীর আদম উপাসনা করিতেছিলেন ; রাজা সেই সময় তাহাকে বধ করেন। ঐ স্থানে এখনও একটি মসজিদ আছে। ইহাও জনশ্রুতি আছে যে, ঐ স্থানের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে আবদুল্লাপুরে হিন্দুসৈন্যগণ মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহা দ্বারা পূর্ব কথিত জনশ্রুতি কতকাংশে সত্য বলিয়া বোধ হয়। যদি বল্লালসেন নামে দুই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকেন এবং পরবর্তী বল্লালসেন রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্র হয়েন, তবে বাংলার ইতিহাসের এই অংশে যে গোলযোগ

আছে, তাহা দূর হইয়া যায়।" (ঐ পত্রে লিখা আছে যে, ব্রহ্মপুত্র নদ এখনকার মুন্সিগঞ্জের পূর্ব দিকে ছিল। ইহার বিষয় স্থানান্তরে স্মর্তব্য।)

৩৩. ঢাকার মেডিস্ট্রেট ডি আর লায়েল সাহেবের নিকট ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস ওয়াইজ সাহেব ইং ১৮৭২। ১৫ মার্চ তারিখে ১৫২ নম্বর চিঠি দ্বারা সোনার গাঁ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে রাজমহল হইতে মুসলমান রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া ঢাকাতে স্থাপিত হইবার তারিখ ১৬০৮ খ্রিঃ অব্দ বলিয়া লিখা আছে।

দিল্লিশ্বর আকবর বাদশাহের সময় খালিশা মাহাল ১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে রাজা তোডরমল দ্বারা বন্দোবস্ত হয়। তাহার কাগজপত্র আইন-ই-আকবরির অন্তর্গত। তাহাতে নবম সরকার নামে যে বিভাগ ধার্য হয়, তাহার নাম সুবর্ণগ্রাম। এই সুবর্ণগ্রামের পশ্চিম সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ ; উত্তর সীমা শ্রীহট্ট ; এই সোনারগ্রাম সরকারে পঃ বিক্রমপুর, পঃ বল্‌দাখাল, পঃ দক্ষিণ সাহাপুর ; পঃ দাঁন্দরা এবং পঃ যোগদিয়া ভুক্ত থাকা দেখা যায়। ওই আইন-ই-আকবরিতে সপ্তম সরকার বা বিভাগের নাম বাজুহা লিখিত আছে। ঐ বাজুহা বিভাগের মধ্যেই বর্তমান ঢাকা নগর স্থাপিত ; কিন্তু আইন-ই-আকবরিতে তাহার উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে উহা স্থাপিত হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩৪. প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুড্‌ইভ্‌ চক্রবর্তী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৫. এ অঞ্চলে দরজা শব্দে রাস্তা বুঝায়।

শেরশাহের আমলে
(ষোড়শ শতকে) বাংলাদেশ
পূর্ণিয়া
তিস্তা নং
ব্রহ্মপুত্র নদ
ঘোড়াঘাট
জয়ন্তিয়াপুর
তেলিয়াগড়ি
রাজমহল
শ্রীহট্ট
শেরপুর-আতিয়া
(ময়মনসিংহ)
শেরপুর-মুর্চা
(বগুড়া)
শাহজাদপুর
(পাবনা)
চলনবিল
সোনারগাঁ
চা-সরাই (চাসারা)
চাঁদপুর
বাখরগঞ্জ
মীর সরাই
সীতাকুণ্ড
(কীটগড়)
চট্টগ্রাম
কুতুবদিয়া
কক্স বাজার
দামোদর নং
ব ঙ্গো প সা গ র
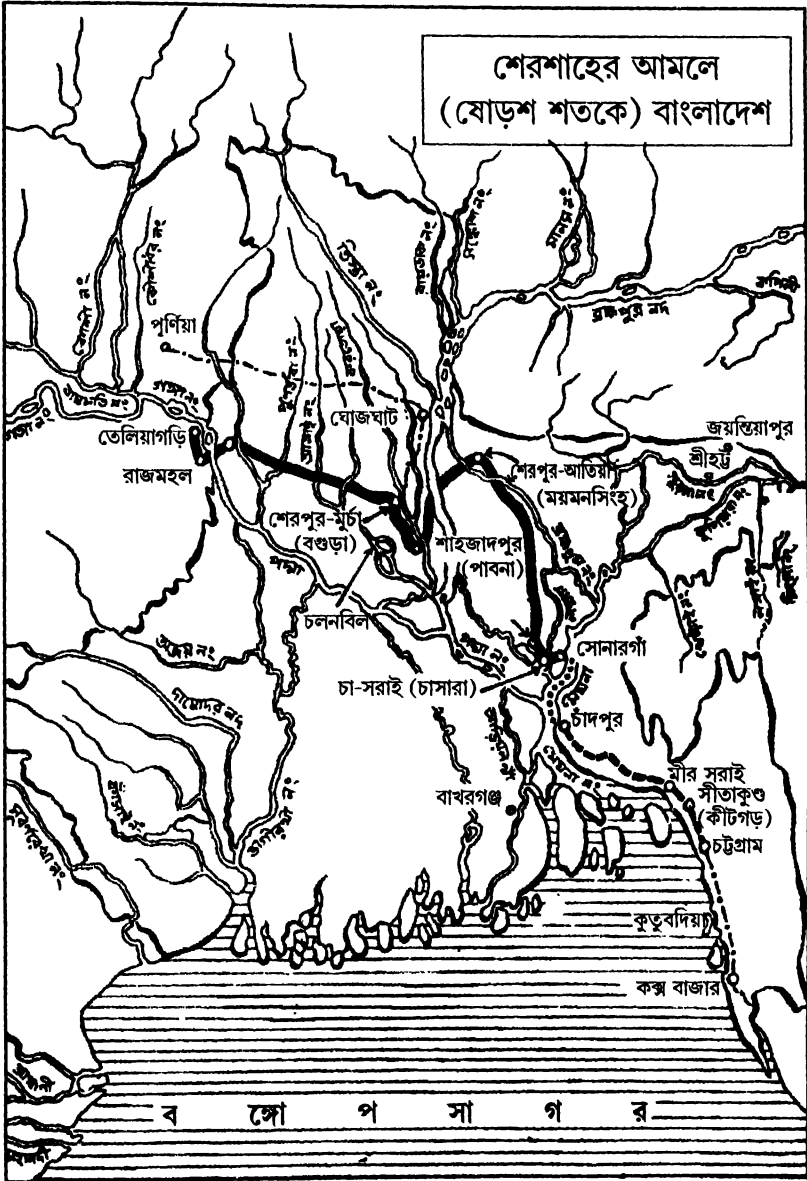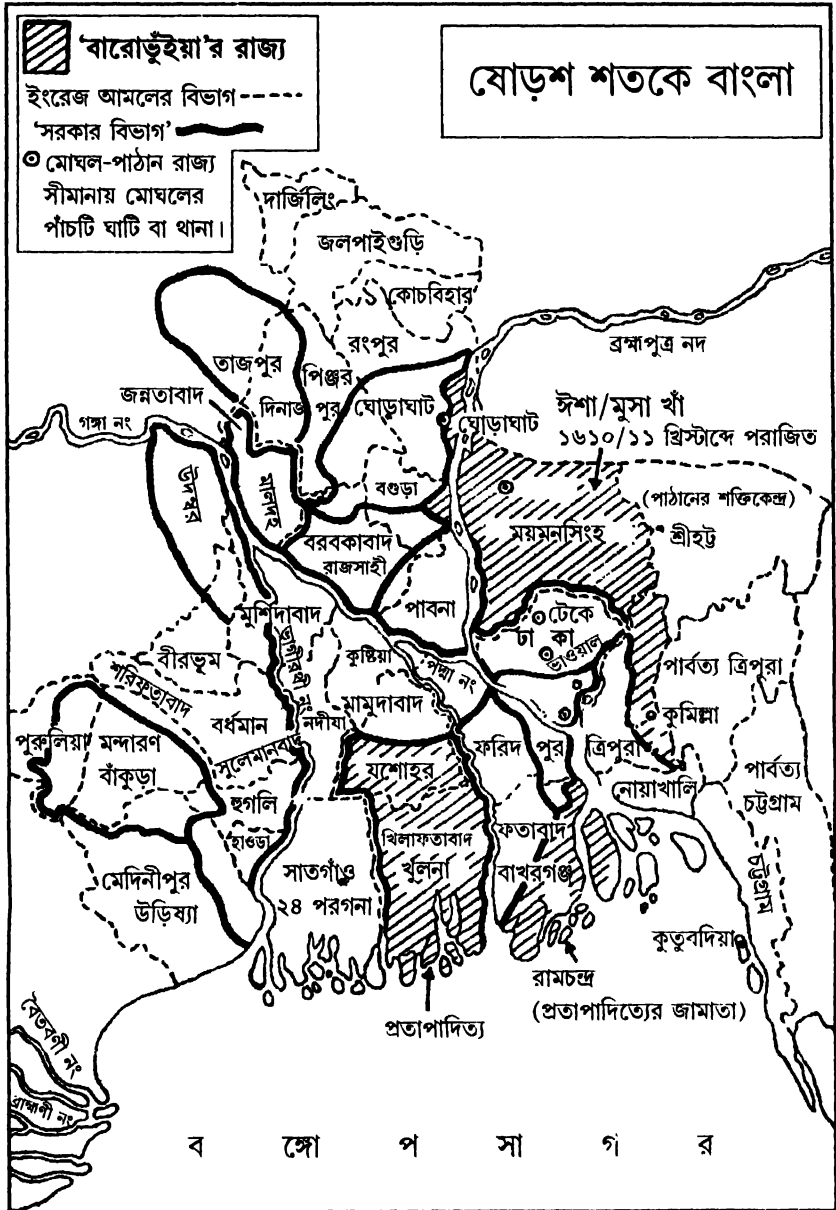
'বারোভুঁইয়া'র রাজ্য
ইংরেজ আমলের বিভাগ
'সরকার বিভাগ'
মোঘল-পাঠান রাজ্য সীমানায় মোঘলের পাঁচটি ঘাটি বা থানা।
ষোড়শ শতকে বাংলা
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
রংপুর
ব্রহ্মপুত্র নদ
তাজপুর
পিঞ্জর
জন্নতাবাদ
দিনাজপুর
ঘোড়াঘাট
ঘোড়াঘাট
ঈশা/মুসা খাঁ
১৬১০/১১ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত
গঙ্গা নং
বগুড়া
(পাঠানের শক্তিকেন্দ্র)
ময়মনসিংহ
শ্রীহট্ট
বরবকাবাদ
রাজসাহী
পাবনা
মুর্শিদাবাদ
টেকে
ঢাকা
ভাওয়াল
বীরভূম
কুষ্টিয়া
পদ্মা নং
পার্বত্য ত্রিপুরা
মামুদাবাদ
কুমিল্লা
পুরুলিয়া
মন্দারণ
বর্ধমান
নদীয়া
ফরিদপুর
ত্রিপুরা
বাঁকুড়া
সুলেমানবাদ
যশোহর
নোয়াখালি
পার্বত্য চট্টগ্রাম
হুগলি
হাওড়া
খিলাফতাবাদ
ফতাবাদ
মেদিনীপুর
উড়িষ্যা
সাতগাঁও
২৪ পরগনা
খুলনা
বাখরগঞ্জ
কুতুবদিয়া
রামচন্দ্র
(প্রতাপাদিত্যের জামাতা)
প্রতাপাদিত্য
বঙ্গোপসাগর

নির্ঘণ্ট